১৯৭২ ১৯৭৫

কয়েকটি দলিল

ড. সাঈদ-উর রহমান

স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমাদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ঘটনা। স্বাধীনচেতা জাতি হিসেবে বাঙালিরা স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে। ১৯৭২ সালে হাজার বছরের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে। প্রথমবারের মতো সুযোগ আসে একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করার, এবং সংগ্রামী মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়ে বিশ্বসভ্যতায় অবদান রাখার।

সে-স্বপ্ন সফল হয়নি। প্রধান কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা। দলমতনির্বিশেষে একতাবদ্ধ হয়ে সে দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করাই ছিল সময়ের দাবি। কিন্তু সে-দাবি জানতে এবং উপলব্ধি করতে ক্ষমতাসীনেরা বিফল হয়। তাঁদের পদক্ষেপগুলি জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি না করে বিভেদকে উস্‌কে দিতে থাকে। তার প্রভাব ও পরিণতি হয়েছিল জাতির জন্য সর্বনাশা। সে-ব্যর্থতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল ১৯৭২-৭৫ পর্বে।

সে-পর্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলির সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। দলিলগুলি প্রামাণ্য। সেগুলি থেকে দেখা যাবে মতাদর্শগত বিভেদের তীব্রতা এবং জাতীয় অনৈক্যের দুঃসহ দৃশ্য।

যুদ্ধে বিজয়ী একটি জাতি কীভাবে দেশগঠনে পরাজিত হচ্ছে তার নিখুঁত আলেখ্য ধারন করছে এই সংকলন।

ড. সাঈদ-উর রহমানের জন্ম ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ, কুমিল্লা জেলার শিমপুর গ্রামে। লেখাপড়া করেছেন গ্রামের পাঠশালা, কুমিল্লা জিলা স্কুল, সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মেধার পরিচয় দিয়েছেন সর্বত্র—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. পেয়েছেন ১৯৭৯ সালে। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নিবিড়ভাবে। শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার মধ্যেই এদেশের সমৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে বলে তিনি মনে করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর—প্রফেসর পদে উন্নীত হন ১৯৯১ সালে। বিভাগের সভাপতি ছিলেন ১৯৯৭-২০০০ টার্মে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সহ সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে।

শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন ও বিজ্ঞানসহ বিচিত্র বিষয়ে তিনি কৌতূহলী। সমকালীন বিষয় নিয়ে নিয়মিত কলাম লেখেন বিভিন্ন দৈনিকে। দুরূহ বিষয়কে সহজে ও সংক্ষেপে বলার এবং লেখার ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছেন। অনুবাদ ও মৌলিক রচনা মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থসংখ্যা এক ডজনের অধিক।

অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমানের সহ ধর্মিণী মিসেস আনিস ফাতেমাও শিক্ষকতা করেন—বর্তমানে ঢাকা কলেজের ইতিহাস বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র অতীশ আসিফ রহমান এ-বছর ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবে।

১৯৭২
১৯৭৫
কয়েকটি দলিল

১৯৭২ ১৯৭৫ কয়েকটি দলিল

ড. সাঈদ-উর রহমান

প্রথম প্রকাশ ❑ জুন ২০০৪
স্বত্ব ❑ লেখক
প্রচ্ছদ ❑ এস কে মাসুম
প্রকাশক ❑ এস কে মাসুম, মৌলি প্রকাশনী, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০
অক্ষর বিন্যাস ❑ হৃদয় কম্পিউটার, ঢাকা-১০০০. মুদ্রণ ❑ আল ফয়সাল
অফসেট প্রিন্টার্স, ঢাকা-১১০০
মূল্য ❑ ৩৫০.০০ টাকা

1972-1975 Koyakty Dolil : By Dr. Sayed-Ur Rahman. Published by
S K Masum, Mauli Prokashoni. 34 North Brook Hall Road.
Banglabazar. Dhaka—1100. Cover design : S.K. Masum
Price : Taka 350.00 Only.
US $ 15

ISBN 984-751-060-1

উৎসর্গ

মোঃ ফকরুজ্জামান
মোঃ জয়নাল আবেদীন
ড. গোলাম মহিউদ্দিন
ও
সুফিয়া ভাবী
অকালে ও সদ্য -প্রয়াত
চার স্বজনকে

লেখকের অন্যান্য বই

১. চারু মুজমদার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (বিশ্ব পরিচয়, ঢাকা)
২. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (অনন্যা, ঢাকা)
৩. পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)
৪. ওদুদ-চর্চা (কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা)
৫. মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা (শিখা প্রকাশনী, ঢাকা)
৬. এ কেমন বাংলাদেশ (হৈমন্তী পাবলিকেশানস্, ঢাকা)
৭. ৭ নভেম্বর : ইতিহাসের মোড়, যৌথ সম্পাদনা (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা)
৮. সামন্তযুগে বাঙালি-সংস্কৃতি : কয়েকটি প্রসঙ্গ (মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা)
৯. অনিশ্চিত গন্তব্যে বাংলাদেশ (মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা)
১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জাতীয় স্বার্থ, যৌথ সম্পাদনা (বই পড়া, ঢাকা)
১১. আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সম্পাদনা (জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা)
১২. শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ (গ্রন্থকানন, ঢাকা)
১৩. একই মায়ের পুত ও অন্যান্য (এশিয়া পাবলিকেশানস্, ঢাকা)
১৪. সাহিত্য-সংস্কৃতির উদার প্রান্তরে (মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা)
১৫. আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা (এশিয়া পাবলিকেশানস্, ঢাকা)
১৬. বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য (সম্পাদক) বাংলা একাডেমী

প্রসঙ্গ-কথা

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সাড়ে তিনবছর তথা ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত পর্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালের সমাজ ও রাজনীতি ভালভাবে বোঝার জন্য এই অধ্যায়টি সম্পর্কে যথার্থ ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

এদেশের মানুষ হাজার-হাজার বছর ধরে লড়াই করে আসছে প্রকৃতি ও মানুষের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। একদিকে বন্যা-প্লাবন-ঘূর্ণিঝড়, ওলাওঠা-বসন্ত-মহামারী অপরদিকে ঠগী-বর্গী-বানিয়া। বাঙালি মানস ও চৈতন্য গড়ে ওঠেছে এদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের ফলাফল ধারণ করে।

১৯৭০ সালের মহাপ্লাবন ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাসংগ্রাম পুরানো ঐতিহ্যেরই ধারাবাহিকতা– এমন অভিমত কারো কারো আছে। হলেও হতে পারে, কিন্তু পরিসংখ্যান ও ব্যাপকতায় এ-দুয়ের সঙ্গে পূর্বের অনুরূপ কোন ঘটনারই তুলনা সাজে না। সত্তরের মহাপ্লাবনে প্রাণ হারিয়েছেন কয়েকলাখ মানবসন্তান, আর একাত্তরের মহাআহবে শহীদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। এত অল্পসময়ে এত ছোট অঞ্চলে এত বেশি প্রাণহানির নজির ইতিহাসে নেই।

মুক্তিযুদ্ধ যথার্থ অর্থেই জনযুদ্ধ ছিল–সেটা দুই পেশাদার সেনাবাহিনীর লড়াই ছিল না। শেষোক্তভাবে বিবেচনা করা হলে যথার্থ পরিচয় হয়না। সর্বশ্রেণীর সব মানুষ– ধনী-গরীব, গ্রাম্য-শহুরে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এতে শামিল হয়েছিলেন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল দুনিয়া জুড়ে। ইতিহাসখ্যাত ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধে সাধারণ মানুষ ছিলেন নিস্পৃহ দর্শক : ১৯৭১ সালের যুদ্ধে হয়ে উঠেছিলেন কুশীলব। তারা লড়েছিলেন সোনালী ভবিষ্যতের আশায়। দুঃখ-কষ্ট-অত্যচার-নির্যাতন ছিল প্রচণ্ড– কিন্তু স্বপ্ন ছিল আকাশচুম্বী : সমাজ বদলাবে, বৈষম্য দূর হবে, রক্তস্রোতে অবগাহন করে জেগে উঠবে নতুন মানুষ।

তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। রাষ্ট্র-সরকার-সমাজ সবই চলছিল সনাতন ধারাবাহিকতায়। যুদ্ধ-বিজয়ী মুক্তিসেনাদের ক্ষোভ ও হতাশাই, ছিল সর্বব্যাপী। তারই ফলে স্বাধীনতা-পরবর্তী অধ্যায়টি ছিল বিক্ষুব্ধ মানুষের আন্দোলনে উত্তাল সাগরের মত।

সেই অধ্যায়ের সংবাদ আমরা খুবই কম জানি। যা জানা আছে তার মূল্যায়নও পরস্পর-বিরোধী। একদল মনে করেন সেটা ছিল সোনালী অধ্যায়, আরেকদল মনে করেন সেকালটি ছিল ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত।

ইতিমধ্যে তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সবার আবেগ অনেকটা থিতিয়ে এসেছে। পর্বটিকে মোহমুক্তভাবে দেখার আগ্রহ আছে অনেকের। বাংলাদেশের ১৪

কোটি মানুষের মধ্যে ১০ কোটির জন্ম ১৯৭০ সালের পর। মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা নেই। বর্তমান সংকলনটি তাদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

সংকলনভুক্ত বেশ কয়টি দলিল আমার নিজস্ব সংগ্রহের। দৈনিক বাংলা থেকে নিয়েছি কয়েকটি– দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক থেকে দু-চারটি। যথাযথ উৎস নির্দেশ আছে সবগুলির।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত দলিলের সংখ্যা মাত্র ৫০। অনেক মূল্যবান দলিল প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। যত বেশি দলিল প্রকাশিত হবে ততই সহজ হয়ে আসবে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ঐ পর্বটিকে অনুধাবন করার কাজটি।

বিষয় ও প্রকাশকাল মিলিয়ে দলিলসমূহ বিন্যাস করার আগ্রহ থাকলেও সর্বত্র তা করা সম্ভবপর হয়নি। কয়েকটি দলিলের প্রকাশকাল জানা যায়নি। জাতীয় সংসদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার একটি বক্তৃতা (পৃ. ১২৩–১২৭) যাওয়া উচিত ছিল লীডার অব দি হাউস 'শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার (পৃ. ১৩৯–১৫৩) পরে।

মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে পাক-সেনাবাহিনীর ১৯৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অপরাধীদের তালিকা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ, তাদের সংস্থার প্রকাশিত *'৭১ : গণহত্যার দলিল,* (প্রকাশের তারিখ নেই।) বই থেকে। তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। জনাব হেদায়েত হোসাইন মোরশেদের দুটি বিশিষ্ট ও বিশদ রচনা অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি তাঁর সৌজন্যে। লেখা দুটি সংকলনের মান বৃদ্ধি করেছে।

মৌলি প্রকাশনীর জনাব এস কে মাসুম পান্ডুলিপি হাতে পেয়ে মুদ্রণখানায় পাঠাতে দেরি বা দ্বিধা করেননি। আমার ছোট পরিবারের বাকি দুই সদস্য রলী ও জিকো কাজ করার পরিবেশ তৈরি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

সাঈদ-উর রহমান

১ বৈশাখ ১৪১১

১৪ এপ্রিল ২০০৪

সূচিপত্র

২৫ মার্চের (১৯৭১) রাত প্রসঙ্গে বেগম মুজিব / ১১
যে রাতে মুজিব বন্দী হলেন / ১৩
যুদ্ধের দিনগুলিতে বেগম মুজিব / ২২
যুদ্ধের দিনগুলিতে বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর পরিজনেরা / ২৬
চট্টগ্রামে যেমন করে স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়েছিল / ৩০
মুক্তিযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল / ৩৬
প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের টিভি ভাষণ / ৪৮
বাংলাদেশের জনসভায়
শেখ মুজিবের প্রথম ভাষণ / ৪৯
আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ
সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রিপোর্ট / ৫১
NOTIFICATION
BANGLADESH COLLABORATORS
(SPECIAL TRIBUNALS) ORDER, 1972. / ৬২
মার্কসবাদী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে–কমরেড
লেনিন কর্তৃক প্রদর্শিত পথে-বাংলাদেশের বাস্তব
অবস্থার নিরিখে একটি সুশৃঙ্খল, সুসংহত
বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলুন / ৭০
জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার রূপরেখা ও কর্মসূচি / ৮০
ইন্দিরা গান্ধী জবাব দেবেন কি? / ৮৯
ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ / ৯২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের
মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তিচুক্তি / ৯৭
"ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ও রক্ষা চুক্তি" নামধারী
দাসত্বমূলক চুক্তিটির কবর রচনা করুন /১০১
আরেকটি গণহত্যার চক্রান্ত চলছে / ১০৭
সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা
খন্দকার মোশ্‌তাক আহ্‌মদ / ১১১
শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা / ১২৩
শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা / ১২৮
আ: রাজ্জাক ভূইয়া
ও শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা / ১৩৭
গণপরিষদে সংবিধান-বিলের আলোচনায় 'লীডার অব দি হাউস
শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা / ১৩৯
বাংলাদেশ ভারতের উপনিবেশ? / ১৫৪
মুজিববাদ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান / ১৭০
বাংলাদেশ কৃষক সমিতি
পূর্বাঞ্চল সম্মেলন / ১৭৩
অহিংসা ও বিপ্লব / ১৭৬

দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্তদের প্রতি
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা / ১৮০
যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা ঘোষণার চুক্তি / ১৮২
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যদের নাম / ১৮৬
সত্যিকারের স্বাধীনতা ও মুক্তির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। / ১৯২
ব্যর্থ–অযোগ্য ও দেউলিয়া সরকারের পদত্যাগ চাই / ১৯৮
পূর্ব বাংলার বীর জনগণ, আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি,
পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন
করার মহান সংগ্রাম চালিয়ে যান! / ২০৭
মিথ্যার মুখোশ উন্মোচিত করুন
জাতীয় মুক্তির পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরুন / ২১৭
এই দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন আর না হয় / ২২৩
বাংলাদেশ গণ ঐক্যজোটের ঘোষণা / ২২৫
বঙ্গবন্ধুর আবেদন / ২২৯
অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য ১৯৭৩ সালে সেনাবাহিনীর অপারেশন / ২৩১
গ্রেটবাংলা / ২৩৭
সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী / ২৪৫
সভাপতির ভাষণ
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল / ২৪৭
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি / ২৫৭
ছাত্র-সমাজের আহ্বান
১০ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ
ছাত্র-গণ আন্দোলন গড়ে তুলুন / ২৬০
পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের উদ্দেশ্যে
সিরাজ সিকদারের জরুরী আহ্বান / ২৬৩
রংপুর : কয়েকটি মুখ ক'টি দৃশ্য / ২৬৯
মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন / ২৯২
খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে জাতীয় সংসদে খাদ্যমন্ত্রী
জনাব আবদুল মমিনের বিবৃতি / ২৯৬
এই কি সোনার বাঙলা?
শেখ মুজিব জবাব দাও / ৩১০
রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে অরুণা সেনের বিবৃতি / ৩১৫
সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী উপলক্ষে জাতীয় সংসদে শেখ মুজিবের ভাষণ / ৩২১
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের
গঠনতন্ত্র / ৩৩৫
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের
কার্যনির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি / ৩৫১
স্বৈরাচারী একনায়কত্ব বাঙালি মানে না / ৩৫৪
'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ-১৯৭৩' পরিবর্তন করার জন্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের প্রস্তাব / ৩৬০

২৫ মার্চের (১৯৭১) রাত প্রসঙ্গে বেগম মুজিব*

গত বছর ২৫শে মার্চের সকাল থেকে বাড়ির অবস্থা ভার ভার লাগছিল। দুপুর তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। আমাদের বাসার সামনে দিয়ে সৈন্য বোঝাই দুটো ট্রাক চলে গেল। দোতলা থেকেই ট্রাকগুলো দেখে আমি নিচে নেমে এলাম। শেখ সাহেব তখনও আগত লোকদের সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত। তাঁকে ভেতরে ডেকে মিলিটারী বোঝাই গাড়ি সম্বন্ধে বলতেই দেখলাম পলকের তরে মুখটা তাঁর গম্ভীর হয়ে গেল। পরক্ষণেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত দিনটা কেটে গেল থমথমে ভাবে। এলো রাত। সেই অশুভ রাত। রাত সাড়ে আটটায় তিনি সাংবাদিকদের বিদায় দিলেন। আওয়ামী লীগ সহকর্মীদের কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে দ্রুত বিদায় দিলেন।

রাত প্রায় ১০টার কাছাকাছি কলাবাগান থেকে এক ভদ্রলোক এসে শেখ সাহেবের সামনে একেবারে আছড়ে পড়লেন। তাঁর মুখে শুধু এক কথা—আপনি পালান। বঙ্গবন্ধু পালান। ভেতর থেকে তাঁর কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো আমারও মন। বড় মেয়েকে তার ছোট বোনটাসহ তার স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। যাবার মুহূর্তে কি ভেবে যেনো ছোট মেয়েটা আমাকে আর তাঁর আব্বাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো। শেখ সাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে শুধু বললেন—বিপদে কাঁদতে নেই মা।

তখন চারিদিকে সৈন্যরা নেমে পড়েছে। ট্যাঙ্ক বের করেছে পথে। তখন অনেকেই ছুটে এসেছিল ৩২ নং রোডের এই বাড়িতে। বলেছিল—বঙ্গবন্ধু আপনি সরে যান। উত্তরে দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়েছিলেন তিনি—না, কোথাও আমি যাবো না।

রাত ১০টা থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দূর থেকে তখন গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। দেখলাম প্রতিটি শব্দ-তরঙ্গের সাথে সাথে শেখ সাহেব সমস্ত ঘরটার মাঝে পায়চারী করছিলেন। অস্ফুটভাবে তিনি বলছিলেন—এভাবে বাঙালিকে মারা যাবে না—বাংলা মরবে না। রাত ১২টার পর থেকেই গুলির শব্দ এগিয়ে এলো। ছেলেমেয়েদের জানলা বন্ধ করতে যেয়ে দেখতে পেলাম পাশের বাড়িতে সৈন্যরা ঢুকে পড়েছে। স্পষ্ট মনে আছে এ সময় আমি বাজের মতই এক ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেছিলাম—গো অন, চার্জ.....

সেই সাথে সাথেই শুরু হল অঝোরে গোলাবর্ষণ। এই তীব্র গোলাগুলির শব্দের মধ্যেও অনুভব করলাম—সৈন্যরা এবার আমার বাড়িতে ঢুকেছে। নিরুপায় হয়ে বসেছিলাম আমার শোবার ঘরটাতে। বাইরে থেকে মুষলধারে গোলাবর্ষণ হতে থাকলো এই বাড়িটা লক্ষ্য করে। ওরা হয়ত এই ঘরটার মাঝেই এমনিভাবে গোলাবর্ষণ করে হত্যা করতে চেয়েছিল আমাদেরকে। এমনভাবে গোলাবর্ষিত হচ্ছিল সমস্ত বাড়িটা বোধ হয়

---

* দৈনিক বাংলা, ২৬ মার্চ ১৯৭২

ধসে পড়বে। বারুদের গন্ধে মুখচোখ জ্বলছিল। আর ঠিক সেই দুরন্ত মুহূর্তটাতে দেখছিলাম ক্রুদ্ধ সিংহের মত সমস্ত ঘরটার মাঝে অবিশ্রান্তভাবে পায়চারী করছিলেন শেখ সাহেব। তাঁকে ঐভাবে রেগে যেতে কখনও আর দেখিনি।

রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে ওরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে উপরে উঠে এলো। এতক্ষণ শেখ সাহেব ওদের কিছু বলেননি। কিন্তু এবার অস্থিরভাবে বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সামনে। পরে শুনেছি সৈন্যরা সেই সময়ই তাঁকে হত্যা করে ফেলতো যদি-না কর্নেল দু হাত দিয়ে তাঁকে আড়াল করতো। ধীর স্বরে শেখ সাহেব হুকুম দিলেন গুলি থামাবার জন্য। তারপর মাথাটা উঁচু রেখেই নেমে গেলেন তিনি নিচের তলায়। মাত্র কয়েকমুহূর্ত। আবার তিনি উঠে এলেন উপরে। মেজ ছেলে জামাল এগিয়ে দিল তাঁর হাতঘড়ি ও মানি ব্যাগ। স্বল্প কাপড় গোছানো স্যুটকেস আর বেডিংটা তুলে নিল সৈন্যরা। যাবার মুহূর্তে একবার শুধু তিনি তাকালেন আমাদের দিকে। পাইপ আর তামাক হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সাথে। সোফার নিচ থেকে, খাটের নিচ থেকে আলমারীর পাশ থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন দল কর্মী। ওরা আস্তে আস্তে বললো—মাগো আমরা আছি। আমরা আছি। ওদের সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে সে-রাতে কেঁদে ফেলেছিলেন বেগম মুজিব। বলেছিলেন, “খোদার কাছে হাজার শুকুর তোদের অন্তত ফেরত পেয়েছি। তোরা অন্তত ধরা পড়িসনি।” এ পর্যন্ত বলেই তিনি শেষ করলেন সেই রাতটার কথা।

যে রাতে মুজিব বন্দী হলেন*

ব্রিগেডিয়ার (অব.) জেড এ খান

অনুবাদ ঃ ফারুক মঈনউদ্দীন

[পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার (অব.) জেড এ খানের বই 'ওয়ে ইট ওয়াজ'-এ আছে তার নিজ জবানিতে একাত্তরের মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্ণনা। এ সময়ে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, ২৫শে মার্চ রাতে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এ যাবৎ বাংলাদেশের ঘটনাবহুল সেসব দিনের বহু ভাষ্য ও বর্ণনা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের কোনো বিস্তারিত বিবরণ অদ্যাবধি কোথাও পাওয়া যায়নি। 'ওয়ে ইট ওয়াজ' বইটি থেকে সে অভিযানের বর্ণনা এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হলো। পাঠকরা প্রথমবারের মতো জানতে পারবেন ঠিক কিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল।]

মার্চ মাসের ২৩ তারিখের দুপুরে আমাকে জানানো হলো, গ্যারিসনের জন্য খাদ্য সরবরাহ নিয়ে একটা সি-১৩০ কুমিল্লা বিমানবন্দরে পৌঁছেছে। ঢাকায় একরাত থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে ইউনিফর্ম পাল্টে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আমার স্ত্রী বলল আমি যেন আমার অফিসের সেফে রাখা ওর গয়নাগুলো ওকে দিয়ে যাই। সেদিন সন্ধ্যায় অফিসার্স ক্লাবের পার্টিতে ওগুলো পরে যাবে ও। আমাদের ঘরে গয়না রাখার মতো কোনো নিরাপদ জায়গা ছিল না। কুমিল্লার ব্যাংকগুলোতেও লকার ছিল না কোন। আমি গয়নাগুলো এনে দিই ওকে। পরের ঘটনাবলি যেভাবে ঘটেছিল, ভাগ্যিস এনে দিয়েছিলাম ওগুলো।

এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার পথে একটা ন্যাংটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার জীপটা দেখে ছেলেটা হিংস্রভাবে চিৎকার করে ওঠে, 'জয় বাংলা'। আমার আড়াই বছরের মেয়েটাকেও দেখতাম 'জয় বাংলা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ির চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করতে, ওর বড় বোন চাইত ওকে বাধা দিতে।

'সাধারণ ধর্মঘট' শুরু হওয়ার পর আমার ব্যাটালিয়ন থেকে হামজা কোম্পানির একটা প্লাটুন নিয়ে কুমিল্লা বিমানবন্দরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সি-১৩০ বিমানটা কুমিল্লা গ্যারিসনের জন্য রেশন নিয়ে এসেছিল। টিনের দুধ, চিনি ইত্যাদি নামানোর কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা টেক অফ করে। বিমানটার পাইলট ছিল স্কোয়াড্রন লিডার আবদুল মুনিম খান, আমার ছোটভাই স্কোয়াড্রন লিডার শোয়েব আলমের ভায়রা (শ্যালকও হতে পারে–অনুবাদক)। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঢাকায় পৌঁছে যাই।

---

* দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ মার্চ ২০০২

সেদিন ২৩ মার্চ, পাকিস্তান দিবস ছিল বিধায় সকল ভবনশীর্ষে পাকিস্তানি পতাকা উড়ার কথা। আমরা যখন ঢাকার ওপর দিয়ে উড়ছিলাম দেখি সারা শহরে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। আমি ১৪ ডিভিশন অফিসার্স মেসে পৌঁছার পর একজন আমাকে জানায়, কেবল একটা পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে ঢাকার মোহাম্মদপুরের বিহারি কলোনিতে। আরো কজন অফিসারের সঙ্গে আমি একমাত্র পাকিস্তানি পতাকাটা দেখার জন্য ওখানে গিয়েছিলাম।

মেজর বিলালকে জানানো হয়েছিল, সি-১৩০ বিমানটিতে করে আমি যাব। তাই এয়ারপোর্টে গিয়ে ও আমাকে রিসিভ করে। এয়ারপোর্ট থেকে অফিসার্স মেসে যাওয়ার পথে ও আমাকে বলে, ওর প্রতি নির্দেশ আছে যাতে আমাকে মার্শাল ল' হেডকোয়ার্টারের কর্নেল এস ডি আহমদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল বিধায় আমরা অফিসার্স মেসে কর্নেলের রুমে চলে যাই। তিনি আমাকে বললেন, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পরদিন অথবা তার পরদিন গ্রেফতার করতে হবে; আমি যেন প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করি। তিনি আমাকে আরো বললেন, ইউনাইটেড ব্যাংকের জোনাল ম্যানেজার দুটো গাড়ি আমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন যাতে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান, জরিপ ইত্যাদি কাজ সেরে নিতে পারি আমি।

সে সন্ধ্যায় মেজর বিলাল, ক্যাপ্টেন হুমায়ুন এবং আমি ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির চারপাশে ঘুরে আসি। মোহাম্মদপুর থেকে আসা রাস্তা থেকে একটা গলি বাড়িটার সামনে দিয়ে চলে গেছে; গলিটার অন্যপাশে ছিল একটা লেক। বাড়িটার কাছে বেশ বড়সড় একটা জটলা দেখি, পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের প্রহরীও ছিল ওখানে। আমরা সামনে দিয়ে যখন গাড়ি চালিয়ে যাই তখন একদল পুলিশ হিন্দু বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। কেউ আমাদের চ্যালেঞ্জ করেনি। কারণ আমরা ধানমণ্ডিতে ঢুকে আবার বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।

পরদিন সকালে আমরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ধানমণ্ডি যাওয়ার রাস্তাগুলো পরীক্ষা করি। রাস্তা ছিল দুটো। প্রধান সড়কটা ক্যান্টনমেন্ট থেকে 'ফার্মগেট' নামের এক জংশন পর্যন্ত। সেখান থেকে একটা রাস্তা ধানমণ্ডি পর্যন্ত চলে গেছে। দ্বিতীয়টা এমএনএ হোস্টেল থেকে জাতীয় পরিষদ ভবন পর্যন্ত গিয়ে মোহাম্মদপুর-ধানমণ্ডি রোডকে যুক্ত করেছে। ঢাকা বিমানবন্দরে ঢোকা এবং বের হওয়ার সবগুলো রাস্তা ছিল ক্যান্টনমেন্টের দিকে। তবে অন্য পাশে একটা গেট ছিল যেটা দিয়ে এমএনএ হোস্টেল এবং জাতীয় পরিষদ রোডের ওদিকে বের হওয়া যেত। গেটটা তৈরি করা হয়েছিল বিমান পর্যবেক্ষক ইউনিট যাতে এয়ারফিল্ডে আসা-যাওয়া করতে পারে। এ ইউনিটের প্রধান ছিল আমার ছোট ভাই স্কোয়াড্রন লিডার শোয়েব আলম।

শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার আনুষ্ঠানিক আদেশের জন্য আমাকে ২৪ মার্চ বেলা ১১টায় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আমি জেনারেলের অফিসে গেলে তিনি আমাকে বলেন, পরের রাতে মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করতে হবে। তার নির্দেশ শুনে স্যালুট করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে থামালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, কাজটা কীভাবে করতে হবে সেটা শুনতে

চাও না? আমি তাকে বলি, কীভাবে কোনো একটা নির্দেশ পালন করতে হবে সেটা বলে দেওয়ার রেওয়াজ নেই, তবে তার মনে যেহেতু কিছু একটা আছে তিনি তা বলতে পারেন। তখন তিনি বলেন, আমি একটা বেসামরিক গাড়িতে একজন মাত্র অফিসার নিয়ে যেতে পারব এবং সেভাবেই শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করতে হবে। আমি বলি, বাড়ির চারপাশে যে পরিমাণ ভিড় থাকে, তাতে এক কোম্পানির কমে কাজটা করা সম্ভব হবে না। তিনি তখন বললেন, এটা তার নির্দেশ এবং তিনি যেভাবে বলেছেন নির্দেশটা সেভাবেই পালন করতে হবে। আমি তখন তাকে বলি তার আদেশ আমি গ্রহণ করছি না এবং কাজটা করার জন্য তিনি যেন অন্য কাউকে দায়িত্ব দেন। তারপর তিনি কিছু বলার আগে স্যালুট করে তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসি আমি।

বুঝতে পারি বিপদে পড়েছি। দিনের বাকি সময়টা আমি এমন কোথাও যাই না যেখানে আমার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করতে পারে। এ সময় খবর পেলাম মেজর জেনারেল এ ও মিটঠা পিআইএর এক ফ্লাইটে ঢাকা আসছেন; বিকেল ৫টায় তার পৌঁছার কথা। ফ্লাইট যখন পৌঁছে আমি তখন এয়ারফিল্ডে অপেক্ষমান। তার সঙ্গে দেখা করে আমার ওপর নির্দেশের কথা তাকে বলি এবং এটাও জানাই যে, বাড়িটার সামনে সমবেত জনতার কারণে কেবল একটা গাড়ি চালিয়ে গিয়ে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়। জেনারেল ৯টার সময় আমাকে ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

পরদিন সকাল ৯টা বাজার আগেই আমি ইস্টার্ন কমান্ডের কর্নেল আকবরের (পরবর্তী সময়ে ব্রিগেডিয়ার) অফিসে যাই। ঢুকেই দেখি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী সেখানে বসা। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ওখানে কেন গিয়েছি আমি। আমি জানাই, মেজর জেনারেল মিটঠার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। তিনি তখন কর্নেল আকবরকে নির্দেশ দেন যাতে একটা হেলিকপ্টার জোগাড় করে ১৫ মিনিটের মধ্যে আমাকে ঢাকা থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কর্নেল আকবর একবার আমার দিকে আর একবার জেনারেলের দিকে তাকান। তারপর আর্মি এভিয়েশন বেসে টেলিফোন করেন। ফোনে আলাপ শেষ করে বলেন, হেলিকপ্টার তৈরি হতে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। আমি কর্নেল আকবরকে জিজ্ঞেস করি মেজর জেনারেল মিটঠা এসেছেন কিনা কিংবা আসার কথা আছে কিনা। তিনি বলেন, জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কার রুমে আছেন। আমি তখন শরীরটা এমনভাবে ঘুরিয়ে বসলাম যাতে জেনারেল টিক্কার অফিসে ঢোকার দরজাটা দেখা যায়। অস্বস্তিকর ১৫টা মিনিট কেটে যায়। এমন সময় দরজাটা খোলে এবং জেনারেল মিটঠা বেরিয়ে আসেন। আমি এক লাফে কর্নেল আকবরের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে জেনারেলকে ধরি এবং কী ঘটেছে তাকে জানাই। জেনারেলের স্টাফ কার দাঁড়িয়েছিল ওখানে, তিনি আমাকে গাড়িতে উঠতে বলেন। আমরা জেনারেল আবদুল হামিদ খানের বাসার দিকে রওনা হই।

জেনারেল হামিদের বাসার এক ওয়েটিং রুমে প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষার পর আমাকে ভেতরে ডেকে নেওয়া হয়। মেজর জেনারেল মিটঠা আমাকে বলেন, আমি তাকে যা বলেছি সেসব যাতে জেনারেল হামিদকে খুলে বলি। জেনারেল হামিদ আমার কথা

শোনেন, তারপর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে টেলিফোন করে বলেন যে, আমাকে তার কাছে পাঠাচ্ছেন তিনি এবং আমার যা যা প্রয়োজন সব যাতে মেটানো হয়। আর আমাকে তিনি বলেন, শেখ মুজিবকে আমাকেই গ্রেফতার করতে হবে এবং তাঁকে যাতে জীবিত রাখা হয়। আমি যখন বেরোনোর জন্য দরজার কাছে পৌঁছি তিনি আমার নাম ধরে ডাক দেন। আমি ফিরে তাকালে বলেন, মনে রাখতে হবে তাকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরতে হবে, যদি সে মারা যায় তোমাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করব।

আমি তখন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর অফিসে যাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমার কী কী জিনিস লাগবে। আমি বলি তিনটা সেনা বহনকারী গাড়ি এবং বাড়িটার একটা নকশা দরকার আমার। তার কাছে বাড়িটার নকশা ছিল। সেটা আমাকে দিলেন এবং বললেন, গাড়ির ব্যবস্থাও হবে। আমি তাকে বলি, শেখ মুজিবের বাড়ির পেছনে জাপানি কনসালের বাড়ি। সে যদি কূটনীতিকের বাড়িতে ঢুকে পড়ে তাহলে আমি কী করব। জেনারেল সে ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি খাটাতে বললেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি এবং সেখানে যাওয়ার রাস্তার একটা মডেল তৈরি করা হলো; ইস্যু করা হলো গোলাবারুদ। রাতের খাবারে পর আমি আমার কোম্পানিকে ব্রিফ করলাম। কোম্পানিকে তিনটা দলে ভাগ করি আমি। ক্যাপ্টেন সাঈদের নেতৃত্বে ২৫ জনের একটা দল শেখ মুজিবের বাড়ি ঘেরাও করবে। মোহাম্মদপুর-ধানমণ্ডি সড়ক থেকে গলিটা যেখানে ঢুকেছে সেখানটা বন্ধ করে দিতে হবে। দ্বিতীয় রোড ব্লকটা হবে প্রথম ডানদিকের মোড়ে। তৃতীয়টা হবে দ্বিতীয় ডান মোড়ে আর একটা আবার মোহাম্মদপুর-ধানমণ্ডি সড়কে, যাতে জাপানি কূটনীতিকের বাড়িসহ সবগুলো বাড়িকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়। ক্যাপ্টেন হুমায়ুনের নেতৃত্বে ২৫ জনের দ্বিতীয় দলটা প্রথম দলকে অনুসরণ করে শেখ মুজিবের বাড়ির সামনে পৌঁছবে। তারপর পাশের বাড়ির সীমানার ভেতর থেকে। দেওয়াল টপকে শেখের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে না পারে। ১২ জনের তৃতীয় দলটার নেতৃত্বে থাকবে মেজর বিলাল। এ দলের কাছে বৈদ্যুতিক টর্চলাইট ইত্যাদি থাকবে। বাড়িটা তল্লাশি করবে এরা। প্রথমে নিচতলা, তারপর ওপরের তলা। আমাদের মিলিত হওয়ার স্থান ঠিক হলো এমএনএ হোস্টেলের দিকে এয়ারফিল্ডের গেটে। আর রাস্তা হবে এয়ারফিল্ড, জাতীয় পরিষদ ভবন, মোহাম্মদপুর হয়ে ধানমণ্ডি। আমার জিপ পুরো হেডলাইট জ্বালিয়ে সামনে থাকবে। ক্যাপ্টেন সাঈদ, ক্যাপ্টেন হুমায়ুন আর মেজর বিলাল বাতি না-জ্বেলে তাদের ট্রাক নিয়ে আমাদের অনুসরণ করবে– এটার উদ্দেশ্য ছিল হেডলাইটের দিকে তাকিয়ে যাতে কেউ আন্দাজ করতে না পারে পেছনে কয়টা গাড়ি আছে। আমাকে বলা হয়েছিল অপারেশনটা শুরু করতে হবে মাঝরাতে। আর একটা পাসওয়ার্ড (সাঙ্কেতিক শব্দ) দেওয়া হয়েছিল যেটা পুরো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রযোজ্য।

অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে বিস্তারিত পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলা হলো। তারপর পুরো কোম্পানি এয়ারফিল্ডে গিয়ে বের হওয়ার গেটের কাছে জড়ো হয়। ক্যাপ্টেন হুমায়ুনকে বেসামরিক পোশাকে ওর দলের দুজনকেসহ বেসামরিক গাড়িতে পাঠানো হলো একটা চক্কর দিয়ে শেখের বাড়ির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসতে।

অন্ধকার হয়ে এলে সৈন্যরা ব্যারাক থেকে বের হলে সঙ্গে যা যা নিয়ে থাকে সেসব

নিয়ে গাড়ি ভর্তি করা হয়। তারপর ক্যান্টনমেন্টের ভেতর থেকে রওনা হয়। সেনাবাহিনীর সঙ্গে পরিচিত যে কেউই স্পষ্ট বুঝতে পারত কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। পরে এটা জানা যায় যে, বাঙালি অফিসাররা শেখ মুজিবকে জানিয়ে দিয়েছিল, সেনাবাহিনী সে রাতে কিছু একটা করতে যাচ্ছে

রাত প্রায় ৯টার দিকে আমি এয়ারফিল্ডের দিকে যাই। আমার জিপ বিমানবন্দর এলাকায় ঢুকলে এক সৈনিক আমাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং পাসওয়ার্ড জানতে চায়। আমি পাসওয়ার্ড বললে সে বলে পাসওয়ার্ড ওটা নয়। এ নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয়। আমি ওকে বলি, আমি কমান্ডো ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার। ও বলে, আমি যে-ই হই পাসওয়ার্ড ছাড়া আমার এয়ারফিল্ডে ঢোকা যাবে না। ও কোন্ ইউনিটের সৈনিক জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, বিমান বিধ্বংসী ইউনিটের সদস্য। আমি তখন আমাকে ওর কমান্ডিং অফিসারের কাছে নিয়ে যেতে বলি। এয়ারফিল্ড পেরিয়ে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টারের দিকে যাওয়ার সময় সৈনিকটি আমার দিকে রাইফেল তাক করে ধরে রেখেছিল। রেজিমেন্ট কমান্ডার আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে পুরো ব্যাপারটাতে খুব মজা পান। তিনি জানান, আমাকে যে পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে তাকে সেটা দেওয়া হয়নি আর যেহেতু তার ইউনিট এয়ারফিল্ড পাহারায় নিয়োজিত, তাই তিনি নিজেই নিজেদের পাসওয়ার্ড বানিয়ে নিয়েছেন।

রাত প্রায় ১০টার দিকে ক্যাপ্টেন হুমায়ুন শেখ মুজিবের বাড়ির চারপাশ রেকি করে এসে রিপোর্ট করে, মোহাম্মদপুর-ধানমণ্ডি সড়কে প্রতিবন্ধক তৈরির কাজ চলছে। কোম্পানির সবগুলো রকেট লাঞ্চার নিয়ে আসতে নির্দেশ দিই আমি; প্রত্যেকটির সঙ্গে দুই রাউন্ড গোলা। রকেট লাঞ্চারধারী সৈনিকদের ক্যাপ্টেন সাঈদের দলের সঙ্গে থাকতে বলা হলো। এ দলকে নির্দেশ দেওয়া হলো রোড ব্লকের মুখোমুখি হলে সৈনিকরা এক লাইনে এগোবে, মাঝে থাকবে রকেট লাঞ্চারধারী, প্রথমে রকেট ছোড়া হবে, তারপর সবগুলো রাইফেল একসঙ্গে। আমি ব্যাখ্যা করে বলি যে, ব্যারিকেডের আশেপাশের জনতা আগে কখনোই রকেট লাঞ্চার থেকে গোলা ছোঁড়া এবং বিস্ফোরণের দ্বৈত আওয়াজ শোনেনি। তাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্য একটা দলকে রাস্তার দুপাশে লক্ষ্য রাখতে বলি আমি। রাস্তার তৈরি প্রতিবন্ধক মজবুত করার সময় কমিয়ে দেওয়ার জন্য নিজ উদ্যোগে অপারেশন শুরু করার সময় মধ্যরাত থেকে এগিয়ে রাত ১টা নির্ধারণ করেছিলাম।

২৫ মার্চ রাত ১১টায় আমরা এয়ারফিল্ড থেকে বের হয়ে এমএনএ হোস্টেল থেকে মোহাম্মদপুর অভিমুখী রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই। রাস্তার বাতি ছিল নেভানো, সমস্ত বিল্ডিং অন্ধকার, আমার জিপের হেডলাইট পুরো জ্বালানো, সিগন্যাল কোরের কাছ থেকে নেওয়া সেনাবাহী গাড়িগুলো বাতি নিভিয়ে আমার জিপের পেছন পেছন আসছিল। ঘন্টায় প্রায় ২০ মাইল বেগে কনভয়টা মোহাম্মদপুর- ধানমণ্ডি সড়কের ওপর বামে মোড় দেয়। ধানমণ্ডি থেকে প্রায় সিকি মাইল আগে রাস্তার ওপর কাত করে ফেলে রাখা ট্রাক এবং অন্যান্য গাড়ি রেখে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ মোতাবেক ক্যাপ্টেন সাঈদের দল লাইন করে দাঁড়ায়। প্রথমে রকেট নিক্ষেপ করে, তারপর রাইফেল থেকে গুলি করা শুরু করে; রাস্তার পাশের দলগুলোও গুলি করতে থাকে। প্রায় দু-তিন মিনিট পর আমি গুলি বন্ধ

করার আদেশ দিলাম। কিন্তু সে আদেশ মানা হচ্ছে না। তাই আমাকে জনে জনে গিয়ে গুলিবর্ষণ বন্ধ করাতে হয়। ব্যারিকেড তৈরিতে ব্যবহৃত গাড়িগুলোতে আগুন ধরে যায়। একটা সাদা ভক্সওয়াগন কম্বিং দেখলাম দাউ দাউ করে জ্বলছে, ব্যারিকেড বহাল রইল। তবে ওটা রক্ষা করার জন্য যারা ছিল সব ততক্ষণে উধাও। ব্যারিকেডের মাঝখান দিয়ে কীভাবে একটা ফাঁক সৃষ্টি করা যায় সেটা ভাবছিলাম আমি। সেনা বহনকারী গাড়িগুলো পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজনবোধ করিনি। কিন্তু তখন ওগুলোর দিকে তাকাতেই লক্ষ্য করলাম একটা পাঁচটনি ট্রাক আছে উইঞ্চ (কপিকল/ক্রেন) ফিট করা। দুটি গাড়ির সাহায্যে আমরা ব্যারিকেডের কিছু গাড়ি টেনে সরিয়ে ফাঁক তৈরি করতে সমর্থ হলাম। তারপর আবার রওনা হলো আমাদের গাড়ি।

প্রায় ২০০ গজ এগোনোর পর আরেকটা রোড ব্লকের সম্মুখীন হলাম আমরা। এবার প্রায় দুই ফুট ব্যাসের পাইপ, এগুলোর দৈর্ঘ্য দুপাশের উঁচু দেওয়ালের মধ্যবর্তী রাস্তার পুরোটাই বন্ধ করে রেখেছে। আমরা উইঞ্চের মোটা ধাতব রশি পাইপের মাঝ বরাবর বেঁধে টান লাগাই। এতে করে পুরো বন্ধকটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসে কিন্তু রাস্তা জুড়ে থাকে একইভাবে। তখন উইঞ্চ ক্যাবল বাঁধা হলো পাইপের এক মাথায়, আর ক্যাপ্টেন সাঈদের লোকজনকে অন্য মাথায় বসিয়ে টান দেওয়া হলো। এতে পাইপ কেন্দ্র থেকে ঘুরে যায়, গাড়ি পার হওয়ার মতো ফাঁক সৃষ্টি হয় এতে। আমরা আবার আমাদের বাহনে উঠে রওনা হই।

আমরা আরো শদুয়েক গজ গেলে আরেকটা প্রতিবন্ধক পথে পড়ে। এটি প্রায় তিন ফুট উঁচু আর চার ফুট প্রশস্ত করে জড়ো করা ইট দিয়ে তৈরি। আমরা ট্রুপস ক্যারিয়ার দিয়ে ধাক্কা দিয়ে গাড়ির জন্য, রাস্তা তৈরি করে নিতে চাইলাম। কিন্তু সম্ভব হয় না। তখন ক্যাপ্টেন সাঈদের দলকে নির্দেশ দিলাম যাতে হাতে-হাতে ইট সরিয়ে গাড়ি বের হয়ে যাওয়ার মতো প্রশস্ত পথ তৈরি করে নেয়। বাহিনীর বাকি সদস্যদের বললাম গাড়ি ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা হওয়ার জন্য।

আমরা মোহাম্মদপুর-ধানমণ্ডি সড়ক ধরে হেঁটে শেখ মুজিবের বাড়ির দিকে অগ্রসর হই। তারপর লেক এবং সে বাড়ির মধ্যবর্তী গলিতে ঢোকার জন্য ডানে মোড় নেই। ক্যাপ্টেন হুমায়ুনের বাহিনী শেখ মুজিবের বাড়ির পাশের বাড়িতে ঢুকে ছুটে গিয়ে দেওয়াল টপকে সে বাড়িতে প্রবেশ করে। গুলিবর্ষণ করা হয়, কম্পাউন্ডের ভেতর থেকে কিছু লোক গেট পেরিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়, একজন মারা যায়। বাড়ির বাইরে পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের প্রহরী দল তাদের ১৮০ পাউন্ডের তাবুতে ঢুকে খুঁটিসমেত তাঁবু উঠিয়ে নিয়ে লেকের দিকে পালিয়ে যায়। শেখ মুজিবের সীমানা দেওয়াল নিরাপদ করা হলো, আলকাতরার মতো অন্ধকার চারপাশে, মুজিবের বাড়ি এবং আশপাশের বাড়িতে কোনো বাতি নেই।

তখন সার্চ পার্টি বাড়িটাতে ঢোকে। শেখ মুজিবের এক প্রহরীকে নিয়ে একজন সৈনিক পাশে পাশে হেঁটে আসছিল। বাড়ি থেকে সামান্য দূরে যাওয়ার পর সেই প্রহরী একটা দা, লম্বা ফলাওয়ালা ছুরি বের করে সৈনিকটিকে আক্রমণ করে। সে জানত না পেছন থেকে ওকে কাভার দেওয়া হচ্ছে। ওকে গুলি করা হয়, তবে মেরে ফেলা হয়নি।

নিচতলা সার্চ করা হয় কিন্তু কাউকে পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানী দল ওপরতলায় যায়। যেসব কামরা খোলা ওখানে কাউকে পাওয়া গেল না। একটা কামরা ভেতর থেকে আটকানো। আমি ওপরতলায় গেলে একজন আমাকে বলে, বন্ধ কামরাটার ভেতর থেকে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আমি মেজর বিলালকে বন্ধ কামরাটার দরজা ভেঙে ফেলতে বলে ক্যাপ্টেন সাঈদ এসেছে কিনা এবং অন্য কোনো লোকজন জড়ো হয়েছে কিনা দেখার জন্য নিচতলায় নেমে আসি।

বাইরে বেরিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় নেমে দেখি ক্যাপ্টেন সাঈদ ওর বাহনগুলো নিয়ে এসে পৌঁছে গেছে। তবে পাঁচটনি গাড়িগুলো ঘোরানোর সময় সরু রাস্তায় একটাকে আটকে ফেলেছে। আমার জিপের ওয়্যারলেসের লাউড স্পিকারে শুনতে পাই ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব (পরবর্তী কালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) তার ইউনিটগুলোর একটি তাদের 'রোমিও রোমিওগুলো' (রিকয়েলসেস রাইফেল–অনুবাদক) ব্যবহার করার জন্য তাড়া দিচ্ছেন।

আমি যখন ক্যাপ্টেন সাঈদকে গাড়িগুলো কীভাবে লাইন করতে হবে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছিলাম তখন প্রথমে একটা গুলির শব্দ, তারপর গ্রেনেড বিস্ফোরণ এবং শেষে সাবমেশিনগান থেকে ব্রাশফায়ারের আওয়াজ শুনতে পাই। ভাবলাম কেউ বুঝি শেখ মুজিবকে মেরে ফেলেছে। আমি ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে ওপরতলায় গিয়ে যে ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল সেটার দরজার সামনে কম্পিত অবস্থায় শেখ মুজিবকে দেখতে পাই। আমি তাকে আমার সঙ্গে যেতে বলি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারবেন কিনা। আমি অনুমতি দেই। তিনি কামরাটার ভেতর গেলেন। সেখানে পরিবারের সবাই আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর দ্রুত বেরিয়ে আসেন। আমরা গাড়িগুলো যেখানে, সেদিকে হাঁটতে থাকি। ক্যাপ্টেন সাঈদ তখনো ওর গাড়িগুলো ঘোরাতে সক্ষম হয়নি। আমি ইস্টার্ন কমান্ডে একটা রেডিওবার্তা পাঠাই যে, শেখ মুজিবকে ধরা গেছে।

মুজিব এ সময় আমাকে বলেন, তিনি ভুলে পাইপ ফেলে এসেছেন। আমি আবার তার সঙ্গে ফিরে আসি। পাইপ নিয়ে নেন তিনি। এর মধ্যে শেখ মুজিব নিশ্চিত হয়ে গেছেন, আমরা তাকে হত্যা করব না। তিনি বলেন, আমরা তাঁকে ডাকলেই হতো, তিনি নিজে থেকেই বেরিয়ে আসতেন। আমি তাঁকে বলি, আমরা তাঁকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে ওকে গ্রেফতার করা হবে। আমরা ফিরে আসতে আসতে ক্যাপ্টেন সাঈদ ওর গাড়িগুলো লাইন করে ফেলে। শেখ মুজিবকে মাঝে সেনাবাহিনীর গাড়িতে ওঠানো হয়। আমরা ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাত্রা করি।

আমি পরে জানতে পারি মেজর বিলালকে ওপরতলার বন্ধ রুমের দরজাটা ভাঙার জন্য বলে আমি গাড়ির অবস্থা দেখার জন্য যখন নিচে নেমে আসি, কেউ একজন ওর সৈন্যরা যেখানে জড়ো হয়েছিল সেদিকে লক্ষ্য করে এটা পিস্তল দিয়ে গুলি করে। ভাগ্যক্রমে কেউ আঘাত পায়নি। কেউ থামানোর আগেই ওর এক সৈনিক বারান্দার যেদিক থেকে পিস্তলের গুলি এসেছিল সেদিকে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে। তারপর সাবমেশিনগানের শব্দে শেখ মুজিব বন্ধ কামরার ভেতর থেকে ডাক দিয়ে বলেন যে, যদি

তাকে হত্যা করা হবে না এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয় তাহলে তিনি বেরিয়ে আসবেন। তাঁকে নিশ্চিত করা হয়। তখন তিনি বেরিয়ে আসেন। তিনি বের হয়ে আসার পর হাবিলদার মেজর খান ওয়াজির, পরবর্তী সময়ে সুবেদার, তাঁর গালে একটা সশব্দ চড় মেরেছিল।

আমার ওপর আদেশ ছিল শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার কিন্তু তাঁকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে কিংবা কার কাছে হস্তান্তর করতে হবে সেসব কিছুই বলা হয়নি। আমরা ফিরে যাওয়ার সময় আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি। শেষে ঠিক করলাম ওকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভবনে নিয়ে গিয়ে পরবর্তী নির্দেশ না-পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই রেখে দেব। আমি জাতীয় পরিষদ ভবনের সামনে গিয়ে থামি। তারপর জিপের একটা সিট খুলে নিয়ে মুজিবকেসহ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাই। সেখানে ল্যান্ডিংয়ে বসাই তাকে। আমরা যখন এসব করছিলাম তখন ফার্মগেটের দিকে হাজার লোকের ছোটার শব্দ পেলাম। আমরা ভাবি ওরা আমাদের দিকে আসছে। তাই নিজেদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত হই আমরা। কিছুক্ষণ পর শব্দটা মিলিয়ে যায়।

জাতীয় পরিষদ ভবন থেকে আমি মার্শাল ল'হেডকোয়ার্টারে যাই। লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ওখানে তার প্রধান দপ্তর বানিয়েছিলেন। ব্রিগেডিয়ার গোলাম জিলানি খানের সঙ্গে দেখা করলাম আমি। তিনি ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাকে জানালাম, শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বিল্ডিংয়ে রেখে এসেছি।

তিনি আমাকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের অফিসে ঢোকার মুখ পর্যন্ত নিয়ে যান। তারপর ভেতরে গিয়ে জেনারেলের কাছে রিপোর্ট করতে বলেন। জেনারেল টিক্কা নিশ্চয়ই জেনেছেন শেখ মুজিবকে বন্দী করা হয়েছে। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে–এই মর্মে আমার আনুষ্ঠানিক খবরটার জন্য খুব শান্ত হয়ে বসে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। একটু মজা করার জন্য আমি তাকে বলি, একজন লোককে গ্রেফতার করেছি যিনি দেখতে মুজিবের মতো; আমার মনে হয় এ লোকটাই মুজিব। তবে আমি নিশ্চিত নই। এটা শোনামাত্রা জেনারেল টিক্কা বাক্সের ভেতর স্প্রিং লাগানো পুতুলের মতো তার চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর ব্রিগেডিয়ার জিলানিকে ডাক দেন। তিনি অফিসে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলে আমি কী বলেছি তা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি এক্ষুণি ব্যাপারটা দেখছেন বলে কমান্ডারকে আশ্বস্ত করেন। কর্নেল এস ডি আহমদকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে জাতীয় পরিষদ ভবনে গিয়ে দেখে আসতে বলা হলো আমি আসল না নকল শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করেছি।

কর্নেল এস ডি আহমদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে করতে সিগারেট খাওয়ার জন্য আমি অফিস বিল্ডিংয়ের বাইরে এসে দাঁড়াই। আমি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলাম হেডকোয়ার্টারের সীমানার কাঁটাতারের কাছে বসানো একটা হালকা মেশিনগান থেকে এক পশলা গুলি বর্ষিত হয়। ওটা দুর্ঘটনাবশতও হতে পারে অথবা গানার কিছু একটা দেখতে পেয়েছিল। গুলিবর্ষণের পর কিছুক্ষণের জন্য আর কোন শব্দ শোনা যায় না। তারপর ক্যান্টনমেন্টের এবং শহরের সবগুলো অস্ত্র একসঙ্গে গুলিবর্ষণ শুরু করে। অন্যদের থেকে পিছিয়ে না-থাকার জন্য এয়ারফিল্ডের এন্টি এয়ারক্র্যাফট

রেজিমেন্টও গোলাবর্ষণ করে। সবুজ আর হলুদ আলোর ধনুকাকৃতির রেখা পুরো ঢাকা শহরের ওপর আঁকিবুকি করতে থাকে। কয়েক মিনিট পর যেভাবে শুরু হয়েছিল সেভাবে হঠাৎ করে সব থেমে যায়।

প্রায় মিনিট বিশেক পর কর্নেল এসডি আহমদ ফিরে এসে নিশ্চিত করে, আমি আসল শেখ মুজিবকেই গ্রেফতার করেছি। তাঁকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে এ কথা জিজ্ঞেস করলে তারা একত্রে শলাপরামর্শ করতে থাকেন। কারণ আগে এরা এ বিষয়ে কিছুই ভাবেননি। সবশেষে ঠিক হয় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর তাকে যে কামরায় রাখা হয়েছিল সে কামরাতেই রাখা হবে। আমরা তাঁকে ১৪ ডিভিশন অফিসার্স মেসে নিয়ে যাই। তাঁকে একটা আলাদা এক শয্যা কক্ষবিশিষ্ট অংশে রাখা হয়, সঙ্গে একজন গার্ড দেওয়া হয়। পরদিন মেজর জেনারেল মিটঠা আমাকে জিজ্ঞেস করেন শেখ মুজিবকে কোথায় রাখা হয়েছে। কোথায় রেখেছি বললে তিনি খুব বিরক্ত হলেন। বলেন, পরিস্থিতি বুঝতে পারার মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে এ ব্যাপারে। তাঁকে মুক্ত করার একটা চেষ্টা চালানো হতে পারে। তিনি পরে শেখ মুজিবকে একটা স্কুল বিল্ডিংয়ের তিনতলায় স্থানান্তরের নির্দেশ দেন।

মার্চ ১৯৭১-এ যারা পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করেছে তাদের প্রত্যেকে মনে করেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো ধরনের ব্যবস্থা না-নেওয়ার কারণেই পূর্ব পাকিস্তানকে হারাতে হয়েছিল। এটা মনে করা হয় যে, অ্যাডমিরাল আহসান পদত্যাগ করেছিলেন কারণ তিনি সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। বলা হয়ে থাকে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান সামরিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তাকে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে বলা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং পদত্যাগ করেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াকুবের অস্বীকার, তার উত্তরসূরি খুঁজে নিতে জেনারেল ইয়াহিয়ার বিলম্ব এবং ১৮ দিন ধরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের কোনো ব্যবস্থা না-নেয়া ইত্যাদি আওয়ামী লীগকে সুযোগ করে দিয়েছিল জনগণের কাছে দেখাতে যে, তারা সেনাবাহিনী এবং সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষকে অকেজো করে দিয়েছে। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত পরবর্তী ব্যবস্থার প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগও করে দেওয়া হয়েছিল এতে করে।

যুদ্ধের দিনগুলিতে বেগম মুজিব*

২৬শে মার্চ–সমস্ত দিন ছিল কারফিউ। গোলাগুলির শব্দ তখনও থামেনি। নিস্তব্ধ বাড়িটা জুড়ে যেনো এক ভৌতিক বিভীষিকা মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে। সামনে ধানমণ্ডি বালিকা বিদ্যালয়ে তাক করে রাখা বড় বড় কামানের মুখগুলো আমার বাসার দিকে। ভয়ে জানালা গুলো পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারিনি। দুপুরে কারফিউর মধ্যেই এবাসা ওবাসা করে বড় ছেলে কামাল এসে পৌঁছালো।

রাত এলো। সেই আঁধার কাল রাত। ইয়াহিয়া খানের হিংস্রভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে বলা বিবৃতি শুনেই নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারলেন বেগম মুজিব। তাই কালবিলম্ব না করে ছোট আর মেজ ছেলেকে নিয়ে পাঁচিল টপকে প্রতিবেশি ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। অন্যদিকে বড় ছেলে কামাল এবং মহিউদ্দীন সাহেব পালালেন অন্যদিকের পাচিল ডিঙ্গিয়ে। রাত ১১টা থেকেই তোপদাগার শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। কতটা চেতন কতটা অচেতন অবস্থায় বেগম মুজিব ২৬শে মার্চের সেই ভয়াবহ রাতে শুনলেন তাঁর আদরের বাড়িতে গোলাগুলির শব্দ। রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত। সেরাতে এভাবে না পালালে তাঁর সন্তানদের ভাগ্যে কি যে ঘটতো আজও তিনি তা ভাবতে পারেন না।

২৭ তারিখ সকালে বাচ্চা দু'টো সাথে নিয়ে তিনি আবার পালালেন। পুরো দেড় মাস এবাসা ওবাসা করেন। শেষে মগবাজারের এক বাসা থেকে পাকবাহিনী তাঁকে আঠারো নং রোডের এই বাসায় নিয়ে আসে।

১৮ নং রোডে আসবার পূর্বেকার মুহূর্তটি স্মরণ করে গম্ভীর হয়ে গেলেন বেগম মুজিব। বললেন–"আমি তখন মগবাজারে একটা বাসায় থাকি। আমার বড় মেয়ে হাসিনা তখন অন্তঃসত্ত্বা। সে, জামাই, আমার দেওর, জা, মেয়ে রেহানা, পুত্র রাসেল সহ বেশ কজন একসাথে ছিলাম মগবাজারের বাসাটাতে। হঠাৎ একদিন পাকবাহিনী ঘেরাও করে ফেললো বাসাটা। একজন অফিসার আমাকে জানালো যে আমাকে তাদের তত্ত্বাবধানে অন্যত্র যেতে হবে। জানিনা কি হবে। ঠিক সেই মুহূর্তটাতে ভীষণ সাহসী হয়েছিলাম আমি। কড়াভাবেই সেই অফিসারকে বললাম, লিখিত কোন আদেশপত্র না দেখালে আমি এক পাও বাড়াবনা। উত্তরে সে উদ্ধতভাবে জানালো যে ভালোভাবে তাদের সাথে না-গেলে তারা অন্য পন্থা গ্রহণ করবে। তখন বাধ্য হয়ে আমি বললাম, যে আমার মগবাজার বাসায় যাঁরা আছেন তাদের প্রত্যেককে আমার সাথে থাকতে দিতে হবে। আমার কথায় তারা নিজেরা কি যেনো আলোচনা করলো, পরে তারা রাজী হয়ে নিয়ে এলো আমাদেরকে ১৮ নং রোডের এই বাসাটাতে।

---

* দৈনিক বাংলা, ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, (সংক্ষেপিত)

১৮ নং রোডে আসার প্রথম দিনের কথা বলতে গিয়ে আবার হেসে ফেললেন বেগম মুজিব। ময়লা আবর্জনাপূর্ণ এই বাড়িটাতে তখন বসবার মতো কোন আসবাবপত্র দূরে থাক, একটা মাদুর পর্যন্ত ছিল না। জানালার পাশ ঘেষা ৩/৪ ইঞ্চি প্রশস্ত একফালি জায়গায় ঘেষাঘেষি করে বসেছিলেন তিনি এবং পরিবারের সমস্ত সদস্য।

অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে এইভাবে কষ্ট করে বসে থাকতে দেখে সেদিন বুক ফেটে যাচ্ছিল তাঁর। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেননি, শুধু অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলেন চারদিক। হয়তো অসহায়ের করুণ ডাক আল্লাহতায়ালা সেদিন শুনছিলেন। প্রহরী পাক-বাহিনীর এক পাঠান অফিসার অনুভব করেছিল তাঁর অসহায় অবস্থাকে। সেই অফিসার একজন ঝাড়ুদার সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে দেয় ঘর-দুয়ার—সংগ্রহ করে দিয়েছিল কয়েকটি চেয়ার এবং একটি কম্বল।

বন্দী জীবনের নৃশংস পাকপাহারাদার বাহিনীর মধ্যে এই অফিসারটিই ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম।

ধানমণ্ডির এই বাড়িটার মাঝে অনেক দুঃখ-দৈন্যের স্মৃতি চিরদিনের মতো বেগম মুজিবের বুকে আঁকা হয়ে গেছে, তবুও এই বাসাতেই তিনি তাঁর প্রথম আদরের নাতিকে বুকে নিতে পেরেছিলেন–এ স্মৃতি তাঁর কাছে কম উজ্জ্বল নয়।

একদিনের ঘটনা। আমার শোবার ঘরে জামাল আর রেহানা ঝগড়া করছিল। বন্দী জীবন জামালের মত ছেলে সহ্য করতে পারছিল না। কেমন যেনো ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন তাই ওদের দু'ভাই বোনের ঝগড়াটা একটু বেশি রকমে শুরু হয়েছিল। ওদের ঝগড়ার মাঝেই হুট করে ঘরের মধ্যে সিভিল আর্মড ফোর্সের একজন অফিসার ঢুকলো। চোখ লাল করে হিংস্রভাবে সে জামালকে বললো, তুমি আজকাল বেশি বাড়াবাড়ি করছ। এভাবে গোলমাল করলে আমরা তোমাকে আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে যাব। পা দু'টো উল্টো করে বেঁধে তোমাকে চাবুক মারা হবে। জীবনে আর যাতে কারো মুখ দেখতে না-পাও সে ব্যবস্থা করা হবে। বেশ চিৎকার করেই অফিসারটি কথাগুলি বলেছিল। আমি প্রথমে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে বললাম ঘর থেকে। একটা হিংস্র দৃষ্টি আমাদের ওপর নিক্ষেপ করে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিসারটি চলে যাবার পর বেগম মুজিব তার ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করে নিলেন। সে দিনই তিনি অফিসারটির জঘন্য আচরণের সমস্ত ঘটনা প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত উপর মহলেই লিখে জানালেন।

কিন্তু এ ঘটনার পর থেকেই জামাল যেনো আরও অশান্ত হয়ে উঠলো। পালাবার জন্য সমস্ত সময় সে সুযোগ খুঁজতো। ২৭শে জুলাই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাসিনার সন্তান হলো। আমাদের জীবনে এলো প্রথম নাতী। অথচ তাঁকে দেখবার জন্য আমাদের কাউকেই অনুমতি দেয়া হল না। ঘরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলাম সেদিন। কেঁদেছিলাম পাক করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরগায়।

৫ই আগস্ট জামাল পালিয়ে গেল বাসা থেকে। কয়েকদিন আগে থেকেই পালিয়ে যাবার জন্য সে চেষ্টা চালাচ্ছিল। আমাকে বলছিল আমি যদি পালাতে পারি তাহলে ৩/৪

ঘণ্টা ওদেরকে কোন খবর দিও না। জামাল পালাবার পর বুঝতে পারলাম যে ও পালিয়েছে। মন আবার অশান্ত হলো। যদি ধরা পড়ে শেষ হয়ে যায়; আবার সান্ত্বনা পেলাম, বাঁচলে এবার ও বাঁচার মতো বাঁচবে। বেলা দু'টায় খাবারের সময় ওর খোঁজ পড়লো। খোঁজ, খোঁজ, চারিদিকে খোঁজ। কিন্তু জামাল কোথায়? সন্তানের খোঁজে আমি তখন দিশেহারা হবার ভান করলাম।

সরাসরি চিঠি পাঠালাম ওপর মহলে। আমার ছেলেকে তোমরা ধরেছ। এবার ফিরিয়ে দাও। হানাদারদের তরফ থেকে কিছুই বলার ছিল না। কেননা আগেই আমি এ সম্পর্কে সজাগ হবার জন্য চিঠি লিখেছিলাম সর্বত্র। তদন্তের জন্য যে কর্নেলকে পাঠানো হয় সে মনে মনে শংকিত হলো। হয়তো সত্যিই ওদের বাহিনীর কেউ জামালকে গুম করেছে। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে কর্নেল ফিরে গেলেন। কিন্তু আমাদের ওপরে কড়াকড়ির মাত্রা আরেক দফা বাড়লো।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে জামালের চিঠি পেলাম। এসময় আমার শ্বাশুড়ীর শরীর বেশি খারাপ থাকায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। প্রতিদিন দু'ঘণ্টার জন্য আমাকে হাসপাতালে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। রোগী দেখার ভান করে ওপার থেকে অনেকেই আসতো। ওদের মাথায় হাত রেখে হানাদার প্রহরীদের দেখিয়ে উপদেশ দিতাম ঠিকমতো ঘরে থেকে লেখাপড়া করার জন্য। এক ফাঁকে চিঠিটা হস্তগত করে নিজে সাথে করে নিচ পর্যন্ত পৌছে দিতাম ওদেরকে। ভীষণ ভয় লাগতো ওদের জন্য। কিন্তু আল্লাহকে ডাকা ছাড়া কিইবা আমি করতে পারতাম তখন।

ঠিক এভাবেই কেটে গেছে আমার দিন। সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তা দিয়ে চলতো আমার ছোট সংসার। দুঃখ-দৈন্য-যন্ত্রণা দেহমনে সব কিছুই যেনো আটকে গিয়েছিল। প্রতি মুহূর্ত একটি সন্দেহ দিয়ে ঘেরা মৃত্যুর রাজত্বে ধুকেধুকে দিন কাটতো আমাদের।

প্রিয়জনরা ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। জানতাম না কেমন আছে ওরা। স্বামীর জন্য আর চিন্তা করতাম না। কেননা আল্লাহ ছাড়া তাঁকে বাঁচাবার সাধ্য যে আর কারো নেই।

একথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। তবু মাঝে মাঝে শিরা উপশিরাগুলো অবশ হয়ে আসতো। কোথায় আমার বুকের সন্তানেরা আর এই কারাগৃহে আবদ্ধ আমাদের জীবনের স্থায়িত্বই বা কোথায়?

নভেম্বরের শেষের দিকেই বুঝতে পেরেছিলাম ডিসেম্বরে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমার বন্দী জীবনে বাইরের সংবাদ আসার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ট্রানজিস্টার সেটটা ছিল। আমরা শুনেছিলাম ভারত বাংলাদশকে যেদিন স্বীকৃতি দেবে সেই দিনই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে। তিন তারিখের কলকাতার ঐতিহাসিক জনসভা শোনার জন্য তাই আমাদের প্রতীক্ষা ছিল একটু ভিন্নতর। ইন্দিরাজীর ভাষণ শেষ হলো। খুবই বিস্ময় লেগেছিল। কেন জানি ট্রানজিস্টারের সামনে থেকে নড়তে ইচ্ছা করছিলনা। রাত বাড়ল, আকাশ বাণীর সংবাদ শেষ হলো। হঠাৎ ঘোষণা করা হলো শীঘ্রই বিশেষ ঘোষণা প্রচার করা হবে। সমস্ত দিনের ক্লান্ত দেহমন। পরিবারের সকলেই ঘিরে বসলাম ট্রানজিস্টারের চারিদিক। কিন্তু কোথায় সে ঘোষণা। সময় কেটে যাচ্ছিল। একে একে বাচ্চারা ঘুমাতে

চলে গেল। মাথার কাছে ট্রানজিস্টারটা খোলা রেখে প্রতীক্ষা করতে করতে কখন যেনো ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাংগল বিমান- বিধ্বংসী কামানের কটকট শব্দে। বুঝলাম যুদ্ধ বেঁধে গেছে।

৬ ডিসেম্বর ভারত স্বীকৃতি দিল স্বাধীন বাংলাদেশকে। সে এক অনন্য অনুভূতি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির সংবাদ এলোমেলো করে দিচ্ছিল আমার দেহ-মনকে। বাচ্চারা কাঁদছিল ওদের আব্বার জন্য। আমি চেষ্টা করছিলাম ওদের সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু স্বাধীনতার স্বীকৃতি আর অতি প্রিয়জনের মৃত্যুর আশঙ্কা আমার আত্মাকে যেনো অসাড় করে তুলেছিল।

ডিসেম্বরের দিনগুলো প্রতিদিন যেনো নতুন নতুন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াতো। ১৭ তারিখ সকালে যখন পাক আর্মিকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল তখন শেখ মুজিবের বাসা থেকে শুধু মাত্র সিভিল আর্মড অফিসার দুজনকে সরিয়ে নেয়া হয়। প্রধানত আর্মিকে শৃঙ্খলায় রাখার জন্য সিভিল আর্মড অফিসার নিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে সিভিল আর্মড অফিসার দু'জনকে ফিরিয়ে নেয়ার সাথে সাথেই আর্মি প্রহরীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে ওরা আশা করেছিল যে ওদেরও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত যখন চারিদিক থেকে "জয় বাংলা" ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল তখন ভীষণ রকম ক্ষেপে গেল ওরা।

আমাদের ঘরের মধ্যে কাপড় শুকোবার জন্য তার বাঁধা ছিল। রাতে তারটা ঝনঝন করে বেজে উঠতেই সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। রক্তের মত লাল দু'টো চোখ নিয়ে প্রহরী দলের অধিনায়ক সুবেদার রিয়াজ দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। কঠোর ভাবে সে বললো খোকাকে ডাকো। ঠাণ্ডা হয়ে বললাম খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। কোন কথা থাকলে আমাকে বলতে পার। আমার মুখের দিকে কঠোর ভাবে তাকিয়ে সে বলল, সাবধানে থাকো।

মেজর তারা সিং এলেন বেলা ন'টার সময়। তারা সিং সাধারণ বেশে এসেছিলেন কিন্তু পেছনে তিনি একদল সৈন্যকে পজিশন নেয়া অবস্থাতে রেখে দিয়েছিলেন চারিদিকে। খালি হাতে শুধু ওয়্যারলেস সেট সাথে নিয়ে তিনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ওদেরকে বুঝাচ্ছিলেন। প্রথমে ওরা সারেনডার করতে চায়নি। শেষে দু'ঘণ্টা সময় চেয়েছিল। গেটের সামনে থেকে ওদের কথা শুনে মেজর তারা সিং যেই পা বাড়ালেন অমনি ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠলো বাচ্চারা, আপনি যাবেন না মেজর। যাবেন না। সময় পেলেই ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। সত্যিই সময় পেলে ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলতো। কিন্তু মেজর তারা সিং তাদের আর সে সময় দেননি। ঢুকে পড়েছিলেন গেটের মধ্যে।

পাশের বাঙ্কার থেকে কাঁপতে কাঁপতে হানাদাররা তখন বের হয়ে আসছে আত্মসমর্পণের জন্য।

যুদ্ধের দিনগুলিতে বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর পরিজনেরা*

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বীর নায়ক মেজর (বর্তমানে কর্নেল) জিয়া যখন হানাদার পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাদেরকে নাজেহাল করে তুলছিলেন তখন তাঁর প্রতি আক্রোশ মেটাবার ঘৃণ্য পন্থা হিসেবে খান সেনারা নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজনের ওপর।

তাদের এই প্রতিহিংসার লালসা থেকে রেহাই পাননি কর্নেল জিয়ার ভায়রা শিল্পোন্নয়ন সংস্থার সিনিয়র কো-অর্ডিনেশন অফিসার জনাব মোজাম্মেল হক।

চট্টগ্রাম শহর শত্রু কবলিত হবার পর বেগম খালেদা জিয়া যখন বোরখার আবরণে আত্মগোপন করে চট্টগ্রাম থেকে স্টিমারে পালিয়ে নারায়ণগঞ্জে এসে পৌঁছেন তখন জনাব মোজাম্মেল হকই তাঁকে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। সেদিন ছিল ১৬ই মে। ঢাকা শহরে ছিল কারফিউ। নারায়ণগঞ্জেও সন্ধ্যা থেকে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। এরই মধ্যে তিনি তাঁর গাড়িতে রেডক্রস ছাপ এঁকে ছুটে গিয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জ টার্মিনালে।

বেগম জিয়াকে নিয়ে আসার দিনদশেক পর ২৬শে মে শিল্পোন্নয়ন সংস্থায় হক নাম সম্বলিত যত অফিসার আছে সবাইকে ডেকে পাক সেনারা কর্নেল জিয়ার সঙ্গে কারোর কোন আত্মীয়তা আছে কিনা জানতে চায়। জনাব মোজাম্মেল হক বুঝতে পারলেন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তিনি সেখানে কর্নেল জিয়ার সাথে তাঁর আত্মীয়তার কথা গোপন করে অসুস্থতার অজুহাতে বাসায় ফিরে আসেন এবং অবিলম্বে বেগম জিয়াকে তাঁর বাসা থেকে সরাবার ব্যবস্থা করতে থাকেন।

কিন্তু উপযুক্ত কোন স্থান না-পেয়ে শেষপর্যন্ত ২৮শে মে তিনি তাঁকে ধানমণ্ডিতে তাঁর এক মামার বাসায় কয়েকদিনের জন্য রেখে আসেন এবং সেখান থেকে ৩রা জুন তাঁকে আবার জিওলজিক্যাল সার্ভের এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জনাব মুজিবুর রহমানের বাসা এবং এর কদিন পরে জিওলজিক্যাল সার্ভের ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব এস কে আব্দুল্লাহর বাসায় স্থানান্তরিত করেন।

এরই মধ্যে ১৩ই জুন তারিখে পাকবাহিনীর লোকেরা এসে হানা দেয় জনাব মোজাম্মেল হকের বাড়িতে। জনৈক কর্নেল খান এই হানাদার দলের নেতৃত্ব করছিলেন। কর্নেল খান বেগম জিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং জানায় যে, এই বাড়িতে তারা বেগম জিয়াকে দেখেছে। জনাব হকের কাছ থেকে কোন সদুত্তর না-পেয়ে তাঁর দশ বছরের ছেলে ডনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ডন কর্নেল খানকে পরিষ্কারভাবে জানায় যে, গত তিন বছরে সে তার খালাকে দেখেনি।

---

* বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬-৪৮০

সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে খান সেনারা তাঁর বাড়ি তল্লাশী করে। কিন্তু বেগম জিয়াকে সেখানে না-পেয়ে হতোদ্যম হয়ে ফিরে যায়। যাবার আগে জানিয়ে যায়, সত্যি কথা না বললে আপনাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

এর পরই জনাব হক বুঝতে পারেন সর্বক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করা হচ্ছে; যেখানেই যান সেখানেই তাঁর পেছনে লেগে থাকে ফেউ। এই অবস্থায় তিনি মায়ের অসুখের নাম করে ছুটি নেন অফিস থেকে এবং সপরিবারে ঢাকা ছেড়ে যাবার ব্যবস্থা করতে থাকেন।

ব্যবস্থা অনুযায়ী ১লা জুলাই গাড়ি গ্যারেজে রেখে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে তাঁরা দুটি অটোরিকশায় গিয়ে ওঠেন। উদ্দেশ্য ছিল ধানমন্ডিতে বেগম জিয়ার মামার বাসায় গিয়ে আপাতত ওঠা। কিন্তু সায়েন্স ল্যাবরেটরী পর্যন্ত আসতেই একটি অটোরিক্শা তাঁদের বিকল হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাঁরা কাছেই গ্রীনরোডে এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে ওঠেন। কিন্তু এখানে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল এক বিরাট বিস্ময়। জনাব হক এখানে গিয়ে উঠতেই তাঁর এই বিশিষ্ট বন্ধুর স্ত্রী তাঁকে জানান যে, কর্নেল জিয়ার লেখা চিঠি তাঁদের হাতে এসেছে। চিঠিটা জনাব হককেই লেখা এবং এটি তাঁর কাছে পাঠাবার জন্যে কয়েকদিন ধরেই তাঁকে খোঁজ করা হচ্ছে।

তাঁর কাছে লেখা কর্নেল জিয়ার চিঠি এ বাড়িতে কেমন করে এলো তা বুঝতে না পেরে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হন এবং চিঠিটা দেখতে চান। তাঁর বন্ধুর ছেলে চিঠিটা বের করে দেখায়। এটি সত্যিই জিয়ার লেখা কিনা বেগম জিয়াকে দিয়ে তা পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্যে তিনি তাঁর বন্ধুর ছেলের হাতে দিয়েই এটি জিওলজিক্যাল সার্ভের জনাব মুজিবুর রহমানের কাছে পাঠান।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় জনাব হক তাঁর এই বন্ধুর বাসায় রাতের মত আশ্রয় চান। তাঁদেরকে আরো নিরাপদ স্থানে রাখার আশ্বাস দিয়ে রাতে তাঁদেরকে পাঠানো হয় সূত্রাপুরের একটি ছোট্ট বাড়িতে। তাঁর বন্ধুর ছেলেই তাঁদেরকে গাড়িতে করে এই বাড়িতে নিয়ে আসে। এখানে ছোট্ট একটি ঘরে তাঁরা আশ্রয় করে নেন।

কিন্তু পরদিনই তাঁরা দেখতে পেলেন পাকবাহিনীর লোকেরা বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে। জনা দশেক সশস্ত্র জওয়ান বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে। এই দলের প্রধান ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ আর ক্যাপ্টেন আরিফ। তারা ভেতরে ঢুকে কর্নেল জিয়া ও বেগম জিয়া সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জনাব হক ও তাঁর স্ত্রী জিয়ার সাথে তাদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে যান। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ জনাব ও বেগম হকের সাথে তোলা বেগম জিয়ার একটি গ্রুপ ছবি বের করে দেখালে তাঁরা জিয়ার সাথে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন। তবে তাঁরা জানান কর্নেল ও বেগম জিয়া কোথায় আছেন তা তাঁরা জানেননা।

এই পর্যায়ে বিকেল পাঁচটার দিকে জনাব হক ও তাঁর স্ত্রীকে সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িতে তুলে মালিবাগের মোড়ে আনা হয় এবং এখানে মৌচাক মার্কেটের সামনে তাঁদেরকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়। এখানেই তাঁদেরকে জানান হয় যে বেগম জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর তাদেরকে দ্বিতীয় রাজধানী এলাকা ঘুরিয়ে আবার সূত্রাপুরের বাসায় এনে ছেড়ে দেয়া হয়। এখান থেকে রাতে তাঁরা গ্রীনরোডে জনাব

হকের বন্ধুর বাসায় আসেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসেন খিলগাঁয়ে তার নিজের বাসায়।

উল্লেখযোগ্য যে এই দিনই জনাব এস কে আব্দুল্লাহর সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে বেগম জিয়া ও জনাব আব্দুল্লাহকে এবং একই সাথে জনাব মুজিবুর রহমানকেও পাকবাহিনী গ্রেফতার করে। ৫ই জুলাই তারিখে জনাব মোজাম্মেল হক অফিসে কাজে যোগ দিলে সেই অফিস থেকেই ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।

ক্যান্টনমেন্টে তাঁকে এফ আই ইউ (ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন ইউনিট) অফিসে রাত দশটা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হয় এবং দশটায় স্কুল রোডের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেলে প্রবেশের আগে তাঁর ঘড়ি-আংটি খুলে নেয়া হয় এবং মানিব্যাগটিও নিয়ে নেয়া হয়। সারাদিন অভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কিছুই খেতে দেয়া হয়নি। পরদিন সকালে তাঁকে এক কাপ মাত্র ঠাণ্ডা চা খাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাপ্টেন সাজ্জাদের অফিসে। সাজ্জাদ তাঁর কাছে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানতে চায়। তিনি তাঁর কোন পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন। ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ এতে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করে এবং শাস্তি হিসেবে তাঁকে বৈদ্যুতিক শক দেবার হুমকি দেখায়। কিন্তু-এর পরও কোন কথা আদায় করতে না পেরে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলোর নিচে শুইয়ে রাখার হুকুম দেয়।

হুকুমমত রাতে তাঁকে তাঁর সেলে চিৎ করে শুইয়ে মাত্র হাত দেড়েক ওপরে ঝুলিয়ে দেয় পাঁচশো পাওয়ারের দুটি অত্যুজ্জ্বল বাল্ব। প্রায় চারঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়।

পরদিন আবার তাঁকে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সাজ্জাদ আবার তাঁর পরিকল্পনার কথা জানতে চায়। জানতে চায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর কি কি কথা হয়েছে, তিনি ভারতে চলে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা। জনাব হক সব কিছুই অস্বীকার করলে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁর ঘাড়ে আঘাত হানে। এর পর তাঁর সেলে চব্বিশ ঘণ্টা হাজার ওয়াটের বাতি জ্বালিয়ে রাখার হুকুম দেয়।

বেলা একটায় তাঁকে সেলে এনেই বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ঘণ্টা কয়েক পরেই তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করতে থাকেন। চীৎকার করে তিনি একটি কথাই বলতে থাকেন : আমাকে একেবারেই মেরে ফেল। এভাবে তিলে তিলে মেরোনা।

তিনি যখন অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করছিলেন তখন তাঁর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো একজন পাঠান হাবিলদার। তাঁর এই করুণ আর্তি বোধ হয় হাবিলদারটি সইতে পারেনি। তারও হৃদয় বোধ হয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল মানুষের ওপর মানুষের এই নিষ্ঠুর জুলুম দেখে। আর তাই বোধ হয় সেন্ট্রিকে ডেকে হুকুম দিয়েছিল বাতি নিভিয়ে দিতে। বলেছিল, কোন জীপ আসার শব্দ পেলেই যেন বাতি জ্বালিয়ে দেয় আবার জীপটি চলে যাবার সাথে সাথেই যেন বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়।

এরপর ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে আরো কদিন জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং নতুন ধরনের নির্যাতন চালায়। তাঁর কাছ থেকে সারাদিন ধরে একটির পর একটি বিবৃতি লিখিয়ে নেয়া হয় এবং তাঁর সামনেই সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে আবার তাঁকে সেগুলি লিখতে বলা হয়। এবং

যথারীতি আবার তা ছিঁড়ে ফেলে আবার সেই একই বিবৃতি তাকে লিখতে বলা হয়। এবং আবার তা ছিঁড়ে ফেলা হয়। এই অবস্থায় ক্লান্তি ও অবসন্নতায় তিনি লেখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। এদিকে হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলোর নিচে থাকার ফলে তিনি দৃষ্টি শক্তিও প্রায় হারিয়ে ফেলেন। দিন ও রাতের মধ্যে কোন পার্থক্যই বুঝতে পারতেননা।

২৬শে জুলাই বিকেলে তাঁকে ইন্টার স্টেটস স্ক্রুটিনি কমিটির (আই এস এস সি) ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে একটি ছোট্ট কামরায় তাঁরা মোট ১১০ জন আটক ছিলেন। বিকেলে পাঁচটার দিকে তাঁকে বের করে রান্নাঘরের বড় বড় পানির ড্রাম ভরার কাজ দেয়া হয়। এই কাজে আরো একজনকে তাঁর সাথে লাগানো হয়। তিনি হচ্ছেন জিওলজিক্যাল সার্ভের জনাব এস কে আব্দুল্লাহ্। তাঁরা দুজনে প্রায় পোয়া মাইল দূরের ট্যাপ থেকে বড় বড় বালতিতে করে পানি টেনে তিনটি বড় ড্রাম ভরে দেন। রাতে লাইন করে দাঁড় করিয়ে তাদেরকে একজন একজন করে খাবার দেয়া হয়। এতদিন পরে এই প্রথম তিনি খেতে পান গরম ভাত ও গরম ডাল।

পরদিন সকালে তাঁর এবং আরো অনেকের মাথার চুল সম্পূর্ণ কামিয়ে দেয়া হয়।

এখানে বিভিন্ন কামরায় তাঁকে কয়েকদিন আটকে রাখার পর ৬ই আগস্ট নিয়ে যাওয়া হয় ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন সেন্টারে (এফ আই সি)। মেজর ফারুকী ছিল এই কেন্দ্রের প্রধান এবং এখানে সকলের ওপর নির্যাতন করার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল সুবেদার মেজর নিয়াজী। ফারুকী এখানে তাঁকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং বিবৃতি দিতে বলে। কিন্তু বিবৃতি লেখানোর নাম করে করে সেই পুরোনো নির্যাতন আবার শুরু হয়। একটানা তিন দিন ধরে তিনি একই বিবৃতি একের পর এক লিখে গেছেন এবং তাঁর সামনে তা ছিঁড়ে ফেলে আবার এই একই বিবৃতি তাঁকে লিখতে বলা হয়েছে।

৯ই আগস্ট তাঁকে দ্বিতীয় রাজধানীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এখানে বিভিন্ন কক্ষে তাঁকে প্রায় দেড়মাস আটক রাখার পর ২১শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ৩০শে অক্টোবর তিনি মুক্তি পান।

ইতিমধ্যে রাজাকাররা তিনদফা তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়ে সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যায়। সর্বশেষ গত ১৩ই ডিসেম্বর তারা তাঁর গাড়িটিও নিয়ে যায়।

চট্টগ্রামে যেমন করে স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়েছিল*

সেদিনও ঝকঝকে রোদ উঠেছিল চট্টগ্রামের আকাশে। বন্দর নগরীর ব্যস্ততা শুরু হয়েছিল অন্যান্য দিনের মত। কর্মব্যস্ততা ষোল শহর ক্যান্টনমেন্টেও।

এই কর্মব্যস্ততার সুযোগেই একজন আর সব সামরিক অফিসারের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে নিঃশব্দে উঠে এলেন অফিসের ছাদের ওপর। ওরা জানতেন ওদের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বড় সজাগ। প্রকাশ্যে নয় ওরা গিয়ে দাঁড়ালেন ছাদের পেশাবখানার আড়ালে। ওরা একজন মেজর আর একজন ক্যাপ্টেন।

কথা শুরু করলেন মেজর। বললেন মনে হচ্ছে এমন একটা দিন আসবে যখন আমাদেরকে বিদ্রোহ করতে হতে পারে। পাকিস্তানিরা আমাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেবার জন্যে আসতে পারে। কিন্তু অস্ত্র আমরা দেবনা রুখে দাঁড়াব। তুমি রাজী?

মত নেবার দরকার ছিল না। ক্যাপ্টেন তার আগেই মন স্থির করে ফেলেছিলেন। মেজরের কথা শেষ না হতেই সমস্ত মন উজাড় করে দিয়ে বলে উঠলেন, হ্যাঁ আমি অস্ত্র দেব না। বিদ্রোহ করবো। বিপুল আবেগে একান্ত আপন জনের মত একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত আঁকড়ে ধরলেন দুজন দুজনের হাত। শপথ নিলেন তাদের একথা প্রকাশ হবে না, ওরা দু'জন ছিলেন মেজর জিয়া আর ক্যাপটেন আলী।

সেদিন ছিল ৩রা মার্চ। ১৯৭১ সাল। সময় সকাল সাড়ে নয়টা। এই প্রথম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপারে প্রথম আলোচনা।

এদিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছিল। সামরিক বাহিনীর অন্যান্য বাঙালি অফিসার অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সবার মনেই একটি চিন্তাই পাক খেয়ে ফিরছিল–কি করা যায়? কি করবো? বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ে তাঁরা বারবার ছুটে আসছিলেন মেজর জিয়ার কাছে। মেজর জিয়া তখন ছিলেন ৮ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের দ্বিতীয় প্রধান। ব্যাটালিয়নের বাঙালি অফিসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত।

এরপর এলো ৭ই মার্চ। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলেন। বললেন যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।

৮ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের অফিসাররা একে অস্ত্র তুলে নেবার আহবান বলেই মনে করলেন।

৮ই মার্চ। আবার সেই সকালে ওরা দুজন সবার অলক্ষ্যে উঠে এলেন ছাদে। মেজর (বর্তমানে লে. কর্নেল) জিয়াউর রহমান আর ক্যাপ্টেন আলী আহমদ বিদ্রোহ ঘোষণা

---

* মনজুর আহমদ, জিয়াউর রহমানের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত প্রবন্ধ, দৈনিক বাংলা। মার্চ ১৯৭২

সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলেন। ঠিক হলো বিদ্রোহ ঘোষণার উপযুক্ত মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু কখন আসবে সেই উপযুক্ত মুহূর্ত? কখন? কবে? জানতেন এই বিশেষ মুহূর্তটি আসবে তখনই যখন তাঁদের বিদ্রোহের সমর্থনে পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসবে জনসাধারণ। এই মুহূর্তটি আসবে তখনই যখন শত্রুর বর্বরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ সবার সামনে তুলে ধরা যাবে।

এদিকে ইয়াহিয়া বসলো মুজিবের সাথে আলোচনায়। ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসাররা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন–আলোচনার ফল কি হয়? বাংলাদেশের ভাগ্য কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

কিন্তু এ কেমনতরো আলোচনা? আলোচনার পাশাপাশি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের আর এক তৎপরতায় শিউরে উঠলেন তাঁরা। তাঁদের সন্দিগ্ধ মনে তখনই প্রশ্নের ঝড় উঠলো, এই অশুভ তৎপরতা কেন?

এই কেনর জবাব না-পেলেও তাদের দিব্যদৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার অন্তরালে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের এক জঘন্যতম চক্রান্ত। সে চক্রান্ত বাঙালিদের ওপর হামলার। সে চক্রান্ত বাংলাদেশের ওপর বর্বর অভিযানের।

আলোচনা চলছিল। আর এদিকে আসছিল জাহাজ বোঝাই সৈন্য। বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ। জাহাজ বোঝাই যেসব সৈন্য আসছিল তাদেরকে দ্রুত বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করে পাঠানো হচ্ছিল।

এমনি সময় ডাক এলো লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীর কাছ থেকে। ১৭ই মার্চ রাত সাড়ে নয়টায় চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে সামরিক আইন সদর দফতরে তাঁর ডাকে প্রথম গুপ্তবৈঠক অনুষ্ঠিত হল। চারজন সামরিক বাহিনীর বাঙালি অফিসারের মধ্যে। এরা চার জন হচ্ছেন লে. কর্নেল এম আর চৌধুরী, মেজর জিয়াউর রহমান, নোয়াখালীর মেজর আমিন চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন আলী আহমদ।

কি মনে করছো? বৈঠকের শুরুতেই কর্নেল চৌধুরী পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন মেজর জিয়াকে।

ওদের ভাবগতিক দেখে পরিষ্কার মনে হচ্ছে ওরা হামলা চালাবে।

কর্নেল চৌধুরী বললেন তাঁরও তাই ধারণা। কিন্তু কি করা যায়?

কি করা যায়?–সবারই মনে এই প্রশ্ন। এক–বিদ্রোহ। কর্নেল চৌধুরী সুস্পষ্টভাবে বলেন, সশস্ত্র অভ্যুত্থানই একমাত্র পথ। তিনিই প্রথম বাঙালি সামরিক অফিসার যিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান জানালেন।

সশস্ত্র অভ্যুত্থান। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম 'সিপাহী বিদ্রোহে'র পর আর এক নতুনতরো সিপাহী বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া বিকল্প কিছু আর নেই। বঙ্গবন্ধুও তাই ডাক দিয়েছেন– যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।

ওরা চার জন বাঙালি অফিসার বসলেন বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রণয়নে। ঠিক হল ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার একমাত্র বাঙালি বিগ্রেডিয়ার এম আর মজুমদারকে এ

পরিকল্পনা থেকে বাইরে রাখতে হবে। ঠিক হলো লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীর নেতৃত্বেই তারা বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবেন।

এদিকে পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলার প্রস্তুতি চলছিল পুরোদমে। বাঙালি অফিসারদের ওপর তাদের সজাগ দৃষ্টি হয়ে উঠছিল আরো প্রখর। আর এরাও পাল্টা গোয়েন্দা বৃত্তি চালিয়ে সংগ্রহ করছিলেন পাক সেনাদের তৎপরতা।

এরই মধ্যে কুমিল্লা থেকে তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নকে আনা হলো চট্টগ্রামে। তাদেরকে রাখা হতে লাগলো শহরের অবাঙালিদের বাড়ি-বাড়ি। চট্টগ্রামের ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরাও প্রতি রাতে সাদা পোশাকে অসামরিক ট্রাকে করে বেরিয়ে যেত শহরে। তাদের কাজ ছিল অবাঙালিদের সাথে মিলে লুটপাট করা। বাংলাদেশের ওপর বর্বর হামলার প্রস্তুতি দেখতে এলেন পাকবাহিনীর জেনারেল হামিদ খান। ২১শে মার্চ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে তাকে আপ্যায়িত করা হলো মধ্যাহ্ন ভোজে। এই মধ্যাহ্ন ভোজেই পশ্চিমা সামরিক অফিসারদের কানাঘুষা আর জেনারেল হামিদের একটি ছোট্ট উক্তিতে বাঙালি অফিসাররা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন দিন ঘনিয়ে এসেছে। হামলা অত্যাসন্ন।

মধ্যাহ্ন ভোজে জেনারেল হামিদ বাঙালি অফিসারদের যেন চিনতেই পারেন নি। তাঁর যত কানাঘুষা আর কথাবার্তা চলছিল পশ্চিমা অফিসারদের সাথে।

কি এত কানাঘুষা? কিসের এত ফিসফাঁস? সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল মেজর জিয়ার মন। কৌশলে অন্য একজনের সাথে কথা বলতে বলতে গিয়ে দাঁড়ালেন জেনারেল হামিদের ঠিক পেছনে। দাঁড়ালেন পেছন ফিরে। কথা বলতে লাগলেন সঙ্গীটির সাথে আর দু কান সজাগ রাখলেন জেনারেল হামিদের কথার দিকে।

জেনারেল হামিদ তখন কথা বলছিলেন ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল ফাতমীর সাথে। অনেক কথার মধ্যে অনেকটা যেন সামরিক নির্দেশের মতই কর্নেল ফাতমীকে বলে উঠলেন জেনারেল হামিদ– দেখ ফাতমী, অভিযান (এ্যাকশন) খুব দ্রুত ও কম সময়ের মধ্যে হতে হবে। আমাদের পক্ষে কেউ যেন হতাহত না হয়। আঁতকে উঠলেন মেজর জিয়া। এ কি? কি হতে যাচ্ছে? এই দিনই বিকেলে তিনি সস্ত্রীক সৌজন্য সাক্ষাতে গেলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বাসায়। কথায় কথায় তিনি জানতে চাইলেন জেনারেল হামিদের সফরের উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সে তথ্য ছিল অজানা। তিনি শুধু বললেন, ওরা আমাকে বিশ্বাস করে না। তিনি জানালেন, জেনারেল হামিদ যখন অপারেশন রুমে ছিল তখন তাঁকে সে ঘরে ঢুকতেই দেয়া হয়নি।

কি বুঝলেন? জানতে চাইলেন মেজর জিয়া।

মনে হচ্ছে সামথিং ফিসি। জিয়া বললেন, ফিসি নয়–বিরাট কিছু। বিরাট এক চক্রান্তে মেতেছে ওরা। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার মেনে নিলেন সে কথা।

পরদিন ২২শে মার্চ। রাত ১১টায় চট্টগ্রাম ইপিআর সেক্টর সদর দফতরের এ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন রফিক এসে দেখা করেন মেজর জিয়ার সাথে । তিনি সরাসরিই বলেন, সময় খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদেরকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেই হবে। আপনার প্রতি আমাদের আস্থা আছে। আপনি বিদ্রোহ ঘোষণা করুন। ইপিআরদের সাহায্য

পাবেন। মেজর জিয়া তাঁকে তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানান এবং ইপিআর-এর সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা করেন।

২৫শে মার্চ ব্যাপক রদবদল ঘটে গেল ক্যান্টনমেন্টের প্রশাসন ব্যবস্থায়। ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে এলেন জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, জেনারেল আনসারী, মেজর জেনারেল মিটা খান, লে. জেনারেল খোদাদাদ খান প্রমুখ। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে তাঁরা জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন ঢাকায়। সেই সাথে নিয়ে গেলেন মেজর আমিন আহমদ চৌধুরীকেও। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের স্থানে আনসারী নিযুক্ত হলেন স্টেশন কমান্ডার, কর্নেল শিগারী দায়িত্ব নেন ই বি আর-এর সেন্টার কমান্ডার হিসেবে।

এই রদবদলে শঙ্কিত হয়ে উঠেন বাঙালি সৈনিক ও অফিসাররা। এই দিন গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন লে. কর্নেল এম আর চৌধুরী।

এদিকে চট্টগ্রাম শহরে উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। অস্ত্র বোঝাই জাহাজ সোয়াতের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা হচ্ছিল প্রবল প্রতিরোধ। অস্ত্র খালাস করে যাতে পশ্চিমা সৈন্যদের হাতে না-পৌঁছাতে পারে তার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় তৈরি করা হয়েছিল ব্যারিকেড।

এই ব্যারিকেড সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে লাগানো হলো বাঙালি সৈন্যদের। রাত দশটা পর্যন্ত চললো এই ব্যারিকেড সরাবার কাজ। রাত এগারোটায় অফিসার কমান্ডিং জানজুয়া আকস্মিকভাবে মেজর জিয়ার কাছে নির্দেশ পাঠালেন এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে বন্দরে যাবার জন্যে। এই আকস্মিক ও রহস্যজনক নির্দেশের অর্থ তাঁর কাছে বোধগম্য হলো না। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় জানজুয়া নিজে এসে তাঁকে নৌবাহিনীর একটি ট্রাকে তুলে ষোলশহর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বন্দরের দিকে রওনা করে দেন। কিন্তু রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে সরিয়ে যেতে তাঁর দেরী হচ্ছিল। আগ্রাবাদে যখন একটা বড় ব্যারিকেডের সামনে বাধা পেয়ে তাঁর ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ে তখন পেছন থেকে ছুটে আসেন একটি ডজ গাড়িতে ক্যাপ্টেন খালিকুজ্জামান। গাড়ি থেকে নেমেই তিনি দৌড়ে আসেন মেজর জিয়ার কাছে। হাত ধরে তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে যান রাস্তার ধারে।

পশ্চিমারা গোলাগুলি শুরু করেছে। শহরে বহু লোক হতাহত হয়েছে। খালিকুজ্জামানের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর থেকে কথা কয়টি ঝরে পড়ে। কি করবেন জিয়া ভাই এখন? মাত্র আধ মিনিট। গভীর চিন্তায় তলিয়ে যান মেজর জিয়া। তারপর বজ্রনির্ঘোষে বলে ওঠেন—'ওই রিভোল্ট'।

সাথে সাথে তিনি খালিকুজ্জামানকে ফিরে যেতে বলেন। বলেন,ব্যাটেলিয়নকে তৈরি করার জন্যে আলী আহমদকে নির্দেশ দিতে। আর সেই সাথে নির্দেশ পাঠান ব্যাটেলিয়নের সমস্ত পশ্চিমা অফিসারকে গ্রেফতারের।

খালিকুজ্জামান দ্রুত ফিরে গেলেন ষোলশহরের দিকে। আর মেজর জিয়া ফিরে এলেন ট্রাকে। যে পশ্চিমা সামরিক অফিসারকে তাঁর সাথে দেয়া হয়েছিল তাঁকে বল্‌লেন, হুকুম বদলে গেছে। বন্দরে যেতে হবে না। আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে ক্যান্টনমেন্টে। বাঙালি সৈন্য যাঁরা তার সাথে যাচ্ছিলেন তাঁদেরকে ইশারায় বললেন রাইফেল লোড করে রাখতে। প্রয়োজন হতে পারে।

তাঁরা ফিরে আসেন ব্যাটেলিয়নে। এসেই তিনি সাথের পশ্চিমা অফিসারকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দী। অফিসারটি আত্মসমর্পণ করলে তিনি ট্রাক থেকে নেমে ট্রাকের পশ্চিমা নৌসেনাদের দিকে রাইফেল তাক করে তাদেরকেও অস্ত্র ছেড়ে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। হতচকিত পশ্চিমা সেনারা সবাই আত্মসমর্পণ করে।

এরপর তিনি একাই একটি গাড়ি নিয়ে ছুটে যান অফিসার কমান্ডিং জানজুয়ার বাড়ি। কলিং বেল টিপতেই ঘুম ভেঙ্গে উঠে আসে জানজুয়া। আর সামনেই মেজর জিয়াকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে ওঠে। তাঁর ধারণা ছিল পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর জিয়া বন্দরে বন্দী হয়ে রয়েছে। জানজুয়াকে গ্রেফতার করে নিয়ে ষোলশহরে ফিরে আসেন মেজর জিয়া। পথে অফিসারস মেসে মেজর শওকতকে তিনি সব কথা বলতেই মেজর শওকত উৎফুল্ল হয়ে উঠেন এবং বিদ্রোহে তাঁর যোগ দেবার কথা ঘোষণা করে দ্রুত ব্যাটালিয়নে চলে আসেন।

এরপরই মেজর জিয়া টেলিফোনে স্থানীয় জননেতা ও বেসামরিক অফিসারদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু কাউকেই পান না।

তখন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটরকে তিনি অনুরোধ জানান সবাইকে টেলিফোন করে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহ ঘোষণার কথা জানাতে। অপারেটর সানন্দে তাঁর সে নির্দেশ জানাতে রাজি হন।

তিনি লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীর সাথেও টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকেও পাননি। পরে শুনেছিলেন এই রাতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা গুরুতর অসুস্থ এম আর চৌধুরীকে হত্যা করেছিল।

শুরু হয়ে গেল বিদ্রোহ। রাত তখন দুটো। ব্যাটালিয়নের আড়াইশোর মত বাঙালি সৈন্যকে একত্রিত করে তাঁদেরকে সব কথা বললেন মেজর জিয়া। সবাই একবাক্যে এই বিদ্রোহের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন। তাঁরা জানান দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা জান দিতে প্রস্তুত।

কিছু সৈন্য ষোলশহরে রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে মেজর জিয়া বেরিয়ে পড়েন কালুরঘাটের পথে। এদিকে ইপিআর-এর জওয়ানরাও লড়াই শুরু করেছিলেন। কালুরঘাটে পর দিন তাঁদের সাথে বেশ কিছু পুলিশও যোগ দেন।

২৬শে মার্চ সকাল। আগের রাতে ঢাকা শহরে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে রাজধানীতে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী। আর সেই আনন্দে সকাল হতেই পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতরে চলছিল মিষ্টি বিতরণ আর অভিনন্দন বিনিময়ের পালা। কিন্তু মুহূর্ত কয়েক পরেই তাদের মুখের হাসি ম্লান হয়ে যায়। মিষ্টি হয়ে যায় বিস্বাদ। চট্টগ্রামের যুদ্ধের খবর যখন তাদের কাছে পৌঁছালো তখন এক দারুণ সন্ত্রাসে আঁতকে উঠলেন তারা।

চট্টগ্রাম। পাকিস্তানিদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো চট্টগ্রাম। ২৭শে মার্চ সকালেই বিমান বোঝাই হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে গেল পুরো দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়ন। চট্টগ্রাম যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরির জন্যে মিটঠা খানকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হয় চট্টগ্রামে।

বাঙালি সৈন্যরা গুলি করে সে হেলিকপ্টারটি ফুটো করে দেয়। একই সাথে বিমানে করে নামানো হতে লাগলো দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নকে। নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ বাবরকে নিয়ে আসা হয় বন্দরে। এতে ছিল দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য। ডেস্ট্রয়ার, এক স্কোয়াড্রন ট্যাংকও লাগানো হয় এই যুদ্ধে। জাহাজের গান থেকেও গোলা নিক্ষেপ হতে থাকে শহরের দিকে।

এই বিরাট শক্তির মোকাবিলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না এ কথা বাঙালি সৈন্যরা বুঝেছিলেন। তাই শহর ছেড়ে যাবার আগেই বিশ্ববাসীর কাছে কথা জানিয়ে যাবার জন্যে মেজর জিয়া ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে যান। বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা মেজর জিয়াকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন।

কিন্তু কি বলবেন তিনি? একটি করে বিবৃতি লেখেন আবার তা ছিঁড়ে ফেলেন। কি জানাবেন তিনি বিশ্ববাসী এবং দেশবাসীকে বেতার মারফত? এদিকে বেতার কর্মীরা বারবার ঘোষণা করছিলেন আর পনেরো মিনিটের মধ্যে মেজর জিয়া ভাষণ দেবেন। কিন্তু পনেরো মিনিট পার হয়ে গেল। মেজর জিয়া মাত্র তিন লাইন লিখতে পেরেছেন, তখন তার মানসিক অবস্থা বোঝাবার নয়। বিবৃতি লেখায় ঝুঁকিও ছিল অনেক। ভাবতে হচ্ছিল শব্দ চয়ন, বক্তব্য পেশ প্রভৃতি নিয়ে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা মোসাবিদার পর তিনি তৈরি করেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি। নিজেই সেটা তিনি বাংলা এবং ইংরেজিতে পাঠ করেন।

১১ই এপ্রিল পর্যন্ত কালুরঘাট থেকে তারা চট্টগ্রামের যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁদের সাথে যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ২০তম বালুচ রেজিমেন্ট, কুমিল্লা থেকে নিয়ে যাওয়া ৫৩ ব্রিগেড। আর নিশ্চিহ্ন হয়েছিল কমান্ডো যারা অবাঙালিদের ঘরে ঘরে ঘাঁটি গেড়েছিল।

এদেরকে ছাড়াও চট্টগ্রামের এই যুদ্ধে বাঙালিদের বিরুদ্ধে লাগানো হয়েছিল কোয়েটা থেকে নিয়ে আসা ১৬শ ডিভিশন ও প্রথম কমান্ডো ব্যাটালিয়নকে।

৩০শে মার্চ সকালে মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র) থেকে আর এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা করেন।

এই দিনই দুটি পাকিস্তানি বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করে বেতার কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

১১ই এপ্রিল কালুরঘাট এলাকা থেকে অবস্থান সরিয়ে নেবার পর যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এ যুদ্ধ চলে রামগড়, রাঙামাটি এলাকায়। যুদ্ধ চলে কক্সবাজারের পথে, শোভাপুরে। যুদ্ধ শুরু হবার প্রথম থেকেই দলে দলে জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্ররা এসে যোগ দিয়েছে মুক্তি বাহিনীতে। অস্ত্র ধরেছে, ট্রেনিং নিয়েছে, বীরত্বের সাথে লড়াই করেছে।

৩০শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাবার পর ৩রা এপ্রিল রাত সাড়ে নয়টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন একটি গোপন এলাকা থেকে চালু করা হয় আর একটি বেতার কেন্দ্র। 'আমার সোনার বাংলা' দিয়ে করা হয় কেন্দ্রের উদ্বোধন। এই গানটি গাইবার জন্যে সে-রাতে সেখানে এসেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন পুলিশ সুপার জনাব রহমানের তিন মেয়ে।

মুক্তিযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল*

'সর্বপ্রথমে আমরা যুদ্ধ করেছি নিয়মিত পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালু থাকে মে মাস পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ার জন্যে নিয়মিত বাহিনীর যে স্বাভাবিক পদ্ধতি তারও কিছু রদবদল করা হয়েছিল। এপ্রিল মাস নাগাদ আমরা বুঝতে পারলাম—আমাদের একটি বিরাট গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে এও বুঝতে পারলাম, বইয়ে লেখা ক্লাসিক্যাল গেরিলা ওয়ারফেয়ার দ্বারা দেশমুক্ত করতে হলে সময় লাগবে অনেক। তাই এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে—সময় কমাবার জন্যে আমাদের একটি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সেই পদ্ধতি হল—বড় একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করে ভেতরে থেকে শত্রুর আতে আঘাত করতে হবে এবং সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনীর ছোট ছোট ইউনিট দিয়ে শত্রুকে আঘাত করে তাকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করা হবে.....

বলছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর তদানীন্তন সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জেনারেল ওসমানী ২৬শে মার্চ থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল এবং ৩রা ডিসেম্বরের পরবর্তী পর্যায়ে সম্মিলিত বাহিনীর (অর্থাৎ বাংলাদেশ বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর) রণনীতি ও রণকৌশল ব্যাখ্যা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্ট্রাটেজী এবং মোডাস অপারেন্ডি সম্পর্কে জেনারেল ওসমানী এই প্রথম সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন।

অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ঘরোয়া পরিবেশে আমাদের এই সাক্ষাৎকারটি অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়ার একজন বিশিষ্ট ওয়ার স্ট্রাটেজিস্ট জেনারেল ওসমানী সময়ের কালানুক্রম অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের রণকৌশলগত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। বাংলাদেশ নিয়মিত বাহিনী ও গণবাহিনী কিভাবে সংগঠিত হলো; এর সংখ্যা কত ছিল; এর অস্ত্রসজ্জা; বিমান বাহিনী ও নৌ-কমান্ডো ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়েও তিনি বক্তব্য রাখেন।

প্রশ্ন : মুক্তিবাহিনী কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং ২৬শে মার্চের পর থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা কোন ধরনের রণনীতি ও রণকৌশল অবলম্বন করেছিলেন?

জেনারেল ওসমানী : আপনাদের মনে আছে ২৬শে মার্চ থেকে শত্রুকে প্রতিরোধ এবং বাঙালি দমনে শত্রুদের কার্যক্রম প্রতিরোধ করতে প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর বাঙালি সৈনিক, প্রাক্তন ইপিআর-এর বীর বাঙালিরা এবং আনসার মোজাহেদ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বীর জওয়ানেরা। সঙ্গে সঙ্গে এদের সাথে এসে যোগ দিয়েছিলেন যুবক ও ছাত্ররা।

---

* হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, জেনারেল ওসমানী সাক্ষাৎকার অবলম্বন রচিত প্রবন্ধ, দৈনিক বাংলা ডিসেম্বর ১৯৭২, (ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)

সর্বপ্রথমে যুদ্ধ হয় নিয়মিত পদ্ধতিতে। আর এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালু থাকে মে মাস পর্যন্ত। শত্রুকে ছাউনিতে যথাসম্ভব আবদ্ধ রাখা এবং যোগাযোগের কেন্দ্রসমূহ তাকে কব্জা করতে না-দেয়ার জন্যে নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হয়েছিল। এজন্যে পদ্ধতি ছিল–যত বেশি বাধা সৃষ্টি করা যায় তা সৃষ্টি করা হবে; যেসব ন্যাচারাল অবস্ট্রাকল বা প্রতিবন্ধক রয়েছে তা রক্ষা করতে হবে এবং এর সাথে সাথে শত্রুর প্রান্তভাগে ও যোগাযোগের পথে আঘাত হানা হবে। মূলত এই পদ্ধতি ছিল নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতি। আর সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে। এই পর্যায়ে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ রয়েছে। যথা : ভৈরব-আশুগঞ্জের যুদ্ধ; এই যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়নের বিরুদ্ধে শত্রু পুরো দুটো ব্রিগেড নিয়োগ করে। এখানে শত্রু বাহিনীকে চারদিন আটকে রাখা হয়।

তবে একটা বিষয়ে আমি আলোকপাত করতে চাই। নিয়মিত বাহিনীর যেটা স্বাভাবিক কৌশল তা আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার জন্যে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমরা ছোট ছোট অংশ অর্থাৎ ছোট ছোট পেট্রল বা ছোট ছোট কোম্পানি প্লাটুনের অংশ দিয়ে শত্রু বাহিনীর তুলনামূলক অধিক সংখ্যক লোককে রুদ্ধ করে রাখি এবং সাথে সাথে শত্রুর ওপর আঘাতও হানতে থাকি। এভাবে চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে সর্বপ্রথম যুদ্ধ শুরু হয়।

সে সময় আমি ও আমার অধিনায়কদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমরা কেবলমাত্র নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে চলতে পারব না। কারণ আমাদের সংখ্যা তখন সর্বমোট মাত্র ৫টি ব্যাটালিয়ন। এছাড়া আমাদের সাথে প্রাক্তন ইপিআর-এর বাঙালি জওয়ানেরা, আনসার, মোজাহেদ, পুলিশ ও যুবকরাও ছিলেন। যুবকদের অস্ত্র দেয়া একটু কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমরা ভেতর থেকে যে অস্ত্রগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে তাদেরকে তাড়াতাড়ি মোটামুটি প্রশিক্ষণ দিয়ে দাঁড় করিয়েছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে তখন শত্রু বাহিনীর ছিল তিন-চারটি ডিভিশন। এই তিনটি ডিভিশনকেই নিম্নতম সংখ্যা হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে এদেরকে প্রতিরোধ করা, ধ্বংস করা সোজা নয়, সম্ভব নয়। তাই এপ্রিল মাস নাগাদ এটি আমার কাছে পরিষ্কার ছিল যে আমাদের বিরাট একটি গণবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই গণবাহিনী শত্রুপক্ষের সংখ্যার গরিষ্ঠতাকে নিউট্রালাইজ করবে। এই গণবাহিনী এরকম হবে যেমন মানুষের পেটের অন্ত্রের মধ্যে একটি শক্তিশালী জীবাণু অন্ত্রটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে তেমনি ভেতর থেকে শক্তিশালী গেরিলা বাহিনী শত্রুর আঁতগুলো বিনষ্ট করে দেবে। তাছাড়া শত্রুকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না। কারণ তাদের সংখ্যা বেশি, তাদের অস্ত্র বেশি; তাদের বিমান রয়েছে আর আমাদের কাছে বিমান ছিল না। এ-ছাড়া সম্বল তাদের অনেক বেশি।

কিন্তু এর সাথে সাথে এটাও পরিষ্কার ছিল যে বইয়ে লেখা ক্লাসিক্যাল গেরিলা ওয়ারফেয়ার করে দেশমুক্ত করতে হলে বহুদিন যুদ্ধ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ জনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর বিশেষ কিছু উদ্ধার করার থাকবে না। সেজন্য এপ্রিল মাসের শেষের দিকে এটাও আমার কাছে পরিষ্কার ছিল যে আমাদের একটি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে

সময় কমাবার জন্যে। সেই পদ্ধতিতে বড় একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করে ভেতর থেকে শত্রুর আঁতে আঘাত করতে হবে এবং সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনীর ছোট ছোট ইউনিট অর্থাৎ কোম্পানি বা প্লাটুন দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে হবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে তাকে বাধ্য করতে হবে। সে যেন কনসেনট্রেটেড না-থেকে ডিসপার্জড হয়। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সে ছোট ছোট ট্রলিতে তার ফোর্সকে কমিট করতে বাধ্য হবে। এবং তখন গেরিলা পদ্ধতিতে তার যোগাযোগের রাস্তা, তার রি-ইনফোর্সমেন্টের রাস্তা, তার সংযোগের রাস্তা ধ্বংস করে তাকে ছোট ছোট পকেটে আইসোলেট বা বিচ্ছিন্ন করা হবে।

এজন্যে আমার অনেক নিয়মিত বাহিনীরও প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের কথা আমি মে মাসের শুরুতে সরকারকে লিখিতভাবে জানাই। এবং এই ভিত্তিতে মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্যও চাই। তাতে আমার উদ্দেশ্য ছিল (ক) কমপক্ষে ৬০ থেকে ৮০ হাজার গেরিলা সমন্বিত বাহিনী ও (খ) ২৫ হাজারের মতো নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই বাহিনী সত্বর গড়ে তুলতে হবে। কারণ, একদিকে গেরিলা পদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে নিয়মিত বাহিনীর কমান্ডো ধরনের রণকৌশল দিয়ে শক্তিকে বণ্টন করার জন্যে বাধ্য করতে হবে যাতে তার শক্তি হ্রাস পায়।

এই পদ্ধতি আমরা কার্যে পরিণত করি। ক্রমশ গড়ে উঠলো একটি বিরাট গণবাহিনী–গেরিলা বাহিনী। জুন মাসের শেষের দিক থেকে গেরিলাদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। প্রথমে বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি বানানো হয় এবং জুন মাসের শেষের দিক থেকে আমাদের গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী এ্যাকশনে নামে। তবে, জুলাই-আগস্ট মাসের আগ পর্যন্ত শত্রুবাহিনী তাদের ওপর গেরিলা বাহিনীর প্রবল চাপ বুঝতে পারেনি। যদিও শুরু থেকে আমরা কিছুসংখ্যক যুবককে ট্রেনিং দিয়ে ভেতরে পাঠিয়েছিলাম। তারা চট্টগ্রাম বন্দরেও গিয়েছিল, ঢাকায়ও এসেছিল, তবে শত্রুরা জুলাই মাস থেকে গেরিলাদের চাপ অনুভব করতে শুরু করে।

এর সাথে সাথে আরেক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আমাদের নৌবাহিনী ছিল না। আমার কাছে নিয়মিত নৌবাহিনীর বহু অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার ও নাবিক আসেন। ফ্রান্সের মতো জায়গা থেকে কয়েকজন পাকিস্তানের ডুবো জাহাজ ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগদান করে। আমি তাদেরকে ভিত্তি করে এবং আমাদের বড় শক্তি যুবশক্তিকে ব্যবহার করে নৌ-কমান্ডো গঠন করি। এই নৌ-কমান্ডো জলপথে শত্রুর চলাচল ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।

১৯৭১ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে আমাদের এই নৌ-কমান্ডোদের আক্রমণ শুরু হয়। তারা যে-বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর নেই। তারা মংলায় বহু জাহাজ ডুবায়। শত্রুর জন্যে বিভিন্ন অস্ত্র ও সামান নিয়ে যেসব জাহাজ আসছিল চট্টগ্রামে তারা সেগুলো ধ্বংস করে। এজন্যে অত্যন্ত দুঃসাহসের প্রয়োজন ছিল। তারা শত্রুর দুটো বন্দর অচল করে দেয় এবং নদীপথেও তাদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়।

আমাদের কৌশল অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ শত্রু রক্তহীন হয়ে ওঠে। তার ২৫ হাজারের মতো সৈন্য বিনষ্ট হয়। বহু যানবাহনের লোকসান

হয়। ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত শত্রুর এ অবস্থা দাঁড়ায় যে একজন বক্সার রিং-এর দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্লান্ত হয়ে ঘুরছে এবং একটা কড়া ঘুষি খেলে পড়ে যাবে– তার যোগাযোগের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন হয়ে পড়েছিল। যেভাবে আমার উদ্দেশ্য ছিল সেভাবে বিভিন্ন জায়গায় তারা ছোট ছোট পকেট বানিয়েছিল। তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে রি-ইন-ফোর্স কংক্রিটের বাংকার বানিয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে তারা ঢুকে ছিল। রাতের বেলাতে বেরুতো না, দিনের বেলায়ও বেশিসংখ্যক লোক ছাড়া বেরুতো না। শত্রুর তখন এই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। অক্টোবর-নভেম্বর থেকেই শত্রু যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। যাতে তাদের জান বাঁচে, জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের পরে একটা যুদ্ধবিরতি হয়, অবজারভার এসে যায় এবং জাতিসংঘের কাছে সমস্যাটি দিয়ে তাদের জান রক্ষা হয়–শত্রুপক্ষের এই ছিল প্রচেষ্টা। কারণ, তখন তারা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে তাদের পরাজয় একেবারে অনিবার্য। জাতিসংঘ যখন হস্তক্ষেপ করল না তখন তারা একটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালালো। যাতে জাতিসংঘ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। প্রথমে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের ঘাঁটি পজিশন ও বেসগুলোর ওপর হামলা করে। সাথে সাথে তারা পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা অঞ্চলেও গোলাগুলি শুরু করে।

আরেকটি ব্যাপারে আমি বলতে চাই। আমার কাছে বিমান ছিল না। তবে শেষের দিকে কয়েকটি বিমান নিয়ে আমি ছোটখাট একটি বিমান বাহিনী গঠন করেছিলাম। আমি যে বিমান পেয়েছিলাম তা ছিল দুটো হেলিকপ্টার, একটি অটার এবং আমার বাহন স্বরূপ একটি ডাকোটা। সেই অটার ও হেলিকপ্টারগুলোতে মেশিনগান লাগিয়ে যথেষ্ট সজ্জিত করা হল। আমাদের যেসব বৈমানিক স্থলযুদ্ধে রত ছিলেন তাদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে একটি ছোট বিমান বাহিনী গঠন করা হল। এই বাহিনীর কৌশল ছিল–গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘাঁটিতে হামলা করা এবং ইন্টারডিকশন অর্থাৎ শত্রুর যোগাযোগের পথকে বন্ধ করে দেয়ার জন্যে লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানা।

আপনারা জানেন কিনা জানি না, শত্রুর ওপর প্রথম যে বিমান হামলা তা বাংলাদেশের বীর বৈমানিকেরা করেছে। ২৬শে মার্চ থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত যে যুদ্ধ হয়েছে তাতে যদিও আমাদের কাছে বিমান ছিল না কিন্তু আমরা বিমান ঘাঁটিগুলোতে আঘাত হেনেছি। শেষের দিকে একজন মুক্তিযোদ্ধা সিলেট বিমান ঘাটিতে একটি সি-১৩০ বিমানের ওপরও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মেশিনগান চালায়। মেশিনগানের গুলিতে ও সি-১৩০ বিমানটি পড়ে যায়নি; কোন রকমে ঢুলু ঢুলু করে চলে গিয়ে শমসেরনগরে নেমেছিল এবং পরে অনেকদিন মেরামতে ছিল।

জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর কাছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল–'৩ রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্মিলিত বাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল কি ছিল?

জেনারেল ওসমানী : প্রথমেই একথা বলে নিচ্ছি, শেষের দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বরের আগে শেষপর্যায়ে শত্রুবাহিনী ভারতের উপর যথেষ্ট পরিমাণ হামলা শুরু করলো। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে ভারতীয়দের যুদ্ধে নামতে হবে যদিও ওপর থেকে তারা তখনো নির্দেশ পাননি। এমনকি শেষের দিকে যখন যশোর সীমান্তে ভারতের ওপর হামলা

হয়েছে তখনো ওপর থেকে ক্লিয়ারেন্স আসেনি। একদিনের কথা আমার মনে পড়ছে। সেই অঞ্চলে যুদ্ধরত আমার মুক্তিবাহিনীর ওপর পাকিস্তানের ট্যাংক আক্রমণ হচ্ছে। আমাদের কাছে ট্যাংক ছিল না। পাকিস্তানি ট্যাংকগুলো ভারতীয় অঞ্চলের ওপরেও গোলাবর্ষণ করছে। আমি তখন ওদের জিজ্ঞেস করলাম– আপনারা এর জবাব দিচ্ছেন না কেন? জবাবে তাঁরা বললেন–পলিটিক্যাল ক্লিয়ারেন্স নেই। তখন আমার নিয়মিত বাহিনী ও গণবাহিনীর যোদ্ধারা অতি বীরত্ব ও কৃতিত্বের সহিত মোকাবেলা করছে।

ভারতীয় বাহিনী তেসরা ডিসেম্বর যুদ্ধে নামে। এবং শত্রু আত্মসমর্পণ না-করা পর্যন্ত ১৩দিন যুদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য এর আগে তাঁরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ভারতীয় বাহিনীর যখন যুদ্ধে নেমে আসার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন আমরা সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা করে একটি রণনীতি অবলম্বন করি। সেই নীতি ছিল–যেহেতু ভারতীয়দের কাছে ট্যাংক, কামান ও বিমান রয়েছে সেজন্যে যেখানে অধিক শক্তিশালী প্রতিরোধ রয়েছে এবং বড় অস্ত্রশক্তি প্রয়োজন সেখানে তাঁরা প্রথম লক্ষ্য দেবেন এবং আমাদের বাহিনী শত্রুকে 'আউটফ্ল্যাংক' অর্থাৎ শত্রুকে দুপাশ দিয়ে অতিক্রম করে–'ক্রস কান্ট্রি' দিয়ে গিয়ে ব্যূহের পার্শ্বভাগে আক্রমণ করবে অথবা ভারতীয়রা সামনের দিকে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে এবং আমাদের বাহিনীকে 'আউটফ্লাংক' করে পেছন দিক আক্রমণ করবে। যেহেতু অঞ্চলগুলো সম্পর্কে আমাদের বাহিনী সম্পূর্ণ সজাগ ছিল সেজন্যে এই কাজগুলো করার দায়িত্ব ছিল আমাদের ওপর। যেখানে অধিকসংখ্যক গোলাবারুদ, বিমান বা ট্যাংকের আক্রমণ করতে হবে সেখানে ভারতীয় বাহিনী শক্তি নিয়োগ করবে।

যেসব অঞ্চল কেবল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী মুক্ত করেছিল সেখানে আমাদের বাহিনী সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের পরিকল্পিত পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করেন। আমাদের বাহিনী যেসব অঞ্চল এভাবে মুক্ত করে তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট অঞ্চল, সিলেটের সুনামগঞ্জ ও দুতিক অঞ্চল, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরাঞ্চল, চট্টগ্রামের করের হাট, হায়াকু, হাটহাজারী অঞ্চলের 'এক্সেস অব এডভান্স', কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চল, যশোরের মনিরামপুর ও অভয়নগর অঞ্চল, খুলনার বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও কালিগঞ্জ অঞ্চল, ফরিদপুর সদর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ অঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং ঢাকা পৌঁছার শেষ পর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-ভৈরব, নরসিংদী-ঢাকা, এই 'এক্সেস অব এডভান্স' রয়েছে। শেষ পর্যন্ত মিত্ররাও এই পদ্ধতিটি বেশি কার্যকর বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই পদ্ধতিটি ছিল–শত্রুর যেখানে পাকা বাংকার রিইনফোর্সড কনক্রিটের শক্তিশালী ব্যূহ বা স্ট্রং পয়েন্ট রয়েছে সেখানে গিয়ে সরাসরি ঢু মারা বুরবকের কাজ হবে। এক্ষেত্রে যা করতে হবে তা ১৯৪২ সালে জাপানীরা বৃটিশ বাহিনীকে (যাতে আমি ছিলাম) শিখিয়েছিল। এক্ষেত্রে সামনে দিয়ে শত্রুকে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং তাকে 'আউটফ্লাংক' করে ওর পেছনে গিয়ে স্ট্রং পয়েন্ট বানিয়ে বসুন। সে যাবে কোথায় এবং ওর 'রিইনফোর্সমেন্ট ও গোলাবারুদ, রসদ ইত্যাদি আসবে কোত্থেকে। এইভাবে তাকে বিচ্ছিন্ন করে তার ব্যূহের পেছন ও পার্শ্বভাগে আঘাত করুন। প্রথম প্রথম মিত্রদের অনেকে ভাবতেন আমরা ভীতু নাকি। তারপর একটি অভিজ্ঞতা হওয়ার পর বুঝলেন যে আমাদের পদ্ধতিই একমাত্র কার্যকর

রণপদ্ধতি। এভাবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কেবল একটি ব্যাটালিয়ন শত্রুর ১৪ নং ডিভিশনকে আশুগঞ্জের যুদ্ধের পর ঘেরাও করে অকেজো করে দেয়।

তাই যেসব অঞ্চলে আমরা একা যুদ্ধ করেছি সেখানে আমাদের পদ্ধতি ছিল–শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটিকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে সম্মুখভাগে ব্যস্ত রেখে ও আউটফ্লাংক করে পেছনে গিয়ে বসা এবং তারপর পার্শ্বভাগ ও পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করা। অভ্যন্তরভাগের গেরিলাদের (গণবাহিনীর) এবং আমাদের নিয়মিত বাহিনীর আক্রমণের সামঞ্জস্য বিধান করার নির্দেশ থাকতো, গেরিলারা যখন অমুক জায়গায় আক্রমণ করবে দৃষ্টিকে অন্য দিকে ধাবিত করতে হবে তখন শত্রুর যাতে গোলাগুলি ও রিইনফোর্সমেন্ট না-আসতে পারে তার ব্যবস্থা করবে। গেরিলারা অমুক জায়গায় অমুক পুলটি ভাংগবেন। তবে আমরা বড় বড় পুলগুলোতে হাত দেইনি। সেগুলো শত্রুরাই আগে ভেঙ্গে ছিল।

যেখানে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছি; সেখানে কৌশল ছিল— যেখানে অধিক অস্ত্র, গোলাবারুদ, ট্যাংক ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেবে, 'এক্সেস অব এডভান্স'-এ ভারত শত্রুর স্ট্রং পয়েন্টের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে এবং বাংলাদেশ বাহিনী 'আউট ফ্লাংক' করে পার্শ্বভাগে বা পেছনের দিক থেকে অক্রমণ করবে।

এর সঙ্গে এটাও সুস্পষ্ট নীতি ছিল যে, স্ট্রং পয়েন্টগুলো ক্লিয়ার করার পরবর্তী পর্যায়ে শত্রুর অন্য পজিশনগুলো আয়ত্ত করতে হবে, সেখানে মুক্তিবাহিনী অর্থাৎ বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী এগোবে। তাঁদের অগ্রাভিযানে ভারতীয় গোলান্দাজ বাহিনী যতটুকু সাপোর্ট দেয়ার ঠিক ততোটুক দেবে।

প্রশ্ন : মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যখন এক সাথে এগোতো তখন অগ্রবর্তী দল হিসেবে মুক্তি বাহিনী যেতো এবং সাপোর্ট আসতো ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকে– তাই কি?

জেনারেল ওসমানী : দুরকম ছিল। সেটা হয়েছে প্রথম স্ট্রং পয়েন্টটি ক্লিয়ার করার পরে। মনে করুন, শত্রুর খুব শক্তিশালী একটা ঘাঁটি রয়েছে। সেই ঘাঁটির উপর ভারতীয় বাহিনী ট্যাংক ও কামান দিয়ে হামলা করতো। ক্রস কান্ট্রি এগিয়ে যাওয়ার বিশেষ দক্ষতা মুক্তি বাহিনীর ছিল। এর দুটো কারণ ছিল– প্রথমতঃ আমরা নমাস নিজের অঞ্চলে যুদ্ধ করে আসছি এবং আমাদের বাহিনী তুলনায় হাল্কা ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সংযোগ ছিল স্থানীয় লোকের সাথে, আমাদের প্রতি তাদের ছিল পুরো সমর্থন। সেজন্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে আউটফ্লাংক করে শত্রুর পার্শ্বভাগ ও পেছন থেকে আক্রমণ করতাম যাতে সে আর টিকতে না পারে। তার পরে যখন অগ্রবর্তী অন্যান্য শত্রু পজিশন আক্রমণ করতে হতো বা এগিয়ে যেতো হতো তখন আমাদের বাহিনী অগ্রসর হতো ও আক্রমণ করতো। কারণ, অঞ্চলের পথঘাটগুলো আমাদের জানা ছিল, শত্রুর পজিশন সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তের খবর আমরা পেতাম; দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত আমাদের সেলগুলোও থাকতো। গেরিলাদের সাথে আমাদের সমন্বয় ও সংযোগ ছিল; আবার এখানেও প্রয়োজন হলে ভারতীয় বাহিনী আমাদেরকে আর্টিলারি বা ভারি কামানের দ্বারা সাপোর্ট দিত।

প্রশ্ন : কটি সেক্টর ছিল? হেড কোয়ার্টার কোথায় ছিল?

জেনারেল ওসমানী : বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেছিলাম; এক একটি

সেক্টর এক-এক-জন অধিনায়কের অধীনে ছিল। এবং প্রত্যেক অধিনায়কের একটি সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল। এবং এই সেক্টর হেডকোয়ার্টারগুলো বাংলাদেশের ভেতরেই ছিল। এই সেক্টরগুলোর উপরে ভিত্তি করে আমি যুদ্ধটি লড়েছি। কারণ বাংলাদেশের মত এত বড় একটা 'থিয়েটার অর্থাৎ দেশব্যাপী রণক্ষেত্রে–যার ১১টি সেক্টরের মধ্যেরয়েছে অসংখ্য নদীনালা; দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে সামরিক সদর দফতর, উপযুক্ত পরিমাণ অফিসার ও স্টাফ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সম্পদ ও সঙ্গতির প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার ছিল মাত্র ১০ জন অফিসার বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্রবাহিনীর রণ-পরিচালনার হেডকোয়ার্টার। এছাড়া এতবড় একটা বিরাট অঞ্চলব্যাপী সামগ্রিক যুদ্ধে একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে দৈনন্দিন আদেশ, নির্দেশ ও অনুজ্ঞা প্রেরণ এবং সে অনুযাযী যুদ্ধ পরিচালনা আমাদের তখনকার পরিস্থিতিতে শুধু অসম্ভব নয়, অবাস্তবও ছিল। তাই আমি আমার চীফ অব স্টাফ ও অন্য কমান্ডারদের কাছে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য; আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক বিবেচ্য বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন এবং আমাদের ও শত্রুর কাছে কার্যক্রমের কোন কোন পথ উন্মুক্ত রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক চিত্র তুলে ধরি। আমাদের সামরিক লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কিত আমার নির্দেশের (অপারেশনাল ইনস্ট্রাকশন ও অপারেশনাল ডাইরেক্টিভ) মাধ্যমে সাধারণভাবে আমাদের বাহিনীর করণীয়, প্রত্যেক সেক্টরের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং সাংগঠনিক ও যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে জানতাম। আমার প্রতিটি সেক্টর কমান্ডারের স্থানীয়ভাবে তাদের দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। সেক্টর কমান্ডারদের সাথে আমি লিয়াজোঁ অফিসার ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। এছাড়া আমার কমান্ডারদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা এবং যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমি এক সেক্টর থেকে যেতাম অন্য সেক্টরে। সে অবস্থায় আমি যখন যে সেক্টরে থাকতাম সে সেক্টরের হেডকোয়ার্টারই হতো আমার হেডকোয়ার্টার। এভাবে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতাম ও সে অনুযায়ী নির্দেশ দিতাম। এছাড়া যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভাকেও আমি যুদ্ধের অগ্রগতি ও সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত রাখতাম।

যখন বাংলাদেশ সরকার আমাকে সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করেন তখন আমি তাদের অনুমোদনে লেফট্যানান্ট কর্নেল (বর্তমানে মেজর জেনারেল) এম এ রবকে চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করি। তিনি আমার পর সবচেয়ে সিনিয়র ছিলেন। তিনি গণপরিষদেরও সদস্য। বিভিন্ন সেক্টরের কমান্ডার নিয়োগ করি– (১) এক নম্বর সেক্টরে প্রথমে মেজর (বর্তমানে কর্নেল) জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিক; (২) দুই নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফ; পরে তিনি যখন কে ফোর্স-এর কমান্ডার হয়ে যান তখন বেশ কিছুদিন তিনি দুটোই কমান্ড করছিলেন। তিনি আহত হওয়ার পরে মেজর আবু সালেক চৌধুরী কমান্ড করেন কে ফোর্স এবং ২ নম্বর সেক্টর মেজর হায়দার; (৩) তিন নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর (বর্তমানে কর্নেল) শফিউল্লাহ, পরে যখন তিনি এস ফোর্সের কমান্ডার হয়ে যান তখন মেজর (বর্তমানে লে. কর্নেল) নূরুজ্জমান–বর্তমানে যিনি জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টর তার স্থলাভিষিক্ত হন, (৪) চার

নম্বর সেক্টরে কমান্ডার ছিলেন মেজর (বর্তমানে কর্নেল) চিত্তরঞ্জন দত্ত–যিনি নিয়মিত অফিসার যারা চাকুরীতে রয়েছেন তাদের সকলের মধ্যে সিনিয়র। আইয়ুব আমলে তাকে সুপারসিড করা হয়েছিল। (৫) পাঁচ নম্বর সেক্টরে ছিলেন মেজর (বর্তমানে কর্নেল) মীর শওকত আলী যিনি যুদ্ধের প্রারম্ভে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধ করেন, (৬) ছয় নম্বর সেক্টরে ছিলেন উইং কমান্ডার (বর্তমানে গ্রুপ ক্যাপ্টেন বাশার) তিনি বৈমানিক ছিলেন কিন্তু কিছু স্থানে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন। (৭) সাত নম্বর সেক্টরে কমান্ডার ছিলেন মেজর (পরে লে. কর্নেল) কাজী নুরুজ্জামান। তিনি পেনশনে ছিলেন ও আমার মতো যুদ্ধাবস্থায় এ্যাকটিভ লিস্টে কাজে যোগদান করেছিলেন। আবার পেনশনে চলে গেছেন। (৮) আট নম্বর সেক্টরের শুরুতে কমান্ডার ছিলেন মেজর (বর্তমানে কর্নেল) ওসমান চৌধুরী এবং আগস্ট মাস থেকে মেজর (বর্তমানে কর্নেল) মনজুর। (৯) নয় নম্বর সেক্টরে কমান্ডার ছিলেন প্রায় শেষের দিন পর্যন্ত মেজর এম. এ. জলিল। তিনি এখন চাকুরীতে নেই। তারপরে ছিলেন মেজর জয়নাল আবেদীন। (১০) দশ নম্বর সেক্টর (নৌকমান্ডো-সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও আভ্যন্তরীণ নৌপথ)। এতে নৌকমান্ডোরা বিভিন্ন সেক্টরে নির্দিষ্ট মিশনে সংশ্লিষ্ট কমান্ডারের অধীনে কাজ করেন। (১১) এগারো নম্বর সেক্টরে ছিলেন মেজর (পরে লে. কর্নেল) আবু তাহের যিনি জখমের জন্য বোর্ড আউট হয়েছেন। এ ছাড়া, তিনটি বিগ্রেড ফোর্স- জেড ফোর্স, কে ফোর্স ও এস ফোর্স কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ ও শফিউল্লাহ। হেড. কোয়ার্টারে ডেপুটি চীফ অব স্টাফ ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (বর্তমানে এয়ার কমান্ডার) এ. কে. খোন্দকার। চীফ অব স্টাফ রব সাহেব পূর্বাঞ্চলে থাকেন। ওখানে আমার হেডকোয়ার্টারের একটি অংশ ছিল। ওখানে যতগুলো সমস্যা-প্রশাসন ও রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কিত- তিনি সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং যেটা নীতি গ্রহণ সম্পর্কিত হতো সে বিষয়ে আমার নির্দেশ চাওয়া হতো।

প্রশ্ন : নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা কত ছিল এবং কি ধরনের অস্ত্রে তারা সজ্জিত ছিল? গণবাহিনীর মোট সংখ্যা কত দাঁড়িয়েছিল।

জেনারেল ওসমানী : নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা বাড়াতে বেগ পেতে হয়েছিল। অস্ত্র নিয়ে বেগ পেতে হতো। বেশির ভাগ সময় সকলের সদিচ্ছা থাকলেও অনেক জিনিস আমরা পেতাম না। আমার চেষ্টা ও চিন্তা এই ছিল যে আমি বিভিন্ন অস্ত্র কত তাড়াতাড়ি জোগাড় করতে পারি। কারণ ভারতীয়রা যদি তেসরা ডিসেম্বর যুদ্ধে না-নামতো তাহলে তখন যে পরিস্থিতি ছিল তাতে আমাকে আরো ছয় মাস যুদ্ধ করতে হতো। এতে দেশের আরও অনেক ক্ষতি হতো। এজন্য শত্রুকে আরও সত্বর ধ্বংস করার জন্য আমাদের অনেকগুলো অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। সর্বশেষ একটি দেশের সঙ্গে আমার সংযোগ হয়েছিল। সেই দেশটি তখনই অস্ত্র দিতে প্রস্তুত ছিল যদি আমার নিজের বিমান ঘাঁটি থাকতো। সেজন্যে আমি জেড ফোর্সকে (বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম ব্রিগেড) সিলেটে পাঠিয়েছিলাম। অনেকে জানতেন না হঠাৎ কেন জেড ফোর্সকে সিলেটের উপর চাপালাম। তারা কেবল মাত্র স্ট্রেটিজিক কারণই জানতেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল দুটো: বিমানঘাটি যত তাড়াতাড়ি পাই তত তাড়াতাড়ি আমি হয়তো অনেক জিনিস সরাসরি

আনতে সক্ষম হবো; এছাড়া, শত্রুর শক্তিকে অন্যদিকে আকর্ষণ করাও আমার উদ্দেশ্য ছিল।

যাহোক, যুদ্ধের শুরুতে খুব তাড়াতাড়ি একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব মনে হতো না। কিন্তু আমার মুক্তিবাহিনীর সৈনিক, নিয়মিত বাহিনীর অফিসার ও অধিনায়কদের চেষ্টায় আমি যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে প্রায় কুড়ি থেকে বাইশ হাজার সৈন্য সংবলিত নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলেছিলাম। তারা সাধারণ ইনফ্যানট্রি অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন।

দুটো গোলন্দাজ ব্যাটারী আমরা গড়ে তুলেছিলাম। ভারতীয়দের প্রাচীন কিছু কামান ছিল। ওগুলো দিয়ে প্রথম ব্যাটারীটি গড়ে উঠেছিল। ওর নাম দিয়েছিলাম– 'নম্বর ওয়ান মুজিব ব্যাটারী।' এই ব্যাটারী যুদ্ধেও ছিল। এর পরে আমরা দ্বিতীয় ব্যাটারী গঠন করি। আগেরটির চেয়ে একটু ভাল কামান দিয়ে এটি সজ্জিত ছিল। এ ব্যাটারীও যুদ্ধ করে।

আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করি প্রায় ৫ ব্যাটালিয়ন সৈন্য দিয়ে। যুদ্ধের শুরুতেই অনেকগুলোর সংখ্যা পূরণ করতে হয়েছে। যেমন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন। একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী পুরোনো পল্টন। মাত্র ১৮৮ জনকে আমি পেয়েছিলাম। বাকীরা নিহত কিংবা আহত হয়েছিলেন যশোরের যুদ্ধে। তাদের সংখ্যা পূরণ করতে হলো। শেষ পর্যন্ত আমি ৫টি ব্যাটালিয়ান থেকে ৮টি ব্যাটালিয়নে উন্নীত করি। এগুলো ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক, দুই, তিন, চার, আট, নয়, দশ, এগারো নং ব্যাটেলিয়ন। নয়, দশ, এগারো ছিল নতুন।

এছাড়া সেক্টর ট্রুপস গড়ে তুলি। সেক্টর ট্রুপস-এর সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ছিল দশ হাজার। যারা প্রাক্তন ইপিআর এবং নিয়মিত বাহিনীর বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে এসেছিলেন তাদেরকে ১১টি সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সেক্টরে ট্রুপস হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। কোন সেক্টরে চার কোম্পানি, কোন সেক্টরে পাঁচটি কোম্পানি, কোন সেক্টরে ছটি কোম্পানি–এমনি বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজন অনুসারে সংখ্যা বিভিন্ন ছিল। তারা সেক্টর কমান্ডারের অধীনে যুদ্ধ করতেন।

নিয়মিত ফোর্স ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন দিয়ে গঠিত হয়েছিল ব্রিগেড। ব্রিগেডগুলোকে আমি ফোর্স নাম দিয়েছিলাম–জেড ফোর্স, কে ফোর্স, এস ফোর্স। ব্রিগেডগুলোর কমান্ডারদের নামে এই নামকরণ হয়েছিল। জেড ফোর্স কমান্ড করতেন জিয়াউর রহমান, কে ফোর্স খালেদ মোশাররফ এবং এস ফোর্স শফিউল্লাহ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে যে অর্গানাইজেশন ছিল আমরা তার পরিবর্তন করি নি। এই অরগানাইজেশন অনেক চিন্তা করে বিগত দশ বছরে শান্তি ও যুদ্ধে পরীক্ষার ভিত্তিতে গড়া হয়েছিল, এর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সেটা ভারতীয় অর্গানাইজেশন-এর চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। আমি মনে করি, আমাদেরটা সুষ্ঠু। সেই অর্গানাইজেশনের ভিত্তিতে আমাদের ব্যাটালিয়নগুলোর সাধারণ অস্ত্রসজ্জা ছিল। অন্যান্য দেশের ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নের যা সাধারণ অস্ত্র থাকে এখানেও তাই ছিল, তবে ফায়ার পাওয়ার-টা এই অর্গানাইজেশনের কিছুটা বেশি। যেমন, সাধারণত একটি সেকশনে একটি লাইট মেশিনগান থাকে, আমাদের ছিল দুটো লাইট মেশিনগান। আর অস্ত্র ছিল যা স্বাভাবিক ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নে থাকে–গ্রেনেড, রাইফেল. লাইট মেশিনগান, মিডিয়াম

মেশিনগান, দুই ইঞ্চি এবং তিন ইঞ্চি বা ৮১ মিলিমিটার মর্টার এবং ট্যাংক বিধ্বংসী কামান।

সেক্টর ট্রুপস-এর অস্ত্রও প্রায় এ ধরনের ছিল। তবে ওদের স্কেল ছিল আলাদা। ওদের কাজ ঠিক নিয়মিত বাহিনীর মতো ছিল না। তাদের ভূমিকা ছিল–প্রথম তারা ঘাঁটি করবেন। সেই ঘাঁটি থেকে গেরিলা ভেতরে পাঠানো হবে এবং গেরিলাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রুর ওপর বিভিন্ন হামলা ও অন্যান্য কাজ করবেন। তাই তাদের অস্ত্রের পরিমাণ বা স্কেল এ্যাকটিভ ব্যাটালিয়নের চেয়ে কিছুটা পৃথক ছিল, কিছু কিছু কম ছিল। বিভিন্ন ধরনের অপারেশনের জন্যে থাকতো বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক। নৌ কমান্ডোদের আত্মরক্ষার জন্যে হালকা অস্ত্র থাকতো, বেশির ভাগ সময়ই গ্রেনেড। আর থাকতো অপারেশনের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন লিম্পেট মাইন।

যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাই আমার সৈন্য সংখ্যা ছিল–কুড়ি-পঁচিশ হাজার নিয়মিত বাহিনী এবং সত্তুর-আশি হাজার গণবাহিনী।

প্রশ্ন : গণবাহিনীর কোন আলাদা সেক্টর ছিল কিনা? সি-ইন-সি স্পেশাল সংগঠনটিও বা কি ছিল?

জেনারেল ওসমানী : বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নাম ছিল মুক্তিবাহিনী। এর ভেতরে স্থল, জল ও বিমান তিনটিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকে মুক্তিবাহিনী শব্দে ভুল করেন। তারা মনে করেন শুধু গেরিলাদের বুঝি মুক্তিবাহিনী বলা হতো। আসলে তা নয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পুরোটা মিলিয়ে ছিল মুক্তিবাহিনী। এর দুটো অংশ ছিল– (১) নিয়মিত বাহিনী এবং (২) গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী বা অনিয়মিত বাহিনী। ভারতীয়রা এই শেষোক্ত অংশকে বলতেন এফএফ অর্থাৎ ফ্রীডম ফাইটার। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা তো সবাই। আর গণবাহিনীর ও নিয়মিত বাহিনীর সেক্টর একই ছিল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য স্বীকারকারী সকলেই এই এগারটি সেক্টরের কোন-না-কোন একটি সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন।

সি-ইন-সি স্পেশাল সম্পর্কে এবার বলছি। শুরুতে গেরিলাদের দু'সপ্তাহ ট্রেনিং দেয়া হতো। কিন্তু এটা যথেষ্ট ছিল না। পরে মেয়াদ খানিকটা বাড়ানো হলো। তখন তিন সপ্তাহের মতো সাধারণ গেরিলা ট্রেনিং দেয়া হতো। এছাড়া, আমি কিছু সংখ্যক গেরিলার জন্যে একটি বিশেষ কোর্সের বন্দোবস্ত করেছিলাম। একে বলা হতো স্পেশাল কোর্স, ওটা ছয় সপ্তাহের ছিল। এই ফোর্সে গেরিলা লীডারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার অর্থাৎ শহরাঞ্চলে আবাসিক এলাকায় যুদ্ধ করার পদ্ধতিও তাদের শেখানো হতো। এদের ভূমিকা ছিল গেরিলাদের নায়কত্ব করা এবং সাধারণ গেরিলাদের দিয়ে সম্ভব নয় এমন সব কাজ সম্পন্ন করা। এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল খুব কম। চাকুলিয়া নামে এক জায়গায় তাদের ট্রেনিং দেয়া হতো। এসব গেরিলারা বিশেষভাবে সিলেট হয়ে যেতো। এদের সিলেকশনের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি লোক নিয়োগ করেছিলাম। তাই এদের নাম কেউ কেউ বলতো সিইনসি স্পেশাল। আসলে এ নামে কোন স্বতন্ত্র বাহিনী ছিল না।

প্রশ্ন : যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ অর্থাৎ অপারেশনাল ইন্সট্রাকশন বা ডাইরেকটিভস সম্পর্কে কিছু বলুন।

জেনারেল ওসমানী : সরকার গঠনের আগে আমি সর্বপ্রথমে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছি মুখে বলে, যোগাযোগ করে। তারপর আমি কমান্ডারদের আমাদের লক্ষ্য বা অবজেকটিভ এবং প্রত্যেক সেক্টরে কি ফলাফল অর্জন করতে হবে তা জানিয়েছি। এজন্যে আমি সাধারণত অপারেশনাল ইন্সট্রাকশন দিতাম। তাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিনায়কের উপর দায়িত্ব যথেষ্ট বিকেন্দ্রীকরণ করা হতো। সাধারণ লক্ষ্য এবং সেই অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য ও দায়িত্বের কথা এই হুকুমনামা বা ইন্সট্রাকশনে লেখা থাকতো। এছাড়া আমি একটি জিনিস ব্যবহার করেছিলাম–যা নতুন ছিল এবং আমার জানামতে এর আগে কোন সামরিক বাহিনীতে তা ব্যবহার করা হয়নি। সেটা ছিল–অপারেশনাল ডাইরেক্টিভস—নির্দেশ এবং উপদেশ। পরিস্থিতি যাচাই ও বিবেচনা করে কি পরিমাণ এই ডাইরেক্টিভস একজন অধিনায়ক অনুসরণ করবেন তা তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। কারণ তা না-হলে আমরা যুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারতাম না। তবে মৌলিক কয়েকটি বিষয় বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি।

সব সময় মন্ত্রিসভাকে– মাসে অন্তত একবার-রণাঙ্গনের পরিস্থিতির মূল্যায়ন অবহিত করতাম। এছাড়া, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভিত্তিক যে-নির্দেশ মন্ত্রিসভা আমাকে দিতেন তা আমার অধিনায়কদের কাছে পৌঁছে দিতাম।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো?

জেনারেল ওসমানী : বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু থেকেই আমরা ঘাঁটিগুলো গড়ে তুলেছিলাম। গণবাহিনী কাজ শুরু করার পর, এই ঘাঁটিগুলো অধিকতর সক্রিয় হয়। ঢাকা নগরীতেও কয়েকটি ঘাঁটি ছিল। ঘাঁটি প্রায়ই পরিবর্তন করা হতো। কয়েকটি ঘাঁটি শত্রুর হাতে ধরাও পড়েছিল। ঘাঁটিগুলোতে যে কেবল মুক্তিযোদ্ধা ছিল তা নয়, এতে আমাদের 'কনট্যাক্ট' এবং কোরিয়াররাও ছিলেন। একটা কোরিয়ার সার্ভিস পরিচালিত হতো। ছিল ওয়্যারলেস যোগাযোগ। কোরিয়ার-এর আসা-যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করা হতো। কোরিয়ার-এর মাধ্যমে ভেতরের ঘাঁটিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হতো। ঘাঁটি সাধারণত তিন রকমের ছিল–(১) যেখানে অস্ত্র জমা থাকতো (২) যেখানে তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হতো ও যেখান থেকে পাঠানো হতো এবং (৩) যেখান থেকে শত্রুর উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়া হতো।

এছাড়া, ভেতরে অনেকে ছিলেন যারা মুক্তিযুদ্ধে বাইরে না-গিয়ে ভেতরে থেকে সহযোগিতা করেছেন।

প্রশ্ন : অধিকৃত এলাকার জনগণের কাছ থেকে কি ধরনের সাড়া পেয়ে ছিলেন?

জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে আন্তরিক ও অকুণ্ঠ সমর্থন আমরা পেয়েছি। কেবলমাত্র গুটি কয়েক লোক ছাড়া। বাংলাদেশের লোক ২৬শে মার্চ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এসেছেন। অনেক সময় নিজের প্রাণ বিপন্ন করে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। এটা অবশ্য সত্য–যারা দালালি করেছে–রাজাকার, আল-বদরদের যুদ্ধে অনেক জায়গায় পেয়েছি। তারা বেশির ভাগ

সাহস সেখানে যুদ্ধ করতে দেখিয়েছে যেখানে তাদের মালিক পাঞ্জাবীরা ছিল, আর তা না হলে তারা মুক্তিবাহিনী দেখামাত্র পালিয়ে যেতো। তবে অনেক জায়গায় শত্রুর একটা প্লাটুন থাকতো আর একশো দুশোজন রাজাকার আল-বদর থাকতো।

জনগণের সাথে শুরু থেকেই যোগাযোগ ছিল। সাড়ে সাতকোটি মানুষের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। আমার, আমার অধিনায়ক ও মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের সব সময় এমন মনে হতো যে-বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষ আমাদের সঙ্গে শ্বাস নিচ্ছে।

প্রশ্ন : অধিকৃত সময়ে আপনি কি কখনো ঢাকা এসেছিলেন?

জেনারেল ওসমানী : ঢাকায় আসিনি। আমি জানি অনেকে বলেছেন আমি ঢাকায় এসেছিলাম। সেটা ঠিক নয়। আমি অন্যান্য অঞ্চলে এসেছি, ও ঘুরেছি। কিন্তু, ঢাকায় আসিনি এবং ঢাকায় আসা ঠিক সম্ভবপর ছিল না। আরেকটি কথা-জনগণের সমর্থন প্রসঙ্গে আমি বলছি। বলছি যোগাযোগ আমাদের সব জায়গায় ছিল সশরীরে-সব জায়গায় সব শহরে। আপনারা জানেন কিনা জানি না-অমুক তারিখে হাজির হতে হবে বলে টিক্কা খান আমাকে যখন সমন দিলেন তখন তার জওয়াব আমি দিয়েছিলাম। সেই জওয়াব টিক্কাখানকে পৌছানো হয়। আমার হাতের লেখা জওয়াব। টিক্কা খানের বাড়ির দেয়ালে একটি বালক গিয়ে সেই জওয়াবের কাগজ লাগিয়ে দিয়েছিল। পরের দিন সেই কাগজটি নাকি কেউ টিক্কা খানকে দেখাবার পর সে বলেছিল-হাঁ এটি ঐ..... এর হাতের লেখা।

ভারতীয় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা

জেনারেল ওসমানী সাক্ষাৎকারে প্রবাসী বাঙালি ও প্রবাসী বাঙালিদের মেডিকেল সমিতির চিকিৎসা সাহায্য, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামরিক হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা সেবা কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভারতীয় জনগণের ও সরকারের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাও জানান। তিনি বলেন, তাদের অবদান ভুলবার নয়। ভারতীয় বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তিনি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের টিভি ভাষণ*

"দশ লক্ষাধিক মানুষের আত্মাহুতির মাঝ দিয়ে আমরা হানাদার পশুশক্তির হাত থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনাবিধৌত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঢাকার বুকে সোনালী রক্তিমবলয় খচিত পতাকা উত্তোলন করেছি। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা লাভের আনন্দ অস্পষ্ট রয়ে গেছে কেননা আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা মুক্তির দিশারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এতদিন পর্যন্ত শত্রুর হাতে বন্দী রয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার নানাভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে মহান নেতার মুক্তির চেষ্টা চালিয়ে আসছে।"

"আমরা জানতে পেরেছি বিনাশর্তে বঙ্গবন্ধুর আশু মুক্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক বিশ্বের চাপে ইসলামাবাদের একনায়ক সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।"

"বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বর্নিতা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। আজ শুধু একান্তভাবে প্রার্থনা করছি আমাদের মহান নেতা আমাদের মাঝে ফিরে আসুন। রক্তাপ্লুত বাংলাদেশের মুখে হাসি ফুটে উঠুক। আসুন আমরা অযুত কণ্ঠে বলি– জয় শেখ মুজিব। জয় বাংলা"

---

* দৈনিক বাংলা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২

বাংলাদেশের জনসভায় শেখ মুজিবের প্রথম ভাষণ*

আমি জানিতাম না বাংলার মাটি আর মানুষকে আমি এত ভালবাসি। আমার স্বপ্ন সফল হইয়াছে। আমি আমার বহু ভাইকে আর এ জীবনে দেখিতে পাইব না।–তাদের এই রক্তপাত বিফলে যাইব না– যাইতে দিবনা।"

"বাঙালি আজ স্বাধীন। তবে এই স্বাধীনতা সার্থক হইবে না যদি আমার বোন ভাই ভাত খাইতে না পায়, যদি আমার যুবক ভাইয়েরা বেকার থাকে।"

সোনার বাংলার মানুষ আবার হাসিবে খেলিবে, সোনার বাংলার মানুষ পেট ভরিয়া ভাত খাইবে–ইহাই আমার কামনা।

বাংলার যে সন্তান, যে কৃষক, যে ছাত্র ও যে যুবক সংগ্রাম করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই এবং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। আমি ফাঁসিকাষ্ঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমি জানিতাম বাঙালিকে কেউ দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। আজ সত্যই বাংলাদেশ মুক্ত হইয়াছে।......

এই বর্বর নরপিশাচ বাহিনী বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এত লোক নিহত হয় নাই।.....

আমি জানিতাম না যে, আমি বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর জিন্দানখানা হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব। আমার কবরও তাহারা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিল। আমি তাহাদের শুধু একটি অনুরোধই করিয়াছিলাম।...... আমার লাশ বাংলাদেশে ফিরাইয়া দিও।.....

"এক কোটি লোক বর্বর বাহিনীর নিপীড়নে দেশ ছাড়িয়া ভারতে চলিয়া যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাহাদের খাবার দিয়াছেন। ৫৫ কোটি ভারতবাসী তাহাদের অন্নের ভাগ দিয়াছে। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীনই থাকিবে, কেউ বাঙালিকে রুখতে পারিবে না। কোন ষড়যন্ত্রে কাজ হইবে না।...... শান্তিপূর্ণ বাংলার স্বাধীনতা কেউ হরণ করিতে পারিবে না।.... আমার বহু ভাই, বহু কর্মী ও বহু নেতা নাই। আমি তাহাদের আর কখনো দেখিতে পাইব না। কিন্তু তাহাদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে?

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।..... আমাদের দেশে আজ ভাত নাই। আমাদের দেশে আজ মানুষের থাকার ঘর নাই, আমার দেশবাসী আজ সর্বহারা।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন, " সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধা

---

* দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২

জননী, রেখেছে বাঙালি করে মানুষ করনি।'..... বাঙালি আজ স্বাধীন হইয়াছে তারা মানুষ হইয়াছে।"

বাংলাদেশের অবাঙালিদের উদ্দেশ্য করিয়া শেখ সাহেব বলেন, 'যাহারা বাংলা জাননা, তোমাদের বলিতেছি, তোমরা আজ হইতে বাঙালি হইয়া যাও।' বাঙালিদের উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন,– "তোমরা তাহাদের উপর হাত তুলিও না।" অযুতকণ্ঠের হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন–' যাহারা অন্যায় করিয়াছে, পাকবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিয়াছে, তাহাদের বিচার হইবেই। কেউ রেহাই পাইবে না।"

"বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। প্রথম বৃহত্তম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া, তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হইল ভারত, আর পাকিস্তান এখন চতুর্থ মুসলিম রাষ্ট্র। "তিনি বলেন, বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হইলেও ইহা হইবে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।"

বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর ভূয়সী প্রশংসা ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলেন, "বিশ্বের এমন কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনেতা নাই যাহার কাছে তিনি তাঁহার (বঙ্গবন্ধুর) মুক্তির জন্য অনুরোধ জানান নাই। তিনি বলেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনি, পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরুর কন্যা মিসেস ইন্দিরা গান্ধী একজন জনদরদী মহিলা।"....

"ক্ষমা করো ভাই, ক্ষমা করো, কাহারো বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। তাই তোমাদের বলি, আইন তোমরা নিজ হাতে তুলিয়া নিও না।"

ড. কামাল হোসেনের উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পাকিস্তানি রাহিনী তাঁহার উপর তিনমাস অত্যাচার করিয়া, তাঁহাকে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন নাই। কিন্তু কয়েকজন বাঙালি তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়াছে। তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া তিনি জানান।

পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত ন্যূনতম কোন সম্পর্ক রাখার জন্য জনাব ভুট্টো অনুরোধ জানাইয়াছেন। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন, "তোমরা স্বাধীন আমরাও স্বাধীন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই তোমাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক থাকিবে।"

"বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এখানো চলিতেছে।.... আমরা সবাই প্রাণ দিব তবু স্বাধীনতা রক্ষা করিব।" জাতির পিতা মুক্তিবাহিনী, গেরিলা বাহিনী, শ্রমিক-ছাত্র-যুবক হতভাগ্য হিন্দু-মুসলমানকে সালাম জানান। সুস্থ হইলে তিনি পুনরায় জনগণের সহিত সাক্ষাৎ ও ভাষণ দিবেন বলিয়া সভায় আশ্বাস দেন।"

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রিপোর্ট*

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরিষদের সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দ, স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুক্ত পরিবেশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে আজ সর্বাগ্রে স্মরণ করি সেই অগণিত শহীদদেরকে যাদের চরম আত্মত্যাগের ফলে আজ আমরা স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করতে পেরেছি। সশস্ত্র বাহিনী ও গণবাহিনীর শহীদ সদস্যদের পাশাপাশি আজ স্মরণ করি জনাব মসিউর রহমান, আমজাদ হোসেন, আমিন উদ্দীন আহমদ, ডা. জিকরুল হক, মাসুদুল হক চৌধুরী, মিলি চৌধুরী ও আলাউদ্দীনের মত আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদেরকে, যাঁরা বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে শহীদ হয়েছেন। এই সঙ্গে স্মরণ করি জনাব আবদুল হককে, স্বাধীনতার পরে এক দুর্ঘটনায় যাকে আমরা হারিয়েছি। এইসব আত্মত্যাগী পুরুষদের অমলিন আদর্শ আওয়ামী লীগের কর্মীদেরকে চিরকাল দেশহিতব্রতে অনুপ্রাণিত করবে।

১৯৭০ সালের জুন মাসের ৩ থেকে ৫ তারিখে যখন আমাদের বিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তখন আমাদের পশ্চাতে ছিল ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের ঐতিহ্যপূর্ণ স্মৃতি এবং সামনে ছিল দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। গত অধিবেশনে আমরা সেই সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম : একদিকে ছয় দফাভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবকে সামনে রেখে এবং অন্যদিকে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়ে। ইতিহাসের ধারায় আজ আমাদের তখনকার অনেক চিন্তা-ভাবনা ও ভয়-ভীতি সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে গেছে। আবার তখনকার অনেক পরিকল্পনা আজ নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। আজ আমার রিপোর্টে ঐ কাউন্সিল সভার পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের একটা বিবরণ দেওয়া কর্তব্য।

আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের যে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম, এই নির্বাচন হবে ছয়-দফা সম্পর্কে একটা গণভোট। এই ঘোষণায় সামরিক চক্র ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলি ভয় পেয়েছিল। এইসব রাজনৈতিক দল জনসমর্থন ও নির্বাচনী প্রস্তুতির অভাবে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবি জানিয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, বাংলাদেশে বন্যা হবে এবং তার ফলে নির্বাচন হতে পারবে না। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে দেশে যখন বন্যার সূচনা হয়, তখন এই

---

* দৈনিক বাংলা, ৯ এপ্রিল ১৯৭২

দাবী জোরদার হল। আওয়ামী লীগ এই দাবি সমর্থন করেনি। কারণ, আমাদের আশঙ্কাও ছিল যে কায়েমী স্বার্থবাদীরা কোন-না-কোন ছলে হয়তো নির্বাচন এড়িয়ে যেতে চাইবে। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন পিছিয়ে দিতে বললে তারা সেই সুযোগ লুফে নেবে। বন্যার পরে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলসমূহ সেই সুযোগ সৃষ্টি করল এবং ইয়াহিয়া খান তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নির্বাচন পিছিয়ে দিলেন ডিসেম্বরে।

নভেম্বর মাসে দেখা দিল ইতিহাসের সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশের দশ লক্ষাধিক মানুষ সে দুর্যোগে প্রাণ দিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট চীন সফর শেষে ঢাকা হয়ে ইসলামাবাদে ফিরে গেলেন– অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ-বাসীর এই মর্মান্তিক দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখার সময় করতে পারলেন না। পৃথিবীর দূর দেশ থেকে সাহায্যসামগ্রী এবং তা বিতরণের জন্য হেলিকপ্টার এসে পৌঁছালো–অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার বসে রইল ইয়াহিয়ার মনোনীত প্রাদেশিক গভর্নরও তা চেয়ে পেলেন না। বাংলাদেশের মানুষের এই মরণ-যন্ত্রণার মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের মর্মান্তিক ঔদাসীন্যে দেশবাসীর কাছে সরকারি বৈষম্যনীতির স্বরূপ নতুন করে উদ্ঘাটিত হল। যে মোহ বহুদিন আগে থেকেই ভাঙতে শুরু হয়েছিল, এবারে তার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

আবারও নির্বাচন পিছিয়ে দেবার প্রস্তাব উঠল, কিন্তু গণসমর্থনহীন দলগুলির এই দাবীর সুযোগ নিতে এবারে আর ইয়াহিয়া খান সাহস করলেন না। ডিসেম্বর মাসের ৭ ও ১৭ তারিখে শান্তিপূর্ণভাবে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে নির্বাচন হল ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি। ফেব্রুয়ারিতে হল জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচন। মার্চের ১লা তারিখে হল জাতীয় পরিষদের মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন। এইসব নির্বাচনে–ইয়াহিয়া খান নিজেই যাকে অবাধ ও নিরপেক্ষ বলে বর্ণনা করেছিলেন–আওয়ামী লীগের বিজয় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায় রচনা করল।

আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের পরে দেশবাসী শেষবারের মত আশা করল যে কায়েমী স্বার্থবাদীদের খেলা শেষ হবে, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবারে ঔপনিবেশিকতাবাদী মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে নির্বাচনের রায় মেনে নেবেন, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে।

জানুয়ারি মাসের মধ্যভাগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী' বলে আখ্যা দিলে জনমনে সে আশা দৃঢ়তর হয়।

জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বৈঠক এবং পিপলস পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগের বৈঠকে ছয় দফাভিত্তিক সংবিধান রচনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। সংবিধান সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের বা পিপলস পার্টির পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য এসব আলোচনায় উত্থাপিত হয়নি, বরঞ্চ তাঁরা শুধু ছয়-দফার তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে চেয়েছিলেন। অন্যপক্ষে সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছয়-দফা সমর্থন করেছিলেন। ভুট্টো চেয়েছিলেন, পরিষদের বাইরে আগে সংবিধানের প্রশ্নে মীমাংসা হয়ে যাক, আর আমরা চেয়েছিলাম, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেই সংবিধান

রচনার কাজে অগ্রসর হওয়া,-প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা পরিষদ চলাকালেই হতে পারত।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার জন্য বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেন। প্রেসিডেন্ট সে দাবি উপেক্ষা করে ভুট্টোর পরামর্শ অনুযায়ী ৩রা মার্চ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেন, তখন আমরা ক্ষুণ্ন হলেও সে তারিখ মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু ভুট্টো আকস্মিকভাবে পরিষদ বর্জনের হুমকি দিলেন। ভুট্টোর হুমকি এবং তাঁর পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল উমরের সক্রিয় কার্যকলাপ সত্ত্বেও, পিপলস পার্টি ও কাইউম মুসলিম লীগের সদস্য ব্যতীত জাতীয় পরিষদের সকল পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য হয় ঢাকায় এসে গিয়েছিলেন নয়তো নির্ধারিত সময়ে ঢাকায় আসবার জন্য টিকিট করেছিলেন। এমনকি কাইউম লীগ ও পিপলস পার্টির বহু সদস্যই যথা সময়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভুট্টোর প্রতিরোধ ভেঙে পড়তে পারে, এই ভয়েই ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী ঘোষণা করেন।

সেই সময়ে সংবিধানের খসড়া রচনার কাজে আওয়ামী লীগ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ৩০ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া প্রণয়ন কমিটি প্রভূত পরিশ্রম করে এইকাজ করেছিলেন এবং ১লা মার্চে পূর্বানী হোটেলে কমিটি মিলিত হয়েছিল এ বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা করার জন্য। ঠিক সেই সময়েই প্রেসিডেন্টের ঘোষণার কথা আমরা জানতে পারি।

এই ঘোষণায় সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে, রাজধানী ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ও ধর্মঘট পালিত হয়। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ তখন থেকেই স্বাধীনতার কথা ভাবতে আরম্ভ করে। বঙ্গবন্ধু ২রা ও ৩রা মার্চ তারিখে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের আহ্বান জানান কিন্তু সামরিক চক্র শান্তিভঙ্গের সকল ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে। গভর্নর পদ থেকে ভাইস অ্যাডমিরাল আহসানকে অপসারিত করা হয় এবং ২রা ও ৩রা মার্চ নিরস্ত্র জনতার উপর সামরিক বাহিনী গুলিবর্ষণ করে। ছাত্রলীগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের আহূত ঢাকার জনসভায় ৩রা মার্চ বঙ্গবন্ধু শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

এর পরবর্তী ঘটনা আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। এরকম পরিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায়নি। শুধু যে সর্বশ্রেণীর মানুষ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তা নয়; প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগের নির্দেশে দেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে সচল করে রেখেছিল। বিভিন্ন সময়ে মানুষ আমাদের কাছে ছুটে এসেছিল পরামর্শ নেবার জন্য এবং পরামর্শ দেবার জন্য। বস্তুত আওয়ামী লীগই সে সময়ে একমাত্র বৈধ সরকার হিসেবে দেশের কর্মপরিচালনা করেছিল। সামরিক বাহিনীর দমননীতি ও উত্তেজনা সৃষ্টির সকল প্রয়াস সত্ত্বেও বাংলা দেশের মানুষ আশ্চর্যজনকভাবে ঐক্য ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছিল। এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চের বেতার ভাষণে আওয়ামী লীগের প্রতি সকল দোষ আরোপ করেন এবং ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথা

ঘোষণা করেন। একই দিনে 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের পদ থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াকুবকে অপসারণ করে কুখ্যাত টিক্কা খানকে গবর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতিদের অসহযোগের ফলে তিনি গবর্নর হিসেবে শপথ নিতে পারেননি।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন। তিনি ঘোষণা করেন : "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তিনি দেশবাসীকে সেই বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের সর্বত্র আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশবাসী সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। অন্যদিকে ১লা মার্চ থেকে অবাঙালি সামরিক অফিসারদের ও পশ্চিম পাকিস্তানি ধনীদের পরিবার-পরিজনকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতে থাকে এবং সামরিক ও বেসামরিক বিমানে সামরিক বাহিনীর লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র বাংলাদেশে আমদানি করা হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে আপোস আলোচনার ছল করে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে পৌঁছেন। পরে তাঁর আমন্ত্রণক্রমে ভুট্টোও ঢাকায় আগমন করেন।

১৬ই থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন দফায় এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে বঙ্গবন্ধু এককভাবে ইয়াহিয়ার সঙ্গে মিলিত হন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগের উচ্চতম পর্যায়ের পাঁচজন নেতাসহ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়া পক্ষের আলোচনা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তিনজন বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রীয় সরকারের তিনজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবন্টনের বিষয় আলাপ করেন। এসব আলোচনার ফলে যেসব বিষয়ে মতৈক্য স্থাপিত হয়, তা হল :

(১) ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অনুসরণে প্রেসিডেন্টের ঘোষণাবলে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নিয়ে বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে।

(২) জেনারেল ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকবেন ও কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

(৩) প্রদেশসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে।

(৪) জাতীয় পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যেরা প্রথমে পৃথকভাবে মিলিত হবেন, পরে পরিষদের পূর্ণ ও অর্থাৎ যুক্ত অধিবেশনে সংবিধানের চূড়ান্ত রূপদান করা হবে।

এই মতৈক্যের পরে অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধানের খসড়ার চূড়ান্ত রূপদানের পথে আর কোন বাধা ছিল না। তাই ২৪শে মার্চে সাংবাদিকদেরকে আমি বলেছিলাম যে, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আর আলোচনার মত কোন বিষয় নেই।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণের অনেকগুলি ঘটনা ঘটে। জয়দবপুরের ঘটনায় বহু ব্যক্তি হতাহত হয়। সরকারের বর্বর দমননীতি সত্ত্বেও দেশবাসীর মনোবল অটুট থাকে এবং স্বাধীনতার দাবি প্রবলতর হতে থাকে। এক্ষেত্রে 'সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বলিষ্ঠ। উন্নয়নশীল দেশমাত্রেই ছাত্র সমাজ

রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশেও তার অন্যথা হয়নি। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে তারা প্রকাশ্যেই সন্দেহ প্রকাশ করে এবং স্বাধীনতা-ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুকে চাপ দিতে থাকে। ২৩শে মার্চ তারিখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। ইয়াহিয়া খানের সমর-প্রস্তুতি আমাদেরও অগোচর ছিল না। কিন্তু দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে যে দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছিল, তার ফলে আওয়ামী লীগকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হচ্ছিল। সামরিকচক্র এ-অবস্থায় নতুন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের বাঙালি কমান্ডিং অফিসারকে অপসারণ করে একজন পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক অফিসারকে তাঁর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় এবং সেই দিন সন্ধ্যায় সোয়াত জাহাজ থেকে জোর করে অস্ত্রশস্ত্র খালাসের কাজ শুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বঘোষিত নীতি অনুযায়ী নিরস্ত্র জনসাধারণ অস্ত্রশস্ত্র পরিবহণের পথরোধ করলে সামরিক বাহিনী তাদের উপর ক্রমাগত গুলিবর্ষণ করে। গুলিবর্ষণে অসংখ্য লোক হতাহত হয়। ঘটনার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ২৭শে মার্চ তারিখে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান।

২৫শে মার্চ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান রচনার জন্য সরকার ও আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত অধিবেশন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। বিশ্বাসঘাতকতার এক অতুলনীয় ইতিহাস রচনা করে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা না করে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাতের বেলায় ঢাকা ত্যাগ করেন। তার পরেই পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী টিক্কা খানের ঘাতক সেনারা মধ্যরাতে ঢাকা শহরের বুকে হত্যার তাণ্ডবে মেতে ওঠে। তারই মধ্যে তারা গ্রেফতার করে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ২৬শে মার্চ রাতের ভাষণে ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে বেআইনী ঘোষণা করেন।

কুর্মীটোলায় সেনানিবাসে, পীলখানায় ইপিআর সদর দফতরে ও রাজারবাগে পুলিশ লাইনে সশস্ত্র বাঙালিরা অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে আমৃত্যু যুদ্ধ করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, বস্তি অঞ্চলে এবং সাধারণ মানুষের উপরে বর্বর পাকসেনারা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তা প্রতিরোধ করার শক্তি ছিল না নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিদের। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রামে রত মেজর জিয়াউর রহমান বেতার মারফত বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন এবং বাংলাদেশে গণহত্যা রোধ করতে সারা পৃথিবীর সাহায্য কামনা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা জানতে পেরে বাংলার মানুষ এক দুর্জয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলল। সারা বাংলাদেশে সামরিক, আধা সামরিক ও বেসামরিক কর্মীরা অপূর্ব দক্ষতা, অপরিসীম সাহসিকতা ও অতুলনীয় ত্যাগের মনোভাব নিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা-রক্ষার সংগ্রামে অগ্রসর হন। মাত্র তিন দিনে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ করতলগত করার যে পরিকল্পনা সামরিক সরকার করেছিল, প্রাণের বিনিময়ে বাংলার মানুষ তাকে সর্বাংশে ব্যর্থ করে দেয়।

১১ই এপ্রিল তারিখে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমি বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের ঘোষণা প্রচার করি। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে

উপরাষ্ট্রপ্রতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, আমাকে প্রধানমন্ত্রী এবং জনাব মনসুর আলী, খন্দকার মুশতাক আহমদ ও জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকেও কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে বিভিন্ন সামরিক অফিসারকে এক এক অঞ্চলের ভার দেওয়া হয়। সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলের ভার দেওয়া হয় মেজর (এখন কর্নেল) খালেদ মোশাররফকে, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের ভার মেজর (এখন কর্নেল) জিয়াউর রহমানকে, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের ভার মেজর (এখন কর্নেল) শফিউল্লাহকে, কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চলের ভার মেজর ওসমানকে, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের ভার মেজর জলিলকে, রাজশাহীর ভার মেজর আহমদকে, সৈয়দপুরের ভার মেজর নজরুল হককে ও রংপুরের ভার দেওয়া হয় মেজর নওয়াজেশকে। ১৮ই এপ্রিলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ করা হয়' জাতীয় পরিষদ সদস্য' কর্নেল (এখন জেনারেল) এম এ জি ওসমানীকে। ইতিমধ্যে বেসামরিক তরুণদের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গ্রহণ করে তাদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও চূড়ান্ত করা হয়।

মন্ত্রিসভা গঠনের পর আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি দান এবং আমাদের সংগ্রামকে সমর্থনদানের জন্য পত্র প্রেরণ করি। ১৭ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগরে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বহু দেশের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। এই সম্মেলনের ফলে বিদেশী সাংবাদিকেরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বাস্তব ভিত্তির সঙ্গে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে পাঠিয়ে সেইসব দেশের সরকার ও জনসাধারণের কাছে বাংলাদেশের বাস্তব সত্যকে তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের কথা। এই সম্মেলনের প্রতিনিধিরা সর্বপ্রথম প্রকৃত পরিস্থিতি অবগত হন এবং সম্মেলনেই বাংলাদেশকে শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। জাতিসংঘেও অনুরূপ একটি প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়। প্রবাসী বাঙালিরাও বিদেশে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সেখানে জনমত সৃষ্টি ও অর্থ সংগ্রহ করে তাঁরা বাংলাদেশের সংগ্রামকে শক্তিশালী করে তোলেন।

আমাদের আহ্বানে বহুসংখ্যক সরকারি কর্মচারী অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে মুজিবনগরে গিয়ে পৌঁছেন। এদের মধ্যে অনেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনে যোগদান করেন, কিন্তু আমাদের স্বল্প সামর্থ্যের জন্য অনেককে চাকরি দেওয়া সম্ভব হয়নি। অনেকে আবার চাকরি না-করে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

দেশে মুক্তিসংগ্রামের শক্তি বৃদ্ধি হয় দ্রুতগতিতে এবং দৃঢ়ভাবে। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তরুণ ও ছাত্রসমাজ যে-বিপুল সংখ্যায় এবং আত্মত্যাগের যে মনোভাব নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে, তা যে কোন জাতির মুক্তিসংগ্রামের পক্ষেই আদর্শস্থানীয়। এক্ষেত্রে ছাত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষত ছাত্রলীগ এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহ, বিশেষত শ্রমিক লীগের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযোদ্ধারা কেউই ব্যক্তিগত অসুবিধাকে গ্রাহ্য করেনি। আমি ও আমার সহকর্মীরা যখনই রণাঙ্গনে গিয়েছি, তখন তাদের দৃঢ় প্রত্যয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের কষ্টের কথা বলেনি,

তাড়াতাড়ি যেন আবার যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি পেতে পারে, সে-ব্যবস্থা করতে বলেছে। যাঁরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেননি, তাঁরাও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সক্রিয় সাহায্য করেছেন। অধিকৃত এলাকায় যাঁরা বসবাস করতেন, তাঁরাও চরম ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন নানাভাবে। জনসাধারণের মনোবল বৃদ্ধিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। মে মাসে এই বেতার কেন্দ্রের জন্য একটা শক্তিশালী প্রেরণ যন্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছিল। এই বেতার কেন্দ্র সংগঠনে জনাব আবদুল মান্নানের অবদানের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

বাংলার এই প্রতিরোধের মুখে ইয়াহিয়া চক্র তাদের কৌশল পাল্টে ফেলে। কুখ্যাত টিক্কাখানের বদলে একজন সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদকে তারা গভর্নর পদে নিয়োগ করে এবং বেসামরিক শাসন প্রবর্তনের ছল করতে চায়। বিশ্বমতকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সদস্যপদ বাতিল করে তারা তথাকথিত উপনির্বাচনের মাধ্যমে বংশবদ ব্যক্তিদেরকে 'নির্বাচিত' করে। প্রদেশে একটি তাঁবেদার মন্ত্রিসভাও গঠিত হয়। বেসামরিক কর্তৃত্বে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার ভাওতা দিয়ে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংবিধান ঘোষণার জন্য ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ ধার্য করা হয় এবং বলা হয় যে ডিসেম্বরে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে। কিন্তু এই প্রয়াস যে কত শূন্যগর্ভ ছিল, তার প্রমাণ তারাই দিয়েছে পদে পদে। অন্যপক্ষে মুক্তিযোদ্ধা ও সশস্ত্র বাহিনী দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হয়; তাদের গেরিলা পদ্ধতির আক্রমণে ঢাকায় এবং অন্যত্র পাকিস্তানি হানাদারদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। এই হৃত-মনোবল সৈন্যরাই পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হয়ে বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিসংগ্রামের কালে আমাদের রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হলে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, কমরেড মণি সিং ও শ্রী ভবেশ নন্দী। হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য ৮ই সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সরকারের এক পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হয়। শ্রী ভবেশ নন্দী ছাড়া পূর্বোক্ত নেতারা এই কমিটির সদস্য ছিলেন; কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কমিটিতে থাকেন শ্রী মনোরঞ্জন ধর। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে এই কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশপ্রেমিক দলগুলির মধ্যে সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়।

আওয়ামী লীগের নিজস্ব উদ্যোগের মধ্যে সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকার প্রকাশখুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই পত্রিকা জনমনে তুমুল সাড়া জাগিয়েছিল। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পুস্তিকা প্রচারপত্র প্রকাশের কথাও এখানে বলা যেতে পারে। জুলাই মাসের ৫ ও ৬ তারিখে আওয়ামী লীগের কার্যকরী সমিতির সভা ও আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্যদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভাতেই মুক্তিসংগ্রামের কর্মসূচি সমর্থন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থাজ্ঞাপন করা হয়। আমাদের সাংগঠনিক গঠনতন্ত্র

অনুযায়ী মন্ত্রিসভার সদস্যদের দলীয় কর্মকর্তার পদ ত্যাগ করার কথা ছিল। কিন্তু কার্যকরী সমিতি দেশের সংকটজনক অবস্থায় এই বিধির ব্যতিক্রম করে আমাদেরকে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে যেতে অনুরোধ করে। ২০-২১ ও ২৭-২৮ অক্টোবরে আবার আওয়ামী লীগের কার্যকরী সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় আমরা মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিকল্পনার আভাস দান করি এবং এই সভা তা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে।

এইখানে আমি আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতা এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সদস্যদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। একথা সুবিদিত যে ২৫শে মার্চের রাত থেকে ইয়াহিয়া খানের রক্তলোলুপ সৈন্য আওয়ামী লীগের সকল শ্রেণীর কর্মীকে হন্যের মত খুঁজে বেড়িয়েছে। তাঁদের বাড়িঘর ধ্বংস করেছে, তাঁদের পরিবার-পরিজনকে অত্যাচার ও সন্ত্রাসের শিকারে পরিণত করেছে। দখলদার সেনাদের এই অভিযানে শহীদ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীর কথা আগে বলেছি; আরো অনেকে অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হয়েছেন। এ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ কর্মী, নেতা ও পরিষদ সদস্যদের মনোবল ভেঙে পড়েনি। নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও তাঁরা মুক্তি সংগ্রামের প্রত্যেকটি পর্যায়ে জনসাধারণ ও সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করেছেন– এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অপরাজেয় শক্তির উৎসস্বরূপ। বেসামরিক প্রশাসনের জন্য সারা বাংলাদেশকে ১১টি অঞ্চলে যখন ভাগ করা হয়, তখন এইসব কর্মী ও সদস্যই আঞ্চলিক কমিটির সদস্য হিসাবে সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখেন। বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরূপেও তাঁরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছেন। মুক্তিসংগ্রামের কালে তাঁদের জন্যই আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক প্রসার ঘটেছে ও শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। শুধু মুষ্টিমেয় সদস্য জাতির সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে হানাদার পক্ষে যোগ দেয়। আজ তারা জাতির কাছে অপরাধী হিসাবে বিচারের অপেক্ষা করছে।

মুক্তিসংগ্রামের কালে আওয়ামী লীগের কর্মতৎপরতার জন্য বিশেষভাবে আমাদের অস্থায়ী সভাপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলামের অবদান স্মরণীয়। আমাদের সহ-সভাপতি জনাব মনসুর আলী ও জনাব খন্দকার মুশতাক আহমদ, সাবেক নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবং সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যরা যে নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা উল্লেখযোগ্য প্রকাশ করে। এ সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের সকল স্তরে আমরা সবসময়ে যাঁর অভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছি তিনি আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য আমরা পৃথিবীর সকল দেশের সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি এবং বিভিন্ন দেশে জনমত গঠনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছি। ইয়াহিয়া খান তাঁর বিচারের স্পর্ধা প্রকাশ করলে বাংলার মানুষ প্রতিবাদে গর্জন করে ওঠে। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর বিচার-প্রহসনের প্রতিবাদে যেমন বিবৃতি, প্রচারপত্র ও পোস্টার প্রচারিত হয়, তেমনি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিবৃতি, প্রচারপত্র ও পোস্টার ছাড়াও জনসভা এবং বিভিন্ন দূতাবাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদলিপি প্রেরিত হয়। তবে একথা আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, বঙ্গবন্ধুর

মুক্তির জন্য সবচেয়ে সক্রিয় ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন।

আমাদের মুক্তিসংগ্রামের কঠিন সময়ে আমরা সবচেয়ে বেশি সাহায্য লাভ করেছি ভারত থেকে। এক কোটি শরণার্থীর অন্ন ও আবাসের সংস্থান করে ভারত আমাদেরকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। তার চেয়েও বড় কথা, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সরকার যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার ও নেতাদের কাছে আমাদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং যেভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নৈতিক ও উপকরণগত সাহায্য যুগিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। এইজন্যই পাকিস্তান সমরনায়কদের আক্রোশ গিয়ে পরে ভারতের উপরে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তারা রূপান্তরিত করে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে রক্তদান করে বীর ভারতীয় সেনাবাহিনী মাত্র বারো দিনের যুদ্ধে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে। তার আগেই ভারত সরকার স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্য এবং বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধানের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ২রা এপ্রিলেই পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ৯ই আগস্টে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হবার পরে বাংলাদেশের বিষয়ে সোভিয়েটের ভূমিকা স্পষ্টতর হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তিন বার ভেটো প্রয়োগ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নই সর্বাগ্রে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, পোলান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী দেশ জাতিসংঘের 'ভিতরে ও বাইরে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কানাডা, ফ্রান্স, ব্রিটেনের ভূমিকাও আমাদের অনুকূলে ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি আমাদেরকে নিরাশ করে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন হানাদার পাকিস্তানি সামরিক চক্রকে সমর্থন করে এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য করে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সর্বশেষ স্তরে জাতিসংঘে চীনের কার্যকলাপ এবং বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহর প্রেরণ– এই দুই দেশের মুক্তিসংগ্রাম বিরোধী ভূমিকার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি।

তবে সরকারী মতামত নির্বিশেষে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সংবাদপত্র ও অপরাপর প্রচার-মাধ্যমের ভূমিকা বাংলাদেশের সংগ্রামের অনুকূল ছিল। এসব দেশের বুদ্ধিজীবী, জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষও আমাদের মুক্তিসংগ্রাম সমর্থন করেছিলেন।

সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের সেই শুভেচ্ছাকে সার্থক করে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয় ১৬ই ডিসেম্বরে। কিন্তু এর পূর্ব মুহূর্তে সামরিক চক্রের সাহায্যকারী ফ্যাসিস্ট বদরবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা। স্বাধীনতার পরে সামরিকচক্রের সহযোগীরা নানাভাবে লোকহত্যা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে রত থাকে। ২২শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সদস্যরা ঢাকায় এসে পৌঁছেন এবং নতুন করে প্রশাসন পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এর পরে মন্ত্রিসভাও সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু তখনও আমাদের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত হয়নি–বঙ্গবন্ধু তখনও শত্রুর কারাগারে বন্দী।

সারা দেশবাসীর এবং বিশ্ববিবেকের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্ত হন। লন্ডন হয়ে তিনি তাঁর প্রিয় দেশবাসীর কাছে স্বাধীন স্বদেশে ফিরে আসেন ১০ই জানুয়ারিতে। ১২ তারিখে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতিরূপে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হয়। মন্ত্রীদের আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা না-থাকার সিদ্ধান্ত করা হয়। এইসভায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নতুন সাংগঠনিক কমিটি গঠন করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বন্ধুগণ, ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এখন তা সংহত করতে চলেছি। বাংলাদেশ আজ নানা সমস্যার ভারে জর্জরিত। এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, দেশের মধ্যে প্রায় দুকোটি উদ্বাস্তু মানুষের অন্নবাসের সংস্থান, বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতিসাধন, , যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, এর প্রত্যেকটিই দুরূহ অথচ জরুরী কর্তব্য। খাদ্যের ঘাটতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষের জীবনে বড় রকম সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে মানুষের হাতে অর্থ এনে দিতে পারলেও সেই অর্থ দিয়ে দরকারি উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই ঊর্ধ্বগতি রোধ করার উপায় হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। অবশ্য সেই সঙ্গে কালোবাজারী ও মজুতদারী বন্ধ করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। আইনের শাসন যত দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, ততই আমরা গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারব। এই আইনের শাসনের নতুন ভিত্তি রচিত হতে যাচ্ছে আমাদের সংবিধানে।

বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন আমাদের দায়িত্ব, সেকথা বলেছি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা পুরোনো অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকেই সচল করতে চলেছি। অর্থনৈতিক জীবনের নবরূপায়ণে আমরা বদ্ধপরিকর। আওয়ামী লীগের বিঘোষিত নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাই ঘোষণা করেছেন যে সমাজতন্ত্রই আমাদের লক্ষ্য। আর এই সমাজতন্ত্র কোন লোকদেখানো ব্যাপার হবে না, এ হবে সত্যিকার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। ব্যাংক, বীমা, পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃহত্তর অংশের জাতীয়করণ এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিকেই দৃঢ় পদক্ষেপ। আমরা আশা করব যে, কৃষিযোগ্য জমি ও শহরের সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হবে এবং বেতনের ক্ষেত্রে এখনকার বিরাট বৈষম্য দূর হবে। আওয়ামী লীগ কল্যাণকর শ্রমনীতির পক্ষপাতী এবং শিক্ষার ভিত্তিকে বিস্তৃত ও গণমুখী করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান সার্থক হবে, আমরা নতুন সমাজ গঠন করতে সক্ষম হব।

পৃথিবীর কোন দেশই আজ নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত নয়। সুতরাং নানাদেশের সাহায্য ও সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন। বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের সহায়তায় আমরা পুনর্বাসন ও খাদ্য

আমদানির ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি। পাকিস্তান থেকে সকল বাঙালিকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রগুলির সহায়তা আমরা কামনা করছি। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন যতই তীব্র হোক না কেন, আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করতে পারে, এমন কোন সাহায্য আমরা গ্রহণ করব না। গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে এবং যুদ্ধজোটের বাইরে থাকতে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ আমরা সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে যাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে আমরাও তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলব।

আমাদের আজকের সংগ্রাম তাই অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সঠিক নেতৃত্বদানের গুরুদায়িত্ব আজ আওয়ামী লীগের উপর অর্পিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে দায়িত্ব পালনে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ যোগ্যতার পরিচয় দেবে। নিজেদের বহু কর্মী ও নেতাকে আমরা হারিয়েছি। আমাদের রাজনৈতিক সংগঠনকে আজ নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে যেন নিম্নতম পর্যায় থেকে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মানুষের কাছে আমাদের বিঘোষিত নীতি ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব ও জনমত গঠনের দায়িত্ব আজ আওয়ামী লীগ কর্মীমাত্রকে গ্রহণ করতে হবে। দেশের পুনর্গঠনে যেন আমরা প্রত্যেকেই মানুষের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজে অগ্রসর হতে পারি, সেটাই আজকের বড় প্রার্থনা। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগকে সহনশীলতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। কেননা, সহনশীলতা ছাড়া গণতন্ত্রের ভিত্তি রচিত হতে পারে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যেন সমাজ জীবনে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, আওয়ামী লীগের কর্মীদেরকে তা দেখতে হবে।

দেশপ্রেমিক সকল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির কাছেও আমার আবেদন, অর্থনৈতিক মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব-প্রতিরোধ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আপনারা নিজের দায়িত্ব পালন করুন।

অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে দেশবাসী প্রমাণ করেছে বৃহত্তম মঙ্গলের জন্য কিভাবে তারা ক্ষুদ্রস্বার্থ বিসর্জন দিতে পারেন। দেশের মানুষের এই কল্যাণবুদ্ধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে বাংলাদেশকে আমরা সত্যিকার সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে পারব। এই আশার বাণী উচ্চারণ করে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। জয় বাংলা।

NOTIFICATION*

The following Order made by the President, on the advice of the Prime Minister, of the People's Republic of Bangladesh on the 24th January, 1972, is hereby published for general information

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(Law Division)

President's Order No. 8 of 1972.

BANGLADESH COLLABORATORS (SPECIAL TRIBUNALS) ORDER, 1972.

WHEREAS certain persons, individually or as members of organisations directly or indirectly, have been collaborators of the Pakistan Armed forces, which had illegally occupied Bangladesh by brute force, and have aided or abetted the Pakistan Armed forces of occupation in committing genocide and crimes against humanity and in committing atrocities against men, women and children and against the person, property and honour of the civilian population of Bangladesh and have otherwise aided or co-operated with or acted in the interest of the pakistan Armed forces of occupation or contributed by any act, word or sign towards maintaining, sustaining, strengthening, supporting or furthering the illegal occupation of Bangladesh by the Pakistan Armed forces or have waged war or aided or abetted in waging war against the People's Republic of Bangladesh;

AND WHEREAS it such collaboration contributed towards the perpetration of a reign of terror and the commission of crimes against humanity on a scale which has horrified the moral consciences of the people of Bangladesh and of right- thinking people throughout the world;

AND WHEREAS it is imperative that such persons should be dealt with effecttively and be adequately punished in accordance with the due process of law;

---

* Bangladesh Gazette, Extraordinary, 24.1.72 Government of Bangladesh

AND WHEREAS it is expedient to provide for the setting up of Special Tribunals for expeditious and fair trial of the offences committed by such persons;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order:

1. *(1)* This Order may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the 26th day of March, 1971.

2. In this Order,—

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(b) "Collaborator" means a person who has—

(i) Participated with or aided, or abetted the occupation army in maintaining, sustaining, strengthening, supporting or furthering the illegal occupation of Bangladesh by such army;

(ii) rendered material assistance in any way whatsoever to the occupation army by any act, whether by words, signs or conduct;

(iii) waged war or abetted in waging war against the People's Republic of Bangladesh;

(iv) actively resisted or sabotaged the efforts of the people and the liberation forces of Bangladesh in their liberation struggle against the occupation army;

(v) by a public statement or by voluntary participation in propagandas within and outside Bangladesh or by association in any delegation or committee or by participation in purported bye-elections attempted to aid or aided the occupation army in furthering its design of perpetrating its forcible occupation of Bangladesh.

Explanation— A person who has performed in good faith functions which he was required by any purported law in force at the material time to do shall not be deemed to be a collaborator

Provided that a person who has performed functions the direct object or result of which was the killing of any member of the civil population or the liberation forces of Bangladesh or the destruction of their property or the rape of or criminal assault on their

womenfolk, even if done under any purported law passed by the occupation army, shall be deemed to be a collaborator.

(c) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh;

(d) "Liberation forces" includes all forces of the People's Republic of Bangladesh engaged in the liberation of Bangladesh;

(e) "Occupation army" means the Pakistan Armed Forces engaged in the occupation of Bangladesh;

(f) "Special Tribunal" means a Tribunal set up under this Order.

3. *(1)* Any Police Officer or any person empowered by the Government in that behalf may, without a warrant, arrest any person who may reasonably be suspected of having been a collaborator.

(2) Any Police officer or person making an arrest under clause (1) shall forthwith report such arrest to the [1][Subdivisional Magistrate] together with a precis of the information or materials on the basis of which the arrest has been made, and, pending receipt of the order of the [1][Subdivisional Magistrate], may, by order in writing, commit any person so arrested to such custody as the Government may by general or special order specify.

(3) On receipt of a report under clause (2), the [1][Subdivisional Magistrate] may by order in writing, direct such person to be detained for an intitial period of six months for the purpose of inquiry into the case.

(4) The Government may extend the period of detention if, in the opinion of the Government, further time is required for completion of the inquiry.

(5) Any person arrested and detained before the commencement of this Order who is alleged to be a collaborator, shall be deemed to be arrested and detained under this order and an order in writing authorising such detention shall be made by the Government

Provided that the initial period of detention of six months in the case of such person shall be computed from the date of his arrest.

4. Notwithstanding anything contained in the Code or in any other law for the time being in force, any collaborator who has committed any offence specified in the schedule shall be tried and

---

[1] The words within square brackets were substituted for the word "Government" by P.O. No.11 of 1972, Art. 2(1).

[1] The words within square barackets were *substituted* for the word "Government" By P. O. No. 11 of 1972. Art. 2(1).

punished by a special Tribunal set up under this Order and no other court shall have any jurisdiction to take cognizance of any such offence.

5. *(1)* The Government may set up as many special Tribunals as it may deem necessary to try and punish offences under this Order for each district or for such are a as may be determined by it.

(2) A special Tribunal shall consist of one member.

(3) No person shall be qualified to be appointed a member of a Special Tribunal unless he is or hasbeen a Session Judge or as Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge.

6. (1) A special Tribunal consisting of a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge shall try and punish offences enumerated in Parts I and II of the Schedule.

(2) A Special Tribunal consisting of an Assistant Sessions Judge shall try and punish offences enumerated in Parts III and IV of the Schedule.

7. A special Tribunal shall not take cognizance of any offence punishable under this Order expect upon a report in writing by an officer-in-change of a police station.

8. [2] [(1) The provisions of the Code in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Order, shall apply to all matters connected with, arising from or consequent upon a trial by a Special Tribunal.

[2][(2) A special Tribunal shall, for the purposs of the provisions of the Code, be deemed to be a Court of Session trying cases without the aid of assessors or jory and without the accused being committed to it by a Magistrate for trial, and shall follow the procedure prescribed by the Code for the trial of summons-cases by Magistrates.

(3) A person conducting prosecution before a Special Tribunal shall be deemed to be a public prosecutor.]

9. (1) A special Tribunal shall not be bound to adjourn a trial for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interests of justice.

(2) No trial shall be adjourned by reason of the absence of any accused person, if such accused person is represented by counsel, or if the absence of the accused person of his counsel has been brought

---

[2] Article 8 was re-numbered as clause (1) and thereafter clauses (2) and (3) were added by P. O. No. 11 of 1972, Art. 2(2)

about by the accused person himself, and the Special Tribunal shall Proceed with the trial after taking necessary steps to appoint an advocate to defend an occused person who is not represented by counsel.

10. A Special Tribunal may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to the offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relative to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abettor, in the commission thereof; and any pardon so tendered shall, for the purposes of sèctions 339 and 339A of the Code, be deemed to have been tendered under section 338 of the Code.

11. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,—

(a) Any collaborator who is convicted for any of the offences specified in Part I of the Schedule shall be punished with death or transportation for life and shall also be liable to a fine;

(b) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in Part II of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceding ten years and shall also be liable to a fine;

(c) any collaborator who is coinvicted for any of the offences specified in Part III of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding five years and shall also be liable to a fine;

(d) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in art IV of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding two years and shall also be liable to a fine.

12. Without prejudice to any sentence passed by the Special Tribunal, the property, immovable, movable, or any portion thereof, of a collaborator may, on his conviction, be forfeited to the Government, upon an order in writing made in this behalf by the Government.

13. If any accused is convicted of and sentenced for more than one offence the sentences of imprisonment shall run concurrently or consecutively, as determined by the Special Tribunal.

14. Notwithstanding anything contained in the Code no person who is in custody, accused or convicted of an offence punishable under this order shall be released on bail

15. The provisions of Chapter XXVII of the Code shall apply to a sentence of death passed by a Special Tribunal.

16. (1) A person convicted of any offence by a Special Tribunal may appeal to the High Court.

(2) The Government may direct a Public Prosecutor to present an appeal to the High Court from an order of Acquittal passed by a Special Tribunal; upon intimation to the Special Tribunal by the Public Prosecutor that such an appeal is being filed, the person in respect of whom the order of acquittal was passed shall continue to remain in custody.

(3) The period of limitation for an appeal under clause *(1)* shall be 30 days from the date of sentence and for an appeal under clause (2) shall be 30 days from the date of the order of acquittal.

(4) The appeal may lie on matters of fact as well as of law.

17. *(1)* If the Government has reasons to believe that a person, who, in the opinion of the Government, is required for the purpose of any investigation, enquiry or other proceedings connected with an offence punishable under this Order, is absconding or is otherwise concealing himself or remaining abroad to avoid appearance, the Government, may, by a written proclamation published in the official Gazette or in such other manner as may be considered suitable to make it widely known :—

(a) direct the person named in the proclamation to appear at a specified place at a specified time;

(b) direct attachment of any property, movable or immovable, or both, belonging to the proclaimed person.

Explanation—"Property belonging to the proclaimed person" shall include property, movable and immovable, standing in the name of the proclaimed person or in the name of his wife, children, parents, minor brothers, sisters or dependants or any *benamdar*.

(2) If the property ordered to be attached is a debt or other movable property, the attachment [1][shall be made by the Subdivisional Magistrate],—

---

[1] The words within square brackets were *substituted* for the words "shall be made" by P.O. No. 11 of 1972.

(a) by seizure; or

(b) by the appointment of an administrator; or

(c) by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or

(d) by all or any two of the methods mentioned in sub-clauses (a), (b) and (c)[2] * * * * * * * * * *

(3) If the property ordered to be attached is immovable, the attachment shall be made [3][by the Subdivisional Magistrate], —

(a) by taking possession of the property; or

(b) by the appointment of an administrator; or

(c) by an order in writing prohibiting the payment of rent or delivery of the property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or

(d) by all or any two of the methods mentioned in sub-clauses (a), (b) and and (c)[2] * * * * * * *

(4) If the property ordered to be attached consists of livestock or is of a perishable nature, the[4] [Subdivisional Magistrate may, if he thinks] it expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the Goverment.

(5) The powers duties and liablities of an Administrator appointed under the Article shall be the same as those of a receiver appointed under Chapter XXXVI of the Code of Civil procedure, 1908 (Act V of 1908).

(6) If any claim is preferred to, or objection made to the attachment, of, any property attached under this Article, within seven days from the date of such attachment, by any person other than the proclaimed person, on the ground that the climant or objector has an interest in such property, and that such interest is not liable to attachment under this Article, the claim or objection shall be inquired into, and may be allowed or disallowed in whole or in part;

Provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this clause may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative.

---

2 The words "as the Government may direct" were omitted, ibid.

3 The words within squar brackets were *substituted* for the words "in the case of land paying revenue of Government, by the Deputy Commissioner of the district in which the land is situate, and in all other cases," by P. O. No. 11 of 1972, art. 2 (3) (b).

4 The words within square brackets were *substituted* for the words "Government may, if it thinks", ibid, Art. 2(3) (C).

(7) A claim or an objection under clause (6) may be preferred or made before such person or authority as is appointed by the Government.

(8) Any person whose claim or objection has been disallowed in whole or in part by an order under clause (6) may, within a period of one month from the date of such order, appeal against such order to an appellate authority, constituted by the Government, for such purpose, but subject to the order of such appellate authority, the order shall be conclusive.

(9) If the proclaimed person appears within in the time specified in the proclamation, the Government may make an order releasing the property from the attachment.

(10) If the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, the Government may pass an order forfeiting to the Government the property under attachment.

(11) When any property has been forfeited to the Government under clause (10), it may be disposed of in such manner as the Government directs.

18. Notwithstanding the provisions of the Code or of any other law for the time being in force, no action or proceeding taken or purporting to be taken under this Order shall be called in question by any Court, and there shall be no appeal from any order or sentence of a Special Tribunal save as provided in [1] [Article 16].

[2] [19. The Government may, by order published in the official Gazette, direct that any power or duty which is conferred or imposed by this Order upon the Government shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercised or discharged by any officer or authority subordinate to it.]

---

1 The word and figure within square brackets were *substituted* for the word and figures "section 16" by P. O. No. 11 of 1972. Art. 2 (4).

2 Article 19 was *added* after Article 18, *ibid*, Article 2(5).

মার্কসবাদী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে–কমরেড লেনিন কর্তৃক প্রদর্শিত পথে-বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার নিরিখে একটি সুশৃঙ্খল, সুসংহত বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলুন*

প্রিয় বিপ্লবী সাথীগণ,

পাকিস্তান উপনিবেশবাদ, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় সামন্তবাদ তথা জোতদার মহাজন বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক পথরেখা ধরে আমাদের দেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মাঝপথে থেমে গেল। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি পরাজিত হল বটে কিন্তু দেশ ও জনগণ সর্বপ্রকার বিদেশী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হল না। বাঙালি ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ (যারা জোতদার-মহাজন ও বাঙালি আমলা দ্বারা বেষ্টিত) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য খাল কেটে কুমীর এনে–ভারতের উপর সকল দিক দিয়ে নির্ভরশীল (dependent) এক সরকার পূর্ববাংলায় প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে ২৪ বছরের ভুয়া স্বাধীনতায় দেশ ও জনগণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই শুধু নয়, আরও কঠিন দুরবস্থায় উপনীত হয়েছে।

কমরেডগণ, সমগ্র দেশ যেখানে জাতীয় স্বাধীনতার উদগ্র কামনায় আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরিত হল, লক্ষ লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আত্মবলি দিল, হাজার হাজার মা-বোন যেখানে পশুশক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হল, প্রায় এক কোটি মানুষ যেখানে হল দেশ ছাড়া এবং আরো প্রায় ১ কোটি মানুষ হল ভিটেমাটি-হারা ছিন্নমূল। মাত্র নয় মাসের মধ্যে একটা জাতি যুদ্ধের আগুনে পোড় খেয়ে ইস্পাতরূপ ধারণ করল, সমগ্র জাতি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়াগড়ি দিল, যে বাঙালি শতাধিক বছর ধরে যুদ্ধবিদ্যা থেকে দূরে ছিল, সেই জাতি এবার যুদ্ধ দেখলো, যুদ্ধ শিখলো এবং অদম্য সাহসিকতার সহিত বীর বিক্রমে যুদ্ধ করল; অথচ সেই যুদ্ধের ফল ভোগ করতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল খোলস পরিবর্তনওয়ালা শাসক ও শোষকের দল, মুখে তাদের সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, শোষণহীন সমাজের ললিত বাণী। কেন এমন হল? এই সত্যকেই আজ আমাদের উদঘাটন করতে হবে। উদঘাটন করতে হবে গত ২৪ বছর যাবত যে দেশ পরাধীন ও উপনিবেশ, তাকে কেন স্বাধীন মনে হয়েছিল! কেন সেই স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্ব অংশে আবার স্বাধীনতার লড়াই সংগঠিত হল?

বিগত ১৯৭১ সালের ২৯/৩০ শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত আমাদের পার্টির দ্বিতীয় বিশেষ কংগ্রেসের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে–১৯৪৬/৪৭ সালে তৎকালীন

---

* পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, জানুয়ারি, ২০, ১৯৭২

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করতে না-পারার দরুন ভারতে বৃটিশ-বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়নি। তৎকালীন ভারতে বিপ্লবের স্তর ছিল "জাতীয় গণতান্ত্রিক।" নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির। যেহেতু তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতারা ঐতিহাসিকভাবে তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃত ও অযোগ্যতার পরিচয় দেয় তার ফলে ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব না-হয়ে লীগ ও কংগ্রেসের সাথে বৃটিশের আপোস হয়। পাক-ভারতের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় দুই দেশের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীলরা।

অনুরূপভাবে ঠিক একই ধাঁচে সংগঠিত না-হলেও গত চব্বিশ বছর ধরে বাংলার মাটিতে কমিউনিস্ট নামধারী যেসব কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান ছিল, তারা কেহই মার্কসীয় দৃষ্টিতে পূর্ববাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়নি। আমাদের পার্টির মূল্যায়ন হল পূর্ববাংলা পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ উপনিবেশ। পূর্ববাংলার জনগণ বৃটিশ গোলামির পরিবর্তে পাকিস্তানি দাসত্বের হার পরেছিল। যার চরম পরিণতি হল গত নয় মাসের স্বাধীনতার যুদ্ধ। আমাদের পার্টি মনে করে কোন বৃহৎ জনসমষ্টি দীর্ঘদিন ধরে শাসক-শোষকদের চিনতে ভুল করে না। জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা শত্রু-মিত্র বোঝে। এই জন্য পূর্ববাংলার শ্রমিক-কৃষকেরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দিক হতেই অভিমত প্রকাশ করত–"বৃটিশ শাসন এর চাইতে ভাল ছিল, পাকিস্তান নয় গোরস্থান।"

কিন্তু বন্ধুগণ, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংশোধনবাদী নামধারী দক্ষিণ-পন্থী বুর্জোয়া 'লেজুড়ে কমিউনিস্টরা'ও প্রথম হতেই পূর্ববাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করতে পারেনি; ঠিক পারেনি বললে ভুল হবে। সচেতনভাবে তারা বাঙালি ধনীকের লেজুড়বৃত্তি করেছে। অনুরূপভাবে পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও জনগণের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে পারল না। তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে মেনে নিয়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করলেন "আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক"–প্রধান বিরোধ বিশ্লেষণ করলেন "সামন্তবাদ।"

তারপর ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বের হয়ে এসে জন্ম নিল "পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি'। ১৯৬৯ সালে এই পার্টির প্রথম রণনীতিগত দলিল ও খসড়া কর্মসূচি প্রকাশিত হয়, তাতে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সুস্পষ্টভাবে রূপ দেওয়া হয়। ঘোষণা করা হয় 'পিণ্ডি ও ওয়াশিংটনের আওতা মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম সুখী সম্পদশালী জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা রাষ্ট্র কায়েম করা হল এই পার্টির আশু লক্ষ্য।" পার্টির এই নীতিকে বাস্তবায়িত করাকালীন পার্টি সেক্রেটারী কমরেড দেবেন সিকদার ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মাহবুব উল্লাহ এক বছর করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই কারাদণ্ড ভোগের জন্য আমাদের পার্টি গর্ববোধ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে পার্টির নেতৃত্বে যারা ছিল তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পার্টিকে পুনঃবামপন্থী বিচ্যুতি ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল পথে নিয়ে যায়। এরাও ঘোষণা করল প্রধান বিরোধ সামন্তবাদের সাথে কৃষক-জনতার। তার থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হল সন্ত্রাসবাদী

পদ্ধতিতে গোপনে শ্রেণীশত্রু খতম। বিপ্লবী সংগঠন গড়ার নামে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকদের কৃষক সমিতি, ছাত্রদের ছাত্র-সংগঠন বর্জন, এমনকি বুর্জোয়া শিক্ষা বর্জনের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোমাবাজী।

ইতিমধ্যে 'কমিউনিস্ট' বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি'র নেতারা পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্রব ত্যাগ করে উক্ত নামে নূতন এক সংগঠন দাঁড় করালেন। তারা পূর্ববাংলার জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে পারলেন না। তারাও দুই পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বামপন্থী হঠকারী নীতি গ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় নামলেন। আওয়াজ তোলেন "তোমার বাড়ি, আমার বাড়ি নক্সাল বাড়ি", "মুক্তি যদি পেতে চাও হাতিয়ার তুলে নাও" "জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো" ইত্যাদি।

অবশেষে এই দলগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয় কে বা কারা কত বেশি 'মহান' চারু মজুমদারের ভক্ত হতে পারেন। সকলে মিলে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সীমারেখা পর্যন্ত অস্বীকার করে আওয়াজ তুলেন, "মহান নেতা চারু মজুমদার আমাদের নেতা, এশিয়ার নেতা, তিনি এই যুগের মাও সে তুং" ইত্যাদি।

অতঃপর দুইটি বছর ধরে এই তিন দল পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস ও দেওয়াল গাত্র বামপন্থী শিশুসুলভ হঠকারী বিপ্লবী শ্লোগানে ধুমায়িত ও ঘোলাটে করে তোলে। প্রত্যেক দল যার যার সামর্থানুসারে শ্রেণীশত্রু খতমের নামে গোপন সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত হয়। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে কেউ তোয়াক্কা করল না। পারল না শ্রমিক ও কৃষকের শ্রেণী সংগ্রামকে ধাপে ধাপে তীব্র করতে।

গত ২৪ বছরে পূর্ববাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় বিপ্লবীদের দুই মূল করণীয় কাজ ছিল।

১. পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ তুলে জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সংগঠিত করা।
২. গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রমিক ও কৃষকের শ্রেণী আন্দোলনকে সুসংগঠিত করে গড়ে তোলা।

উপরোক্ত দুই মূল কাজকে সমন্বয় সাধন করার জন্য [দরকার ছিল] পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে পূর্ববাংলার জনগণের প্রধান বিরোধ এই মূল নীতি ও কৌশলগত সিদ্ধান্তে আসা। আমাদের পার্টির দ্বিতীয় বিশেষ কংগ্রেস আত্মসমালোচনা করে বলেছে যে, উপরোক্ত কাজগুলি পূর্ব বাংলার কোন কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপ বিশেষ করে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। যার ফলে পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হল না। এত রক্ত এত ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে বাঙালি জাতি পেলো পাকিস্তানি দাসত্বের বিনিময়ে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপর সর্ববিষয়ে নির্ভরশীল (dependent) এক সরকার।

এমন এক তিক্ত পরিবেশে অতীতের ব্যর্থতা হতে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সারা দেশের প্রগতিশীল মহলে ও সকল কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে তীব্র আত্মজিজ্ঞাসা শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে আত্ম-অনুশীলন। সকলেই আজ বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর উপলব্ধি করছে একটা দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি ও কর্মকাণ্ড সংগঠিত

করা সহজ কাজ নয়, শুধুমাত্র বিশ-পঞ্চাশ জন অনুসারী নিয়ে মুখে শ্লোগান আউড়িয়ে, দেওয়ালে পোস্টার দিয়ে বা পার্টির নামে দু-একটা প্রচারপত্র বের করে, শুধুমাত্র তত্ত্বকথা লিখে এই কাজ সমাধা করা যায় না। উপরোক্ত বাস্তব উপলব্ধি হতে আজ সকল মার্কসবাদী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রগতিশীলদের আকুল কামনা 'আর কালবিলম্ব না করে সঠিক নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সকল কমিউনিস্টদের একটি কমিউনিস্ট পতাকাতলে সমবেত হওয়া উচিত'। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সকল কমরেডদের এই ঐকান্তিক শুভ কামনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই বিষয়ে আমাদের পার্টির বিশেষ কংগ্রেসের সুনির্দিষ্ট অভিমত হচ্ছে–

"শুধুমাত্র শুভ কামনা থাকলেই উপরোক্ত পার্টি হতে পারে না।" আবার শুধু উপর তলার মিলনের মাধ্যমেও ঐরূপ একটি পার্টি গড়ে উঠতে পারে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পার্টি গড়ার ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাথমিক স্তরে ছোট ছোট বহু কমিউনিস্ট গ্রুপ একত্রিত হয়ে একটি একক কমিউনিস্ট পার্টি সৃষ্টি করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু স্রোতের মিলনে এক মহাস্রোতের আকার নিয়েছে; কিন্তু পূর্ব বাংলায় তার বিপরীত অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। সুদীর্ঘ বছরের (১৯২১ সালে যার জন্ম) একটি পার্টি ভেঙ্গে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান দুই রাষ্ট্রে দুই পার্টি এবং পরবর্তীকালে আরও বহু খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়েছে। একটি মহাস্রোত বিভক্ত হয়ে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতে রূপ নিয়েছে। বহু অন্যায়, অবিচার, রেষারেষি, ভুল বুঝাবুঝি এবং বহু অমার্কসীয় অকমিউনিস্টসুলভ কার্যক্রম, সর্বোপরি নীতিগত বিরোধ ও দৈন্য থেকে এসব ঘটেছে। কাজেই কেবলমাত্র উপর তলার নীতিবিহীন মিলনে এ ঘা শুকাবেনা। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ও গ্রুপগুলোর জন্মের ইতিহাস এসত্যই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। দুই দুইবার উপর তলার মিলন সংগঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথমবার ১৯৬৬ সনে মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি হতে বের হয়ে পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির জন্মলগ্নে। দ্বিতীয়বার ১৯৬৮ সনে ঐ পর্টি হতে বের হয়ে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সময়ে। কিন্তু ইতিহাস নির্মমভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, ঐপথ ও পদ্ধতি পার্টি গঠনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত নয়। যেসব গ্রুপের সমন্বয়ে পার্টি গঠন করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে প্রতিটি গ্রুপ নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখে আত্মপ্রকাশ করেছে, একটি গ্রুপের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়নি। বরং দুই চারটি নতুন গ্রুপের জন্ম নিয়েছে। কাজেই তৃতীয় বারের অনুরূপ উপরতলার মিলন প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কিন্তু কমরেডগণ, তবে কি পূর্ববাংলায় কোনদিন যথার্থ একক শক্তিশালী পার্টি গড়ে উঠবে না! আমরা বিশ্বাস করি গড়ে উঠবেই। শ্রেণীবিভক্ত মানব সমাজে শ্রেণীশোষণ ও নিপীড়ন থাকতে বাধ্য, আর ঐ শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য শ্রমিক ও মেহনতী জনগণের পার্টির বিকাশ না হয়ে পারে না। আমাদের পার্টি গভীর আস্থার সহিত বিশ্বাস করে অগণিত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী কর্মীদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা থাকলে এবং উপর দিকের সংগ্রামী নেতারা উদ্যোগ গ্রহণ করলে অদূর ভবিষ্যতে যথার্থ একক শক্তিশালী বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠবেই। বিশেষ করে বর্তমান ভুক্তভোগী পরিবেশে ইহা ত্বরান্বিত না হয়ে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন....

১. অতীতের ভুলভ্রান্তির সঠিক পর্যালোচনা করা, ব্যর্থতাই সফলতার সোপান। তাই অতীতকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎকে সুন্দর ও সুদৃঢ় করে গড়া যায় না।
২. মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করা অর্থাৎ পূর্ববাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণে একমত হওয়া।
৩. বর্তমানের শত্রু-মিত্র নির্ধারণের মধ্য দিয়ে প্রধান বিরোধ কার সাথে কার তা নির্ণয় করা।

অতীতের মূল্যায়নে আমাদের পার্টির দ্বিতীয় বিশেষ কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেছে-(ক) পূর্ববাংলা পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ উপনিবেশ। (খ) পূর্ববাংলার বামপন্থী কমিউনিস্টরা সংগঠনগতভাবে সকলেই বামপন্থী হঠকারী, সুবিধাবাদী ও দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল নীতির দিশারী ছিল। আমাদের পার্টির উক্ত কংগ্রেসের রণনীতিগত দলিলে বলা হয়েছে, একটা দেশকে প্রত্যক্ষ উপনিবেশ হিসাবে বিবেচনার জন্য যেইসব উপাদান (ফ্যাক্টর) দরকার তার সবগুলিই পূর্ববাংলায় বিরাজমান ছিল। যথা-

(ক) ভৌগোলিকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন চৌদ্দ শত মাইল দূরের ভূখণ্ড পূর্ববাংলা।

(খ) রাষ্ট্রের মূল শাসকগোষ্ঠী বিদেশী ও সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানকে তাদের নিজেদের দেশ ও পিতৃভূমি মনে করতো।

(গ) পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে বাঙালি জাতির কোনপ্রকার ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক মিল বা সম্পর্ক নেই।

(ঘ) পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শ্রমের কোন স্বাভাবিক চলাচল নেই।

(ঙ) দু অঞ্চলের দূরত্বজনিত ও বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডজনিত কারণে দুই অর্থনীতি বিরাজমান ছিল।

(চ) রাষ্ট্রের রাজধানী স্থায়ীভাবে পশ্চিম অঞ্চলে থাকার পূর্বঅঞ্চল ধারাবাহিকভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে।

(ছ) পৃথক ভূখণ্ড এবং শাসক গোষ্ঠী বিদেশী বিধায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে নানাবিধ কৌশলে বাংলাদেশ হতে ধারাবাহিকভাবে সম্পদ পাচার করা হয়েছে।

(জ) পূর্ববাংলাকে শোষণ ও বঞ্চিত করে এখানের সম্পদ পাচার করে পশ্চিম পাকিস্তানকে শিল্পায়িত ও সম্পদশালী করা হয়েছে। যেমন বৃটিশ ভারতকে শোষণ করে ইংল্যান্ডকে শিল্পয়িত ও সমৃদ্ধ করেছিল।

(ঝ) পূর্ব বাংলায় লবণ ও আখের গুড়ের উৎপাদনে নানাবিধ বিধিনিষেধ জারি করা হত। যেমন বৃটিশেরা ভারতে করতেন।

(ঞ) পূর্ববাংলায় বস্ত্রশিল্পের বিকাশ সাধন না-করে ধ্বংসসাধন করা হয়-পশ্চিম পাকিস্তানের কটন শিল্পের পণ্যের বাজার করার জন্য।

(ট) বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র করা হয়।

(ঠ) বাঙালিকে প্রশাসনিক বিভাগের উচ্চ পদে নিয়োগ করা সাধারণত হ'ত না; যেমন বৃটিশেরা করতো না।

(ড) সেনা বিভাগ ও অন্যান্য দেশরক্ষা বিভাগে বাঙালিকে মোটেই বিশ্বাস করা হত না, যেমন বৃটিশেরা করতো না।

(ঢ) সামরিক একনায়কত্বের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য গণতন্ত্রের টুটি টিপে ধরা হত এবং ১৯৫৪ সাল হতে পূর্ববাংলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার-মান্ডেট অস্বীকার করতে থাকে।

(ণ) পূর্ববাংলা হতে দালাল পাওয়ার জন্য এখানের জোতদার-মহাজন গোষ্ঠীকে লালন-পালন করা হত। যেমন বৃটিশেরা দেশীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো।

ইহাছাড়া পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকের জনসংখ্যা যথাক্রমে সাড়ে সাত কোটি ও সাড়ে পাঁচ কোটি হওয়া সত্ত্বেও সকল মহল কর্তৃক স্বীকৃত ঘটনা হ'ল চব্বিশ বছর ধরে সর্বক্ষেত্রে পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, তার বাস্তব চিত্র হ'ল :

	পূর্ববাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
মাথা পিছু গড় আয়...	১৫ পাউণ্ড	৪৫ পাউণ্ড
মাথা পিছু গড় আয় (টাকায়)	১৫০ টাকা	৪৫০ টাকা
বিদেশী বিনিময় মুদ্রা অর্জন	৬৫ ভাগ	৩৫ ভাগ
বাজেটে খরচ করা হয়	৩০ "	৭০ "
বিদেশী ঋণ বণ্টনে	২০"	৮০ "
সিভিল সার্ভিসের চাকুরি পদে		৮০ "
সামরিক বিভাগের উচ্চ পদে	×	১০০ "
সামরিক বিভাগের নিম্ন পদে	১০ "	৯০
শিল্প কারখানার বিকাশ সাধনে ও স্থাপনে	২০ "	৮০ "
বস্ত্র শিল্প স্থাপনে	৫ "	৯৫ "
পূর্ব বাংলাকে শোষণ করে পশ্চিম পাককে সম্পদশালী করার পরে ৬৮/৬৯ সালের দিকে বিদেশী বিনিময় মুদ্রা অর্জন	৪৮ "	৫২

পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনের বিশেষজ্ঞ ডক্টর মাহবুবুল হকের মতে পাকিস্তানের সমস্ত সম্পদের (ওয়েলথ) ৮৪ ভাগের মালিক দুই শত বৃহৎ ধনী পরিবার তার মধ্যে বাইশটি হ'ল একচেটিয়া ধনী। এদের হাতে কুক্ষিগত হয়েছিল রাষ্ট্রের প্রায় সমুদয় সম্পদ। সমস্ত ব্যাঙ্ক পুঁজির শতকরা ৮৪ ভাগ, বীমা ও ইনসিউরেন্স ব্যবসায়ের শতকরা ৯৭ ভাগ এবং শিল্পে নিয়োজিত পুঁজির ৬৬ ভাগের মালিক এই বাইশটি একচেটিয়া ধনী পরিবার। এরাই কার্যত পাকিস্তানের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য আমদানি-রপ্তানি, শিল্প-কারখানা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতো।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা দিনের আলোর মত সত্য ছিল যে, পূর্ববাংলা

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ উপনিবেশ। যদিও পাকিস্তান নিজেই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া উপনিবেশ; ঔপনিবেশিক শক্তি বা আধা উপনিবেশ হওয়ার জন্য কোন কালে ধনবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদে উন্নীত হওয়ার বাধ্যতামূলক শর্তের প্রয়োজন হয় না। যেমন ১৭৫৭ সালে ভারত যখন বৃটিশের উপনিবেশে পরিণত হয়, তখন ইংল্যান্ড শিল্পে উন্নত দেশ ছিল না। পাল তোলা জাহাজে করে বৃটিশ বণিকেরা ভারতে এসেছিল। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশকে শোষণ করেই ইংল্যান্ডের বিকাশ ও উন্নতি ঘটে।

বাঙালি জাতির স্বাধীনতার যুদ্ধ

গত ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বর্বরোচিত হামলা, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য গত নয় মাস ধরে বাঙালি জাতির মরণপণ লড়াই, লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মবলিদান, হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট, তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন, কোটি কোটি লোকের গৃহত্যাগ, ভিটামাটি ছাড়া হওয়াও ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত, কোটি কোটি টাকার সম্পদহানি ইত্যাদি কি প্রমাণ করে না, পূর্ববাংলা ও বাঙালি জাতি গত চব্বিশ বছর ধরে পরাধীন ছিল? আমাদের পার্টি গভীর আস্থার সহিত বিশ্বাস করে যে, পূর্ববাংলা তর্কাতীতভাবে উপনিবেশ তথা পরাধীন ছিল। এই পরাধীনতা কেবলমাত্র ২৫শে মার্চের পর হতে নয়, চব্বিশ বছর পূর্ব হতে।

এখনও কোন কোন কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপের নেতারা মনে করেন পূর্ববাংলা ঠিক পরাধীন তথা উপনিবেশ ছিল না। তাদের কারো মতে পূর্ববাংলায় ঔপনিবেশিক ধরনের শোষণ ছিল, কারো মতে এই শোষণ ছিল "বিজাতীয় শোষণ"-এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার) এবং কমিউনিস্ট সংহতি কেন্দ্রের মতে গত নয় মাস ধরে পূর্ববাংলায় যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল ইহা স্বাধীনতার যুদ্ধ নয়, ইহা হল "বিজাতীয় শোষণ হতে মুক্তির লড়াই।"

উক্ত কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির মূল্যায়ন তর্কের খাতিরে মেনে নিলে ঘটনাটা এই দাঁড়ায় যে, গত চব্বিশ বছর ধরে পূর্ববাংলা ও বাঙালিরা স্বাধীন ছিল, কেবলমাত্র বিজাতীয় শোষণ থেকে বাঁচার জন্য বাঙালি জাতি লড়াই করেছে। বন্ধুদের এই মূল্যায়ন কি সেই মূল্যায়ন নয় যখন আমরা কমবেশি বামপন্থী হঠকারী, সুবিধাবাদী ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে সক্রিয় ও আস্থাবান ছিলাম? তখনকার মূল্যায়ন আর বর্তমান মূল্যায়নে কি খুব বেশি পার্থক্য আছে? পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে এই ভ্রান্ত মূল্যায়ন পরিহার করে এবং লক্ষ কোটি জনতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল-এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ; পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক দাসত্ব হতে মুক্তির যুদ্ধ। জনগণের ভাষায় পাঞ্জাবির গোলামি থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ।

কাজেই সবগুলি কমিউনিস্ট গ্রুপ ও পার্টি নিয়ে এক পার্টি গঠনের সিদ্ধান্তে আসতে হলে অতীতের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বন্ধু পার্টি ও গ্রুপগুলির মূল্যায়ন যে ভ্রান্ত তার স্বীকৃতি দিয়ে এক পার্টি গঠনের পথ পরিষ্কার করতে হবে। কোন প্রকার গোঁজামিল দিয়ে ফল হবে না।

গত ৩১শে ডিসেম্বর নিম্নলিখিত চারটি পার্টি ও গ্রুপ এক সাথে বসে পরস্পর চিন্তা-ভাবনার মত বিনিময় করা হয়। ইতিপূর্বে আরও কয়েকটি মত-বিনিময়ের জন্য বৈঠক হয়। ৩১শের বৈঠকে উপস্থিত ছিল "পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি," কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি, বাংলাদেশের কমিউনিস্টি পার্টি (হাতিয়ার) এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট সংহতি কেন্দ্র (হক-তোহা হতে বের হয়ে আসা গ্রুপ)। বৈঠকে সাধারণভাবে ঐক্য মতে আসা হয় যে, নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপের সমন্বয়ে একটি পার্টি গড়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বৈঠক দ্বিতীয় যে বিষয়ে ঐক্যমতে আসে তাহল প্রতিটি পার্টি ও গ্রুপ নিজেদের অতীতের কার্যকলাপের আত্মসমালোচনা করে প্রত্যেকে একটি করে দলিল প্রকাশ করবে। এবং নিজ নিজ পার্টির মধ্যে ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির কর্মীদের মধ্যে প্রকাশ করবে। এই ভিত্তিতে প্রতিটি পার্টি ও গ্রুপের ঐক্যের প্রশ্নে চিন্তাভাবনার সুনির্দিষ্ট রূপ প্রকাশ পাবে।

ইহা ছাড়া উক্ত বৈঠকে যেসব বিষয়ে চিন্তাভাবনার ভিন্নতা প্রকাশ পায় তাহল (ক) বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন। (খ) অতীত সম্পর্কে মূল্যায়ন (গ) পূর্ববাংলায় অতীতে কোন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল কিনা?

পূর্ববাংলার অতীত মূল্যায়ন সম্পর্কে আমাদের পার্টির বক্তব্য আমরা এই দলিলে সুস্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করেছি। বর্তমান অবস্থার মূল্যায়নে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি গত ১৭, ১৮, ১৯শে জানুয়ারি '৭২, পার্টি কংগ্রেসের অনুমোদনসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পূর্ববাংলার বর্তমান সরকার ভারতের উপর সর্ববিষয়ে নির্ভরশীল সরকার। এই সরকারের প্রতি আমাদের বর্তমান মূল্যায়ন চূড়ান্ত নয়। দুই কারণে এই মূল্যায়ন পরিবর্তন হতে পারে।

১। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনে সরকারের বলিস্ট ভূমিকা কতটুকু বৃদ্ধি পাবে?

২। আমাদের পার্টির আগামী কংগ্রেসে এই মূল্যায়ন যদি পরিবর্তন হয়, তাই আমাদের এই মূল্যায়ন চূড়ান্ত নয়।

তবুও এক পার্টি গঠনের ঐক্যমতে আসার জন্য এই মূল্যায়নকে নীতিগত বিষয়ের ভিত্তি আকারে উপস্থিত করছি। অবশ্য অন্য তিন গ্রুপের বর্তমান অবস্থার আপাতত মূল্যায়ন হল, বর্তমান সরকার ভারতের 'প্রভাবিত' সরকার।

৩। তৃতীয় বিষয়ে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সাথে উক্ত তিন গ্রুপের প্রথম হতেই ভিন্ন মত বিরাজ করছে। তা হল পূর্ববাংলায় কোন কমিউনিস্ট পার্টি কোন কালে ছিল কি না? বন্ধুদের মতে পূর্ববাংলায় এ পর্যন্ত কোন বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম নেয়নি। দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর সবেমাত্র বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্ট গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। বন্ধুদের সাথে এই বিষয়ে আমাদের পার্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে।

আমাদের মতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজ একদিনে বা একবারে শেষ হয়ে যায় না। এই কাজ করতে হয় একটানা ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোক্তরা পাক-ভারত উপমহাদেশে অতীতে যে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তারই উত্তরসূরী। ১৯২১ সালে প্রবাসে, তাসখন্দে কমরেড লেনিনের প্রত্যক্ষ গাইডেন্সে

(সহযোগিতা) প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম নেয়। তারপর ১৯২৫-২৬ সাল থেকে পুন পার্টি গড়ার প্রচেষ্টা চলে। সেই প্রচেষ্টা সফল হয় ১৯৩৩ সালে মীরাট জেলে। মীরাট জেলে বসেই দ্বিতীয়বার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এরপর ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও ভাগ হয়। প্রথম 'পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির এই নামকরণ হয়। তারপর ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বপাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটি নাম ধারণ করে। ১৯৬৬ সালে এই পার্টি বিভক্ত হয়ে এক অংশ পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি নামে নতুন পার্টি গঠন করে। এরপর ১৯৬৮ সালে উক্ত পার্টির এক অংশ বের হয়ে এসে পূর্ববাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি নাম ধারণ করে। ১৯৭১ সালে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের বিষয় নিয়ে এই পার্টি আর একবার ভেঙ্গে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এর এক অংশের নাম পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, অপর অংশের নাম পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)।

দ্বিতীয়ত, আমাদের মতে কোন দেশের পার্টি ভুল করে না, ভুল করে তার নেতারা। নেতারা ভুল করে বলেই দোষটা পার্টির ঘাড়ে চাপে। কাজেই ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সমালোচনার আন্তর্জাতিক নিয়ম হলো পার্টিকে কেহ সমালোচনা করে না। সমালোচনা করে সেই পার্টির নেতৃত্বকে।

কাজেই পূর্ববাংলায় কোনকালে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না, এই সমালোচনা বিজ্ঞানসম্মত হয়। পার্টি ১৯৪৭ সাল থেকেই ছিল।

তৃতীয়ত, যেই সব বন্ধুরা বলে যে, পূর্ববাংলায় কোনদিন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না, তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলতে পারেন এই কারণে যে তারা পাক-ভারতের অতীতের কোন পার্টির ঐতিহ্য বহন করেন না। তারা অতীতের কোন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না বা তাদের সদস্য পদ দেওয়া হয়নি। অন্য দুই গ্রুপ মনে করেছেন যেহেতু তারা এখনও পরিপূর্ণভাবে পার্টি গঠনের পথে কোন পদক্ষেপ দেননি অথবা একটা পার্টি গঠনের জন্য যা ন্যূনতম প্রয়োজন তা তাদের নেই বলে পার্টি গঠনে অগ্রসর হননি। কিন্তু তাদের জন্য যা বাস্তব সত্য পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির জন্য তা নয়। বরং তার বিপরীত। যথা–

(ক) পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি অতীতের কমিউনিস্ট পার্টির পুনর্গঠিত রূপ।

(খ) ১৯৬৮ সালে এই পার্টি নতুন নাম ধারণ করে জন্মগ্রহণ করে।

(গ) এই পর্যন্ত এই পার্টির তিনটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) এই পার্টির রয়েছে রণনীতিগত দলিল ও কর্মসূচি, আর আছে গঠনতন্ত্র ও নির্বাচিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

(ঙ) ইহার প্রতিটি সভ্য নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে দরখাস্ত করে এবং দুইজন সভ্যের দ্বারা সমর্থিত হয়ে ন্যূনতম ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস প্রার্থী সভ্য হিসাবে কাজ করে সদস্য পদ অর্জন করেছে।

(চ) এই পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা ১৯৩৭ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত এবং ১৯৪০ সাল থেকে তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী।

(ছ) এই পার্টির বহু সভ্য আছেন যারা দেশ ভাগ হওয়ার পূর্বের পার্টি সভ্য।

এমত অবস্থায় অন্যান্য কমিউনিস্ট গ্রুপের ন্যায় পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, তার

নেতা ও কর্মীরা এই দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নাই বলে স্বীকৃতি দিয়ে নিজেরা নিজেদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করতে পারে না। পারে না অতীতের ঐতিহ্যকে বেমালুম অস্বীকার করতে। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, কারণ ছাড়া কোন কার্য হয় না। অতীতের সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে যেমন করে নতুন সমাজের জন্ম হয়; তেমন করে বন্ধু সংগঠনগুলি সহ সকল কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপের অতীত ইতিহাস রয়েছে। কেউই ভূঁই-ফোঁড় নয়।

আলোচনায় দেখা গেছে অতীত নিয়ে বন্ধুরা বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান না। আমরা কিন্তু তার তীব্র বিরোধী। সৎপুত্রের দায়িত্ব হচ্ছে--ভ্রান্ত পথের পথিক পিতাকে সমালোচনা করা, পিতাকে অস্বীকার করা নয়।

অতএব, কমরেডগণ! বাংলার সমস্ত বিপ্লবী শক্তির সমবায়ে এক পার্টি গড়ে তোলার ভিত্তি হিসাবে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করছে :

(১) অতীতের মূল্যায়ন হচ্ছে–পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির পূর্ববাংলা ছিল প্রত্যক্ষ উপনিবেশ। এই ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে পূর্ববাংলার জনগণ যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল সেই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ।

(২) উপরোক্ত মূল্যায়ন করতে না-পারার এবং সময়মত করতে না-পারার দরুন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে সমস্ত কমিউনিস্টরা ব্যর্থ হয়েছে।

(৩) জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম মূল শর্ত শ্রমিক ও কৃষকদের সচেতন ও সুসংগঠিত সংগঠন এবং শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে জাতীয় ধনীক শ্রেণীসহ বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গঠন। এই কাজেও কমবেশি সব কমিউনিস্টরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

(৪) প্রধান বিরোধ নির্ধারণেও সব পার্টি নেতৃত্ব ভুল করেছে। যারা সামন্তবাদের সাথে প্রধান বিরোধ বলত, তারা চরম বামপন্থী হঠকারী। প্রধান বিরোধ ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে জনগণের।

(৫) অতীতে পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি ছিল। কিন্তু তার নেতৃত্ব বারে বারে ভুল করে এসেছে। কোন কালে এই দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না–এই মূল্যায়ন ভ্রান্ত এবং বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা।

(৬) বর্তমান সরকারের মূল্যায়ন হচ্ছে--এই সরকার সর্বদিক দিয়ে ভারতের উপর 'নির্ভরশীল' (ডিপেনডেন্ট) সরকার। "প্রভাবিত" সরকার নয়।

উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ে একমত হয়ে সকল কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপের সমন্বয়ে এক পার্টি গড়ার কাজে আমাদের পার্টি উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

কমরেডগণ! উপরে বর্ণিত বিশ্লেষণ ও বিষয়গুলিকে ভিত্তি করে সকল কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপের কর্মীদের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শুরু করুন। আলোচনা করুন অগণিত বামপন্থী প্রগতিশীল কর্মী সমর্থক ও দরদীদের সাথে। আলোচনার মাধ্যমে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করুন যাতে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যথার্থ, একক, সুসংহত, সুশৃঙ্খল, শক্তিশালী এক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে।

বিপ্লবী শুভেচ্ছা সহ–বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। ২০/০১/৭২

যেহেতু বর্তমানে এই দেশের নাম বাংলাদেশ, তাই পার্টি কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে পার্টির নাম সংশোধন করে বাংলার কমিউনিস্ট পর্টি রাখা হয়েছে।

জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার রূপরেখা ও কর্মসূচি*

ভূমিকা

পূর্ববাংলা আজ পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি তথা দস্যু হানাদার বাহিনীর কবলমুক্ত। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ মুক্তি। এ মুক্তি সংগ্রামে পূর্ব বাংলার সমগ্র শোষিত মেহনতী মানুষের রয়েছে সক্রিয় অবদান। বিশেষ করে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত মুক্তি ফৌজের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। বাংলা মায়ের মুক্তি-পাগল ঐ সেনানীদের জীবনাহুতি ছাড়া এ সংগ্রাম কিছুতেই সফল হতে পারত না, যদিও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক পশুশক্তিকে পরাজিত করার প্রশ্নে ভারত সরকার ও তার সেনাবাহিনীর ভূমিকাও এখানে জড়িত আছে। তবুও একথা দৃঢ়তার সাথে বলা চলে যে, পূর্ববাংলার মেহনতী জনগণ ও তার সন্তানদের দ্বারা গঠিত মুক্তি বাহিনীই ছিল এ যুদ্ধের নিয়ামক শক্তি। আগামী দিনেও স্বাধীন-সুখী-সমৃদ্ধিশালী সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনে এরাই নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

দেশ আজ হানাদার–মুক্ত হলেও শত্রু-মুক্ত নয়, নয় শোষক ও শোষণহীন। কেননা, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর কেবলমাত্র পাকিস্তানি শাসকরাই শোষণ চালায়নি–তাদের সাথে শোষণের শরিকদার ছিল (ক) দেশের অভ্যন্তরের জোতদার মহাজন বা সামন্তবাদী শ্রেণী, (খ) বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যদিও এ তিনের মধ্যে প্রধান শত্রু ছিল পাকিস্তানি শাসকরা।

বাংলার মাটিতে আজ পাকিস্তানি শাসকরা না-থাকলেও তাদের বহু কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক-ইনসিওরেন্স ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়ে গেছে, রয়ে গেছে মার্কিনসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজি-পাট্টা; তদুপরি জোতদার-মহাজনরা রয়েছে অক্ষত। অতএব, ঐ সব দেশী-বিদেশী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসন ও শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে।*

গত নয় মাসের ঘটনাবলী কি প্রমাণ করে? প্রমাণ করে দেশের অভ্যন্তরের জোতদার-মহাজন ও তাদের দালালরাই ছিল পাকিস্তানি শাসকদের মূল খুঁটি; এদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পূর্ব বাংলার অসংখ্য গ্রামে সংঘটিত হয়েছে অগণিত 'মাইলাই' (ভিয়েতনাম) হত্যাকাণ্ড। আজো শেষ হয়নি দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র, ভাঙেনি তাদের শোষণের বিষদাঁত।

তাছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন, তা পূর্ব বাংলার জনগণ গত চব্বিশ বছর ধরে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে, উপলব্ধি করেছে বলেই বাংলার সাধারণ মানুষ সর্বাগ্রে স্বাধীনতার দাবি তুলেছে, সকলের আগে ধারণ করেছে

---

* বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা, ২০ জানুয়ারি, ১৯৭২

অস্ত্র। এ জনগণই গত নয় মাসে সব চাইতে বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছে। তাই জনগণকে সকল প্রকার শোষণ থেকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। শুধু মুখের কথায় জনগণের মুখে হাসি ফুটবে না, পেটে ভাত জুটবে না, বেকার পাবে না কাজ, ভূমিহীন পাবে না জমি, ঋণগ্রস্ত মানুষ হবে না ঋণমুক্ত, রোগী পাবে না ওষুধ-পথ্য, শিক্ষার দ্বার হবে না সকলের জন্য খোলা।

এমতাবস্থায় দেশের সকল শ্রেণীর জনগণকে দেশি-বিদেশী সকল শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করতে হলে সর্বপ্রথম তিনটি কাজের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথমত, দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে আনতে হবে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা। দেশের মাটিতে মিত্র বাহিনীর অবস্থানকে জনগণ ভীষণ আশঙ্কার চোখে দেখছে। যেহেতু আমাদের দেশের মানুষ ঘরপোড়া গরুর মত, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই তাদের ভয় জাগা স্বাভাবিক! এ অবস্থায় সরকারকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে হবে–

পাকিস্তানি শাসক তথা বাইশ পরিবারের, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের [নির্মূল করার জন্য জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আপোষহীন সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে।]*

দ্বিতীয়ত, সকল স্তরের মুক্তি ফৌজকে নিয়ে একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও কর্মক্ষম পুরুষদের সামরিক ট্রেনিং দানের জন্য মুক্তি ফৌজের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন করা।

তৃতীয়ত , দেশের অভ্যন্তরে ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় সমগ্র জাতির উন্নতি ও কল্যাণার্থে একটি সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সমগ্র জাতির সামনে বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের নিকট বিবেচনার জন্য উপরোক্ত উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচি সবিনয়ে উপস্থিত করছি। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, একমাত্র এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বাংলার সমগ্র শোষিত ও মেহনতী জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি আসতে পারে। আমরা এও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের সাথে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রথমত রাষ্ট্রের নাম হওয়া উচিত জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা (Peoples Republic of Purba Bangla)। যেহেতু দুই বাংলা ছিল এক বাংলা, তাই বাংলাদেশ নামটিতে সমগ্র বাংলাদেশকে বুঝায় এবং এতে বিভ্রান্তি থেকে যায়।

রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ

(১) সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দেশকে অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ হতে উন্নত শিল্পপ্রধান দেশরূপে গড়ে তুলতে হবে। দেশকে শিল্পায়িত দেশরূপে গড়ে তোলার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পূর্ব ধাপ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে মূল বাধারূপে তিনটি শত্রু সমাজের

---

* পাণ্ডুলিপিতে বাক্যটি অসমাপ্ত ছিল। ব্র্যাকেটবন্দী অংশটি সম্পাদক সংযোজন করেছেন।

উপর জগদ্দল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। এ তিনটি শত্রু হচ্ছে : (১) উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ, (২) দেশীয় সামন্তবাদ এবং (৩) আমলাতান্ত্রিক শোষণ।

পাকিস্তান উপনিবেশবাদ, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বা নয়া উপনিবেশবাদ, দেশীয় সামন্তবাদ (জোতদার-মহাজনী) ও এদের দালালদের সমস্ত এবং সম্পদ এবং দেশীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজি গণতান্ত্রিক সরকার বাজেয়াপ্ত করবে।

(২) রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম। আনুপাতিক ভোট* ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণ তাদের শ্রেণী-ভিত্তিক প্রতিনিধি নির্বাচন করে পার্লামেন্ট গঠন করবে এবং এ পার্লামেন্ট হবে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যকরী করার সর্বোচ্চ শক্তিশালী হাতিয়ার। ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের প্রতিটি নর-নারীর ভোটাধিকার থাকবে।

(৩) সকলের জন্য কর্মসংস্থান, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং বৃদ্ধকালীন ভাতা প্রদান করার নিশ্চয়তা (গ্যারান্টি) সম্মুখে রেখে সমস্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকরী করা হবে।

(৪) বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল জাতি, উপজাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে।

(৫) এ রাষ্ট্র দেশের মধ্যে সকল রকমের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি, ভিক্ষাবৃত্তি, ব্যভিচার-বেশ্যাবৃত্তি, মদ-মাতলামী-জুয়া, ছেলে-ধরা, কালোবাজারী-মজুতদারী, দাঙ্গা-দাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র আঞ্চলিকতা প্রভৃতি যেসব সামাজিক অনাচার ও শোষণ-নিপীড়ন মানুষকে যুগ যুগ ধরে পঙ্গু করে এসেছিল– তার পরিপূর্ণ উচ্ছেদ করবে।

উপরোক্ত মূলনীতি সামনে রেখেই বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিম্নোক্ত কর্মসূচি হাজির করছে–

১। কৃষক ও কৃষি সমস্যার ক্ষেত্রে

(ক) বাংলাদেশের আধাসামন্তবাদী ব্যবস্থার অবশেষকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করা হবে। "যে চাষ করে জমি তার" এ নীতির ভিত্তিতে কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হবে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে তিন শত্রুর এবং তাদের দালালদের সমস্ত বাজেয়াপ্ত জমি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্ষেতমজুর, বর্গাচাষী ও গরিব কৃষকদের মধ্যে প্রয়োজনের অনুপাতে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হবে।

(খ) বিপ্লবের মিত্র শিবিরে অনেক অকৃষক জমির মালিক আছে বা থাকবে যারা কৃষির আয়ের দ্বারা সূচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেনা বলে অন্য পেশা গ্রহণ করেছে; কৃষক হিসাবে এদের ভূমিকা নেই। এদের জমি উচিত মূল্যে সরকারি খরচে ক্রয় করে

---

* আনুপাতিক ভোট বলতে বুঝায় : নির্বাচনে ব্যক্তি প্রার্থী না হয়ে পার্টি প্রার্থী হবে। জনগণ পার্টিগুলোকে ভোট দিবে। যে পার্টি সারা দেশে যত ভোট পাবে তা একত্র করে সম্পূর্ণ প্রদত্ত ভোটের অনুপাতে পার্লামেন্টে ঐ পার্টির প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে। তারপর ঐ পার্টি ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে দিবে (অর্থাৎ পার্লামেন্টে প্রতিনিধি মনোনীত করে পাঠাবে)। এ ব্যবস্থায় কোন ভোটারের ভোট অপ্রতিনিধিত্বমূলক থাকে না।

বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হবে। কিন্তু এদের জমি তখনই নেওয়া হবে যখন এরা নিজ নিজ পেশার আয়ের দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে, তার আগে নয়।

(গ) অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান এর মৌলিক প্রশ্নে অসহায় বিধবা ও অন্যান্য অকৃষক মানুষের হাতে জীবনধারণের মূল উপকরণ হিসেবে যে জমি আছে তা' উচিতমূল্যে সরকারি খরচে ক্রয় করে নেওয়া হবে ও বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হবে। তবে তা করা হবে ঐ সকল মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, রাষ্ট্র কর্তৃক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর, তার আগে নয়।

(ঘ) আবাদযোগ্য পতিত জমি ও সরকারি খাসজমিসমূহ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। ওয়াকফ, দেবোত্তর সম্পত্তির নামে যুগযুগ ধরে কৃষকদেরকে যে শোষণ করা হচ্ছে তাকে বিলুপ্ত করা হবে। কিন্তু ধর্মীয় ও সৎ উদ্দেশ্যে যে ওয়াকফ বা দেবোত্তর করা হয়েছিল সে-উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না-হয়, তার জন্যে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঙ) উন্নত ধরনের বীজ, সার ও বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রপাতি সরবরাহ, কৃষিতে সেচসহ উন্নত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন, জরুরী কার্যক্রম হিসেবে বন্যা ও জলস্ফীতি প্রতিরোধের স্থায়ী ও দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ, খাল-বিল-নদী-নালার সংস্কার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে।

(চ) বাংলাদেশের জলসম্পদের যথাযথ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বনজ সম্পদ, বন্যপশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি সাধন করা হবে এবং মৎস্যশিল্পে বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রবর্তনসহ উহার সার্বিক উন্নতি সাধন করা হবে।

(ছ) কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেত মজুরদের জন্যে উপযুক্ত মজুরি পাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(জ) জাতীয় শত্রু জোতদার-মহাজনদের নিকট যে সমস্ত কৃষক মজুর ও গরিব কুটির শিল্পী যুগযুগ ধরে ঋণদায়গ্রস্ত, তাদের ঐ ঋণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা হবে।

(ঝ) কৃষকদের জন্যে এবং কুটির-শিল্পীদের জন্যে বিনাসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাবার ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির উচিত মূল্য পাবার ব্যবস্থা করা হবে। কৃষকদের মত কুটির শিল্পীদেরও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

(ঞ) কৃষক ও কুটির শিল্পীদের স্বার্থে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমবায় গঠনের জন্যে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে। পর্যায়ক্রমে কৃষি সমবায়, পণ্য সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ সমবায় প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ট) জনসাধারণকে যৌথ অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুসংখ্যক আদর্শ যৌথ খামারের প্রবর্তন করা হবে।

২। শ্রমিক ও শ্রম সমস্যার ক্ষেত্রে

(ক) শ্রমিকদের জন্য মানুষের মত বেঁচে থাকার উপযোগী মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

(খ) দৈনিক অনধিক ৮ ঘণ্টা শ্রমের রেওয়াজ প্রতিটি শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও দোকান কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কড়াকড়িভাবে চালু করা হবে। অবশ্য প্রয়োজনে ৮ ঘণ্টার অধিক শ্রমের জন্য দ্বিগুণ হারে উপরি পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) অবসরপ্রাপ্ত বা কাজ করতে গিয়ে পঙ্গু বা কার্যে অক্ষম হয়ে গেছে এমন শ্রমিকদের জন্য সরকার ও মালিকদের খরচে বিশেষ মঞ্জুরী (গ্রাচুয়েটি), বীমা ও পেনশনের ব্যবস্থা করা হবে।

(ঘ) শ্রমিকদের জন্যে প্রয়োজনীয় বাসস্থান এবং অবসর বিনোদনকেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা হবে।

(ঙ) শ্রমিকদের জীবনধারণের মান ও চাকুরির শর্ত উন্নত করার প্রয়োজনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, মালিকদের সাথে যৌথ দর কষাকষি ও ধর্মঘট করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে।

৩। শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে

(ক) কৃষি নির্ভরশীল অবস্থা থেকে দেশকে দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা হবে এবং এ নীতির উপর ভিত্তি করে শিল্পব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা হবে।

(খ) রেল, স্টীমার, ও স্টেটবাস, ব্যাঙ্ক, বীমা, বন, পোর্ট, ডক এবং কাগজ, পাট, তৈল, খনি, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, অস্ত্র কারখানা ও বি, আই, ডি, সি, ওয়াপদা ও বিসিক কর্তৃক নির্মিত কারখানা ইত্যাদি মূল শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত থাকবে।

(গ) দেশকে দ্রুত আত্মনির্ভরশীল ও শিল্প-সমৃদ্ধ করার নীতিতে ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং শিল্পপতিদের সরকারি সহযোগিতা দেওয়া হবে। অল্প সুদে ঋণ প্রদান ও যুক্তিসঙ্গত দামে কাঁচামাল ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা ও বাজারের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা লাভে তাদের সাহায্য করা হবে।

(ঘ) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার ও শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি মারফৎ যৌথভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে। অন্যথায় আমলাতান্ত্রিক শোষণ হতে শিল্পকে রক্ষা করা যাবে না এবং শিল্প বিকাশের পথে এগুনো যাবে না, যেহেতু আমলারা লুটের মাল হিসাবে শিল্পকে এ যাবৎ ব্যবহার করেছে।

(ঙ) ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প ব্যবসার ক্ষেত্রে অত্যধিক মুনাফার ফলে যাতে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ না-ঘটে, শ্রমিকরা যাতে উপযুক্ত মজুরি ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না-হয় তার জন্যে এবং দ্রব্যমূল্যের প্রশ্নে জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মুনাফার উপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে।

(চ) আভ্যন্তরীণ খাদ্য ও পাট ব্যবসা এবং সমস্ত প্রকারের বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে।

৪। ছাত্র ও শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে

(ক) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করা

হবে। সর্বস্তরে বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী শিক্ষার প্রচলন করা হবে। কারিগরি ও বাস্তবমুখী শিক্ষার প্রাধান্য দেওয়া হবে।

(খ) মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক রাখা হবে। এর পর সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। শ্রমিক, কৃষক ও অল্প আয়ের লোকের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার পরও দশম মান পর্যন্ত সরকারি খরচে শিক্ষা দেওয়া হবে। এদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য সরকারি খরচে উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(গ) উপরোক্ত শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষালয় এবং তার আনুসঙ্গিক যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) বাংলা ভাষার মাধ্যমে যাবতীয় শিক্ষা প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করা হবে।

(ঙ) ধর্মীয় শিক্ষার অবাধ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে।

৫। চিকিৎসা ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে

(ক) চিকিৎসা ব্যবস্থাকে জনসেবা এবং আরোগ্যের চাইতে প্রতিরোধ শ্রেয়তর (Prevention is better than cure) ঐ নীতিদ্বয়ের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হবে।

(খ) নিম্ন আয়ের লোকেরা যাতে সরকারি খরচে উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে তার ব্যবস্থা থাকবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে মাতৃসদন, দাতব্য চিকিৎসালয়, আরোগ্য নিকেতন ও জটিল রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র চালু রাখা হবে। বিনা চিকিৎসায় একজন লোকও যাতে মারা না যায় তার ব্যবস্থা থাকবে।

(গ) এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী ও হেকিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যথাযোগ্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকবে।

(ঘ) সকল মানুষের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, ততদিন পর্যন্ত স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ কম মূল্যে (Subsidised price) সরবরাহ করা হবে। শহর, শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্রে স্বল্প ভাড়ায় ঘর পাবার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬। বিচারব্যবস্থা ও আইন সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রে

(ক) 'জনসাধারণের স্বার্থের জন্যে আইন–আইনের জন্যে জনসাধারণ নহে'–ঐ নীতির ভিত্তিতেই আইন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। বিচার যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, তার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করা হবে।

(খ) বিনাবিচারে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া বা হয়রানী করা হবে না। যে আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি এমন ব্যক্তির উচ্চতর আদালতে আপীল করার অধিকার

থাকবে। অভাবগ্রস্তদের জন্য বিনা খরচে আইনগত সাহায্য ও পরামর্শ লাভের ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) ছোট-খাটো ও প্রাথমিক বিরোধের যাতে শুরুতেই অবসান হয় তার জন্য গণআদালতের ব্যবস্থা থাকবে।

(ঘ) বিচারব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন করা হবে। প্রতিটি বিচারক জনসাধারণ কর্তৃক যথাযথভাবে নির্বাচিত হবে। প্রয়োজনবোধে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংশ্লিষ্ট বিচারককে প্রত্যাহার এবং তদস্থলে নতুন বিচারক নির্বাচিত করতে পারবে।

(ঙ) অন্যায় বিচার বা অসদাচরণের দায়ে যেকোন বিচারককে উচ্চতর আদালতে অভিযুক্ত করা যাবে।

৭। ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে

(ক) রাষ্ট্র পরিপূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে। যার যার ধর্ম তার তার কাছে পবিত্র এবং ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ জবরদস্তি নেই–ধর্ম প্রসংগে এ নীতি কড়াকড়িভাবে কার্যকরী হবে। ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ যাতে না ঘটতে পারে– তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হবে; অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার সুযোগ পাবে। রাষ্ট্রে প্রত্যেক ধর্মের স্বীকৃতি ও ধর্মপালকদের অবাধ অধিকার থাকবে। কিন্তু, ধর্মের নামে কোন প্রকারের জোরজুলুম করা বা শোষণ চলতে দেওয়া হবে না।

(খ) বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংস্কৃতি বা তমদ্দুনের ভিত্তি হবে :

(১) বাঙালি জাতির সংস্কৃতির বিকাশ ও তার উন্নয়ন সাধন করা;

(২) সংস্কৃতি ও সাহিত্যে মেহনতি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করা;

(৩) গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রের মূলনীতি বা আদর্শ বিরোধী যাবতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রকাশ, প্রচার ও প্রসার রোধ করা;

(৪) কুরুচিপূর্ণ যাবতীয় গান, বাজনা, সিনেমা, থিয়েটার, শিল্পকলা ইত্যাদি তথাকথিত শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর কঠোর বাধানিষেধ আরোপ করা;

(৫) জনগণের সর্বস্তরে সুন্দর সুষ্ঠু স্বাভাবিক মননশীলতা ও মানসিকতা যাতে গড়ে উঠে তার জন্য এবং শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮। খাজনা, ট্যাক্স ও করের ক্ষেত্রে

(ক) সকল প্রকারের ইজারাদারীসহ প্রচলিত খাজনা প্রথার বিলোপ সাধন করা হবে। সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করা হবে। 'খাজনা প্রথার স্থলে উৎপাদন-অনুসারে কর আদায়ের প্রথা' প্রবর্তন করা হবে। নিম্ন আয়ের কৃষক ও গরিব কুটির শিল্পীদের – যাদের ভরণ-পোষণের পর উদ্বৃত্ত থাকে না– উৎপাদন কর থেকে রেহাই দেওয়া হবে।

(খ) শিল্প কৃষি ও ব্যবস্থা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমিক উচ্চহারের কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে, অর্থাৎ উচ্চ আয়ের জন্যে উচ্চতর হার এবং নিম্ন আয়ের জন্য নিম্নতর হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে এবং পরোক্ষ ট্যাক্স প্রথার বিলোপ করা হবে।

৯। নারী সমাজের ক্ষেত্রে

(ক) নারীরা যে সমস্ত সামাজিক অব্যবস্থা বা দুর্নীতির দরুন যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিতা ও নিগৃহীতা হয়ে আসছে সেগুলোর অবসান ঘটানো হবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, বৃত্তি গ্রহণসহ [সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হবে।]

(খ) নর ও নারীর সমান অধিকার থাকবে। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান মজুরির ব্যবস্থা রাখা হবে। গর্ভাবস্থায় সংকটকালীন সময়ে মেহনতকারী নারীকে সর্বোত্তম প্রয়োজনীয় ছুটি ও বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হবে।

১০। উপজাতি ও তপসিলীদের ক্ষেত্রে

(ক) বাংলাদেশে যে সমস্ত অনুন্নত উপজাতি আছে তাদের মাতৃভাষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়ন করা হবে।

(খ) চাকুরি এবং অন্যান্য সামাজিক ও শিক্ষাগত সুযোগের ক্ষেত্রে উপজাতি, তপসিলী ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

১১। রাষ্ট্র কাঠামো ও সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রে

(ক) বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা হবে এক কক্ষবিশিষ্ট। ঐ আইনসভা হবে– জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের স্বার্থের রক্ষক ও জনগণের মধ্য থেকে আসা–গণপ্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ সংস্থা।

(খ) বিপ্লবের তিন শত্রু বা তাদের সাহায্যকারী দালালদের কোনরূপ নাগরিক অধিকার বা ভোটাধিকার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে না। ঐ নির্দিষ্ট সময়ে সরকারি শাসন বা প্রশাসন ব্যবস্থায় তাদেরকে কোনরূপ অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তারা যাতে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন করে নতুন সমাজের নতুন মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে– তার জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জেল-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে অপরাধীদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধন করে তাদের পুনর্বাসন [করা হবে।]

(ঘ) পার্লামেন্ট, আইনসভা বা স্থানীয় শাসন বা প্রশাসন সংস্থাগুলোর নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে যারা আঠার বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের এবং মানসিক সুস্থ অবস্থায় আছেন–নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সকলেরই সর্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার থাকবে। সংশ্লিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রয়োজনবোধে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার (Recall) করতে এবং নতুন প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবে। গোপন ব্যালট প্রথাতে ভোটদান ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

(ঙ) দেশে ব্যাপক গণপঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় গণপঞ্চায়েতের প্রাধান্য থাকবে।

(চ) সর্বনিম্ন প্রশাসক থেকে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকল সরকারি প্রশাসক ও পরিচালক

জনসাধারণের গোপন সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে। প্রথমত, স্থানীয় জনসাধারণ থেকেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসক বা পরিচালক নির্বাচিত করা হবে। নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রয়োজনবোধে উপরোক্ত যেকোন প্রশাসক বা পরিচালককে প্রত্যাহার করে নতুন প্রশাসক বা পরিচালক নির্বাচিত করতে পারবে।

(ছ) যেকোন প্রশাসক বা পরিচালকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

(জ) দেশের সামরিক, আধা-সামরিক বা প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনীর সর্বত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকবে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও তাদের ভোটাধিকার থাকবে। আমাদের দেশের সামরিক বাহিনী এযাবত যে দাসত্বমূলক অবস্থায় বা মৌলিক অধিকারবিহীন অবস্থায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়ে এসেছে, তার থেকে তাদের মুক্ত করা হবে। তাদের দেশপ্রেমকে আরও উন্নত করার জন্য এবং গণতন্ত্রের ভাবধারায় তাদের আরও উদ্বুদ্ধ করার জন্য যথাযথ সরকারি প্রচেষ্টা থাকবে।

(ঝ) দেশরক্ষার কাজে যাতে দেশের সমস্ত নাগরিক বিশেষ করে [মুক্তিযোদ্ধারা অংশ নিতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে।]

(ঞ) বিপ্লবে অংশগ্রহণের কারণে যারা পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ ও শহীদ হয়েছেন বা হবেন যথাক্রমে তাদের বা তাদের পরিবারের উপযুক্ত ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সরকার বহন করবে।

(ট) বিপ্লবে জড়িত থাকার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের প্রতিটি অংশকে পুনর্বাসন করা হবে। বিপ্লব চলাকালে পূর্ব বাংলার যে সকল অধিবাসী দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে তাদের সম্পত্তি ফেরত পাবার ও তাদের পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবে।

১২। বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে

(ক) বিশ্বের ধনবাদী-সাম্রাজ্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক এ দুই শিবিরের মধ্যে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার নিঃসন্দেহে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষেই থাকবে।

(খ) বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিভিন্ন নিপীড়িত জাতির বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তির ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে থাকবে এবং সামর্থ্য অনুসারে ঐ সমস্ত জাতিকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবে।

(গ) বিশ্ব সর্বহারার সমর্থনে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হবে। প্রত্যেক জাতির নিপীড়িত জনসাধারণের সাথে আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের নীতি সরকার গ্রহণ করবে।

(ঘ) গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিবেশীদের সঙ্গে যথা: ভারত, বার্মা, নেপাল, সিংহল ও মহাচীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে চলবে এবং এ রাষ্ট্রে বিশ্বের বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার সাথে পঞ্চশীলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করে চলবে।

[১৯৭১ সালের ৩০ ও ৩১ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে (দ্বিতীয় বিশেষ) গৃহীত রাজনৈতিক দলিলের ভিত্তিতে রচিত]

ইন্দিরা গান্ধী জবাব দেবেন কি?*

১। আপনার সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী। কিন্তু মিত্রবাহিনী কিভাবে পাক-সামরিক ফ্যাসিষ্টদের কয়েক শত কোটি টাকার অস্ত্র-যুদ্ধ সরঞ্জাম ভারতে নিয়ে গেল, পূর্ব বাংলার লুপ্ত কলকারখানা–তার খুচরো অংশ, গাড়ি, উৎপাদিত পণ্য, পাট, চা, চামড়া, স্বর্ণ, রৌপ্য ভারতে পাচার করলো?

আপনি আপনার দখলদার বাহিনী প্রত্যাহার করার কথা বলে জনগণকে ভাঁওতা দিচ্ছেন। আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বাঙালিদের দ্বারা আপনার উপনিবেশ পাহারা দেওয়া, বাঙালিদের দ্বারা বাঙালি দমন করা। এছাড়া অসংখ্য ভারতীয় দখলদার সৈন্য আপনি সাদা পোশাকে এবং বাংলাদেশ বাহিনী ও বাংলাদেশ রাইফেলের ইউনিফর্মে পূর্ব বাংলায় রেখেছেন। আপনার সৈন্য প্রত্যাহারের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

২। আপনি নিজেকে মুক্তি সংগ্রামের বন্ধু বলে জাহির করেন। কিন্তু নাগা, মিজো, কাশ্মিরী, শিখদের মুক্তি সংগ্রামকে কেন ফ্যাসিবাদী উপায়ে দমন করছেন?

ইহা কি প্রমাণ করে না আপনি বিশেষ উদ্দেশ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের সহায়তার বেশ ধরেছেন? এ উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলায় আপনার উপনিবেশ স্থাপন, আপনার হারানো পশ্চাৎভূমি পুনরুদ্ধার, পূর্ব বাংলা শোষণ ও লুণ্ঠন করে আপনার আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট হ্রাস করা, চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করার ঘাঁটি স্থাপন করা।

৩। আপনি মিত্রের বেশে পূর্ব বাংলার মাছ-মাংস-ডিম, তরি-তরকারি, ধান-চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য; পাট, চা, চামড়া ও অন্যান্য কাঁচামাল; শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রশাসন, দেশরক্ষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে কি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে শোষণ ও লুণ্ঠন করছেন, পূর্ব বাংলায় আপনার উপনিবেশ কায়েম করেছেন।

এ উপনিবেশ কায়েমের জন্য আপনি পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিকদের কামানের খোরাক হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

যে সকল দেশপ্রেমিক বিশেষ করে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির কর্মী, যারা আপনার গোলাম হতে রাজি হয়নি তাদেরকে 'নকসাল' অভিহিত করে আপনি খতম করিয়েছেন। এভাবে পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিকদের রক্তে আপনি হাত কলঙ্কিত করেছেন।

এতদিন আপনি এ শোষণ ও লুণ্ঠন গোপন চুক্তির মাধ্যমে করেছেন। বর্তমানে ২৫ বৎসরের শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির নামে আপনার তাঁবেদার বাংলাদেশ পুতুল সরকার প্রকাশ্যে আপনাকে বাঙালি জাতির দাসখত লিখে দিয়েছে এবং আপনার শোষণ লুণ্ঠন ন্যায়সঙ্গত করেছে।

আপনার ও আপনার তাঁবেদারদের শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে পূর্ব বাংলায় ৭০-৮০ টাকা

---

* প্রচারপত্র, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, মার্চ–১৯৭২ সংশোধিত ও পুনর্মুদ্রিত

মণ হয়েছে চাল, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য হয়েছে অগ্নিমূল্য। অনাহার– অর্ধাহার ও বেকারের হাহাকার উঠেছে পূর্ব বাংলায়। পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। না-খেয়ে লোক মরছে। পূর্ব বাংলার জন্য আপনার দরদ উছলে পড়েছে, চাল ও অন্যান্য সাহায্য দ্রব্য পূর্ব বাংলায় পাঠাবার কথা বলে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কতগুণ বেশি লুটে নিচ্ছেন তাতো বলেন না। এর ফলেই আজ ভারতে চাল ও খাদ্যদ্রব্যের দাম কমছে।

এভাবে ভারতের অর্থনৈতিক সংকট আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে আপনি উদ্ধার পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

৪। আপনি গণতন্ত্রের কথা বলেন। কিন্তু আপনার দেশে কি আপনি সামরিক বাহিনী, রিজার্ভ পুলিশ, পুলিশ, সশস্ত্র যুব কংগ্রেসের পাণ্ডাদের মাধ্যমে ফ্যাসিষ্ট শাসন চালাচ্ছেন না? "নকসাল" অভিহিত করে শত সহস্র জনগণকে হত্যা করছেন, পাক-সামরিক ফ্যাসিষ্টদের সাথে আপনার নির্যাতনের কোন পার্থক্য আছে কি?

৫। আপনি গলাবাজি করে বেড়ান আপনি ধর্মনিরপেক্ষ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের তাঁবেদার কংগ্রেস হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-জোতদার, পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীরা যদি পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন না-চালাতো তবে কি পূর্ব বাংলার জনগণ পৃথক ভূ-খণ্ড দাবি করতো? তারা এ কারণেই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সমর্থন করেছে।

১৯৪৭ এর পরে ভারতে মুসলিম-বিরোধী কয়েকশ রায়ট হয়েছে। অবাংঙালি মুসলমান, কলিকাতা, আসাম-ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাংঙালি মুসলমান জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাদেরকে বলপূর্বক কপর্দকহীন অবস্থায় পূর্ব বাংলায় ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা ১৯৪৭ সালে ভারতে গিয়েছিল তাদেরকে আপনি শরণার্থীর বেশে পূর্ব বাংলায় পাঠাচ্ছেন, আপনার পুতুল সরকারের মাধ্যমে তাদের ভূ-সম্পত্তি ফেরত দেওয়াচ্ছেন।

কিন্তু ভারত থেকে বিতাড়িত বিহারী এবং বাঙালি জনগণকে আপনি তাদের জন্মস্থান ভারতে ফেরত নিতে, তাদের সম্পত্তি ফেরত দিয়ে তাদেরকে পুনর্বাসন করতে কেন রাজি হচ্ছেন না? আপনি আফ্রিকা, বার্মা, সিংহল থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ফেরত দিয়েছেন। কিন্তু ভারত থেকে বিতাড়িত বাঙালি মুসলমানদের ফেরত না-নিয়ে আপনি কি প্রমাণ করছেন না যে 'মুসলিম' এ কারণে তাদেরকে ফেরত নিচ্ছেন না? ইহা প্রমাণ করে আপনি সাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ নন। আপনার ধর্মনিরপেক্ষতার বুলির উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলায় আপনার উপনিবেশ বজায় রাখার পথে মুসলিম ধর্মের বাধা দূর করা এবং ধর্মীয় নিপীড়ন চালানো।

৬। আপনি 'সমাজতন্ত্র' 'গরিবী হটাও' বুলি কপচাচ্ছেন। এটা কি জনগণকে ভাঁওতা দেওয়া ছাড়া আর কিছু? সমাজতন্ত্রের নামে ভারতে চলছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এ চার পাহাড়ের নির্মম শোষণ ও লুণ্ঠন। এর ফলে জনগণ অকল্পনীয় খারাপ অবস্থায় পতিত হয়েছে।

আপনার ‘গরিবী হটাও’ “সমাজতন্ত্রের” বুলির ভাঁওতা ঢাকার জন্য অন্যদেশ শোষণ ও লুণ্ঠন করে চরম অর্থনৈতিক সংকট কাটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

অতীতে জাপানি ফ্যাসিষ্টরা “এশিয়ায় সহ উন্নত অঞ্চলের” বুলিকে এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের দখলকৃত এলাকায় তথাকথিত স্বাধীন পুতুল সরকার বসায়।

আপনিও জাপানি ফ্যাসিষ্টদের কবরে যাওয়ার পদচিহ্ন বেয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আপনার সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করছেন।

পূর্ব বাংলার জাতীয় সমস্যার সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ব বাংলার ছয় পাহাড়ের দালাল মীরজাফরদের সহায়তায় পূর্ব বাংলা দখল করে এখানে উপনিবেশ কায়েম করেছেন, মীরজাফরদের নিয়ে পুতুল সরকার কায়েম করেছেন।

কিন্তু এখানেই আপনার অভিলাষ শেষ নয়। আপনি নেহেরুর ‘ভারত আবিষ্কার’ অনুসরণ করে দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরে রাজত্ব বিস্তার করার রঙিন স্বপ্ন দেখছেন। আপনার এই সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষায় সহায়তা করছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী নয়া জার ব্রেজনেভ-কোসিগিন বিশ্বাসঘাতক চক্র।

হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ তার পরাজয়ের সূচনা করে, জাপানি ফ্যাসিষ্টদের চীন আক্রমণ তার পরাজয়ের সূচনা করে, একইভাবে আপনার ঢাকা দখল বিজয়ের পদক্ষেপ নয়, আপনার চূড়ান্ত কবরে যাওয়ার পদক্ষেপ মাত্র।

আপনার ও আপনার তাঁবেদারদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণ ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করছেন। পূর্ব বাংলার বীর জনগণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পূর্ব-বাংলার ছয় পাহাড়ের দালাল মীরজাফরদের চূড়ান্তভাবে কবরস্ত করে পূর্ব বাংলার সত্যিকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি– জিন্দাবাদ।

কমরেড সিরাজ সিকদার– জিন্দাবাদ।

নোট : ছয় পাহাড়ের দালাল সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ এবং পূর্ববাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ এই ছয় পাহাড়ের প্রতিনিধি, আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থী ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সংগঠনসমূহ।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোন, আত্মবলিদানে নির্ভয় হোন, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বিজয় অর্জন করুন : মাও সেতুং

গ্রামে গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ গড়ে তুলুন!

শেখ মুজিব ও তার সাগরেদদের চক্রান্ত খতম করুন!

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ নিপাত যাক!

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!

ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ

গতকাল রোববার ঢাকায় ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদের যুক্ত ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ। যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমন্ত্রণক্রমে ভারতের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৭ই মার্চ থেকে ১৯শে মার্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত ঢাকা সফর করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং, পরিকল্পনা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক এস চক্রবর্তী প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব শ্রী পি এন কাউল, প্রধানমন্ত্রীর সচিব শ্রী পি এন ধর এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন এবং তাঁকে এক নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হয়। এসব উপলক্ষে বাংলাদেশের মানুষ তাঁর প্রতি যে প্রীতি ও আন্তরিকতা প্রকাশ করে, তা ভারত ও বাংলাদেশের জনসাধারণের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যসূচক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাবের পরিচায়ক।

২। এই সফরকালে উভয় প্রধানমন্ত্রী পারস্পরিক স্বার্থসম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শরণ সিং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে পৃথকভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

৩। এই সফরের সুযোগে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ে দুই দেশের সম্পর্কের সকল দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ ও ভারত এশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলির দরুন যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ের আলোচনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব রুহুল কুদ্দুস, পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জানাব এস এ এম এস কিবরিয়া, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. এ আর মল্লিক, আইন সচিব বিচারপতি মুনিম এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের জনাব নূরুল ইসলাম।

৪। অর্থনৈতিক বিষয়াদির আলোচনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন পরিকল্পনা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান ড. নূরুল ইসলাম, সদস্য ড. মোশাররফ হোসেন এবং অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অর্থ সচিব জনাব মতিউল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ের উপদেষ্টা জনাব বি এম আব্বাস, বাণিজ্য সচিব জনাব নূর মোহাম্মদ, পরিবহন সচিব জনাব এ সামাদ, বিদ্যুৎ ও সেচ দফতরের সচিব জনাব আল-হুসেইনী প্রমুখ।

৫। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের বীর সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে পাকিস্তানের অত্যাচারী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাবার জন্যে অকুতোভয় মুক্তিবাহিনীর সকল শ্রেণীর যোদ্ধার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে তারা চরম ত্যাগ স্বীকার করে। বাংলাদেশে স্বল্পকালীন অবস্থানের সময় তাঁরা যেরূপ সদাচরণ করে তিনি তার প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্য শেষ হয়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই তাদের শেষ দলটির সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

৬। এশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করবার সময় উভয় প্রধানমন্ত্রীই এই অঞ্চলের দেশগুলোর নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও আঞ্চলিক সংহতির জন্য বিপদজনক শক্তিসমূহের উল্লেখ করেন। তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে এসব শক্তি প্রতিরোধ করবার কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন। উভয় প্রধানমন্ত্রীই আস্থা প্রকাশ করেন যে স্বার্থবাদী রাষ্ট্রসমূহ ইতিহাসের গতিধারা বিপরীত দিকে প্রবাহিত করার যে প্রয়াস পাচ্ছে, ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক তা সার্থকভাবে প্রতিহত করবে।

৭। এই প্রসঙ্গে উভয় প্রধানমন্ত্রীই জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে বলেন যে জাতীয় স্থিতিশীলতা ও স্বাধীনতাকে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির শক্তিসমূহকে জোরদার করবার কাজে জোটনিরপেক্ষতা একটি প্রত্যক্ষ ও গঠনমূলক ভূমিকা নিয়েছে।

৮। ভারত ও বাংলাদেশের মতামত, আদর্শ ও স্বার্থের সামঞ্জস্যকে বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্যে উভয় প্রধানমন্ত্রীই বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা এবং শান্তির জন্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৯। উভয় প্রধানমন্ত্রী আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে দুই দেশের সহযোগিতা জোরদার করবার জন্যে উভয় সরকারের পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা দফতর, পরিকল্পনা পরিষদ এবং অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও কারিগরি বিষয়াদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দফতরসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে নিয়মিতভাবে আলাপ-আলোচনা নির্দিষ্ট সময় পর পর, প্রতি ছয় মাসে অন্ততঃপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হবে।

১০। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের বাঙালি জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জোর দিয়ে বলেন যে তাঁদের অবিলম্বে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে তাঁদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সহজতর করবার, বিশেষ করে এ-ব্যাপারে পরিবহনের সুবিধাদির জন্যে সকল প্রকারে সহায়তা করবেন।

১১। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক আচরণের জন্যে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল লোক এবং সরকারি কর্মচারী দায়ী, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাদের বিচার ত্বরান্বিত করবার জন্যে বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত

ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। উভয় প্রধানমন্ত্রীই আশা প্রকাশ করেন যে বিচারের ফলে এই সকল অপরাধী উপযুক্ত শাস্তি পাবে এবং বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার ভয়াবহতা সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে সাম্প্রতিক কালের জঘন্যতম গণহত্যার জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যাপারে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এই সঙ্গে উভয় প্রধানমন্ত্রীই এ বিষয়ে একমত যে গুরুতরভাবে পীড়িত ও আহত যে সকল যুদ্ধবন্দী যুদ্ধাপরাধী নয়, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের পাকিস্তানে ফিরে যেতে দেয়া হবে।

১২। জাতিসংঘ সনদের আদর্শ ও লক্ষ্যসমূহের প্রতি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের ঘোষিত আনুগত্যের আলোকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সভ্যপদ লাভের ব্যাপারে ভারত সরকার পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা দেবে। তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, জাতিসংঘে বাংলাদেশের যোগদান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

১৩। উভয় প্রধানমন্ত্রীই ঘোষণা করছেন যে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সামরিক প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। তাঁরা এই অঞ্চলে স্থল, বিমান ও নৌঘাঁটি স্থাপনের বিরোধিতা করেন। তাঁদের বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্যে ভারত মহাসাগরে নৌচালনের স্বাধীনতা ও সমুদ্রপথ সমূহের নিরাপত্তা বিধানের এটাই একমাত্র উপায়। উভয় প্রধানমন্ত্রীই এই সংকল্প প্রকাশ করছেন যে তাঁরা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে আণবিক অস্ত্র থেকে মুক্ত এলাকায় পরিণত করবার জন্যে চেষ্টা করবেন।

১৪। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের আলোচনাকালে এবং এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীদের আলাপ-আলোচনার সময় অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক সহযোগিতা দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উভয় প্রধানমন্ত্রীই স্থির করছেন যে–

(ক) উভয় দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহের ব্যাপক জরিপ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উভয় দেশের জন্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও সেগুলির বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই দুই দেশের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্থায়ী ভিত্তিতে একটি যুগ্ম নদী পরিষদ গঠন করা হবে।

দুই দেশের জনসাধারণের পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে এতদঞ্চলে জলসম্পদ যাতে ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়, তার জন্যে উভয় দেশের বিশেষজ্ঞগণকে বন্যার পূর্বাহ্নেই বন্যা সম্পর্কে সতর্কীকরণ, বন্যার পূর্বাভাস দান, বড় বড় নদীগুলির বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে সংলগ্ন ভারতীয় এলাকাসমূহের সংযোগ সাধনের সম্ভাব্যতা

পরীক্ষার জন্যে উভয় দেশের বিশেষজ্ঞদের বিস্তারিত প্রস্তাবাদি প্রণয়ন করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

(খ) বাংলাদেশকে ইতিমধ্যেই যে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যৎ সাহায্যের যে আশ্বাস পাওয়া গেছে, তার জন্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট কৃতজ্ঞতা জানান। অর্থনৈতিক সহায়তা দান কর্মসূচীর অধীনে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, উভয় প্রধানমন্ত্রীই তার পর্যালোচনা করেন এবং স্বীকার করেন যে বাংলাদেশের পুনর্বাসন কর্মসূচির জরুরী অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দরুন এই সকল দ্রব্যের সরবরাহ ত্বরান্বিত করবার প্রয়োজন রয়েছে।

(গ) উভয় প্রধানমন্ত্রীই নিজ নিজ দেশের মধ্য দিয়ে অপর দেশে বাণিজ্য চালানোর ব্যবস্থা এবং সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তির পুনরুজ্জীবনের নীতি অনুমোদন করেন। তাঁরা নির্দেশ দেন যে এই সমস্ত চুক্তিসহ সাধারণ বাণিজ্য ও মূল্য পরিশোধ চুক্তিসমূহ ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে সম্পাদন করতে হবে।

১৫। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে উভয় প্রধানমন্ত্রীই নির্দেশ দিচ্ছেন যে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও তথ্য বিনিময় করবেন,

(ক) আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার,

(খ) শিল্পোন্নয়নের জন্যে কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল,

(গ) সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ভবিষ্যতের মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল ব্যবহার।

১৬। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে, উভয় প্রধানমন্ত্রীই সে বিষয়ে সচেতন এবং এজন্যে তারা স্থির করছেন যে দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করবার জন্যে উভয় সরকারের উপযুক্ত সংস্থা বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তারা আরও নির্দেশ দিচ্ছেন যে উভয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতার জন্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আলাপ-আলোচনা করবেন।

১৭। ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের আলাপ-আলোচনায় যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং যে সমস্ত বাস্তব ফল পাওয়া গেছে, তাতে উভয়ই গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, এই সমস্ত সমঝোতা ও চুক্তি দুই দেশের জনসাধারণের পারস্পরিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার সুষ্ঠু ও স্থায়ী ভিত্তি গড়ে তুলবে।

১৮। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের

সরকার এবং জনসাধারণ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরকালে তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের প্রতি যে আতিথেয়তা, প্রীতি ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছেন, তিনি তার জন্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে বহুবিধ কার্যের ব্যস্ততার মধ্যেও বাংলাদেশ সফরের সময় করে নিয়েছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তার জন্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৯। উভয় প্রধানমন্ত্রীই দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাতৃত্বের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং দুই দেশের জনগণের ত্যাগের ফলে দৃঢ় হয়, তা দৃঢ়তর হতে থাকবে এবং কালক্রমে এশিয়া তথা বিশ্বে শান্তি ও প্রগতির শক্তিসমূহ জোরদার করবার ব্যাপারে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হবে।

(শেখ মুজিবুর রহমান)
প্রধানমন্ত্রী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

(ইন্দিরা গান্ধী)
প্রধানমন্ত্রী
ভারতীয় সাধারণতন্ত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তিচুক্তি*

শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য একযোগে সংগ্রাম এবং রক্তদান ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার ফলশ্রুতি হিসেবে মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় অভ্যুদয় ঘটিয়ে,

সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সৎপ্রতিবেশিসুলভ সম্পর্ক রক্ষায় এবং উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তকে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের সীমান্ত হিসেবে রূপান্তরিত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকে, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান প্রদর্শনের মূলনীতিসমূহের প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল থেকে,

শান্তি, স্থিতিশলিতা ও নিরপাত্তা রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং সম্ভাব্য সকল প্রকারের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্ব স্ব দেশের অগ্রগতি সাধনের জন্য,

উভয় দেশের মধ্যেকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণ ও জোরদার করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে,

এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের স্থায়ী শান্তির স্বার্থে এবং উভয় রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার আরো সম্প্রসারণের ব্যাপারে স্থিরবিশ্বাসী হয়ে,

বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদের অবশেষসমূহ চূড়ান্তভাবে নির্মূল করার জন্য প্রচেষ্টা নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে,

আজকের বিশ্বে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধান শুধুমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব, বৈরীনীতি ও সংঘাতের মাধ্যমে নয়, এ ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত হয়ে,

জাতিসংঘ সনদের নীতিমালা ও লক্ষ্য সমূহের অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনরুল্লেখ করে এক পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, অন্যপক্ষে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বর্তমান চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুচ্ছেদ এক

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ, স্ব স্ব দেশের জনগণ যে আদর্শের জন্য একযোগে

---

* দৈনিক বাংলা ২০ মার্চ ১৯৭২

সংগ্রাম এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে উভয়দেশ এবং সেখানকার জনগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্ব বজায় থাকবে। একে-অন্যের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে। চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন উভয় পক্ষ উপরে উল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে এবং সমতা ও পারস্পরিক লাভজনক নীতিসমূহের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যেকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ, সুপ্রতিবেশিসুলভ ও সার্বিক সহযোগিতার সম্পর্কের আরো উন্নয়ন ও জোরদার করবে।

অনুচ্ছেদ দুই

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি সমতার নীতিতে আস্থাশীল থাকার আদর্শে পরিচালিত হয়েই চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ সর্বপ্রকারের ও ধরনের উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের নিন্দা করছে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা পুনরুল্লেখ করছে।

চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন উভয় পক্ষ উপরোক্ত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করবে এবং উপনিবেশবাদ – বর্ণবৈষম্য বিরোধী সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে জনগণের ন্যায়সংগত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন দান করবে।

অনুচ্ছেদ তিন

চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা জোরদার করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জোট নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতির প্রতি তাদের আস্থার পুনরুল্লেখ করছে।

অনুচ্ছেদ চার

উভয় দেশের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ সকল স্তরে বৈঠক ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ পাঁচ

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধাজনক ও সার্বিক সহযোগিতা জোরদার ও সম্প্রসারিত করে যাবে। উভয় দেশ সমতা ও পারস্পরিক সুবিধার নীতির ভিত্তিতে এবং সর্বাধিক সুবিধা দানের নীতি অনুযায়ী (most favored nation policy) বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রমাণিত করবে।

অনুচ্ছেদ ছয়

বন্যানিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং জলবিদ্যুৎ শক্তি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা ও যৌথ কার্যক্রম গ্রহণে চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ একমত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ সাত

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে সম্পর্ক প্রসারিত করবে।

অনুচ্ছেদ আট

দুইটি দেশের মধ্যেকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষের প্রত্যেকে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, তারা একে-অন্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না বা অংশগ্রহণ করবে না।

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ একে অন্যের উপর আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত থাকবে এবং তাদের এলাকায় এমন কোন কাজ করতে দেবে না যা চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কোন পক্ষের সামরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে বা কোন পক্ষের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনুচ্ছেদ নয়

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চুক্তিকারী প্রত্যেকে এতদ্‌উল্লেখিত তৃতীয় পক্ষকে যে কোন প্রকার সাহায্য প্রদানে বিরত থাকবে। এছাড়া যে-কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হবার ভীতি দেখা দিলে এই ধরনের ভীতি নিশ্চিহ্ন করবার উদ্দেশ্যে যথাযথ সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনায় মিলিত হয়ে নিজেদের দেশের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং শান্তি স্থাপন সুনিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ দশ

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষের প্রত্যেকে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, এই চুক্তির সঙ্গে অসামঞ্জস্য হতে পারে, এ ধরনের গোপন অথবা প্রকাশ্যে এক অথবা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন প্রকার অঙ্গীকার করবে না।

অনুচ্ছেদ এগারো

এই চুক্তি পঁচিশ বছরের মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হলো এবং চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন

উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অত্র চুক্তি সহি হবার দিন থেকে কার্যকরী হবে।

অনুচ্ছেদ বারো

এই চুক্তির কোন একটি অথবা একাধিক অনুচ্ছেদের বাস্তব অর্থ করবার সময় চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মত-পার্থক্য দেখা দিলে তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সমঝোতার মনোভাবের উপর ভিত্তি করে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় নিষ্পত্তি করতে হবে।

ঢাকায় সম্পাদিত। তারিখ উনিশে মার্চ, উনিশ শো বাহাত্তর সাল।

(শেখ মুজিবুর রহমান)
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে

(ইন্দিরা গান্ধী)
প্রধানমন্ত্রী
ভারত সাধারণতন্ত্রের পক্ষে

“ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ও রক্ষা চুক্তি” নামধারী* দাসত্বমূলক চুক্তিটির কবর রচনা করুন

মুক্তিকামী ভাই ও বোনেরা,
আমাদের জীবনের সব চাইতে মূল্যবান সম্পদ স্বাধীনতা থেকে আজ আমরা বঞ্চিত। দুইশত বছর আগে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর জগৎ শেঠরা গদীতে বসার লোভে আমাদের দেশকে ইংরেজ দস্যুদের হাতে তুলে দিয়েছিলো। দুই শত বৎসর পর সেই মীর জাফরদের বংশধর শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, মণি সিং, মোজাফফররা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রাশিয়া ও ভারতের বেনিয়াদের নিকট বেঁচে দিয়েছে। এই নতুন মীরজাফরেরা ৭টি গোপন চুক্তি এবং একটি প্রকাশ্য চুক্তির মাধ্যমে যেরূপ হীন দাসত্বের সনদে স্বাক্ষর দান করেছে, তারা আমাদের প্রতি ও দেশের প্রতি যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অতীতে মীরজাফররাও এতখানি করেনি।

ভারতে থাকাকালে দেশদ্রোহী তাজউদ্দিন নজরুল সাহেবরা ইন্দিরার সাথে যে সাতটি গোলামীর চুক্তি করেন তা দেশবাসীর নিকট তখনও গোপন রাখা হয় এবং এখনও গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু দেশদ্রোহীদের মধ্যেই গুতাগুতির ফলে তার কিছু কিছু তথ্য আজ ফাঁস হয়ে গেছে। ঐ গোপন সাতটি গোলামী চুক্তির কিছু কিছু শর্ত প্রকাশ্যে এনে দেশদ্রোহীদের সর্দার শেখ মুজিব ইন্দিরা দেবীর সাথে অষ্টম চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছেন। আর এই হীন দাসত্বমূলক চুক্তিটির নাম দেওয়া হয়েছে “ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী, শান্তি ও রক্ষা চুক্তি।”

গোপন সাতটি চুক্তি
দেশদ্রোহী তাজউদ্দিন-নজরুল সাহেবেরা ভারতে থাকাকালে ইন্দিরা দেবীর সাথে গোপনে যে সাতটি গোলামীর চুক্তি স্বাক্ষর করেন সেগুলি হচ্ছে :

(১) ভারতীয় সৈন্যরা যে কোন সংখ্যায় ও যে কোন সময় আমাদের দেশের ভিতরে ঢুকতে পারবে এবং বাধাদানকারী যে কোন মহলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে।

(২) ভারত সরকার তার ইচ্ছামত ও পছন্দসই লোক দিয়ে ও তার সামরিক অফিসারদের কর্তৃত্বে আমাদের দেশে তার একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবে এই বাহিনীর উপর “বাংলাদেশ” সরকার- এর কোন কর্তৃত্ব থাকবে না; দেশবাসীর চোখে ধুলা দেওয়ার জন্য একে আধা সামরিক বাহিনী বলা হলেও আসলে এই বাহিনী অস্ত্রসজ্জা ও

---

* মোঃ তোয়াহা কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশের তারিখ নেই, আনুমানিক ১৯৭৩; কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী–লেনিনবাদী) পূর্ববাংলা

সংখ্যার দিক থেকে মূল সামরিক বাহিনীর তুলনায় হবে অধিকতর শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশের কাছ থেকে "বাংলাদেশ" অস্ত্র কিনতে পারবে না। অস্ত্রের দাম ভারত সরকারই ঠিক করে দেবে। কোন ভারী অস্ত্র, সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্যাংক ইত্যাদি দেওয়া হবে না। সামরিক ট্রেনিং নিতে হবে ভারত ও রাশিয়ার কাছ থেকে।

(৪) "বাংলাদেশ' এর পররাষ্ট্র নীতি ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতির অনুবর্তী হতে হবে।

(৫) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ভারত সরকারে হুকুমমত চলতে হবে। "বাংলাদেশ" এর বাৎসরিক বাজেট ও অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি ভারত সরকারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(৬) "বাংলাদেশ" এর বহির্বাণিজ্য ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ভারত সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা যাবে না। কোন পণ্য কত দরে বাইরে রপ্তানি করতে হবে ভারত সরকার সেই দর বেঁধে দেবে। এইসব পণ্য ভারত সরকার নিজে কিনতে চাইলে "বাংলাদেশ সরকার" আর কারো সাথে সেই পণ্য বিক্রির কথা আলোচনা করতে পারবে না। "বাংলাদেশ" এর আমদানী তালিকা ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(৭) উপরোক্ত চুক্তিগুলি "বাংলাদেশ সরকার' এক তরফাভাবে অস্বীকার করতে পারবে না। ভারত সরকার অস্বীকার না-করলে বছরের পর বছর এ চুক্তিগুলি বলবৎ থাকবে।

শেখ মুজিব প্রকাশ্যে স্বাক্ষর করলেন অষ্টম চুক্তি

তাজউদ্দিনের পর শেখ মুজিব রাশিয়া ও ভারতের আশ্রিত সরকারের সুবেদারী নিয়ে গোপন সাতটি চুক্তি বহাল রেখে তার কয়েকটি ধারা প্রকাশ্যে এনে ভাল ভাল কথার আবরণে অষ্টম চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। এই "ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী, শান্তি ও রক্ষা চুক্তিটির" অষ্টম, নবম, দশম ধারায় বলা হয়েছে :

(১) "ভারত ও বাংলাদেশ সরকার তাঁদের এলাকায় এমন কোন কাজ করতে দেবে না, যা চুক্তিকারী.......কোন পক্ষের সামরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে বা কোন পক্ষের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।"

(২) উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চুক্তিকারী প্রত্যেকে তৃতীয় পক্ষকে কোন প্রকারে সাহায্য প্রদানে বিরত থাকবে। এ ছাড়া কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হবার ভীতি দেখা দিলে এই ধরনের ভীতি নিশ্চিহ্ন করবার উদ্দেশ্যে যথাযথ সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চুক্তিকারী...উভয় পক্ষ সংগে সংগে পারস্পরিক আলোচনায় মিলিত হয়ে নিজেদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং শান্তি স্থাপন সুনিশ্চিত করবে।"

দাসত্বমূলক চুক্তিগুলির বিষময় ফল

এই দাসত্বমূলক চুক্তিগুলির ফলে আমরা আমাদের সব চাইতে মূল্যবান সম্পদ স্বাধীনতাকে হারিয়েছি। আমরা হারিয়েছি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক, সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা।

এই চুক্তিগুলির ফলেই রাশিয়ার সাহায্যে বলীয়ান হয়ে এবং দেশদ্রোহী তাজউদ্দিন মণি সিংদের সাথে যোগসাজশে ইন্দিরা তার সেনাবাহিনী দিয়ে আমাদের দেশকে জবরদখল করে নিয়েছে; আমাদের দেশকে ভারতের একটি আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করেছে; বন্দুকের জোরে তাদেরই হাতে গড়া শেখ মুজিব তাজউদ্দিনদের পুতুল সরকারকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে; বন্দুকের জোরে এই পুতুল সরকারকে টিকিয়ে রাখছে অন্যদিকে শেখ মুজিব-তাজউদ্দিন প্রভৃতি মীরজাফরদের দল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে গদীতে বসা ও টিকে থাকার উদ্দেশ্যে লিখে দিয়েছে গোলামীর দাসখত।

এই চুক্তিগুলির বলেই ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের দেশে অবাধে ঢুকে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামকে দমন করছে, বিপ্লবী কর্মীদের হত্যা করেছে। যেমন তারা করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, যশোর, ময়মনসিংহ, রংপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায়।

এই চুক্তিগুলির বলেই ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের দেশ জবরদখল করার পর আমাদের দেশ থেকে তিন হাজার কোটি টাকার আধুনিক ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ও সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি ভারতে নিয়ে গেছে।

এই চুক্তিগুলির বলেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে গড়ে তোলা হচ্ছে তথাকথিত “রক্ষী বাহিনী।” ভারতীয় সেনানীমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে তাদের বাছাই করা লোক নিয়ে ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর জলপাই রংয়ের পোষাকে, এই বাহিনীকে গড়ে তোলা হচ্ছে। “বাংলাদেশ” এর মূল সামরিক বাহিনীর তুলনায় এই বাহিনী অধিকতর আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত, এদের বেতনের হারও বেশি। এরা ব্যবহার করে ভারতীয় বাহিনীর গাড়ি। এই বাহিনীর সংখ্যা এখনই প্রায় দশ হাজার। আর এই বাহিনীর ভিতরে গুপ্তভাবে বহু ভারতীয় সৈন্য রয়েছে।

এই চুক্তিগুলির বলেই বর্তমানে সাদা পোষাকে গুপ্তভাবে ৬৫ হাজার ভারতীয় গোয়েন্দা ও সশস্ত্র সৈন্য আমাদের দেশে অবস্থান করছে এবং হাজার হাজার রাশিয়ান সাপগুলিও আমাদের আনাচে-কানাচে ফোঁস ফোঁস করছে।

এই চুক্তিগুলির বলেই “বাংলাদেশ” এর সামরিক অফিসার, পুলিশ অফিসার, গোয়েন্দা অফিসার, উচ্চপদস্থ আমলা প্রভৃতির বর্তমান ট্রেনিং-কেন্দ্র হচ্ছে দিল্লী ও মস্কো।’

এই চুক্তিগুলির বলেই “বাংলাদেশ” এর সামরিক বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, উচ্চপদস্থ আমলা, পুলিশ, সর্বস্তরে প্রধান প্রধান পদে রাশিয়ার ও ভারতের শাসক চক্রের বাছাই করা ও শিক্ষা দেওয়া অতি বিশ্বস্ত দালালদের বসানো হচ্ছে এবং যাঁরা রাশিয়া ও ভারতের প্রভুত্ব মেনে নিতে চাইছেন না সে-সব দেশপ্রেমিক অফিসারদের বরখাস্ত করা হচ্ছে অথবা তাদের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

এই চুক্তিগুলির বলেই, "বাংলাদেশ"-এর শিল্প ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে রাখার জন্য তথাকথিত "জাতীয়করণের" ব্যবস্থা করা হয়েছে, রাশিয়া ও ভারত সরকারের সাথে বিভিন্ন অসম বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে, ভারত সরকারও সাম্রাজ্যবাদীদের তুলনায় চীন অনেক বেশি দরে পাট কেনার প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও সে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি, এবং আমাদের দেশের হয়েছে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি। এই চুক্তিগুলির বলেই ভারতের বেনিয়ারা গত দশমাসে আমাদের দেশ থেকে কমপক্ষে দশ হাজার কোটি টাকার মাল লুট করে নিয়ে গেছে, লুট করে নিয়ে গেছে ধান, চাল, পাট, মাছ, ডিম ও কল-কারখানার যন্ত্রপাতি। এই চুক্তিগুলির বলেই ভারতের বাজে মালে আমাদের দেশ ছেয়ে গেছে, তাও বেশি দরে বিক্রী করা হচ্ছে, অথচ অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে অন্য দেশ থেকে ভাল জিনিস আনা হচ্ছে না। এই চুক্তিগুলির বলেই ভারতীয় জাহাজ কর্পোরেশনের সাথে "বাংলাদেশ সরকার" চুক্তি করেছে যে, ভারতীয় জাহাজ ছাড়া অন্য কোন দেশের জাহাজ দ্বারা বিদেশে মাল পাঠানো ও আনা হবে না।

এই চুক্তিগুলির বলেই "বাংলাদেশ সরকার" এর বাজেট, শাসনতন্ত্র এবং তথাকথিত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির জন্য দিল্লীর অনুমোদন নিতে হচ্ছে।

এই চুক্তিগুলির বলেই "বাংলাদেশ" এর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকেও মস্কো ও দিল্লীর অধীন করে রাখা হয়েছে, শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নেয়া হচ্ছে দিল্লীর অনুমোদন, মস্কো ও দিল্লীর অনুগত দালাল বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির জন্য মস্কো ও দিল্লীতে দলে দলে লোক পাঠানো হচ্ছে।

এই চুক্তিগুলির বলেই স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রকামী দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের উপর চালানো হচ্ছে ফ্যাসিস্ট অত্যাচার। আজ জনগণের নাই কথা বলার স্বাধীনতা, প্রচারের স্বাধীনতা, আন্দোলন ও সংগঠন করার স্বাধীনতা। এই দাসত্বমূলক চুক্তিগুলির বিরুদ্ধে যেই আওয়াজ তুলছে তারই মুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কম তোয়াহার সম্পাদিত "গণশক্তিকে", বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মওলানা ভাসানীর পরিচালিত "হক কথা" কে এবং "মুখপত্র', ইত্যাদি আরও বিভিন্ন পত্রিকাকে।

বর্তমানে আমাদের দেশের সব চাইতে বড় দুশমন রাশিয়া ও ভারতের শাসকচক্র, আর তাদের এদেশী পোষা কুকুরেরা বন্দুকের জোরে এই গোলামীর চুক্তিগুলি আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখেছে এবং বন্দুকের জোরেই এই চুক্তিগুলিকে কার্যকরী করার চেষ্টা করছে। এই গোলামীর চুক্তিগুলিকে কার্যকরী করার জন্যই ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের জোরে আমাদের গোলাম করে রাখতে চাইছে, তারা চাইছে আমাদের দেশকে পদানত করে রাখতে; তারা চাইছে আমাদের দেশের সম্পদ যথেচ্ছভাবে শোষণ ও লুণ্ঠন করতে; তারা চাইছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে গোরস্থানে পরিণত করতে।

এই গোলামীর চুক্তিগুলির বলেই রাশিয়ার দস্যুরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে আমাদের দেশে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘাটি স্থাপনের জন্য। এই উদ্দেশ্যেই দেশদ্রোহী কুকুরেরা চীনের বিরুদ্ধে অবিরাম ঘেউ ঘেউ করছে, চীনকে আমাদের দেশের শত্রু হিসাবে চিত্রিত করছে। এই চুক্তির বলেই চট্টগ্রামে নৌ ঘাঁটি স্থাপনের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরকে রাশিয়ানদের নিকট ইজারা দেওয়া হয়েছে।

দেশপ্রেমিক ভাই বোনেরা, এই গোলামীর চুক্তিগুলি, আমাদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, শান্তি, গণতন্ত্র ও অগ্রগতির পথে সব চাইতে বড় বাধা, সব চাইতে বড় বাধা আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার পথে, আমাদের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে, মর্যাদা নিয়ে মানুষের মত বেচে থাকার পথে।

"ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির" নামাবলী গায়ে দিয়ে ভারত ও "বাংলাদেশ" এর জনগণের দুশমন রাশিয়ার তাঁবেদার ভারত সরকার এবং তাদের পুতুল শেখ মুজিবের সরকার "বাংলাদেশ" ও ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে গঠন করেছে মৈত্রী জোট। "ভারত বাংলাদেশ রক্ষা জোট' গঠনের নাম দিয়ে এই দুশমনেরা তাদের প্রভুত্ব ও শাসন-শোষণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ" ও ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে এবং বিশ্ব বিপ্লবের নেতা চীনের বিরুদ্ধে গঠন করেছে এক সামরিক জোট।

শত্রুদের এই জোটকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া ছাড়া এবং বিদেশী ও দেশী দুশমনদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে দেশপ্রেমিক জনগণের শাসন কায়েম ছাড়া আমাদের বাঁচার আর কোন পথ নাই।

কমরেডগণ ও বন্ধুগণ, আজ আমরা জীবন মরণ প্রশ্নের সম্মুখীন। বেঈমান মুজিব, তাজউদ্দিন, মণি সিং মোজাফফররা স্বাধীনতার ধোঁকা দিয়ে আমাদের গলায় পরিয়ে দিয়েছে গোলামীর শিকল। এই শিকল ছিড়ে না-ফেললে দেশ বাঁচবে না, আমরা বাঁচব না।

আজ আমাদের সামনে রয়েছে দুটি পথ। একটি পথ হলো গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ থেকে শোষিত, লুণ্ঠিত ও অত্যাচারিত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করা। আর একটি পথ হলো দেশকে বিদেশী দস্যু ও তাদের পোষা কুকুরগুলির কবল থেকে উদ্ধার করে দেশকে স্বাধীন করে এক সুখী সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা কায়েম করা।

বলা বাহুল্য প্রথম পথটা হলো, আত্মহত্যার পথ; দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদাকে ধুলায় লুটিয়ে দেওয়ার পথ; দেশকে কারবালায় পরিণত করার পথ। বিদেশী দস্যুদের পোষা কুকুর মুজিব, তাজউদ্দিন মণি সিং-রা ভূয়া স্বাধীনতা, ভূয়া সমাজতন্ত্র ও "মুজিববাদ' এর মোড়ক পরিয়ে এই আত্মঘাতী পথই আমাদের সামনে হাজির করেছে।

আমাদের দেশের বীর দেশপ্রেমিক জনগণ কখনও এই আত্মঘাতী পথকে বরণ করে নেবেন না। এই আত্মঘাতী পথের মুখে লাথি মেরে জনগণ নিশ্চয়ই স্বাধীনতা, মুক্তি ও বিপ্লবের পতাকাকে উর্ধে তুলে ধরবেন।

জনগণের সন্তান ও অগ্রণী বাহিনী হিসেবে আমাদের পার্টি স্বাধীনতা, শোষণ মুক্তি ও গণ-বিপ্লবের পতাকাকেই উর্ধে তুলে ধরেছে এবং দেশের সত্যিকার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শোষণমুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অস্ত্র হাতে বিদেশী ও দেশী দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

এই ন্যায় সংগত সংগ্রামে যোগদানের জন্য আমরা দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল দেশপ্রেমিকদের নিকট আহবান জানাচ্ছি। পূর্ব বাংলার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, দেশপ্রেমিক ছাত্র যুবক, বুদ্ধিজীবী ও মহিলাদের নিকট, দেশপ্রেমিক ধনিক ও দেশপ্রেমিক ভূস্বামীদের নিকট, প্রাক্তন, 'মুক্তিবাহিনীর" দেশপ্রেমিক অংশের নিকট দেশপ্রেমিক জোয়ান

ও বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেমিক জোয়ান ও বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেমিক অফিসারদের নিকট এবং সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে দেশপ্রেমিক অংশের নিকট, এক কথায় পূর্ব বাংলার প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রকামী মানুষের নিকট আমাদের পার্টির আবেদন :

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে বিদেশী দস্যুদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য, আমাদের দেশের মুখে এবং দুখি বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাইবোন ও ভবিষ্যত বংশধরদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য, আসুন আমরা স্বাধীনতা ও মুক্তির পতাকা হাতে নিয়ে এক হয়ে দাঁড়াই; চলুন বিদেশী দুশমন ও তাদের পোষা কুকুরগুলির বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র হাতে সংগ্রামে নামি; চলুন দুশমনদের সশস্ত্র বাহিনীকে মোকাবিলা করা ও তাদের পরাজিত করার জন্য আমাদের সশস্ত্র গণ-ফৌজকে শক্তিশালী করি, চলুন ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের উপর নির্ভর করে আমরা প্রথমে গ্রামাঞ্চলে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করি, প্রথমে গ্রামকে শত্রুমুক্ত করি এবং গ্রামে জনগণের বিপ্লবী সরকার কায়েম করি; চলুন আমরা এক কণ্ঠে আওয়াজ তুলি :

* গোলামীর শৃঙ্খল চূর্ণ কর;
* গোলামীর চুক্তিগুলির কবর রচনা কর;
* রুশ-ভারতের প্রভুত্বকে উচ্ছেদ কর;
* পুতুল সরকারকে উচ্ছেদ কর;
* গণ-চীন বিরোধী যুদ্ধ ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ কর;
* জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম কর;

আরেকটি গণহত্যার চক্রান্ত চলছে *

দেশী-বিদেশী সমস্ত শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্যে পূর্ববাংলার জনগণ সশস্ত্র লড়াই করলেন এবং অকাতরে জীবন দিলেন। কিন্তু জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হলো না। আওয়ামী লীগ এখন সারাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়ে তুলেছে। তথাকথিত মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী এবং আওয়ামী লীগের গুণ্ডা-লুটেরা-ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী সশস্ত্র ডাকাতি করছে, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ করছে এবং জনগণের উপর নির্যাতন সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের আশীর্বাদপুষ্ট ব্যবসায়ী, মজুতদার, কালোবাজারী, চোরাচালানীসহ সমস্ত শোষক-গণদুশমন আজ খাদ্যদ্রব্যসহ সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে নির্বিবাদে জনগণকে শোষণ করে চলেছে। শেখ মুজিবের পুতুল সরকার মুখে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে হুমকির ফানুস উড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে আর তলে তলে তাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা দান করছে। এর উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ কর্তৃক এ-দেশের জনগণকে অবাধে শোষণ-লুণ্ঠনের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিচ্ছে বিভিন্ন চুক্তির ছদ্মাবরণে। বস্তুত সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের পোষা কুকুর এবং এ-দেশের সামন্ত ও দালাল ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক উপযুক্ত প্রতিনিধির দায়িত্বই পালন করে যাচ্ছে শেখ মুজিব। ইতিমধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সামরিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের কাছে প্রায় বিক্রি করেই দিয়েছে।

নতুন গণহত্যার চক্রান্ত চলছে

এ-ছাড়া শেখ মুজিব সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের পরামর্শে এ-দেশে নতুন করে গণ-হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পাঁয়তারা ভাঁজছে। শেখ মুজিব নকসাল দেখামাত্রই গুলি করে হত্যা করার ঢালাও নির্দেশ দিয়েছে তার পুতুল সরকারের সশস্ত্র বাহিনীকে। কিন্তু এ নকসাল কারা? নকসাল তো এ-দেশের সমস্ত বিপ্লবী মেহনতি মানুষ। তারা নকসাল বাড়ির পথ ধরে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে সব রকমের দেশী ও বিদেশী শোষণ হতে মুক্ত করে বিপ্লবী মেহনতি মানুষের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাহলে কি শেখ মুজিব দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ গণমুক্তি সংগ্রামের অগ্রসেনা ও বিপ্লবী জনগণকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করেছে? হ্যাঁ, তাই করেছে এবং করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের পরামর্শে আরেকটি গণ-হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ হিসেবে। কারণ সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের মহান চীনকে ঘেরাও করার ষড়যন্ত্র দীর্ঘদিন ধরে। সেই ষড়যন্ত্রকে

---

* ৭এপ্রিল ১৯৭২, পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী), ঢাকা জেলা সাংগঠনিক কমিটি কর্তৃক প্রচারিত প্রচারপত্র।

কার্যকর করার জন্যে তারা সম্মিলিতভাবে শেখ মুজিবকে দিয়ে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু সে পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো এদেশের বিপ্লবী জনগণ। তাই শেখ মুজিব বিপ্লবী জনগণকে খতম করার নীতি গ্রহণ করেছে। বিপ্লবী জনগণকে খতম করা মানেই এদেশে আরেকটি গণহত্যা পরিচালনা। বিগত একাত্তরের গণহত্যাযজ্ঞেও শেখ মুজিবের সমর্থন ছিল। সি. আই. এ-র কুখ্যাত পাণ্ডা ফারল্যাণ্ড শেখ মুজিবের সাথে পরামর্শ করেই ঘৃণ্য পাক-বাহিনী দ্বারা গণ-হত্যা পরিচালনা করেছিল। বস্তুত শেখ মুজিব বিগত বছরের গণ-হত্যার অন্যতম নায়ক এবং আরেকটি গণ-হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পাঁয়তারা ভাঁজছে। তাই সে আগে থেকেই সমাজতন্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের শ্রুতিমধুর শ্লোগানের আড়ালে তার বীভৎস ফ্যাসিষ্ট রূপ ঢেকে রাখতে চাচ্ছে।

আমরাও খতম চালিয়ে যাচ্ছি

কিন্তু কোনভাবেই শেখ মুজিব জনগণকে আর ধোঁকা দিতে পারবে না। বিপ্লবী জনগণের বিপ্লবাত্মক অগ্রাভিযান প্রতিহত করতে পারবে না। আমরাও ভারত, রাশিয়া ও মার্কিনের পোষা কুকুর শেখ মুজিব ও তার দলবল লুটেরা-পাণ্ডাদের খতম করবো। আমরা গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। চেয়ারম্যান মাও-চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ গেরিলারা কোন গণ-দুশমনকেই রেহাই দেবে না।

আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ নতুন মানুষ–আমাদের প্রতি বিন্দু রক্তে হাজার হাজার নতুন মানুষ সৃষ্টি হয়। বিপ্লবীদের জীবন দান পাহাড়ের মত ভারি আর প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম করা জনগণের কাছে আনন্দকর। কমরেড চারু মজুমদার শিখিয়েছেন, "বিপ্লবীর ধর্ম প্রতিটি হামলার বদলা নেওয়া।" তাই আজ গেরিলাদের কর্তব্য–**ওদের পাওয়া মাত্রই খতম করা**।

বস্তুত জনগণের মুক্তির আদর্শে আত্মোৎসর্গিত গেরিলারা শেখ মুজিবের হুমকির জবাব দিচ্ছেন গ্রামাঞ্চলে তার ফ্যাসিষ্ট সাগরেদসহ সকল শ্রেণীশত্রু খতম করে। বিপ্লবী জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার সর্বত্র সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। খতম অভিযান আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষকের বিপ্লবী সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের গেরিলা বাহিনী বীরত্বের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন। চেয়্যারম্যান মাও সেতুং বলেছেন "প্রতিক্রিয়াশীলদের আয়ু আর বেশিদিন নেই। নিপীড়িত মানুষের বিজয় আর বেশি দূরে নয়। জনগণের জয় হবেই।"

ভারত-রাশিয়া-মার্কিনের পোষা কুকুর শেখ মুজিব ইতিহাস থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছে। তার ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে হিটলার-চিয়াংকাইশেকের মত করে দেশে শ্বেত-সন্ত্রাস কায়েম করতে চায়। তাই জনগণের গেরিলা বাহিনী তাকে প্রতিহত করার জন্যে লাল সন্ত্রাসের মাধ্যমে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ লড়াই চলবে পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত; ফ্যাসিষ্ট শেখ মুজিব ও তার প্রভুদের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে! বিপ্লবী জনগণের জয় হবে।

জনযুদ্ধের বিজয় দীর্ঘজীবী হোক!
পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)
ঢাকা-জেলা সাংগঠনিক কমিটি
৭ই এপ্রিল, ১৯৭২

সংবিধান-বিলের ওপর সাধারণ আলোচনা

খন্দকার মোশ্‌তাক আহ্‌মদ*

জনাব স্পীকার : এবার খন্দকার মোশ্‌তাক আহ্‌মদ সাহেব বলবেন।

খন্দকার মোশ্‌তাক আহ্‌মদ (বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও পানি-সম্পদ মন্ত্রী) : জনাব স্পীকার সাহেব, জাতীয় জীবনের ক্রান্তিকালীন এই ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করায় এবং আজকে এই গণপরিষদে সংবিধান সম্পর্কে আলোচনায় যোগদান করবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অনাবিল আনন্দও অনুভব করছি।

জনাব স্পীকার সাহেব, আজ এই গণপরিষদের সাধারণ আলোচনায় সংবিধান সম্পর্কে বলতে গেলে, যেখান থেকে আরম্ভ করতে হয়, সেখান থেকে আরম্ভ করতে গেলে আমার অনেক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর কথা মনে পড়বে।

১৯৪৯ সালে ঢাকার 'গোলাপ বাগ' বা 'রোজ গার্ডেনে' আওয়ামী লীগের সৃষ্টি হয়েছিল। 'গোলাপ বাগে' গোলাপ সেদিন কম ছিল– কাঁটা ছিল অনেক বেশি।

সেদিন বঙ্গবন্ধু কারাগারে ছিলেন। টাঙ্গাইলের আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যিনি কাজ করেছেন, সেই শামসুল হক সাহেবের কথা উল্লেখ না-করলে আমার বিবেককে ফাঁকি দেওয়া হবে।

আজ আমরা দেশকে একটি সংবিধান দেবার জন্য এই গণপরিষদে উপস্থিত হয়েছি–কিন্তু ছেড়ে এসেছি বহু কর্মীকে, ছেড়ে এসেছি বহু বন্ধুকে, যাঁদের সারা জীবনে কখনও আর দেখতে পাব না যতক্ষণ আমরা গিয়ে মিলতে না-পারি তাঁদের সঙ্গে; কারণ তারা চিরদিনের জন্য চলে গেছেন।

আজকের আলোচনা সাধারণ আলোচনা। আমি ধারাবাহিক আলোচনার সুযোগ যখন পাব, তখন বিস্তারিত আলোচনা করব। আজকে সাধারণ আলোচনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রখব।

সেই দিনের আওয়ামী লীগ বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন করে আজকের এই গণপরিষদে মিলিত হয়েছে একটা সংবিধান দেওয়ার জন্য। আমি আবার উল্লেখ করতে চাই, মাননীয় স্পীকার সাহেব, একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের, রক্তস্নানের মাধ্যমে আমরা এখানে এই গণপ্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছি।

আজ আমরা ছেড়ে এসেছি যাঁদের সঙ্গে এক যুগেরও অধিককাল কাজ করেছি, সেই মশিউর রহমান সাহেবকে, যিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। নেই আমিনুদ্দীন সাহেব, জিকরুল হক সাহেব। তাঁরা চলে গিয়েছেন যুদ্ধের বলি হিসাবে।

এর আগে বাংলাকে স্বাধীন করবার জন্য, বাংলার স্বাধিকারের জন্য আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার আগে ছিলেন আলী আহমদ সাহেব, আমাদের বন্ধু খয়রাত হোসেন সাহেব,

---

* ২৩ অক্টোবর ১৯৭২ খন্ড-২ সংখ্যা ৭ পৃঃ ১৭৫-১৮৭

সাহেব ওসমান আলী খানকে। মনে পড়ে আরও অনেক কর্মীকে, যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মনে পড়ে সেই দবিরুল ইসলাম সাহেবকে। তাঁরা সবাই চলে গিয়েছেন। তাঁরা আমাদের উপর দিয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশকে একটা সংবিধান উপহার দেওয়ার দায়িত্ব। তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন আমার দলের নেতা। আজ আমি আপনার মাধ্যমে তাঁদের সবার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আজ আমি বলতে পারি, বাংলার আনাচে-কানাচে, মাঠে-গঞ্জে চব্বিশ বৎসর যাবৎ যাঁরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য আত্মাহুতি দিয়ছেন, যাঁরা নির্যাতন ভোগ করেছেন, তাঁদের অনেকের নাম ইতিহাসে লেখা নাই। সেই অচেনা বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আজ গণপরিষদের সদস্য হিসাবে এখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের আত্মদানের, তাঁদের প্রচেষ্টার, তাঁদের নেতৃত্বের ফলশ্রুতি হিসেবে দেশকে সংবিধান দানের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের উপর আরব্ধ সেই মহান্ দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি।

জনাব স্পীকার সাহেব, এই সংবিধান সম্পর্কে কোন কোন মহল থেকে প্রস্তাব উঠেছে বা খবরের কাগজের মাধ্যমে জনমত গ্রহণের কথা অনেক জায়গা থেকে বলা হয়েছে। জনমতকে আওয়ামী লীগ চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছে। আজকে জনমতের কথা উঠলে আমরা সেই জনমতকে কী মনে করব? আজকে যাঁরা গণপরিষদের সদস্য, ১৯৭০ সালে তাঁরা জনতার রায় নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা একটা সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আজকে রাষ্ট্রের জন্য, জাতির জন্য সংবিধান দিতে এসেছেন। তাঁদেরকে আবার জনসাধারণের মতামত নিতে হবে, এ কথার কী যুক্তি থাকতে পারে, তা আমার সাধারণ জ্ঞানে খুঁজে পাই না।

এই সংবিধান দেওয়ার সময় আরও একটি বৈশিষ্ট্যমূলক ব্যবস্থা এই দল গ্রহণ করেছে। জনাব স্পীকার, আপনি জানেন যে, জাতীয় পরিষদের ১৬২ জন সদস্য নিয়ে এই সংবিধান রচিত হতে পারত। কিন্তু যেহেতু জনতার রায় এবং সাধারণ মানুষের রায়ের উপর এই দল বিশ্বাসী, যার উপর ভিত্তি করে এই দল এতগুলো সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য শুধু জাতীয় পরিষদের সদস্যই নয়—প্রাদেশিক পরিষদের তিন শো সদস্য নিয়েও এই গণপরিষদ গঠিত হয়েছে। তাতে কি এটা প্রমাণ হয় না যে, কোন একটা নির্বাচিত সদস্যকে বাদ দিয়ে এই সংবিধান রচিত হয়নি? যাতে কোন জায়গা থেকে কোন প্রশ্ন না উঠতে পারে যে, জনমত একটুখানি ক্ষুণ্ন হয়েছে, সেই কারণে সংবিধান রচনার ব্যাপারে জাতীয় পরিষদের কেবল ১৬২ জন সদস্যকে নিয়ে এই সংবিধান রচনা হয়নি—প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদেরও সংবিধান রচনার কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার স্মৃতির দুয়ারে করাঘাত করতে চাই। আপনি জানেন যে, এই সংবিধান দেবার অধিকার যাঁরা অর্জন করেছেন, তাঁরা প্রবাসে—মুজিব-নগরে—বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করে পৃথিবীর কাছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার দাবী পেশ করেছিলেন, মুক্ত মানবগোষ্ঠীর কাছে বাঙালির মুক্তির

আবেদন করেছিলেন। যারা গণতন্ত্রকে নির্ধারিত পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেয়নি, যারা পঁচিশে মার্চের রাতে পৈশাচিক হামলা চালিয়েছিল, তাদের নিস্তব্ধ করে দিয়ে আজ বিশ্বের দরবারে সেই গণতান্ত্রিক সরকার স্বীকৃত হয়েছে।

জনাব স্পীকার সাহেব, সেই দিনের পাকিস্তানি কর্মকর্তারা তাঁদের রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের কাছে বলেছিলেন, এটা তাঁদের ঘরোয়া ব্যাপার–একটা বিদ্রোহ-মাত্র। আমরা তাঁদের জবাব দিয়েছি, এটা বিদ্রোহ নয়; নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীর মুক্তবুদ্ধি মানুষ স্বীকার করেছে, এটা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয়– বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধ করছে গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধীনতার জন্য।

জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে এই পরিষদে কেবল মনে করিয়ে দেবার জন্য বলছি যে, যুদ্ধের সময় আমাদের এই গণপরিষদের সদস্যরা বৈঠক করেছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। সেই গণপ্রতিনিধিরা, যাঁরা গণ-রায়ের উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, তাঁদের আজকে আবার নতুন করে জনমত যাচাই করার প্রশ্ন কেন ওঠে, তা আমি বুঝতে পারি না।

১৯৭০ সালে L.F.O. (Legal Framework Order) কে কেন্দ্র করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে যখন অন্যান্য রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জনের কথা বলেছে, তখন ঢাকার ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল-সভায় নির্বাচনে যোগদানের কথা ঘোষণা করা হয়। জনাব স্পীকার সাহেব, সেইদিনের অনেক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে না যাওয়ার জন্য বাংলার জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, বাহানা দিয়েছিল L.F.O.-এর কথা বলে।

জনাব স্পীকার সাহেব, পৃথিবীর ইতিহাস অত্যন্ত নিষ্ঠুর। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও তার প্রজ্ঞা যুগ যুগ ধরে মানুষকে পথ দেখিয়েছে। আবার এই রাজনৈতিক নেতৃত্বই দেউলিয়া হয়ে জাতিকে যে ধ্বংস করে দিয়েছে, সেই উদাহরণও বিরল নয়।

সেদিন যাঁরা ইয়াহিয়ার L.F.O.-র কথা বলে নির্বাচন বর্জনের কথা বলেছিলেন, তাঁদের কথায় না গিয়ে আমি আজকে আপনার মাধ্যমে ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে এ কথা দুনিয়ার কাছে জোর গলায় বলবার সাহস পেয়েছি যে, সেই দিনের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, তার পরিচয় শুধু দেশেই স্বীকৃত হয়নি–পৃথিবীর ৯১টি দেশ তার নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে মানব-গোষ্ঠীর আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। অপর পক্ষে যাঁরা নির্বাচনকে বর্জন করেছে তাঁদের কথা যদি সত্যি হত, তাহলে যুদ্ধ করবার মতো শক্তি গণপ্রতিনিধিদের থাকত না, যুদ্ধে গণ-সমর্থনও আমরা পেতাম না।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যোগদান করে জনমত সংগ্রহ ও গঠন করবার চেষ্টা পেয়েছে গত চব্বিশ বছর। কারণ, আওয়ামী লীগ সৃষ্টিকাল হতেই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে যে, ব্যালটের ক্ষমতা বুলেটের চেয়ে অনেক বেশি। বুলেটের কাছে সমস্ত ক্ষমতা থাকে না। যারা বুলেট ছোঁড়ার জন্য ট্রিগার টেপে, সেই মানুষের উপর নির্ভর করে বুলেটের শক্তি। কিন্তু আমরা সে শক্তিতে আস্থাবান নই। আমরা জনশক্তির উপর নির্ভর করে এই পর্যন্ত এসেছি। যে প্রজ্ঞার পরিচয়, রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয়, দূরদৃষ্টির পরিচয় আওয়ামী লীগ ১৯৬৯ সালে ইডেন হোটেলে নির্বাচনের পক্ষে রায় দেবার মধ্য দিয়ে

দিয়েছিল, তা পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এটা একটা বিদ্রোহের উত্থান নয়, সুন্দরবনের উত্থান নয়–একটা গোটা জাতিকে সঙ্গে নিয়ে নিজের স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দূরদর্শিতার যে পরিচয় আওয়ামী লীগ দিয়েছেন, তার নজীর ইতিহাসে বিরল এবং এ কথা আজ আমি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করি।

জনাব স্পীকার সাহেব, তারপর, কোন কোন ব্যক্তি বা দল, যারা সেই নির্বাচনে জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, আজকে জনমত কি তাদের কাছ থেকে নিতে হবে? জনাব স্পীকার সাহেব, কার পক্ষে তাঁরা বলছেন? কিসের জনমত নিতে হবে? জনমত ১৯৪৯ সালে যখন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই নেওয়া হয়েছে। আজকে যে সংবিধান রচনা করতে বাংলার গণপ্রতিনিধিগণ এখানে উপস্থিত যাঁরা সত্যিকার গণপ্রতিনিধি হিসাবে দাবী করতে পারেন, পৃথিবীও স্বীকার করেছে যাঁদের প্রতিনিধিত্বকে–আজকে কিসের জনমত যাচাই করতে হবে তাঁদের, জনাব স্পীকার সাহেব?

ভাষার লড়াই করেছি আমরা, আত্মাহুতি দিয়েছে আমাদের সন্তানেরা, নির্যাতন ভোগ করেছে আমাদের দেশের সন্তানেরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। এই বাঙালি যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, আপনার মাধ্যমে সে কথা আমি বললে নেহায়েত বেয়াদবী হবে না। পৃথিবীতে ভাষার জন্য কেউ জান দিয়েছে, এর ইতিহাস খুব বিরল। তাই এই সংবিধান বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে। এর জন্যও কি আমাদের জনমত নিতে হবে? জনমত নেওয়া হয়েছে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে।

জনাব স্পীকার সাহেব, জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ যে কথা বলেছে, আজকে সে কথা সংবিধান রচনা করার পূর্ব-মুহূর্তেই কেবল যে বলেছে, তা নয়। বহুদিন বহু নির্যাতনের পরে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কুমার ও কুশিয়ারার পাড়ে পাড়ে জনস্রোত পলি-মাটির বুকে আছাড় খেয়ে সহস্র মাঝি নোঙ্গর ফেলে যুগ-যুগ, শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে যে সঙ্গীত রচনা করছে, সেই নিরন্তন বাংলার রূপকে স্বীকার করে নিয়ে আওয়ামী লীগ স্লোগান দিয়েছে 'তোমার-আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। সেই জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করার জন্য কার কাছে যে জনমত নিতে হবে, সে কথা আমার জানা নাই।

জনাব স্পীকার সাহেব ধর্মনিরপেক্ষতার কথায় আমাকে বলতে হয়, একটা ধর্মীয় রাষ্ট্রে বাস করে এই আওয়ামী লীগ যুক্ত-নির্বাচনের পক্ষে রায় দিয়েছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের অনেক আগে ১৯৫৪ সালে যে যুক্ত-নির্বাচনের পক্ষে, যে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছিল, সেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে আজ নতুন করে কার কাছে জনমত নিতে হবে, তা আমার জানা নাই, জনাব স্পীকার সাহেব।

এই সংবিধানে প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসীকে তার নিজের ধর্ম পালন করবার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় ও মঠে যার যার ধর্ম পালন করবার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে এই সংবিধানে। সেই সঙ্গে ধর্মকে যাতে কেউ নিজের ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করতে না-পারে, তার একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এই সংবিধানে। এটা পৃথিবীর ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তার কারণ আমরা চাই না ধর্মকে রাষ্ট্রীয় আলখেল্লা পরিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে টেনে আনতে। তার কারণ, আমাদের অতীত ইতিহাস থেকে, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি যে, যেখানেই ধর্মকে

রাষ্ট্রীয় আলখেল্লা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানেই জনসাধারণ নির্যাতিত হয়েছে রাষ্ট্রের দ্বারা, রাষ্ট্রের কর্মচারীদের দ্বারা, শাসন-বিভাগের দ্বারা। তখনই তারা আঘাত করেছে। সে আঘাত গিয়ে কেবল শোষণের নায়কের উপর পড়েনি—ধর্ম-নায়কের উপরও পড়েছে।

ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, রাশিয়ায় ১৯৫৮ সালে সম্রাট জার এবং ধর্ম-যাজক জারের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে যখন নির্যাতিত মানুষ আঘাত করে, তখন সে আঘাত শুধু জারকেই করেনি—ধর্ম-যাজকের উপরও সে আঘাত এসেছিল।

বাংলাদেশের লোক ধর্মভীরু। ব্যক্তিগতভাবে সমাজগতভাবে ধর্মপালন বা ধর্মপ্রচারের জন্য আমাদের মন্দির,মসজিদ উন্মুক্ত থাকবে। সেখানে মিলাদ হবে, সেখানে গীর্জায় prayer হবে, সব কিছুই হবে। সেখানে ধর্মের আলখেল্লা পরে, ধর্মীয় রাষ্ট্রীয় টুপি পরে রাষ্ট্রের অপকর্মগুলি ঢাকবার এবং নিজের দোষ চাপা দেবার ব্যবস্থা হয়নি। আমরা ধর্মের নামে শোষণের বিরোধিতা করেছি এবং তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই সংবিধানে। এ সম্পর্কে নতুন করে রায়ের প্রয়োজন আছে কিনা আমার জানা নাই।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমাদের আন্দোলন ছিল শোষণের বিরুদ্ধে, শাসনের বিরুদ্ধে,উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা একবার আমরা পেয়েছিলাম ১৯৪৭ সালে। শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, স্বাধীনতা আমরা পেয়েছিলাম। সে স্বাধীনতা কেবল পতাকায় পর্যবসিত হয়েছে। সে স্বাধীনতা মরুভূমির বালুচরে অকাল-মৃত্যুবরণ করছে। তার কারণ, পতাকার পরিবর্তনের মধ্যে স্বাধীনতার গূঢ় অর্থ নিহিত থাকে না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই মানুষের আসল মুক্তি। সেই মুক্তির জন্যই আমরা সংগ্রাম করেছিলাম। একবার স্বাধীনতা অর্জন করে আমরা পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছিলাম, কিন্তু সে স্বাধীনতা বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারেনি। পাকিস্তানি স্বাধীনতার যে পতাকা ছিল, সে পতাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পাকিস্তান বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আশ্বাস দিতে পারেনি।

অপরপক্ষে শোষণ এবং শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা তাঁদের নীতি, তাঁদের কর্মপন্থাকে প্রতিটি জায়গায় একদিন নয়, দুদিন নয়—বছরের পর বছর ধরে বলে এসেছেন। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার কথা, চিরদিনের শোষণকে মুক্ত করে মুক্তির তাজমহল গড়ে তুলবেন, একথা তাঁরা বাংলার আনাচে-কানাচে, গঞ্জের মানুষের কাছে বারবার বলেছেন। আমি শোষণহীন বাংলা গড়ে তোলায় বিশ্বাসী।

আমরা মানবিক অধিকারে বিশ্বাসী, আমরা সাম্যবাদে বিশ্বাসী। মানুষের উপর মানুষের শোষণ দ্বারা ইংরেজ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তানের গত চব্বিশ বছর যাবৎ একটানা বাংলাকে শোষণ করে যে সম্পদের মোহে গরিয়ান হয়ে, যে সম্পদের মোহে বারবার বাংলার গণতান্ত্রিক শক্তিকে তারা শৃঙ্খলিত করতে চেষ্টা করেছিল, আজ তার হার হয়েছে। জিত হয়েছে বাংলার মানুষের। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই। আমরা মানুষের জন্য সম্পদ সুষমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে প্রমাণ করব যে, আর মানুষ মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। সেজন্য আজ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে এই সংবিধানে স্থির ও নির্দিষ্ট বলে গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের এই অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে

মানবতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মানুষের মতামতের যে স্বীকৃতি আওয়ামী লীগ এই গণপরিষদের সদস্যদের দ্বারা এই সংবিধানের মাধ্যমে দিচ্ছেন, তা একটা অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। মানুষের কাছে যা বলা হয়েছিল, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই সংবিধানের মাধ্যমে।

জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে আর দু-একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আজ সংবিধান সম্পর্কে গণতান্ত্রিক মতামত যাচাইয়ের জন্য কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন। কোন কোন জায়গায় থেকে সন্তুষ্ট থেকেও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। জানি না, কী উদ্দেশ্যে! যদি উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, কোনরূপে বাংলাকে তার নিজ পায়ের উপর দাঁড়াতে দেওয়া হবে না, উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, স্বাধীন হবার পর আন্তর্জাতিক দাবা খেলার মধ্যে বাংলাকে একটু কোণঠাসা করে রাখা হবে, তাহলে তার জন্য জবাব দেওয়ার আমাদের কিছুই নাই।

গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টায় অধিকার লাভে আমরা বিশ্বাসী। আর, সাম্রাজ্যবাদী মতামত হচ্ছে expansionistদের মনোবৃত্তি। সেটা হিংসার উপর নির্ভরশীল।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান সংবিধান দিয়ে তাঁদের ওয়াদা পালন করছেন। যা এই গণতান্ত্রিক সংবিধানে রচিত হয়েছে, যা এই গণপরিষদের মাননীয় সদস্যরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, সেই সংবিধানই হবে গণতন্ত্রের স্বীকৃতি এবং সেই গণতন্ত্রের মাধ্যমেই আমরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমন্বয় ঘটাতে যাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনার জানা আছে যে, যখন কোন আদর্শে নতুন কিছু দেওয়া হয়, তখন সেখানে খট্‌কা অনেক। এগুতে সাহস হয় না, দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করতে ভয় পায়, আবার নির্দিষ্ট ছক কেটে দেওয়ার মাপে তার প্রতিবাদও করতে পারা যায় না। আজ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সাম্যবাদের দ্বারা জনগণের সঙ্গে তাদের অর্থনীতির সুষম বণ্টনের যে ব্যবস্থা এই সংবিধানে করা হয়েছে, তাতে তারা চঞ্চল হয়ে উঠছে। চঞ্চল হওয়ার কারণ আছে। কারণ যে নাই, তা একেবারে নয়। যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

আজ একটা নতুন মতবাদ এখানে হতে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটা সংবিধানে যে নতুন অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে, তা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ করতে পারেনি। আজ এটা একটা experiment হিসাবে বাংলাদেশের মাটিতে হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক মানুষ তাদের অর্থনীতির দিক দিয়ে সাম্যবাদে বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এখানে পুঁজিবাদ grow করতে পারে না। সবকিছু ধুয়ে-মুছে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

এ কথা আপনি স্বীকার করবেন যে, সংবিধানে বিভিন্ন দিকে সামঞ্জস্য ঘটাবার প্রচেষ্টা হচ্ছে। আমরা যে দৃঢ়তা, সততা ও তিতিক্ষার দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজত [illegible] অর্থনীতি কায়েম করার চেষ্টা করছি, তাতে আমরা কোন ছক-কাটা পথে পা না দিলেও বাংলার পলিমাটিতে যে নতুন ব্যবস্থা হল, সেটা দেশ-বিদেশে অনেকেই গ্রহণ করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আবার, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যাকে বলা হয় Violent method সহিংস পদ্ধতি, তার মাধ্যমে পৃথিবীর কোন কোন দেশে সমস্যার মোকাবিলার নজীর বিরল হলেও, দেখা

যায়। Underground থেকে জনগণকে উচ্ছৃঙ্খল, বিশৃঙ্খল নীতির দ্বারা পোড়ামাটিনীতি অনুসরণ করে, রক্তের খেলার দ্বারা ধ্বংসের মাধ্যমে যে সৃষ্টির প্রচেষ্টার কথা, তা আমি আগেও বলেছি। আজ কোন কোন দেশ ধ্বংসের দ্বারা সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে।

বাংলাদেশ আজ বলতে চায়, যদি গণতন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি না-হয়ে ধ্বংসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই সৃষ্টিতে ব্যথা অনেক, জ্বালা অনেক, বেদনা অপরিসীম। ক্ষত একটা থেকে যাবে চিরকালের জন্য। কিন্তু গণতন্ত্রের মাধ্যমে, আবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমে যে সৃষ্টি, তাতে আনন্দ অসীম, বেদনা নাই এবং তার প্রভাব চিরন্তন।

মানুষ চায়, মানুষের কল্যাণ হোক, সম্পদ যাতে একনায়কত্বের কাছে না থাকে, গণতন্ত্রের সেই শক্তিই সর্বশক্তি, সেটা চিরকালের শক্তি। কারণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে না।

আমাদের দেশের এক কবি– যাঁর নাম আমার মনে পড়ছে না–বলেছেন, মানুষের মনে যখন ধ্বংসের সৃষ্টি আসে, তখন তার চোখে আগুন জাগে। তাই আজ আমাদের সৃষ্টিতে আর ধ্বংস না, আর ধ্বংস না। তাই বাংলার মানুষ তার স্বকীয় আদর্শ পাথরে মাথা না-কুটে গড়তে চায়। সেই ইতিহাসের সূর্য সেন, তীতুমীর, আমার সালাম, বরকত যার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে, সেই সংবিধান তৈরি করে গণপরিষদের সদস্যরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করে একটা রাষ্ট্রীয় দলিল-রূপে গ্রহণ করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্তে গোসল করে এই গণপরিষদে আমরা দাঁড়িয়েছি। বাংলার আনাচে-কানাচে যে সব মায়ের ক্রন্দনরোল আজও শোনা যাচ্ছে, তাদের প্রতি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে মনে রাখতে হবে যে, সেই মায়ের চোখের পানি আজও শুকায়নি। কিসের জন্য তারা জান দিয়েছে? জানকে বাজী রেখে যারা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে দিয়েছে, তারা গণপ্রতিনিধিদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে, যত শীঘ্র হোক, তাদেরকে এই জাতীয় দলিল দিতে হবে।

সে দলিল হচ্ছে আজকের সন্তানহারা মা, স্বামীহারা স্ত্রী, ভাইহারা বোন– যাদের সন্তান, স্বামী, ভাই শহীদ হয়েছে এবং আমাদের পরলোকগত বন্ধু মসিউর রহমান, আমানুদ্দীন ও ধীরেন বাবু–যারা দেশের জন্য যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং যাঁদেরকে আমরা আর ফিরে পাব না, তাঁদেরই বিদেহী আত্মার স্বীকৃতি। যে ৩০ লক্ষ শহীদ, মুক্তিযোদ্ধা মায়ের মুক্তির জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের পরলোকগত আত্মাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য এই সংবিধান রচনায় আমারা প্রবৃত্ত হয়েছি।

আজ সেই মা অপেক্ষায় আছেন। তোমাদের সন্তান, স্বামী, ভাই জাতিকে স্বাধীনতা দেয়ার জন্য বর্বরের সঙ্গে লড়াই করে আত্মাহুতি দিয়েছে–আজ আমরা তোমাদের সেই সন্তানদেরকে ফেরত দিতে পারব না, কিন্তু তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আজ রাষ্ট্রীয় জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে, জাতীয় জীবনে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে সারা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠবে এই দলিলের মাধ্যমে। এই দলিল যত তাড়াতাড়ি দিতে পারব, ততই আমাদের মা-বোনদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারব। নতুবা

শহীদের আত্মা এই পরিষদের আনাচে-কানাচে ঘুরে বলবে : তোমাদের কাছে যে দায়িত্ব রেখে এসেছি, সেই দায়িত্ব তোমরা সম্পাদন কর।

একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে আজকে বাংলাদেশের এখানে-ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের নামে নানা রকম কলঙ্ক ও অপবাদ ছড়ানো হয়েছে; তার কোনটা সত্য হতে পারে, কোনটা মিথ্যাও হতে পারে।

আমি আপনার মাধ্যমে গণপরিষদ-সদস্য ভাইদের কাছে বলব যে, রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করার আমার যে সৌভাগ্য হয়েছিল এবং বৎসরের পর বৎসর সেই রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে কাজ করার যে সুযোগ হয়েছে, তা থেকে আমি বলতে পারি, একজন রাজনৈতিক নেতার জীবনে এর চেয়ে বড় সাফল্য পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাই না। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের কাছে মাথা নত করি যে সব বন্ধু দুই যুগ ধরে কোন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি–ন্যায় ও সত্য এবং মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুই যুগ ধরে কেবল লড়াই করে এসেছেন। আজকে আমাদের যুব সম্প্রদায় কেন অপেক্ষা করতে পারে না?

যুব-সম্প্রদায়ের কাছে আমার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে, মাননীয় স্পীকার সাহেব যে, এই যুবকদের অনেকে জান দিয়েছে, আবার অনেক জানকে বাজী রেখে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে জান দিতে হয়নি। আজকে তাদের কাছে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ হবে, যারা জীবন দিতে গিয়েছিল, কিন্তু জীবন যাদের দিতে হয়নি, তারা সামান্য সময় দিতে পারবে, শারীরিক পরিশ্রম করতে পারবে, স্বাধীনতার স্বর্ণফসল বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেবার আগে তারা যেন অপেক্ষা করে এবং নিজেরা 'চেক্' নিয়ে ব্যস্ত না হয়, নতুবা উত্তরাধিকারীর প্রশ্নে এক বিরাট শূন্যতা দেখা দেবে বলে আমি আশঙ্কা করি।

যুব-সম্প্রদায়ের কাছে অনুরোধ থাকবে, ন্যায় নীতি ও তিতিক্ষার মাধ্যমে তাঁরা স্বাধীনতার স্বর্ণফসল বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিন। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেখবেন। ফসলকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে যার ভাগে যেটুকু পড়ে, তার বাইরে যেন আমরা না যাই। যে সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের প্রত্যেকের জন্য যে বাঁটোয়ারা আছে, তা নিয়ে যেন আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি। তার বাইরে কোনটা যেন গ্রহণ না করি। এইভাবে রাষ্ট্রের কাছে যার যে দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব তাকে সম্পূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

এই সংবিধান সম্পর্কে দেশের বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের বিরাট দায়িত্ব আছে। আমরা এর আগে আমাদের জন্য একটা সংবিধান রচনা করতে পারিনি, তার সুযোগ হয়নি, কারণ সবদিন সবকালে সকলের ভাগ্যে এই সুযোগ জোটে না। এই যুগে আমরা জন্মেছি বলে আমরা ভাগ্যবান। অল্প সময়ের মধ্যে এই সংবিধান রচিত হলে বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক ভাইয়েরা যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যদি বাংলার জনমতের কাছে, বাংলার মানুষের কাছে দেশপ্রেমিক সন্তান হিসাবে এটার নির্যাস চয়ন করতে না-পারেন, তাহলে বাংলার শিল্পী, সাধারণ মানুষ আমাদের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠবেন। এদিকে তাঁদের সচেতন হওয়া উচিত।

আজকের পরিষদের নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যুদ্ধকালীন অবস্থায় আমাদের মধ্যে ছিলেন না, তিনি ছিলেন জালেম ইয়াহিয়ার কারাগারের অন্তরালে। তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁরই প্রেরণা লাভ করে সারা বাংলার মানুষ পৈশাচিক বর্বরতার জবাব দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন।

বাংলার মানুষ ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুকে কেবল ভোটই দেয়নি, বরং সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলার ৩০ লক্ষ সন্তান বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছে। ভোট ও বুলেট উভয়ের সমন্বয়ে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেই রাষ্ট্রে আবার সেই নিপীড়িত মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু তাঁদের কাছে ফিরে এসেছেন।

জনাব স্পীকার, আপনার অবশ্য জানা আছে যে, মুজিবনগরে থাকা-কালে বিশ্ব-বিবেকের কাছে আমরা মামলা দায়ের করেছিলাম, বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্রনায়কের কাছে মামলা দায়ের করেছিলাম যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর স্বপ্ন রাজ্যে ফেরৎ পাঠাতে হবে। সে দায়িত্ব বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ এবং রাষ্ট্রসমূহের নায়কদের। বিশ্বের সাধারণ মানুষের সহানুভূতি আমরা পেয়েছিলাম। আমরা মুজিবনগরে এই অপেক্ষায় ছিলাম এবং পৃথিবীর বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়কের কাছে আবেদন করেছিলাম, তাঁরা যেন লুমুম্বার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না-করেন। লুমুম্বার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বর্তমান যুগের বড় বড় রাষ্ট্রনায়করা যেন ইতিহাসকে কলঙ্কিত না-করেন। তাঁরা আমাদের রায় কবুল করেছেন। পৃথিবীর জনমত এটা স্বীকার করেছে। বঙ্গবন্ধুকে ইয়াহিয়ার কারাগার থেকে তাঁর স্বপ্নের রাজ্যে আমরা ফেরৎ এনেছি।

জনমতের রায় যে কত শক্তিশালী, বঙ্গবন্ধুর তাঁর নিজের স্বপ্নরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসের তার আর একটা নজির স্থাপিত হল। লুমুম্বার কাহিনী আবার রূপায়িত হতে পারেনি। বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের সক্রিয় সাহায্য এবং জনগণের সহানুভূতির ফলে যে আমরা বঙ্গবন্ধুকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, সেজন্য নিশ্চয়ই আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আজ এই সংবিধানের সাধারণ আলোচনা করতে গিয়ে ধারাবাহিক আলোচনায় যেতে চাই না। পরে ধারাবাহিক আলোচনায় সময় মতো অংশগ্রহণ করবার চেষ্টা করব।

আজকে আমার বক্তব্য শেষ করার আগে গণ-পরিষদ-সদস্যদের কাছে যদি আর একটি কথা না-বলি, তাহলে আমার নিজের বিবেকের কাছে আমাকে দোষী থাকতে হবে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অপর পক্ষের জামানত বেশির ভাগ বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এখানে এই গণপরিষদে আপনার সম্মুখে উপস্থিত। তাঁরা ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ন্যায় ও ন্যায্যভাবে,গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী এই পরিষদকে পার্লামেন্টে পরিবর্তিত করে চালিয়ে যেতে পারতেন। গণতান্ত্রিক নিয়ম-অনুযায়ী ১৯৭০ সালে যে নির্বাচন হয়েছে, সেই নির্বাচনে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ন্যায়ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারতেন।

এখানে আর একটি উদাহরণ আছে। গণপ্রতিনিধি ও আওয়ামী লীগের নেতারা এই পার্টির সৃষ্টি করেছেন। যে এক বৎসর তাঁরা যুদ্ধ করেছেন, তারপর আর দশ মাসের মধ্যে সংবিধান দিয়ে, নিজেদের আয়ু শেষ করে দিয়ে যাঁরা, তাঁদেরকে প্রিয় নেতা হিসাবে ভোট

দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে এই সংবিধান নিয়ে হাজির হয়ে বলবেন, দেখ রে বাপুরা, তোমরা আমাদেরকে ভোট দিয়েছিলে পাঁচ বৎসরের জন্য; কিন্তু এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান রচিত হয়েছে, নির্বাচন তোমাদের সামনে আবার এসেছে।

এর চেয়ে বেশি অন্য কোন পরিষদ-সদস্যদের করবার সৌভাগ্য হয়েছে কিনা, আমার জানা নাই। আজকে এই গণপরিষদ-সদস্যরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, এটা আর একটি নতুন নজির। ভবিষ্যতে দেশে যাঁরা রাষ্ট্রনায়ক হবেন, তাঁদের প্রতি তাঁরা একটি পবিত্র দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেলেন এই পবিত্র দলিলের মাধ্যমে। এটা সত্যিই প্রশংসনীয়।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমাদের সামাজিক বৈষম্য অনেক আছে। সমস্যাও আমাদের অনেক আছে। এখান থেকে একটি শব্দ, ওখান থেকে দুটি শব্দ নিয়ে একটি সংবিধানের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। এটা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সংবিধানের যে মূল ভিত্তি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, তার অর্থনৈতিক জীবন, তার রাষ্ট্রীয় জীবন এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য বিদেশী রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক, যে চারিত্র্য, যে ছবির representation, সেটা সংবিধানে আছে। সংবিধান, পার্লামেন্ট, আইন–এই তিনটি এক কথা নয়। জনাব স্পীকার সাহেব, এটা না-বুঝে অনেকে অনেক ক্ষেত্রে সংবিধান থেকে কিছু শব্দ বাদ দেবার এবং গ্রহণ করবার জন্য বলেন। সেই ক্ষেত্রে আমি তাঁদের জন্য বলব যে, সংবিধান, পালার্মেন্ট এবং আইনে বিভিন্ন পর্যায়ের কাজে বিভিন্ন দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁরাই পালন করবেন।

জনাব স্পীকার সাহেব, আপনি আমাকে আজকে বলবার অনুমতি দিয়ে যে সুযোগ দিয়েছেন, আপনার কাছে এবং আপনার মাধ্যমে আমার সহকর্মী মাননীয় পরিষদ-সদস্যদের কাছে আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ।

এখানে বসার আগে যে সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং এই গণপরিষদ সৃষ্টি করেছেন, তাতে ভবিষ্যতে, আগামী দিনের পার্লামেন্ট, আগামী দিনের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অনুপ্রেরণা পাবেন, নির্দেশ পাবেন।

মূলনীতি, মৌলিক অধিকার– এ দুটি এক কথা নয়। এ সম্পর্কে আমার কোন কোন বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এই সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। বাঙালির ঐতিহ্য, বাঙালির কৃষ্টি, বাঙালির শিক্ষা, বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি–এর সঙ্গে অন্য কারও যদি না-বনে, তাহলে সেটা আমাদের কোন দুর্ভাগ্য নয়, তাতে আমাদের কোন দুঃখ করবার কথা নাই। অনেকে মশকরা করার জন্যই এ সব করে থাকেন। অন্যদেশের কৃষ্টির প্রতি যাঁদের অতিমাত্রায় লোভ এবং মোহ, তাঁরাই সে সব করে থাকেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, বাংলার পলিমাটির উপর নির্ভর করে আমরা রাজনীতি করেছি। যে মানুষ লাঙ্গলের খুঁটি ধরে জমি চাষ করে, সেই মানুষের শক্তি এবং পেশীর উপর নির্ভর করেই আমরা রাজনীতি করেছি এবং আমরা সেই বাঙালির বাঙালিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। আমরা হয়তো powder milk বা condensed milk-এর মতো চামচে করে তাঁদের মুখে তুলে দিতে পারব না। আমরা সবরি কলা এবং বিন্নি ধানের খৈ

দিয়ে যে নাশ্‌তা তৈরি করেছি, সেটাই বাঙালির ইতিহাস, সেটাই বাঙালির ঐতিহ্য। আমরা হয়তো powder milk তাঁরে মুখে এগিয়ে দিতে পারব না। কিন্তু সবরি কলা, খাঁটি দুধ আর বিন্নি ধানের খৈ দিয়ে নাশ্‌তা তৈরি, অর্থাৎ বাঙালির কৃষ্টি ও বাঙালির ঐতিহ্যের দ্বারা একটি সংবিধান রচনা করবার চেষ্টা করেছি।

আর, এই সংবিধান গ্রহণ করতে কারও কারও যে আপত্তি থাকে, সেই ক্ষেত্রে একটা উদাহরণের কথা আপনার কাছে আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই। একজন বিশিষ্ট মনীষীর কাছে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী নিতে গিয়েছিলেন এক ভদ্রলোক। প্রফেসার সাহেব তাঁকে বললেন যে, আপনি এ সম্পর্কে থিসিস্‌ লিখে আনুন। তিনি বহু ঘাঁটাঘাঁটি করে একটি article লিখে আনলেন। সাতদিন পরে সেই মনীষী তাঁর শিক্ষার্থীর খাতা দেখে বললেন, আমি শুধু আপনার মতামত চেয়েছিলাম। আমি জানি, আপনি বহু কষ্ট করে পৃথিবীর বহু পণ্ডিতের বিধান নকল করে, টুকে হুবহু লিখে দিয়েছেন। কিন্তু আমি তো তাঁদের মতামত চাইনি–আমি এ-বিষয়ে শুধু আপনার মতামত চেয়েছিলাম। এইভাবে শিক্ষার্থীটিকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল।

তাই আমি বলতে চাই, জনাব স্পীকার সাহেব, আজকে আমরা যদি হুবহু অন্য কোন দেশের শাসনতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করে না-থাকি, তাহলে সেটা আমাদের দোষ নয়। আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের নিজস্ব মত, আমাদের নিজেদের দেশে যে সম্পদ আছে, তাই দেবার জন্য। আর, সে ক্ষেত্রে যদি কেউ আমাদের সংবিধানের সমালোচনা করে এর অপব্যাখ্যা করেন, তাহলে সেটা সত্যি দুঃখের বিষয় হবে।

এ বিষয়ে আমার আর একটি উদাহরণ মনে পড়ল। কথায় বলে 'খ্যাপা কাপড় পরিস না কেন?' পাড় পছন্দ হয় না, তাই।'

এই সংবিধানের দুএক জায়গায় সমালোচনার বিষয়বস্তু থাকতে পারে। কারণ, এটা ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। আইন-মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এবং আরও যে ৩৪ জন সদস্য, যাঁরা দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করেছেন, তারপর এই পরিষদ সদস্যরা দিনের পর দিন আট-দশ ঘণ্টা করে খেটে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধানটিকে সুন্দর ও সফল করবার জন্য চেষ্টা করেছেন, সেটা সত্যি প্রশংসনীয়।

আমি স্বীকার করি, এর সমালোচনা বিষয়, সংশোধনের বিষয় থাকতে পারে। অন্যান্য দেশে যে সংবিধান আছে, তাদের সম্পর্কেও সুপ্রীম কোর্টে মামলা হয়। তাদেরও পরিবর্তন করতে হয়। তাদেরও amendment করতে হয়। এই সংবিধানেরও তাই দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন এখানে-ওখানে পরিবর্তিত হতে পারে। আগামী যুগের মানুষ, বাংলার মানুষ যদি মনে করে যে, এর পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, তাহলে তারা তা করবে তাদের কল্যাণের জন্য, তাদের মঙ্গলের জন্য।

আমাদের বিশ্বাস আছে, আগামী পার্লামেন্টে এর চেয়ে যোগ্যতর সদস্য আসবেন। তাঁর এসে এর উন্নতিকল্পে পরিবর্তন করতে পারেন, তাতে আমাদের লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

আমাদের যে বংশধর আসবে, তারা যাতে সুন্দরভাবে সাংগঠনিক কাজে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। আমরা সাফল্যের সঙ্গে দেশকে স্বাধীন

করেছি, সাফল্যের সঙ্গে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান দিয়ে দেশকে নির্বাচনের সামনে এগিয়ে দিয়েছি। নির্বাচনের ভয় আমরা করি না। যদি সামান্যতম উদ্দেশ্য এই পরিষদের থাকত, তাহলে পরিষদ ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারত।

বসবার আগে আমি আপনার মাধ্যমে আবার আমার সহকর্মী মাননীয় পরিষদ সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তার কারণ, তাঁরা প্রত্যেকেই এই সংগ্রামের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সকলে প্রত্যক্ষভাবে,ব্যক্তিগতভাবে, পরিবার-পরিজন নিয়ে, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের আজকের সাফল্য যে, তাঁরা সংবিধান দিলেন এবং দেশে নির্বাচন দিলেন। এর জন্য খসড়া সংবিধান -প্রণয়ন কমিটিতে যাঁরা আছেন–অবশ্যি আমিও একজন ছিলাম, কিন্তু আমার কথা নয়–অন্য সদস্য যাঁরা আছেন– তাঁরা যে পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের শ্রমের সাফল্য আমি কামনা করি।

বাংলার মানুষ তাদের এই সংবিধান নিয়ে, এই পবিত্র দলিল নিয়ে সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে।

আজকে গণতান্ত্রিক বিধির মাধ্যমে ৯১টি দেশ এদেশকে স্বীকার করেছে। সেই ৯১টি দেশের স্বীকৃতি যারা পেয়েছে, সেই গণতান্ত্রিক সমর্থনের মাধ্যমে, এই গণপরিষদের মাধ্যমে এই সংবিধান তৈরি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটা এ-দেশবাসী শুধু গ্রহণই করবে না–সারা বিশ্বে আলোড়নের সৃষ্টি করবে। এত অল্প দিনের মধ্যে এই বাঙালিরা তাদের নিজেদের ভাষায় নিজেদের সংবিধান রচনা করেছে।

১৯৪৮ সালের ভাষার লড়াইয়ে যারা প্রাণ দিয়েছিল, আজকে তাদের আত্মা আনন্দিত হবে এই ভেবে যে, আজকে যাঁরা সংবিধান রচনা করেছেন, সেই সংবিধান বাংলায় রচিত হয়েছে। হয়তো বাংলা শব্দ সম্পর্কে এখানে-ওখানে দু-একটি ইংরেজি শব্দ থাকতে পারে। আমার কথা হল, এই গণপরিষদের বিজ্ঞ সদস্যদের দ্বারা সংশোধিত হোক।

আর, আমি ড্রাফ্‌ট্ কমিটির আলাপ-আলোচনার সময় বার বার এ কথা বলেছি যে, একজন সদস্যও যদি নীতি সম্পর্কে একটি শব্দও দেন, সেটিও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে এবং এ রকম বহু শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে। সংবিধান-প্রণয়ন কমিটিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সেই সংবিধানই যে হুবহু ঠিক রাখতে হবে, একটি শব্দও বদলানো যাবে না, এমন কোন কথা আমি বলি না।

পরিশেষে, আমি বিশ্বাস করি, এই সংবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে যে স্বীকৃতি পৃথিবীর মানুষ আজকে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে বাংলায় আমাদের যে সমস্যা–শোষণ, অবিচার, অনাচার, বিদ্বেষ, এখানে-ওখানে ছোটখাট কলঙ্কময় দৃষ্টান্ত, সেই সমস্তের কবরের উপর আজকে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং secularism-এর উপর নির্ভর করে আমরা যে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের যে ভিত্তি স্থাপন করেছি, সেই রাষ্ট্রের মধ্যের অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে। এই সংবিধানের মাধ্যমে যে মঙ্গলদীপ জ্বলবে, সেই মঙ্গল-দীপের আলোকে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ বংশধররা চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমার বক্তৃতা লম্বা করব না; কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলেই শেষ করব। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটের শতকরা ১৬ ভাগ প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য বরাদ্দ করেছেন। মানুষের বেঁচে থাকা যেমন প্রয়োজন রাষ্ট্রের পক্ষে দেশরক্ষাও তেমনি প্রয়োজন। সরকার জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন; আমরা কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হব না; সব রাষ্ট্রই আমাদের বন্ধু। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায় আত্মরক্ষার। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তাই দেশরক্ষার জন্য আমাদেরকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। Defence Budget করা হয়েছে ৪৭ কোটি টাকা মাত্র–জল, আকাশ এবং স্থলবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করতে হবে। তুলনামূলকভাবে দেখা যায় রক্ষীবাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫ কোটি ৮২ হাজার টাকা। তারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে। জল, আকাশ এবং স্থল–এইটির হিসাবে দেখা যায় এক একটির জন্যে প্রায় ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমার মনে হয় প্রত্যেক বাহিনীর জন্য এর ৩গুণ অর্থাৎ ৪৮ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা প্রয়োজন ছিল। যারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, Civil Government-কে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে তাদের রণ-সম্ভার বেশি থাকবে। যারা শত্রুর সাথে মোকাবেলা করবে, তাদের থাকতে হবে heavy arms and ammunition এবং এজন্য সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সরকারকে মনোনিবেশ করতে হবে। Defence-এর জন্য পাকিস্তান আমলে বাজেটের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় করা হতো। আমি এতটা অনুরোধ করছি না। আমার মনে হয় শতকরা ১৬ ভাগ থেকে বাড়িয়ে অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ Defence Budget-এ বরাদ্দ করা উচিত ছিল। এতে ক্ষতি হতো না।

মাননীয় স্পীকার সাহেব রাষ্ট্রীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষা, কৃষি, দেশরক্ষা এবং তারপর হচ্ছে শিল্প। সুতরাং, সরকার যদি এগুলোর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি না-দেন, তাহলে কোনদিনই মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবেন না।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমার কথা আর লম্বা করতে চাই না। সমাজকল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেটা বাজেটে আয়-ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবেনা। সব কিছুর সার্বিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সঠিকভাবে গড়ে না– উঠলে মানুষের জীবনে নিশ্চয়তা আসবে না।

তারপর, জনাব স্পীকার সাহেব, নিষিদ্ধ পল্লীতে যারা পড়ে আছে, তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পণ্যদ্রব্যের মত অসহায় অবস্থায় তারা নিজের জীবনকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। সংবিধানে Part II, এখানে

---

* সংসদ-বিতর্ক, ২৩ জুন ১৯৭৩, খন্ড-২, সংখ্যা-১৭, পৃঃ ৬৫৮-৬৬৩

Fundamental Principles of State Policy-এ আছে, সেখানে Clause 18(2)-তে এই অবস্থা প্রতিকারের উল্লেখ আছে। আইন করে এই নীতিকে কার্যকরী না করলে সংবিধানে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মানবিকতার মূল্যায়ন করতে হবে, সংবিধান করার সময় যদি আমরা এ-বিষয় অনুধাবন করতে না পারতাম, তাহলে এই অনুচ্ছেদ সংবিধানে সন্নিবেশিত হতো না। তাই, মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করব আইন করে একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে এই অসহায় নারীদের সমাজে পুনর্বাসন করতে হবে, যাতে তারা খেয়ে পরে বাঁচতে পারে এবং প্রকৃত মানুষের মত সমাজে বাস করতে পারে।

আর একটা কথা, মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাজেট বক্তৃতার কোথাও কারাগারের আমূল সংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারাজীবন সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা নাই। কারাগারে কয়েদীরা যে কিভাবে বন্দী জীবনযাপন করছে, যারা কারাগারে গিয়েছেন, তারাই তা পরিষ্কারভাবে জানেন, বিশেষ করে, তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরা কিভাবে সেখান জীবনযাপন করছেন। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীর সেটা জীবন নয়।

জনাব স্পীকার : শ্রীলারমা, আপনি কি কখনও কারাগারে গিয়েছেন?

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : আইয়ুব খান আমাকে ২ বৎসর জেলে রেখেছিলেন এবং ১ বৎসর গৃহে অন্তরীণ রেখেছিলেন।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে দুই বৎসর জেলে ছিলাম। নিরাপত্তা আইনে বন্দী হয়ে আমি জেলে যাই এবং আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী-হিসাবে রাখা হয়। "একখানা থালা আর ২ খানা কম্বল- এই হল জেলখানার সম্বল" জেলখানার সবাই এই ছড়া বলত। সেখানে জীবন বলতে কিছু নাই। সেখানকার কষ্টের কথা কত আর বলব। প্রথম প্রথম আমি প্রশ্রাব পায়খানায় যেতে পারতাম না। একটা ড্রামের মধ্যে প্রশ্রাব পায়খানা; তাও আবার পর্দা নাই। জেলখানার সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন আজও হয় নাই। একটা লম্বা shed-এ যে রকম অবস্থায় মধ্যে মানুষকে রাখা হয় সেখানে কোন মানুষ থাকতে পারে, সে কথা কেউ চিন্তা করতে পারবেন না। একজন যদি রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে বা অন্য কোন ফৌজদারী অপরাধে বন্দী হয়ে জেলে থাকে, তাহলে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আসার সুব্যবস্থা রেখে দেওয়া উচিত। জেলে যেসব criminal আসামী থাকে, তাদের জন্যও এমন কোন ব্যবস্থা নাই যে, তারা জেল থেকে ফিরে এসে সৎজীবনযাপন করতে পারবে। একজন আসামী যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে জেলে থেকে ১২ বৎসর পরে যখন সে বাইরে আসে, তখন সে তার সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখে না। একেবারে বৃদ্ধ বয়সে ফিরে এসে তার বাঁচবার কোন অবলম্বন থাকে না। একজন অপরাধ করে জেলে গেলে জেল থেকে ফিরে তাকে ঠিকভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকার করেন না। জেলে থাকাকালে তার অপরাধ-প্রবণতা থেকে তাকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা করা হয় না। মাননীয় জজ সাহেব বিচার করে একজন খুনীকে জেলে পাঠালেন বা চোরকে জেলে পাঠালেন। সে কারাগারে গেল। কিন্তু তাতে কোন সমস্যার সমাধান হলো না। এ পর্যন্ত কতজনের প্রাণদণ্ড হলো, কতজনের সশ্রম কারাদণ্ড হলো, কিন্তু তবুও কি অপরাধের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হলো?

তাই দেখতে হবে সমস্যা কোথায়। মানুষ যদি খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে সে অপরাধ করে না। আজকের মানুষের সামনে যে প্রধান প্রধান সমস্যা রয়েছে, সেগুলি আমি জাতীয় সংসদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আজকে প্রশ্ন হলো যে, দেশকে যদি উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে একটা মৌল পরিবর্তনের প্রয়োজন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা–এই প্রধান সমস্যা দূর করতে পারলে সব সমস্যারই সমাধান হয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন খাতে কর আরোপের ব্যবস্থা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে ছাতার কাপড়ের উপর কর এবং ছাতার শিকের উপর কর। এ সম্বন্ধে অনেক সদস্য আলোচনা করেছেন। ছাতা এমনিতে আমাদের দেশে ৩৫ টাকার নিচে পাওয়া যায় না। তার উপর যদি ছাতার কাপড় এবং শিকের উপর কর আরোপ করা হয়, তাহলে তার দাম অনেক বেড়ে যাবে। বাজেট পাস হবার আগেই অসাধু ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারের উচিত এইসব অসাধু ব্যবসায়ী যারা আমাদের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র আঁটছে, তাদেরকে উৎখাত করে সাবলীল জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য কর্মপন্থা গ্রহণ করা। "দৈনিক ইত্তেফাকে" প্রকাশিত একটি আবেদনে বলা হয়েছে যে, কর আরোপের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য যেন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করা না-হয় এবং আইন-মত যেন জিনিসের দাম বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সংবিধানের ৮৩ ধারা অনুযায়ী "সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা হবে না।" একথা পরিষ্কার করে লেখা আছে। সুতরাং অসাধু ব্যবসায়ীরা নানা অজুহাতে যে দাম বাড়াবার ব্যবস্থা করছে, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশের সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন করে তার বণ্টন ও মূল্য নির্ধারণ সরকারকেই ঠিক করতে হবে এবং অসাধু ব্যবসায়ীরা তা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করলে তাদের দমন করতে হবে। আজ মানুষের মনে একটা প্রশ্ন জাগছে যে, কত সরকার এল আর গেল, কিন্তু মানুষের ভাগ্যে কোন পরিবর্তন এল না। সুতরাং আজকে যে সরকার রয়েছে তা জনগণের সরকার; এদের উচিত খুঁটিনাটি সব সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। খুঁটিনাটি সমস্যার দিকে দৃষ্টি না-দিলে বড় বড় সমস্যার সমাধান করবে কি করে?

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে সিগারেটের উপর সামান্য কর আরোপের প্রস্তাবে বাজারে সিগারেটের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমি মনে করি সিগারেটের উপর এই কর প্রত্যাহার করা উচিত। অর্থমন্ত্রী সাহেব যে-কর আরোপ করেছেন, আমি তার সমালোচনা করব না। আমি তাঁকে অনুরোধ করব এই কর প্রত্যাহার করুন। ঢেউটিনের উপর যে কর বৃদ্ধি করেছেন, তা প্রত্যাহার করা উচিত। সিমেন্টের উপর যে কর ধার্য করেছেন, তাও প্রত্যাহার করা উচিত। তারপর আমি বলব পশমী কাপড়ের উপর ধার্য কর সম্বন্ধে। পশমী কাপড়ের উপর কর বৃদ্ধি করে ১২৫ টাকা থেকে ১৭৫ টাকা করা হয়েছে। এই কর প্রত্যাহার করা উচিত। ১৯৭২ সালের অক্টোবর, নভেম্বর মাসে ABC Wool-এর পাউন্ড ছিল ২৮ টাকা থেকে ৩২ টাকা আর এখন হয়েছে প্রতি পাউণ্ড ১০০ টাকা থেকে ১৩০ টাকা। আর এই কর আরোপের ফলে কি অবস্থা হবে তা আমরা বেশ বুঝতে পারছি। অবশ্য আমাদের দেশে কিছুসংখ্যক লোক আছে, যারা যে কোন দামে যে কোন জিনিস কিনতে পারবে। আমি সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

লোকের কি গরম কপড়ের প্রয়োজন হয় না? আমি মনে করি পশমী কাপড়ের উপর আরোপিত কর প্রত্যহার করা উচিত।

এবার আমি কৃষি আয়কর সম্বন্ধে বলব। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কৃষি আয়কর আইন সংশোধন করে কৃষি আয়কর সাধারণ আয়করের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। এর ফলে ১০০ বিঘার মালিক যে চাষী তার কৃষি আয় ২,০০০ টাকার বেশি হলে তা তার সাধারণ আয়ের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হবে। এর ফলে চাষীর উপর অধিক কর পড়বে। সরকার একদিকে ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মাফ করার ব্যবস্থা করছেন, আর অন্যদিকে তাদের উপর অধিক কর চাপাবার জন্য আইনের পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন। সরকারের কর আরোপের এই প্রস্তাব বাতিল করা উচিত।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এবার আমি উন্নয়ন ও পুনর্গঠন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলব। আমরা আমাদের উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক ঋণ কোন্ কোন্ দেশ হতে কিভাবে নেবো, তা মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাহেব পরিষ্কার করে কিছু বলেন নাই। এই প্রকার বৈদেশিক ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কত দেশ, কত রাষ্ট্র আজকে গৃহযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হলে তা ভালভাবে যাচাই করে নিতে হবে। অনেক রাষ্ট্র আছে, যারা বন্ধু সেজে ঋণ দিয়ে পরে তার অছিলায় আমাদের ঘর ভাঙ্গার চেষ্টা করতে পারে। যে সব বৈদেশিক ঋণের সঙ্গে কোন শর্ত থাকে সেইসব শর্ত কি এবং ঋণ স্বল্প-মেয়াদী, না দীর্ঘ-মেয়াদী, সবকিছু ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করে তবে যেন বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হয়।

কৃষির উন্নয়নের দিকে যেমন আমাদের নজর দিতে হবে, তেমনি আমাদের শিল্প ও কলকারখানার দিকেও নজর দিতে হবে। শিল্পক্ষেত্রে আমরা যেন পিছনে পড়ে না-থাকি এবং শিল্পোন্নতিতে আমরা যেন অন্যান্য রাষ্ট্রের বা উন্নতিশীল দেশের সম মর্যাদায় পৌছাতে পারি, সেদিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের যে সব কলকারখানা এখনও অকেজো বা অক্ষম হয়ে পড়ে আছে, সেগুলি আস্তে আস্তে কার্যক্ষম করতে হবে এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে উন্নতমানে নিয়ে যেতে হবে। আমরা যেন সব বিষয়ে স্বনির্ভরশীল হতে পারি। সেদিকে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের সক্ষম ও শক্তির সঠিক ও সার্বিক মূল্যায়ন। সার্বিক যে মূল্যায়ন, তার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ সুখ চায়, চায় তাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠা। এই জাতীয় সংসদের বাজেট আলোচনার সময়ে আমি একটা আবেদন রেখে যেতে যাচ্ছি–

যে অঞ্চল থেকে আমি এসেছি, সে অঞ্চল বাংলাদেশের একটা পিছিয়ে-পড়া অঞ্চল। আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না যে, আমাদের ওখানে এখনও আদিম যুগের মানুষ রয়েছে। সেই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এই বাজেটে তেমন কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। "ফলের বাগানের" জন্য বাজেটে একটা বরাদ্দ হয়েছে–যেটা প্রত্যেক বছর হতো–সেটাই হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম যদি পিছনে পড়ে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের স্বাভাবিক যে উন্নতি, তা ব্যাহত হবে। আমাদের এই পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরং ও চাক–এই দশটি ছোট ছোট উপজাতি বাস করে। তাদের মধ্যে মুরং, খুমি, খিয়াং, পাংখো ও বোম উপজাতিরা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়ে আছে। আপনারা বিশ্বাস করবেন না এরা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় এখনও বাস করে। পাহাড়ের পর পাহাড়। তার উপর আমরা বাস করি। সেই পাহাড়ের উঁচু উঁচু চূড়া; সেখানে

চিরহরিৎ বৃক্ষের বন। এক পর্বতশ্রেণীর পর আর একটি পর্বতশ্রেণী, মাঝখানে রয়েছে উপত্যকা। দুঃখের ব্যাপার, বর্তমান যুগের শিক্ষা কিংবা উন্নতির কোন আলোই আমরা আজও পাইনি! মাননীয় স্পীকার সাহেব, ব্রিটিশের সময়ে এবং পাকিস্তানের আমলে আমাদেরকে চিড়িয়াখানার জীবের মত করে রাখা হয়েছিল। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের আমলে আমাদেরকে পাকিস্তান-বিরোধী এবং ভারতের দালাল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছি এবং কামনা করেছি আমাদের জন্য পরিবর্তন আসবে।

যে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নতি সাধিত হচ্ছে সেই কাপ্তাই বাঁধ এলাকার উচ্ছেদকৃত লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এখনও শেষ হয়নি।

কাপ্তাই বাঁধ ঐ এলাকার মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে দিয়েছে। কাপ্তাই বাঁধ আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এ বাঁধের এলাকার উচ্ছেদকৃত লোকের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থাই সরকার করেনি। একবার হয়তো তাদের কিছু পুনর্বাসন করা হয়, আবার সরকারের নির্দেশে তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। এটা একটা মহা সমস্যা। এটা একটা জগদ্দল পাথরের মত আমাদের উপর চেপে আছে। পাকিস্তান সরকার এই সমস্যা সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার কোনও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বর্তমান সরকার এটা দূর করে দিয়ে কাপ্তাইয়ের হাজার হাজার মানুষকে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতির সঙ্গে জড়িত করে নিন- এই আমার আবেদন। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিও দৃষ্টি নিন। সেখানে রাস্তাঘাট বলতে তেমন কিছুই নেই।

চট্টগ্রাম–রাঙ্গামাটি এবং চট্টগ্রাম–কাপ্তাই–এই দুইটি মাত্র পাকা রাস্তা পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকায় আছে। আমার বাড়ি রাঙ্গামাটি থেকে ৫৬ মাইল দূরে। একবার বাড়ী গেলে রাঙ্গামাটি আসতে ইচ্ছে হয় না। রাঙ্গামাটি আস্‌লে আমার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় না। ঝোলা কাঁধে নিয়ে পরিধেয় কাপড় হাঁটু পর্যন্ত ভাঁজ করে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। মাননীয় সদস্যা এবং সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ থাকল আপনারা, বৃটিশ আর পাকিস্তান পার্বত্য চট্টগ্রামকে যেভাবে রেখেছিল সেভাবে আর রাখবেন না। আপনারা যদি আমাদেরকে পিছনে রাখেন, তাহলে কোন দিন বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি হবে না। একটা ক্ষত যদি শরীরে থাকে, তবে সর্ব শরীরে যেমন তীব্র যন্ত্রণা অনুভব হয়, সে রকমভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পিছনে রেখেও বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই আমার নিবেদন। পরিকল্পনা যেন এমনভাবে গ্রহণ করা হয়, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে পিছনে পড়ে না থাকে। আমরাও যেন আপনাদের সাথে সমান তালে উন্নতির পথে চলতে পারি, আপনাদের সাথে সমানভাবে এগিয়ে যেতে পারি; সেইভাবে আপনারা পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ প্রতিটি পিছিয়ে-পড়া অঞ্চল একতালে এগিয়ে যেতে পারে। মাননীয় সদস্যা এবং সদস্যদেরকে আর বিরক্ত করব না। আমার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত করলাম। ধন্যবাদ।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

জনাব ডেপুটি স্পীকার : এখন মানবেন্দ্র নাথ লারমা বলবেন।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি আমাকে যে নাম ধরে বারবার ডাকছেন, আমার নাম তা নয়। আমার নাম মানবেন্দ্রনাথ লারমা নয়, আমার নাম মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের দেশের জন্য যে সংবিধান আমরা রচনা করতে যাচ্ছি, আপনার মাধ্যমে আজকে এই মহান গণপরিষদে দাঁড়িয়ে সেই সংবিধানের উপর আমি কিছু আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে। আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যাঁরা কারাগারে তিল তিল করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসককে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাসি-মুখে হাতকড়া পরেছিলেন, হাসি-মুখে ফাঁসিকাষ্ঠকে বরণ করেছিলেন, তাঁদেরকে।

১৯৪৭ সালের পর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এ দেশ থেকে চলে যাওয়ার পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্য যে কৃত্রিম স্বাধীনতা হয়েছিল, সেই কৃত্রিম স্বাধীনতার পর থেকে যেসব বীর, যেসব দেশপ্রেমিক নিজের জীবন তিলে তিলে চার-দেওয়ালের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে উৎসর্গ করেছিলেন স্বাধিকার আদায়ের জন্য; যাঁরা নিজেদের জীবন উপেক্ষা করে স্বাধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের কথা আজকে আমি স্মরণ করছি, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আজকে এখানে যাঁরা সমবেত হয়েছেন, যে মাননীয় সদস্য-সদস্যাবৃন্দ রয়েছেন, তাঁদেরকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

তারপর, আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি গত এপ্রিল মাসে যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেই কমিটির সদস্য-বন্ধুদের।

সর্বশেষে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমাদের শ্রদ্ধেয় জননেতা, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আজকে আমরা এই গণপরিষদ-ভবনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছি। এই ইতিহাসের পিছনে রয়েছে কত করুণ কাহিনী, কত মানুষের অঝোর ধারায় কান্নার কাহিনী, বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের করুণ আর্তনাদ। তাই আজকে আমরা সেসব মানুষের কথা স্মরণ করে যদি

---

*পরিষদ-বিতর্ক রিপোর্ট, খন্ড ২, সংখ্যা ৯, ২৩ অক্টোবর, ১৯৭২, পৃঃ ২৭৬-২৮৭

বিবেকের প্রতি এতটুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগিয়ে যাই, তাহলে এই কথাই আমরা বলব আজকে এখোনে দাঁড়িয়ে যে পবিত্র শপথ আমরা নিয়েছি, সেই পবিত্র শপথ নিয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য যে পবিত্র দলিল আমরা দিতে যাচ্ছি, সেই পবিত্র দলিলে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে কিনা, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা অর্থাৎ তারা যে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে চায়, সে কথা এই সংবিধানে ব্যক্ত হয়েছি কিনা।

তাই মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে যে কথা তুলতে যাচ্ছি, তাতে যদি কোন ভুল-ক্রটি থাকে, তাহলে আমি তা শুধরে নিতে চাই কিন্তু আমি মনে করি, আমি আমার বিবেক থেকেই এসব কথা বলছি। আমি কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কিছুই বলতে যাচ্ছি না। যেহেতু আমি একজন নির্দলীয় সদস্য, যেহেতু আমি এই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষেরই একজন হয়ে আজকে গণপরিষদ ভবনে আমার মতামত প্রকাশ করতে যাচ্ছি, সাড়ে সাত কোটি মানুষের নিকট প্রকাশ করতে যাচ্ছি, তাই সংবিধানের উপর আমার কোন চুল-চেরা ব্যাখ্যা নেই। আমার যে-ব্যাখ্যা, আমার যে-মত, আমার যে-বক্তব্য, তার সবই দেশের প্রতি ভালবাসার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। যেভাবে আমার দেশকে ভালবেসেছি, আমার জন্মভূমিকে ভালবেসেছি, যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আমার দেশকে, আমার জন্মভূমিকে, এ দেশের কোটি কোটি মানুষকে দেখেছি, সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমি খসড়া সংবিধানকে দেখতে যাচ্ছি।

তাই আমি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য-বন্ধুদের বলছি যে, খসড়া সংবিধান তাঁরা গত জুন মাসে দিতে পারেননি যদিও গত জুন মাসের ১০ তারিখে দেয়ার কথা ছিল। আজকে এই অক্টোবর মাসে আমাদের এই খসড়া সংবিধান তাঁরা দিয়েছেন। এই খসড়া সংবিধান আমরা জুন মাসে পাইনি সেজন্য দুঃখিত নই। অক্টোবর আর জুন মাসের মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েকটি মাসের। সে জন্য আমার ব্যক্তিগত অভিমত, আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু এখানে আমার আপত্তি হচ্ছে এই যে, যে কমিটিকে আমরা এ দেশের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্যনির্ধারণের ভার দিয়েছিলাম, সেই কমিটি-প্রদত্ত সংবিধান আজকে আমাদের হুবহু গ্রহণ করতে হচ্ছে।

এই পরিষদের সামনে আমার বক্তব্য হল, আজকে খসড়া সংবিধান যদি এই গণপরিষদের এইভাবে গৃহীত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার যে আপত্তি আছে, সে আপত্তি হল আমার বিবেক, আমার মনের অভিব্যক্তি বলছে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে নাই। যদি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে থাকত, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না। কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি, পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহরী, কর্ণফুলী, যমুনা ও কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে

ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আমি বলছি, আজকে যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি।

আজকে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আপনারা বাংলাদেশের মেহনতী মানুষের কথা সমাজতন্ত্রের নামে, গণতন্ত্রের নামে বলে চলেছেন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, সংসদীয় অভিজ্ঞতা আমার সে রকম নাই। তবু আমার বিবেক বলছে, এই সংবিধানের কোথায় যেন গলদ রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে যাঁরা কল-কারখানায় চাকা, রেলের চাকা ঘুরাচ্ছেন, যাঁদের রক্ত চুইয়ে আজকে আমাদের কাপড়, কাগজ, প্রতিটি জিনিস তৈরি হচ্ছে, সেই লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের মনের কথা এখানে নাই।

তারপর আমি বলব, সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ, তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ।

মিসেস্ সাজেদা চৌধুরী (এন. ই.-১৬৫ : মহিলা-৩) : On a point of order, Mr. Speaker, Sir. উনি বলেছেন যে, নারীর অধিকার দেয়া হয়নি। আমি উনাকে দেখিয়ে দিতে পারি যে, নারীর অধিকার সম্পূর্ণরূপে রয়েছে এবং এই সংবিধানে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : জনাব স্পীকার সাহেব, আমি মাননীয় সদস্যার যুক্তি খণ্ডন করতে চাই না। তবে আমি যা বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এই যে, আজ পল্লীর আনাচে-কানাচে আমাদের যে সমস্ত মা-বোনকে তাদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, তাদের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি। এই সংবিধানের সেই-মা-বোনদের জীবনের কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি। যদি এটা আদর্শ সংবিধান হত, যদি এটা গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সংবিধান হত, তাহলে আজকে যারা নিষিদ্ধ পল্লীতে নিজেদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেছে, তাদের কথা লেখা হত, তাদেরকে এই নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে আনার কথা থাকত; কিন্তু তাদের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের কথা, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা এই সংবিধানে নাই।

এই সংবিধানে মানুষের অধিকার যদি খর্ব করা হয়ে থাকে, তাহলে আজকে ৩০ লক্ষ শহীদের কথা স্মরণ করে, অতীতের ইতিহাস স্মরণ করে আমি বলব যে ইতিহাস কাউকে কোন দিন ক্ষমা করেনি, করবেও না–ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর।

আমরা দেখেছি ১৯৫৬ সালের সংবিধান, যে সংবিধানকে আইয়ুব খানের মতো একজন সৈনিক লাথি মেরে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে পাকিস্তানের বুকে স্বৈরাচারী সরকার গঠন করেছিল। তারপর ১৯৬২ সালে তার মনের মতো একটি সংবিধান রচনা করে সেটাকে দেশের বুকে চাপিয়ে দিয়ে ভেবেছিল যে, তাঁর এই সংবিধান এ দেশের মানুষ গ্রহণ করবে। কিন্তু এ দেশের মানুষ সেটা গ্রহণ করেনি।

এই সংবিধানও যদি সে ধরনের হয়ে যায়, তাহলে ইতিহাস কি আমাদের ক্ষমা

করবে? তাই ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মতো, ১৯৬২ সালের সংবিধানের মতো এই সংবিধানকেও কি আমরা হতে দিব? আমার বিবেক বলছে, আমরা এমন সংবিধান চাই না। আমরা এমন সংবিধান চাই, যে সংবিধান আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটা পবিত্র দলিল হয়ে থাকবে। সে রকম সংবিধানই আমরা চাই। আমার যা মনের কথা, তা আমি ব্যক্ত করলাম।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমরা অতীতকে ভুলতে পারি না। অতীত যত তিক্তই হোক– তাকে টেনে আনতেই হবে। অতীতকে যদি আমরা টেনে না-আনি, তার থেকে যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ না-করি, সেই অতীতের গ্লানিকে যদি আমরা মুছে ফেলার চেষ্টা না করি, তাহলে কেমন করে আমরা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব, কেমন করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব? ভুলের মাশুল আমরা অনেক দিয়েছি, আর দিতে চাই না। আবার কেন ভুল হবে? ভুলের মাশুল আবার কেন দিতে হবে? অতীতের নেতৃবৃন্দ যে সব ভুল করেছেন, সেই ভুল আমরা যেন পুনর্বার না করি।

আমি বলছি না যে, অতীতকে আমি ধরে থাকব। অতীতের কথা আমি বলছি, তার অর্থ এই নয় যে, অতীতকে আমি ধরে থাকতে চাই। বরং ভবিষ্যৎকে কলুষমুক্ত করার জন্যই আমি অতীতের কথা স্মরণ করছি। অন্যথায়, অতীতের কথা বলবার আমার অন্য কোনই উদ্দেশ্য নাই।

সংবিধানে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মনের কথা যদি সত্যিকারভাবে লিপিবদ্ধ হত, তাহলে আজকে নির্দলীয় সদস্য হিসাবে আমি এই সংবিধানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে পারতাম। অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে না-পারার অনেক কারণের মধ্যে এক কারণ হল : এখানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিগুলি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

মাননীয় স্পীকার, এই দলিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, এক হাতে অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং অন্য হাতে সেটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, সংবিধানের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

"১০। মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।"

এবং

"২০। কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়; এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"– এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।"

মাননীয় স্পীকার, আজকে এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, একদিকে হিংসাদ্বেষ-বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েচে, আর অন্যদিকে উৎপাদনযন্ত্র ও উৎপাদন-ব্যবস্থাসমূহের মালিকানা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে শোষণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এমন একটা ক্ষমতা দেখতে পাচ্ছি, যে ক্ষমতাবলে সরকার একটা লোককে এক পয়সার অধিকারী হতে দেবেন এবং অন্য একটা লোকের জন্য এক কোটি টাকার মালিকানার অধিকার রেখে দেবেন।

[বাধা প্রদান]

মাননীয় স্পীকার, তাই এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা, প্রাণের কথা এখানে প্রতিফলিত হয়নি, শ্রমিকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, রিকশাওয়ালার কথা প্রতিফলিত হয়নি, মেথরের কথা প্রতিফলিত হয়নি। আজ এদের সবার জীবন, মেথরের জীবন, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন অভিশপ্ত। তাদের কথা, তাদের দাবি এখানে স্থান পায়নি। এই যে অভিশপ্ত জীবন, তাদের কথা আজকে সংবিধানে নাই।

তারা যদি আজ জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করতে যাচ্ছ– তাতে আমাদের কথা কি কিছু লিখেছ?" এই প্রশ্নের আমরা কী উত্তর দেব?

যে মেথরেরা দেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, আজ আমরা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে তাদেরকে কী আশ্বাসের বাণী শোনাচ্ছি? তাদের অভিশপ্ত জীবনকে সুখী করে তোলার মতো কতটুকু আমরা দিয়েছি, এই সংবিধানে কী প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি? কিছুই না।

আমাকে আজ বলতে হচ্ছে, বাংলাদেশে যারা সত্যিকারভাবে শোষিত, নিপীড়িত, তাদের কথা এই সংবিধানে নাই, হ্যাঁ, তাদেরই কথা এই সংবিধানে আছে, যারা শোষিত নয়, নির্যাতিত নয়, নিপীড়িত নয়।

[বাধা প্রদান]

মাননীয় স্পীকার, তাই আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে, প্রশ্ন করতে হচ্ছে যে, এটা কাদের সংবিধান? যদি জনগণের সংবিধান না-হয়, তাহলে আমরা দেশকে কেমন করে গড়ে তুলব; দেশের মানুষকে কেমন করে ভবিষ্যৎ সুখী জীবনের নির্ভরতা দান করব?

[বাধা প্রদান]

মাননীয় স্পীকার, আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমাকে বারবার বাধা দেওয়া হচ্ছে। অনেক মাননীয় সদস্য আমাকে বাধা দিচ্ছেন, যার ফলে আমি আমার.....

জনাব ডেপুটি স্পীকার আপনাকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারও নাই। কোন সদস্যের অধিকার নাই আপনাকে বাধা দেয়ার। আমি আপনাকে বলছি, আপনি মন খুলে বলে যান আপনার বক্তব্য।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : এর পর, বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি-সত্তার কথা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতির সত্তার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই।

আমি খুলে বলছি। বিভিন্ন জাতি-সত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না-বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে, বৃটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সব সময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল; অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান-প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা–পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার কাছে বিস্ময়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় এলাকা। এই এলাকার সেই সব ইতিহাসের কথা, আইনের কথা এই সংবিধানে কোথাও কিছু নাই।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই মহান পরিষদে দাঁড়িয়ে আজকে আমি আপনার মাধ্যমে একজন সরল মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছি। আমাদের এলাকাটা একটা উপজাতীয় এলাকা। এখানে বিভিন্ন জাতি বাস করে। এখানে চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরুং এবং চাক এইরূপ ছোট ছোট দশটি উপজাতি বাস করে। এই মানুষদের কথা আমি বলতে চাই।

এই উপজাতি মানুষদের কথা বৃটিশ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছিল। পাকিস্তানের মত স্বৈরাচারী গভর্নমেন্ট আমাদের অধিকার ১৯৫৬ সালের এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বীকার করে নিয়েছিল। জানি না, আজকে যেখানে গণতন্ত্র হতে যাচ্ছ, সমাজতন্ত্র হতে যাচ্ছে, সেখানে কেন আপনারা আমাদের কথা ভুলে যাচ্ছেন?

পৃথিবীর অনেক দেশেই সমাজতন্ত্র রয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নেও উপজাতিদের অধিকার আছে। পৃথিবীর আর একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত– আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু-রাষ্ট্র–আমরা সেখানে দেখি, তাদের সংবিধানে বিভিন্ন জাতিকে অধিকার দেওয়া হয়েছে। জানি না, আমার কী অপরাধ করেছি!

আমি যতদূর বুঝতে পারি, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি, আমি একজন মানুষ। এমন একজন মানুষ, যারা যুগ যুগ ধরে অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেই জাতির প্রতিনিধি আমি। আমার বুকের ভিতর কী জ্বালা, তা আমি বোঝাতে পারব না। সেই জ্বালা আর কারও ভিতর নাই। সেই জ্বালার কথা কেউই চিন্তা করেন নি।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, ১৯৪৭ সালে কেউ কি চিন্তা করেছিলেন যে, পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে? জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলেছিলেন, "Pakistan has come to stay." নিয়তি অদৃশ্য থেকে সেদিন নিশ্চয়ই উপহাসভরে হেসেছিলেন। সেই পাকিস্তান অধিকারহারা বঞ্চিত মানুষের বুকের জ্বালায়, উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

জনাব নূরুল হক (এন. ই.-১৪৭ নোয়াখালী-৩) বৈধতার প্রশ্ন ! জনাব স্পীকার সাহেব, আমার বৈধতার প্রশ্ন হল মাননীয় সদস্য বলেছেন, সংবিধানে উপজাতিদের অধিকারের কোন কথা নাই। আপনার মাধ্যমে আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে সকল প্রকার জাতির, কৃষক-শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের সর্বপ্রকার শোষণ হতে মুক্তিদানের কথা আছে। মাননীয় সদস্য ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমরা করুণার পাত্র হিসাবে আসিনি। আমরা এসেছি মানুষ হিসাবে। তাই মানুষ হিসাবে বাঁচবার অধিকার আমাদের আছে।

মিসেস্ সাজেদা চৌধুরী (এন.ই–১৬৫ : মহিলা-৩) : বৈধতার প্রশ্ন, জনাব স্পীকার সাহেব! শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলতে চেয়েছেন যে, সংবিধানে তাঁদের উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আমি বলব, তাঁরাও আজকে স্বাধীন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সঙ্গে তাঁদেরও একটা জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একটি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কি অধিক মর্যাদাজনক নয়?

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমি আমরা অভিব্যক্তি প্রকাশ করছি। আমি একজন নির্যাতিত্ অধিকার-হারা মানুষ। পাকিস্তানের সময় দীর্ঘ ২৪ বছর পর্যন্ত একটি কথাও আমরা বলতে পারিনি। আমাদের অধিকারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই অধিকার আমরা পেতে চাই এবং এই চাওয়া অন্যায় নয়। সেই অধিকার এই সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মতো যাতে সেই অধিকার আমরাও পেতে পারি, সেই কথাই আজকে আপনার মাধ্যমে পরিষদের নিকট নিবেদন করতে চাচ্ছি। সেই অধিকারের কথাই আমি বলতে চাচ্ছি। মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের দেওয়া হয়নি–যেমন দেওয়া হয়নি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষকে।

তাই আমি আমার কথা যদি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য-সদস্যাদের, ভাই-বোনদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমি মনে করব, আমার অভিব্যক্তি সার্থক হয়েছে। কারণ, আমার যে দাবি, সেই দাবি আজকের নয়। এই দাবি করেছি স্বৈরাচারী আইয়ুব ও স্বৈরাচারী ইয়াহিয়ার সময়ও।

আমরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে পিছনে পড়ে রয়েছি। অগ্রসর জাতির মতো শক্তিশালী দল গঠন করে দাবি আদায় করতে পারছি না। কারণ, এতে যতটা রাজনৈতিক সচেতনতার দরকার, ততটা রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব রয়েছে উপজাতিদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে তাই কথাপ্রসঙ্গে এই কথা বলতে চাচ্ছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বদৌলতে আজকে এই বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জল-বিদ্যুতের বদৌলতেই কল-কারখানা চলছে।

অথচ সেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে শোষণ করা হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে, যারা দেশকে গড়েছে, পাকিস্তানের শাসকরা তাদেরকে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার দেয়নি।

আমার বক্তব্য হলো, আজকে আমরা এই সংবিধানে কিছুই পাইনি। আমি আমার বক্তব্য হয়তো সঠিকভাবে বলতে পারছি না; কিন্তু আমার বক্তব্যের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক কিছুই নাই।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে আমাদের জাতির পিতা শ্রদ্ধেয় বঙ্গবন্ধুর কাছে যুক্ত-স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। এই স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনের কথা বলেছিলাম, আমাদের উপজাতিদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছিলাম। জানি না

[বাধা প্রদান]

জনৈক সদস্য : মিস্টার লারমা একটি পৃথক স্বায়ত্তশাসিত এলাকার দাবি জানাচ্ছেন। এইভাবে এক দিক দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানা হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই সংবিধানে আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা বঞ্চিত মানব। আমাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। এই সংবিধানের

বাইরের কোন কথা আমি বলতে চাচ্ছি না। আমার পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা সংবিধানে বলা হয়নি।

এই জন্য এই কথা বলছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা ইতিহাস। এই ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়েছে। আমি জানি না, আমাদের কথা তাঁরা কেমন করে ভুলে গেলেন? আমরাও যে বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত হয়ে গণবাংলার সঙ্গে এক হয়ে থাকতে চাই, সে কথা কি তাঁরা ভুলে গেছেন?

আমাদের এই সংবিধানের খসড়া তৈরি করার সময় তাঁরা অন্যান্য দেশের সংবিধান দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন বাংলাদেশের এক কোণায় রয়েছে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম। কিন্তু কিসের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসকে এখানে স্থান দেওয়া হয়নি।

আমরা জানি, ইতিহাসকে বিকৃত করা যায় না। কিন্তু আমরা কী দোষ করেছি? কেন আমরা অভিশপ্ত জীবন যাপন করব? পাকিস্তানের সময়ে ছিল আমাদের অভিশপ্ত জীবন। আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র হতে চলেছে। আমাদের অধিকার তুলে ধরতে হবে এই সংবিধানে। কিন্তু তুলে ধরা হয়নি। যদি আমাদের কথা ভুলে যেতে চান, যদি ইতিহাসের কথা ভুলে যেতে চান, তাহলে তা আপনারা পারবেন। কিন্তু আমি পারি না।

উপজাতিরা কী চায়? তারা চায় স্বাধীন গণপরিষদের অধিবেশনে তাদের সত্যিকারের অধিকারের নিশ্চয়তা।

স্পীকার : আপনার বক্তব্য বুঝতে পেরেছি। আমি আপনাকে অধিকারের প্রশ্নে বৈধতার প্রশ্নে কোন বক্তৃতা করতে দিতে চাই না। দয়া করে আপনি বসে পড়ুন।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, তাই আজকে বঞ্চিত মানুষের মনের কথা আমি আপনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। সেই বঞ্চিত মানুষের একজন হয়ে আমি বলতে চাচ্ছি আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা নির্যাতিত সেই বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে, সেই পাকিস্তান আমলের যে নির্যাতন ভোগ করেছি, সেই নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে চাই। আমরা চাই মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে।

এই খসড়া সংবিধান-প্রণয়ন কমিটি আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই খসড়া সংবিধান-প্রণয়ন করেছেন। এই খসড়া সংবিধানে আমাদের অবহেলিত অঞ্চলের কোন কথা নাই। তাই আজকে আমি বলতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ খসড়া সংবিধান-প্রণয়ন কমিটির কাছে কী অপরাধ করেছে, তা আমি জানি না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো বিভিন্ন জাতি-সত্তার ইতিহাস।

কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে-পড়া, নির্যাতিত জাতিকে অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করবে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।

জনাব ডেপুটি স্পীকার : আমি অনুরোধ করছি, দু-এক মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করলে পরিষদের কাজ মুলতবী ঘোষণা করতে পারি।

জনাব আছাদুজ্জামান খান (এন. ই.-৯০ ময়মনসিংহ-১৫) জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে আমি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, যখন স্পীকার কথা বলেন তখন কোন সদস্য যেন কথা না-বলেন।

জনাব ডেপুটি স্পীকার : আপনি দু-এক মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমার বক্তব্য দু-এক মিনিটের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। আপনি অনুমতি দিলে আমি বলতে পারব এবং আপনি অনুমতি না-দিলে আমি বলতে পারব না।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি বলতে চাই যে, মানুষের কথা এই সংবিধানে সংযোজিত করতে হবে। যদি মানুষের কথা এ সংবিধানে না-থাকে, তাহলে এই সংবিধান দিয়ে কী হবে?

জনাব ডেপুটি স্পীকার : আপনার বক্তৃতার প্রায় কথাই পুনরুক্তি।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমার বক্তৃতার কথাগুলি যদি পুনরুক্তি হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমার দোষ নয়। আমার কথার মাঝখানে অন্য কেউ বক্তৃতা দিতে শুরু করলে আমার বক্তৃতার খেই হারিয়ে যায়। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি যে কথা একবার শেষ করতে চাচ্ছি, সেই কথা বলার মাঝখানে যদি বাধা পড়ে, তাহলে নিশ্চয়ই পুনরুক্তি হবে।

আমার কথা হল, বঞ্চিত মানুষের কথা থাকতে হবে এবং সেই বঞ্চিত মানুষের মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসকে কেন এই সংবিধানে সংযোজিত করা হল না? যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার স্বীকৃত না-হয়, তাহলে এই সংবিধান তাঁদের কী কাজে লাগবে। আমি একজন মানুষ যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি, যে জন্মভূমিতে আজন্ম লালিত-পালিত হয়েছি, সে জন্মভূমির জন্য আমার যে-কথা বলার রয়েছে, সে কথা যদি প্রকাশ করতে না-পারি, যদি এই সংবিধানে তার কোন ব্যবস্থাই দেখতে না-পাই, তাহলে আমাকে বলতে হবে যে, বঞ্চিত মানুষের জন্য সংবিধানে কিছুই রাখা হয়নি। বঞ্চিত মানুষের সংবিধান এটা কিছুতেই হবে না, মানুষ এটাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে।

তাই আমার কথা শেষ করার আগে আমার কথাগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে চাই। এই সংবিধানে মানুষের মনের কথা লেখা হয়নি। কৃষক, শ্রমিক, মেথর, কামার, কুমার, মাঝি-মাল্লার জন্য কোন অধিকার রাখা হয়নি। পার্বত্য-চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের অধিকারের কথাও সংবিধানে লেখা হয়নি।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আপনার মাধ্যমে পরিষদের ভাই-বোনদের কাছে এ-কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জনাব ডেপুটি স্পীকার ঃ আগামীকাল সকাল ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করছি।

আ: রাজ্জাক ভূইয়া*
ও শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

জনাব আ: রাজ্জাক ভূইয়া আপনার প্রস্তাব পেশ করুন।

জনাব আ: রাজ্জাক ভূইয়া (ইন. ই. ১১৫ ঃ ঢাকা-১২) : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে,

"সংবিধান-বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক:

"৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

জনাব স্পীকার : পরিষদের সম্মুখে জনাব আবদুর রাজ্জাক ভূইয়া প্রস্তাব এনেছেন যে,

"সংবিধান-বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক :

"৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

ড. কামাল হোসেন (আইন ও সংসদীয় বিষয়াবলী এবং সংবিধান-প্রণয়ন মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই সংশোধনী গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি এবং এটা গ্রহণ করা যেতে পারে।

জনাব স্পীকার : শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (পি. ই.-২৯৯ : পার্বত্য চট্টগ্রাম-১) : মাননীয় স্পীকার সাহেব, জনাব আবদুর রাজ্জাক ভূইয়া সংশোধনী-প্রস্তাব এনেছেন যে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাঙালি' বলে পরিচিত হবেন।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল, সংবিধান-বিলে আছে, "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে"; এর সঙ্গে সুস্পষ্ট করে বাংলাদেশের নাগরিকগণকে 'বাঙালি' বলে পরিচিত করবার জন্য জনাব আবদুর রাজ্জাক ভূইয়ার। প্রস্তাবে আমার একটু আপত্তি আছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা, তাতে করে ভালভাবে বিবেচনা করে তা যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি।

আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষা বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সবদিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা চৌদ্দ পুরুষ–কেউ বলেন নাই, আমি বাঙালি।

---

*৩১ অক্টোবর ১৯৭২ খন্ড ২, সংখ্যা ১৩, পৃঃ ৪৫২-৪৫৩

আমার সদস্য-সদস্যা ভাই-বোনদের কাছে আমার আবেদন, আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙালি বলে পরিচিত করতে চায়.....

জনাব স্পীকার : আপনি কি বাঙালি হতে চান না?

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙালি জাতি বলে কখনও বলা হয় নাই। আমরা কোন দিনই নিজেদেরকে বাঙালি বলে মনে করি নাই। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাস হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি বলে নয়।

জনাব স্পীকার : আপনি বসুন। Please resume your seat.

শ্রীসুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত : মাননীয় স্পীকার সাহেব, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল, জনাব আবদুর রাজ্জাক ভূইয়া সাহেব যে সংশোধনী এনেছেন, তাতে মনে এ-প্রশ্ন জাগে যে বাংলাদেশী বাঙালি ছাড়া ভারতের কেউ বাস করেছে। আমি শুধু বলতে চাই যে, বাঙালি বলতে এইটুকু বোঝায় যে, যারা বাংলা ভাষা বলে তাদেরকে আমরা বাঙারি বলি।

জনাব স্পীকার : Please resume your seat. আপনি বসুন, আপনি বসুন। এখন পরিষদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে :

"৬ অনুচ্ছেদটির পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক ঃ

"৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন, তাঁরা বলুন 'হাঁ'।

['হাঁ'-ভোট গ্রহণের পর–]

আর যাঁরা এর বিপক্ষে আছেন, তাঁর বলুন 'না'।

['না'-ভোট গ্রহণের পর–]

আমার মনে হয়, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে এতএব, এই সংশোধনী গৃহীত হল।

এখন পরিষদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে :

"সংশোধিত আকারে ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংবিধান-বিলের অংশে পরিণত হোক।"

যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন, তাঁরা বলুন 'হাঁ'।

['হাঁ'-ভোট গ্রহণের পর–]

যাঁরা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে, তাঁরা বলুন 'না'।

['না'-ভোট গ্রহণের পর–]

'হাঁ জয়যুক্ত হয়েছে, 'হাঁ জয়যুক্ত হয়েছে, 'হাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে।

অতএব, সংশোধিত আকারে ৬ নম্বর অনুচ্ছেদটি সংবিধান-বিলের অংশে পরিণত হল।

শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (পি. ই.-২৯৯ : পার্বত্য চট্টগ্রাম-১) : মাননীয় স্পীকার আমাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে এই ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধিত আকারে গৃহীত হল। আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদস্বরূপ আমি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিষদের বৈঠক বর্জন করছি।

[অতঃপর মাননীয় সদস্য পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।]

গণপরিষদে সংবিধান-বিলের আলোচনায় 'লীডার অব দি হাউস' শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা*

জনাব স্পীকার : এখন 'লীডার অব দি হাউস' বক্তৃতা করবেন।

সদস্যগণ : জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী; পরিষদ্-নেতা) : জনাব স্পীকার সাহেব, আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম যে, বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র দিচ্ছে। বোধহয় না সত্যিই এটা প্রথম যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে এসে তাঁদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র দিচ্ছেন।

আজ আমাকে স্মরণ করতে হয়, আমাকে অনেকদিনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। তদানীন্তন ভারতবর্ষ-বাংলাদেশ যাকে আমরা sub-continent বলতাম, সেখানে সে যুগে যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম হয়েছে, তার হিসাব করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীরাই রক্তদান বেশি করেছে। তার স্বাক্ষর আছে চট্টগ্রামের জালালাবাদে, স্বাক্ষর আছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মা-বোনদের কাছে।

বাংলার এমন কোন জেলা, মহকুমা ছিল না, যেখানে ইংরেজ-আমল থেকে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে নাই। সেই আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে, সিপাহী বিদ্রোহ এই বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল।

তারপর, বাংলাদেশের অফিসাররা বহু যুদ্ধ করে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে বারবার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তারা জেল ভোগ করেছে অনেক। তাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু দুঃখ, বাঙালির জীবনে সুখ কোনদিন আসেনি। বাংলার সম্বন্ধে ঠাট্টা করে আমাকে একজন বলেছিল, তোমার বাংলা উর্বর জমিই তোমার দুঃখের কারণ। তাই বারবার দেখা গেছে, শকুনিরা এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কারণ, তারা এ দেশের অর্থ-সম্পদের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল।

জনাব স্পীকার সাহেব, সমস্ত দুনিয়া এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষে যারা শোষক ছিল, তারা বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে বাংলার মাটি থেকে। গৃহহারা, সর্বহারা কৃষক, মজুর দুখী বাঙালি, যারা সারা জীবন পরিশ্রম করেছে, খাবার পায় নাই, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার বন্দর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে বোম্বের বন্দর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে মাদ্রাজ, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে করাচী, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে ইসলামাবাদ, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে লাহোর, তাদের সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে ডান্ডি, গ্রেট-বৃটেন। এই বাংলার সম্পদ বাঙালির দুঃখের কারণ ছিল।

---

* পরিষদ-বিতর্ক; খণ্ড ২, সংখ্যা ৭, পৃঃ ৬৯৪-৭০৭, নবেম্বর ৪, ১৯৭২

সংগ্রামী বাঙালিরা বারবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তিতুমীর, যুদ্ধ করেছে হাজী শরীয়তউল্লাহ্। তাদের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। কারণ, বাঙালি আজ শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে।

স্মরণ করতে হয় শেরে বাংলা ফজলুল হকের কথা। স্মরণ করতে হয় সোহ্‌রাওয়ার্দী মরহুমের কথা। আরও স্মরণ করতে হয় মানিক মিয়ার কথা, যিনি তাঁর কলম দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। স্মরণ করতে হয় সেই সব সহকর্মীদের আত্মত্যাগের কথা, যাঁরা জীবন দিয়েছেন এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে।

স্বাধীনতা-সংগ্রাম কেবল নয় মাসই হয় নাই– স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে। তারপর, ধাপে ধাপে সে সংগ্রাম এগিয়ে গেছে। সে সংগ্রামের একটা ইতিহাস আছে তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিতে হয়। একদিনে সে সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছে নাই।

নয় মাস আমরা যে চরম সংগ্রাম করেছি, সে সংগ্রাম শুরু করেছি বহুদিন থেকে।

১৯৪৭ সালে ভাগ করে সংখ্যায় 'মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও বাঙালিরা সব কিছু হারিয়ে ফেলল। জনাব জিন্নাহ্ সাহেব, যাঁকে অনেকে তখন নেতা বলে মানতাম, বাঙালিকে এক শকুনির হাত থেকে আর এক শকুনির হাতে ফেলে দিয়ে করাচীতে রাজধানী কায়েম করলেন। এমন কি, জিন্নাহ্ সাহেব মরার সময় যে deed দিয়েছিলেন, সেই deed-এর ভাগ পেয়েছিল পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পেয়েছিল বোম্বের হাসপাতাল এবং করাচীর স্কুলকেও দান করেছিলেন; কিন্তু বাংলার কোন মানুষের জন্য এক পয়সাও দান করে যান নাই।

বাংলার মানুষ আমরা বুঝতে পারি না, হুজুকে মেতে পরের ছেলেকে বড় করে দেখি–এই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য। দুনিয়ার কোন দেশে 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোন অর্থ পাই না বাংলাদেশ ছাড়া। বাঙালি জাতি আমরা পরশ্রীকাতর এত বেশি। ইংরেজি ভাষায়, রুশ ভাষায়, ফরাসী ভাষায়, চীনা ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোন শব্দ নাই–একমাত্র বাংলা ভাষা ছাড়া।

এই কারণে বাঙালিদের যেমন ত্যাগ, সাধনা করার শক্তি ছিল, বাঙালিদের মধ্যে তেমনি পরশ্রীকাতরতার মনোভাব দেখা দেয়। যে সকল বাংলাদশের নেতা সংগ্রাম করেছেন, আমরা তাঁদেরকে বুঝতে পারি নাই। আমরা বুঝেছি, আমাদের নেতা বুঝি চলে এসেছেন সেই বোম্বে থেকে মিস্টার জিন্নাহ্।

যা হোক, সেই ইতিহাস এবং ১৯৪৭ সালের পরবর্তী করুণ ইতিহাস অনেকেই জানেন।

জনাব স্পীকার সাহেব, ১৯৫২ সালে আপনি যখন আমার কাছে অফিসে এসে বসেন, তখন একখানা ভাঙ্গা চেয়ার, একটা ভাঙ্গা টাইপরাইটার মেশিন আর একজন কর্মী নিয়ে আমরা বসেছিলাম। সে কথা বোধহয় আপনার মনে আছে স্পীকার সাহেব। তখন আমি আড়াই বৎসর পর জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

১৯৪৭ সাল থেকে বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল বাংলাদেশের মানুষকে একটা কলোনী

করে রাখার জন্য। বহু আগেই পশ্চিমের শক্তিকে এ দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে একদল লোক ছিল, যারা স্বার্থের লোভে, পদের লোভে, অর্থের লোভে তাদের সঙ্গে বারবার হাত মিলিয়েছে, আর বারবার চরম আঘাত করেছে আমাদের উপর। আঘাত করেছে ১৯৫২ সালে, আঘাত করেছে ১৯৫৪ সালে। এমন কি, যখন ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র হয়, তখন বাঙালিরা পরিষদ্ থেকে ওয়াক-আউট করে। তখনও বাঙালির মধ্যে কিছু লোক বেইমানী করে পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মিলায় মন্ত্রীত্বের লোভে।

১৯৫৮ সালে 'মার্শাল ল' বাংলার উপর আসে বাঙালিকে শোষণ করার জন্য। তারা যখন দেখেছে, বাংলার মানুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে, তখন তারা বাংলার মানুষের উপর শক্তি প্রয়োগ করেছে। তাদের শক্তি ছিল একটা। সেই শক্তি ছিল তাদের সামরিক বাহিনী।

ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন করতে পাঞ্জাবের কয়েকটি এলাকাকে বেছে নিয়েছিল, যেখান থেকে সামরিক বাহিনীতে লোক 'রিক্রুট' করা হত। বাঙালিকে বিশ্বাস করা হত না। বাঙালিকে সামরিক বাহিনীতে নেয়া হত না। কারণ, বাঙালিরা বিদ্রোহ করে–এই হচ্ছে তাদের দোষ।

১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতালাভের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি ছিল, বুদ্ধিতে বাঙালিরা ভাল ছিল, লেখাপড়া বাঙালিরা ভাল জানত, আক্কেল তাদের বেশি ছিল। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব বাঙালিদের ছিল, যার জন্য বারবার বাঙালি মার খেয়ে গেল। যদিও আমাদের অনেক সহকর্মী চেষ্টা করেছিলেন। সেটা ছিল সামরিক বাহিনীর শক্তি।

সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি তার অধিকার আদায় করতে পারে নাই। যখনই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছে, তখনই এসেছে চরম আঘাত। ১৯৫৪ সালে ৯২ -ক ধারার বলে শেরে বাংলা ফজলুল হক ঘরের মধ্যে অন্তরীণ। আমি সহ ৫০জন সহকর্মী, যাঁরা তদানীন্তন এম-এল-এ ছিলেন, এবং প্রায় ৫ হাজার কর্মী গ্রেফতার হয়ে জেলে চলে যায়।

সে যুগের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। সে কথা কল্পনা করতেও শিউরে উঠি। তখন মানুষ একটু স্থান দিত না, কারও বাড়িতে জায়গা পেতাম না, আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত ভয় করত, একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করত না।

সে যুগে, ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলিম লীগ আমলে জিন্নাহ্ সাহেবের জীবিত অবস্থায় যারা এ দেশে বিরোধী-দল গঠন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেছিল তাদের কথা যদি স্মরণ না করি, তাহলে অন্যায় করা হবে। তাদের কথা আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আরও স্মরণ করি তাদের কথা, এই ২৫ বৎসর বাংলাদেশের পথ-ঘাট, রাস্তা-রাজপথ বাংলার যে সমস্ত ছেলের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মায়ের কোল খালি হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ, মা-বোন জীবন দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জৎ দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ ছেলে আজ শেষ হয়ে গেছে। কত মা আজ পুত্রহারা। কত বোন আজ

স্বামীহারা। কত সংসার আজ ছারখার হয়ে গেছে, তার সীমা নেই। শেষ পর্যন্ত কত খেলা খেলে গেল। উড়ে এসে এক-একজন জুড়ে বসত।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমি গত নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে বলেছিলাম, যে-জাতি রক্ত দিতে শিখেছে, সেই জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না, সেই জাতিকে কখনও কেউ পদানত করতে পারে না–সে কথা অক্ষরে অক্ষরে আজ প্রমাণ হয়ে গেছে।

অনেকে দালালী করেছেন প্রগতির নামে। এহিয়া খানের দালালী করেছেন, আইয়ুব খানের দালালী করেছেন।

অনেকের তখন জন্ম হয় নাই। রাজনৈতিক জীবনে–তাঁরাও অনেক সময় সমালোচনা করে। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলে সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছি। সমালোচনা করুন–কোন সত্য কথা বলতে ভয় না-পাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

গত সংগ্রামের সময়, ২৫শে মার্চ তারিখে আক্রমণ চলে এবং যখন আমার বাড়িতে মেশিনগান মেরে আমাকে গ্রেফতার করে, তখন আমার সহকর্মীদের আমি হুকুম দিয়েছিলাম, যাও, চলে যাও যার যার এলাকাতে–গিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোল এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাও!

২৫শে মার্চ তারিখে যে আক্রমণ চলে, সে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাবাহিনীর উপর, বাঙালি ই. পি. আর-এর উপর, বাঙালি পুলিশের উপর, বাঙালি রক্ষীবাহিনীর উপর, আর বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর। আর যারা এ দেশের দুখী মানুষ, তাদের বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায়, ঢাকা শহর থেকে আরম্ভ করে সেদিন সেই অত্যাচার শুরু হয় এবং মেশিনগান চলে ২৫ তারিখ রাত্রে।

যখন আমি বুঝতে পারলাম, আর সময় নেই এবং আমার সোনার দেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তখন আমার মনে হল, এই বুঝি আমার শেষ। তখন আমি চেষ্টা করেছিলাম, কেমন করে বাংলার মানুষকে এ খবর পৌঁছিয়ে দেই এবং তা আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম তাদের কাছে। সেদিন আমি লাশ দেখেছি, রক্ত আমি দেখেছি। সেই রক্তের উপর দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই রক্তাক্ত মানুষের লাশের পাশ দিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়।

[এই পর্যায়ে তিনি কেঁদে ফেলেন]

সে আগুন আমি দেখেছি। শুধু বলেছিলাম, তোমরা আমাকে হত্যা কর, আমার মানুষকে মের না। তারা আমার কথা শোনে নাই। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার সহকর্মীদের হত্যা করেছে। এই গণপরিষদের আমার বহু কর্মীকে হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে।

মানুষ যে এত পশু হতে পারে, জনাব স্পীকার সাহেব, দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না। হালাকু খাঁর গল্প পড়েছি, চেঙ্গিস খাঁর গল্প পড়েছি, হিটলারের গল্প পড়েছি, মুসোলিনীর গল্প পড়েছি, কিন্তু মানুষ যে এত পশু হতে পারে, তা দেখিনি। দুই বৎসরের দুধের বাচ্চাকে হত্যা করে, তার বুকে লিখে দিয়ে "বল জয় বাংলা" গাছের সঙ্গে টাঙ্গিয়ে

রেখেছে। মানুষ কেমন করে এত পশু হতে পারে! ৭০ বৎসরের বৃদ্ধার উপর পাশবিক অত্যাচার করতে পারে কেমন করে! লক্ষ লক্ষ দুধের বাচ্চাকে তারা হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তারা আমার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। সে রক্ত আমরা ভুলতে পারি না। তাদের কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়।

আওয়ামী লীগ, আমি বা সহকর্মীরা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করতে চাই না। ক্ষমতা চাইলে বহু ক্ষমতা ভোগ করতে পারতাম। সারা দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আমার সহকর্মীরা বাংলার মন্ত্রীত্ব করতে পারত। কিন্তু বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে, বাংলার মানুষ সুখী হবে, বাংলার সম্পদ্ বাঙালিরা ভোগ করবে। সেইজন্য এই সংগ্রাম করেছিলাম।

জনাব স্পীকার সাহেব, বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছি। আমি অনেক সময় ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমার সহকর্মীরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল সবাই। এই এ্যাসেম্বলীর এমন কোন মেম্বার নাই, যার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নাই, আত্মীয়স্বজন হত্যা করা হয় নাই।

অনেকে অনেক কথা বলে, বলাটা স্বাভাবিক। কার বিরুদ্ধে মানুষ বলে? যে কাজ করে, তারই বিরুদ্ধে মানুষ বলে। যে কাজ করে না, তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে না।

আওয়ামী লীগের অনেক সদস্য, আমার কর্মী ভাই-বোন আছে, যাদের ঘর-বাড়ি এমনকি সর্বস্ব চলে গেছে, তবু তারা ক্ষমতা চায়নি। সর্বস্বান্ত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। আমার সহকর্মীরা বুঝতে পারছে না, কী করবে। সেদিন আমি তাদের কাছে নেই। আমি ঘোষণা করে বলে দিয়েছি, সমস্ত জেলায়, মহকুমায় একসঙ্গে প্রতিরোধ-আন্দোলন শুরু হোক এবং হয়েছিলও তাই। আমার সহকর্মীরা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে, স্বাধীন সরকার গঠন করে, দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল।

সেদিন অনেকেই এগিয়ে আসেননি, শুধু আরাম করে খেয়েছেন। এই সংগ্রামের কথা চিন্তাও করেননি। সেই ভাঙ্গাচোরা দল নিয়ে, অন্যান্য যারা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদেরকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে, দুনিয়ার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে তুলে ধরে তারপর তারা পুরোদমে সংগ্রাম করেছিল।

নির্ভীক বাংলার সৈনিক, নির্ভীক মুজাহিদ, আনসার, পুলিশ, নির্ভীক সাবেক ই-পি-আর, নির্ভীক বাংলার ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারীদের এক অংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই নমরুদের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম হয়েছিল চরম সংগ্রাম। অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল তাদের হাত থেকে। তখন তারা অস্ত্র পায়নি অন্যান্য জায়গা থেকে। দেশের মধ্য থেকে অস্ত্র যোগাড় করে নিয়ে তারা সে সংগ্রাম করেছিল। সেইভাবেই এক মাস, দুই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী ভাল ভাল অস্ত্র পেয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পদানত হয়নি বাঙালি।

সেজন্য আমি স্মরণ করি সেই ৩০ লক্ষ লোককে, যারা রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। আমি আরও স্মরণ করি আমার সেই পঙ্গু ভাইদের কথা, যাঁরা বসে আছেন পঙ্গু হয়ে। তাঁদের জন্য কর্তব্য করতে চেষ্টা করেছি। পঙ্গু ভাইদের জন্য 'ট্রাস্ট' করে দিয়েছি চার কোটি টাকা ব্যয় করে। সেখানে তাঁরা পেনশন পাবে সারা জীবন।

স্মরণ করি আমার নির্যাতিতা মা-বোনের কথা। দুই লক্ষ নির্যাতিতা মা-বোন আজও

ক্যাম্পে ক্যাম্পে আছে, যাদের ইজ্জত নষ্ট করে দিয়েছে পাকিস্তানি দস্যুরা– যারা ইসলামের নাম নিয়ে চীৎকার করে, 'মুসলিম বাংলা' বলে চীৎকার করে। লজ্জা করে না। দুই লক্ষ মা-বোনের কথা স্মরণ না-করলে অন্যায় করা হবে।

যাক, আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি রক্তের বিনিময়ে। আমি প্রথমেই বলেছিলাম, এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা। কোন দেশে কোন যুগে আজ পর্যন্ত এত বড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। দেশের কী অবস্থা ছিল, জনসাধারণ জানে। কয় পাউন্ড বৈদেশিক মুদ্রা ছিল, সকলই জানা আছে। রাস্তা-ঘাটের কী অবস্থা ছিল, সবই আপনারা জানেন। চাউলের গুদামে কত চাউল ছিল, এ সবই আপনাদের জানা আছে।

মানুষের ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশ একটি কলোনী-মাত্র ছিল। শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানি মাল বিক্রি করে তার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। সব কিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে যায় এবং যাবার বেলায় গর্ব করে বলে যায় যে, স্বাধীনতা পেল বাঙালি, কিন্তু এমন করে দিয়ে গেলাম যে লক্ষ লক্ষ লোক না-খেয়ে মরবে এবং আর মাজা সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আজ বাংলার মানুষ মাজা টান করে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক স্পীকার সাহেব, নয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেওয়া সহজ কথা নয়। মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়ার কারণ হল, আমরা জনগণের উপর বিশ্বাসী। জনগণের উপর আস্থা রেখেই আমরা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

জনগণের উপর আমার আস্থা রয়েছে। আমি আগেই বলেছি, জনগণকে আমরা ভয় পাই না, জনগণকে আমরা ভালবাসি।

সেইজন্য আপনার মাধ্যমে আমি আমার সহ-কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ না-দিয়ে পারি না। তাঁরা রাতদিন ধরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ বৎসর আমরা চালাতে পারতাম। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বাংলার মানুষের কাছে গণভোটে গিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে, বাংলার মানুষ কাদের ভালবাসে। কিন্তু তা আমরা চাইনি, জনাব স্পীকার সাহেব–চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্যই সংগ্রাম করেছিলাম এবং এই জন্যই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি। আমার সহকর্মীদের এক জনও আপত্তি করে বলেন নাই যে, আমরা এ্যাসেম্বলী dissolve করব না। এজন্য আমি গর্বিত। আমার দলের সহকর্মীদের জন্য, মেম্বারদের জন্য আমি গর্বিত।

যাঁরা এই এ্যাসেম্বলীর মেম্বার হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যাঁরা এই গণপরিষদ্-সদস্য, তারা শাসনতন্ত্র পাস করে বলতে পারতেন যে ভবিষ্যতে আমরা জাতীয় পরিষদরূপে কাজ করব। কারও কিছু বলার অধিকার ছিল না। কেননা, কনভেনশনে তাই রয়েছে, রীতি রয়েছে। কিন্তু তা করি নাই। আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতার লোভী নয়, তার আর একটি প্রমাণ, আজ তারা শাসনতন্ত্র দিয়েছে এবং তারা নির্বাচনে যাবে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে। আমার সহকর্মী সকলেই প্রায় বক্তৃতা করেছেন। যিনি একজন 'অপোজিশনে' ছিলেন, বা দুইজন স্বতন্ত্র ছিলেন, তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদেরকে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে

আসতে পারলে আরও সুযোগ পাবেন। তাতে আমার আপত্তি নাই। আর যদি না-আসতে পারেন, তাতেও আমার আপত্তি নাই। জনগণই ঠিক করে দেবে। আমাদের ভালবাসা রয়েছে—জনগণের উপরই নির্ভর করব।

নয় মাসের মধ্যে যে শাসনতন্ত্র দেওয়া হয়েছে, এটা হল আর একটি নতুন সৃষ্টি। আমি আগেই বলেছি, শাসনতন্ত্র ছাড়া, মৌলিক অধিকার ছাড়া দেশের অবস্থা হয় মাঝিবিহীন নৌকার মতো। তাই মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি, জনগণ এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবেন এবং করেছেন। কারণ, আমরা জনগণের প্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এসেছি। কেউ আমাদের পকেট থেকে বের করে দেন নাই। আর, আমরা আসমান থেকে পড়ি নাই বা কেউ এসে আমাদের 'মার্শাল ল' জারী করে বসিয়ে দেন নাই।

'মার্শাল ল' জারী আমরাও করতে পারতাম। যেদিন আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা এখানে এসে সরকার বসান, সেদিন তাঁরা বলতে পারতেন, emergency! No democracy! No talk for three years! এবং সেটা মানুষ গ্রহণ করতেন। কোন সমালোচনা চলবে না! কোন কথা বলা চলবে না! কোন মিছিল হবে না! কোন পার্টির কাম চলবে না! কারণ, দেশের যা অবস্থা ছিল, তাতে এটা করা যেত। সব দেশে, সব যুগে বিপ্লবের পরে তাই হয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা চাই নাই। শক্তি আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি আমাদের জনগণ।

কেউ যদি মনে করেন যে, শক্তির উৎস বন্দুকের নল, তাহলে আমি তা স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে, শক্তির উৎস হল জনগণ।

জনাব স্পীকার সাহেব, চারটা স্তম্ভের উপর এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই হাউসে হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই এর উপর বক্তৃতা করেছেন। আমার সহকর্মী ড. কামাল হোসেন অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। অন্য সদস্যরাও এর উপর বক্তৃতা করেছেন।

এই যে চারটা স্তম্ভের উপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হল, এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকার হচ্ছে একটা মূল বিধি। মূল চারটা স্তম্ভ-জনগণ ভোটের মাধ্যমে নয়—৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে, রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

হ্যাঁ, অধিকার আছে অনেক কথা বলার।

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চরম মরণ-সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না-হলে কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ্ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং, এ সম্বন্ধে আমি আর নতুন সংজ্ঞা না-ই দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি, আমি বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি।

এই যে জাতীয়তাবাদ, সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন— সকল কিছুর সঙ্গে একটা জিনিস

রয়েছে। সেটা হল অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না-থাকে, তাহলে কোন জাতি বড় হতে পারে না এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, যারা বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক-জাতি হয়েছে। অনেক দেশ আছে, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু নিয়ে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে–তারা এক জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর।

সেজন্য আজ বাঙালি জাতি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা নিয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি, যার উপর ভিত্তি করে আমরা সংগ্রাম করেছি, সেই অনুভূতি আছে বলেই আজকে আমি বাঙালি, আমার 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। এর মধ্যে যদি কেউ আজকে দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন তুলতে চান, তাহলে তাঁকে আমি অনুরোধ করব, মেহেরবানি করে আগুন নিয়ে খেলবেন না।

দ্বিতীয় কথা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে।

মানুষের একটা ধারণা এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যে সব দেশে চলেছে দেখা যায় সে সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের protection দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না।

আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হল, আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে, তাতে যে সব provision করা হয়েছে, যাতে এ দেশের দুঃখী মানুষ protection পায়, তার জন্য বন্দোবস্ত আছে–ঐ শোষকরা যাতে protection পায় তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক schedule-এ রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন।

অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারও সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং, নিশ্চয়ই আমরা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে-চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাঙ্ক, ইনস্যিওরেন্স-কোম্পানি, কাপড়ের কল, জুট-মিল, সুগারইন্ডাস্ট্রি–সব কিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি, তার মানে হল, শোষক-গোষ্ঠি যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না-পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানের গণতন্ত্রের, আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অন্য অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।

তৃতীয় socialism–সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা এগুলি জাতীয়করণ করেছি। যাঁরা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হল না, সমাজতন্ত্র হল না, তাঁদের আগে বুঝা উচিত, সমাজতন্ত্র কী।

সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনও তারা সমাজতন্ত্র বুঝতে পারে না। সমাজতন্ত্র গাছের ফল না– অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুরও হয়। সেই পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌছানো যায়।

সেজন্য পহেলা step, যাকে প্রথম step বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি– শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। এক এক দেশ, এক এক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমাজতন্ত্রের মূল কথা হল শোষণহীন সমাজ। সেই দেশের কী climate, কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সব কিছু বিবেচনা করে step by step এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে।

রাশিয়া যে-পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করে নাই– সে অন্য দিকে চলেছে। রাশিয়ার পার্শ্বে বাস করেও যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া তাদের দেশের environment নিয়ে, তাদের জাতির Background নিয়ে, সমাজতন্ত্রের অন্য পথে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান– ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার মিসর অন্য দিকে চলেছে।

বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনদিন সমাজতন্ত্র হয় না, তা যাঁরা করেছেন, তাঁরা কোনদিন সমাজতন্ত্র করতে পারেন নাই। কারণ লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র হয় না– যেমন আন্দোলন হয় না।

সেজন্য দেশের environment, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের 'কাস্টম', তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সব কিছু দেখে step by step এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা নয় মাসে যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, তা আমার মনে হয়, দুনিয়ার কোন দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে socialism করেছে, তারাও আজ পর্যন্ত তা করতে পারে নাই– আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোন কিছু করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তারপরে আসছে ধর্মনিরপেক্ষতা। জনাব স্পীকার সাহেব, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না।

ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে– তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারও নাই। হিন্দু তাদের ধর্ম পালন করবে–কারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে–তাদের কেউ বাধাদান করতে পারবে না। খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে–কেই বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হল এই যে ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না।

২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরী, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, ধর্মের নামে খুন, ধর্মের নামে ব্যাভিচার– এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে।

ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না।

যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।

কেউ যদি বলে , গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটি কয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে।

কোন কোন বন্ধু বলেছেন, Schedule-এ জিনিস নাই, ও জিনিস নাই। জনাব স্পীকার সাহেব, কেবল শাসনতন্ত্র পাস করলেই দেশের মুক্তি হয় না– ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ জনসাধারণ কেমন করে, কীভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে, তারই উপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের success, কার্যকারিতা। আমরা চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি।

কেউ কেউ বলেছেন যে, সরকারি কর্মচারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তাঁরা অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রও পড়ুন। সরকারি কর্মচারীরা একটি আলাদা জাতি নয়। তারা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তারা কোন different class নয়।

ইংরেজ-আমলে I.C.S., I.P.S. দের protection দেওয়া হত। সেই Protection পাকিস্তান আমলেও দেওয়া হত। আমলাতন্ত্রের সেই protection-এর উপর আঘাত করেছি– অন্য জায়গায় আঘাত করিনি। এই class রাখতে চাই না। কারণ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, classless society প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

আইনের চক্ষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারি কর্মচারীদেরও সেই অধিকার। মজদুর-কৃষকদের টাকা দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের মাইনে, খাওয়াপরার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং, মজদুর, কৃষকদের যে-অধিকার, সরকারি কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশি অধিকার তাঁরা পেতে পারে না।

সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তাঁরা শাসক নন– তাঁরা সেবক।

Some people came to me and wanted protection from me. I told them, "My people want protection from you, gentlemen."

আমি তাঁদেরকে তাঁদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন করতে বলেছি।

কেউ কেউ শাসনতন্ত্রের নবম ভাগের সমালোচনা করেছেন। গত নয় মাসে কয়জন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়েছে। মাত্র কয়েকজনের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে আরও বেশি কর্মচারীর বিরুদ্ধে action নিতে হতে পারে।

আজ যে কাজ করবে, লোকে তাকে কত ভালবাসে, তার উপর নির্ভর করবে তার promotion। Promotion-এর ব্যাপারে গরীব, অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের অধিকার থাকবে। গরীব কর্মচারীদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আজীবন সংগ্রাম করেছি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। আজও বলছি, ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকব। তারা গরীব, আমি জানি। তাদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংবিধানে।

আমরা Services Reorganisation Committee করেছি। সেই কমিটির মেম্বারদের বলেছি, ড. কামাল হোসেনও বলেছেন, Central Government-এর ১২৫

step বা Provincial Government-এর ৩৩ step-আমরা রাখবনা। এই ১২৫ এবং ৩৩ step-এর মধ্যে কত ফাঁক ছিল, যার সুবিধা নিয়ে অনেক promotion হত। সাত আসমান। এর বেশিstep সরকারি চাকুরীতে থাকবে না। মাত্র ৭ step থাকবে।

এতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কিছু কিছু লোক গোপনে গোপনে ফুসফাস করছে এবং M. C. A. দের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করেছে।

বহু ক্ষমা করা হয়েছে। আমরা রক্তের আন্দোলনের মাধ্যমে পয়দা হয়েছি। আমরা এহিয়া খান, আইয়ুব খানের 'তমগা' নিয়ে বেড়াইনি। আমরা চোঙ্গা ফুঁকে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে জনসমর্থন নিয়ে এখানে এসেছি।

কিন্তু আজ যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, এহিয়া খান, আইয়ুব খানের সেই protection পাবেন তাহলে ভুল করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাঁদের ওই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

যাঁরা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মচারীদের খতম কর, action নিলে তাঁরাই আবার মিটিং করে উল্টো প্রস্তাব পাস করেন। নীতি এক হওয়া উচিত।

কেউ কেউ বলেন, সরকারকে ধ্বংস করার জন্য অফিস collaborator-এ ভরে গিয়েছে। Collaborator আছে। যাদের সম্বন্ধে definite খবর পাই, তাদের বিরুদ্ধে action নেওয়া হয়।

তারপর; কাজ না-করে চেয়ার-টেবিলে বসে থাকা, এটা একটা স্টাইল হয়েছে। Mentality must be changed। ঐ C.S.P., P.S.P বাংলাদেশে থাকবে না। সরকারি চাকুরীতে ৭ step থাকবে। Services Reorganisation Committee করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সব কিছু করা হবে। যাঁরা নির্বাচিত হয়ে পরিষদে আসবেন তাঁরা আইন পাস করবেন, তখন সব হবে। এখন অর্ডিন্যান্স পাস করে কাজ করা হচ্ছে।

Scrutiny Committee করা হয়েছে, সেটা থাকবে, অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে।

Pay commission করা হয়েছে। সেটাকে বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। বাধা সৃষ্টি হয়েছে। কেউ ৭৫ টাকা পাবে, কেউ ২ হাজার পাবে– তা হতে পারে না। সকলের বাঁচবার মতো অধিকার থাকতে হবে। একজন সব কিছু পাবে, আর একজন পাবে না– তা হতে পারে না। Pay commission সরকারি কর্মচারীদের highest and lowest pay ঠিক করে দেবেন। সম্পদ ভাগ করে খেতে হবে। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে।

বিরোধী-দলের নাম শুনতে পাই। এ রকম কোন পার্টি আছে কিনা, জানি না। নির্বাচনের আগে এ-রকম কোন পার্টি ছিল না। অনেকেই ভোট না-পেয়ে পশ্চাদপসরণ করেছিল। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যদি তারা ভোট না-পায়, তাহলে সে দোষ আমাদের হবে না। ভোট পেয়ে পরিষদে এসে বলুক, আমরা বিরোধী-দল। যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট পায়নি, তারা বলে, আমরা বিরোধী দল। ভবিষ্যতে ভোট নিয়ে এসে তারপর বলুক আমরা বিরোধী ফল। তা না-হলে বলুক, এই আমাদের দাবী।

গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ব্যবহার করতে হবে। তার জন্য ethics মানতে হয়। খবরের কাগজে journalism করতে হলে ethics মানতে হবে। তা না হলে ethics impose করা হয়। গণতন্ত্রের যে অধিকার, তা কেবল চেঁচিয়ে বেরালে পালন করা হয় না, বক্তৃতা করলে হয় না।

আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ না-খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ২৪ লক্ষ টন খাবার বিদেশ থেকে এনে ৬৫ হাজার গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। রেল-সেতু নাই, কাঠ নাই, বাঁশ নাই। ৬৫ হাজার গ্রামে খাবার পৌঁছে দিয়েছি।

যাঁরা opposition করেছেন, যান না রিলিফ কমিটি করে, চাঁদা তুলে একটা গ্রামের কিছু লোককে যদি খাওয়াতে পারেন, পাঁচটা লোককে যদি খাওয়াতে পারেন, তাহলেও বুঝি। শুধু খবরের কাগজে নাম উঠাবার জন্য বক্তৃতা করে 'গণতন্ত্র চাই' বললে কী হবে!

গণতন্ত্রে যেমন অধিকার আছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও রয়েছে। সেইজন্য শাসনতন্ত্র করার সময় আমরা চারটি স্তম্ভ ঠিক রেখেছি।

আমি শাসনতন্ত্রের উপর clause by clasuse বলতে চাই না। আমার সহকর্মীরা clause by clause আলোচনা করেছেন। সেইজন্য জনাব স্পীকার সাহেব, গণতন্ত্রের কথা আমরা যেমন শাসনতন্ত্রে বলেছি, তেমনি সেখানে কর্তব্যের কথাও রয়েছে।

জনগণের দাবীর মধ্যে আছে ভোটের দাবী। গত বৎসর পর্যন্ত ভোটারের সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা ছিল ২১ বছর– আমরা শাসনতন্ত্রে সেটা ১৮ বৎসর করেছি। এটাও জনগণের দাবীর মধ্যে একটা।

আমরা শাসনতন্ত্র এনেছি। এর উপর আইন পাস হবে, যার দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। আমার ভাইয়েরা ভুল করছেন– শাসনতন্ত্রের অর্থ আইন নয়। শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আইন হয়। আইন যে কোন সময় পরিবর্তন করা যায়। শাসনতন্ত্র এমন একটা জিনিস, যার মধ্যে একটা আদর্শ, নীতি থাকে। সেই শাসনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে আইন করতে হয়।

অনেকে ভুল করছেন, ভুল করে যাচ্ছেন। বলেছেন, শাসনতন্ত্র বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ বুঝবার চেষ্টা করেন নাই বা বুঝতে পারেন না বা বুঝবার মতো আক্কেল নাই, তাই বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না। কারও আবার মগজ নাই।

শাসনতন্ত্রের একটা মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করে আইন হয়। সেই fundamental-এর উপর ভবিষ্যৎ এসেম্বলীতে আইন পাস হবে। এই মৌলিক আইনের বিরোধী কোন আইন হতে পারবে না।

শাসনতন্ত্রের মানুষের মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, দুঃখী মানুষকে, মেহনতী মানুষকে যেন কেউ exploit করতে না পারে। তাদের শোষণ করার জন্য যারা দায়ী সেইসব শোষককে curtail করা হবে।

শোষকদের ভোটের অধিকার দেয়া হয় নাই বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার দাবীও আছে। আমার দেশে ফিরে আসার আগে দেশের লোক তাদের যে মেরে ফেলে নাই, সেজন্য তাদের শোকর করা

উচিত। আমরা এমন শাসনব্যবস্থা কায়েম করব, যেখানে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা থাকবে।

সাধারণভাবে যারা দোষী, যারা collaboration করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারীর কাছে দিয়ে গুলি করে হত্যা করিয়েছে, তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি, অনেককে ডিভিশন পর্যন্ত দিয়েছি। আইনের শাসন আমরাও মানি। যারা নিরপরাধ তারা নিশ্চয় মুক্তি পাবে।

যারা দোষী, যারা জনসাধারণের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, তাদের তারা নাগরিক-অধিকার দিতে চায় না। তাদের নাগরিক -অধিকার পাওয়া উচিতও নয়। কারণ, প্রকাশ্যে গাড়ি দিয়ে, ঘোড়া দিয়ে তারা পাক মিলিটারীকে সাহায্য করেছে। মানুষকে ধরে, আমাদের ছেলেদের ধরে মিলিটারীর কাছে দিয়েছে। নানাভাবে তারা collaboration করেছে।

স্পীকার সাহেব, এই এ্যাসেম্বলীর যে চেয়ারে আপনি বসে আছে, তার আশেপাশে এবং এই এ্যাসেম্বলীর এমন কোন দেওয়াল নাই, যেখানে আমাদের ছেলেদের রক্তের দাগ ছিল না। এই আইনসভার সেই সব দাগ আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। আইন-পরিষদ্ দেশের শ্রেষ্ঠ স্থান। সেখানে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে কত লোককে ধরে হত্যা করা হয়েছে। আপনি দেওয়ালের সেই সব দাগ দেখেছেন কিনা, জানি না। এই পরিষদের যাঁরা কর্মচারী আছেন, তাঁরা নিশ্চয় বলবেন, এখানকার ঘরে ঘরে, কামরায় কামরায়, দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের দাগ ছিল। অনেকে নিজের রক্ত দিয়ে দেওয়ালের গায়ে জয় বাংলা লিখে গিয়েছে। এই এ্যাসেম্বলীর হলের মধ্যে collaborator-দের সাহায্যে বহু মানুষকে ধরে এনে জুলুম করেছে।

নিরপরাধ যাঁরা থাকবেন, তাঁদের খালাস দেওয়া হবে। কিন্তু যাঁরা তাদের সঙ্গে সহ-যোগিতা করে গণপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের– যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তাঁদের seat খালি করিয়ে, আচকান গায়ে দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, এহিয়া খানকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার দেওয়াতেও জনগণ আপত্তি করেছিল। জনগণ বাইরে পেলে তাদের কেটে ফেলত, তাদের আমরা জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি।

যাই হোক, আমরা সংবিধানে Schedule-এ যা রেখেছি, তাতে কেউ কেউ বলেছেন যে,পূর্বের শাসনকালে কিছু কিছু আইনকে আমরা protection দিয়েছি। সব দেশেই এটা করা হয়ে থাকে। তা না-হলে litigation করে সব শেষ করে ফেলবে। দেশের প্রয়োজনেই এগুলিকে protection দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কতকগুলি আইন পাস করতে হলে আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ majority-র প্রয়োজন হবে। কতকগুলি শুধু majority-তেই পরিবর্তন করা যাবে। এই প্রকার difference না রাখলে অসুবিধা হবে।

জনাব স্পীকার সাহেব, আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাস হয়ে যাবে। কবে হতে এই শাসনতন্ত্র বলবৎ হবে, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি, সেইদিন, যেদিন জল্লাদ বাহিনী রেস্‌কোর্স-ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্রের মিত্র বাহিনীর

যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেই তারিখ। সেই ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকর করা হবে। সেই দিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পীকার সাহেব, সেই ইতিহাস আমরা রাখতে চাই।

আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনি ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদ্ মুলতবী করতে পারেন। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সদস্যরা এসে আপনার সামনে original সংবিধানে দস্তখৎ করবেন। শাসনতন্ত্র বাংলায় হাতে লেখা হচ্ছে। তাতে সদস্যরা আপনার সামনে দস্তখৎ করবেন।

১৪ এবং ১৫ তারিখের পর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখে শাসনতন্ত্র চালু হবে। চালু হবে বাংলার মানুষের নতুন ইতিহাস।

স্পীকার সাহেব, আপনার কাছে আজ আর একটা জিনিস ঘোষণা করতে চাই। আমি ইলেকশন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি। সরকারের সমস্ত সাহায্য তাঁকে দেব। আমি আশা করি, তিনি তা গ্রহণ করবেন। আমি উল্লেখ করছি যে, নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট করা হোক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে। কারণ, সেই দিন, ৭ই মার্চে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করেছিলাম! "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সেই দিন ৭ মার্চ তারিখে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চাই এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ সাহায্য করবেন বলে আমি চীফ ইলেকশন কমিশনারকে আবেদন করব।

জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার ধৈর্য নষ্ট করত চাই না– আপনি গত রাত্রে আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করেছেন। আমিও কিছু সময় ছিলাম। আপনাকেসহ কর্মচারীদের ধন্যবাদ দিয়ে, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে এ্যাসেম্বলীর কর্মচারীদের– যাঁরা এই কষ্টের ভিতর বাইরে ডিউটি করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই– তাঁরা কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি খবরের কাগজকে কিছু না-বলি, তাহলে আবার মহাবিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাই বলি, আপনারা এত কষ্ট করেছেন, এত কষ্টের মধ্যে বসেছেন, জায়গা আপনাদের ভালভাবে দিতে পারি নাই বসবার জন্য, এই কষ্টের মধ্যেও যে এত ভালভাবে এ্যাসেম্বলী থেকে শাসনতন্ত্রের প্রসিডিংস-এর রিপোর্ট করেছেন, তার জন্য এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, জানাই মোবারকবাদ আপনাদের। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও কয়েক বছর কষ্ট করবেন। কারণ, নতুন এ্যাসেম্বলীতে না যাওয়া পর্যন্ত আপনাদের কষ্টের সীমা নাই, আমাদেরও নাই। আর, দেশবাসী যখন কষ্ট করেছে, তখন তার কিছু ভাগ নেওয়া উচিত।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমি হাউসের পক্ষ থেকে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই। জনাব ডেপুটি স্পীকার পেছেনে বসে আছেন– তাঁকে ধন্যবাদ না-জানালে অন্যায় হবে।

তারপর, যাঁরা প্রেসে কাজ করেছেন এবং রাত জেগে এই সংবিধানের জন্য দু-তিন-

বার কাজ করতে হয়েছে, তাঁদের সকলকে– আমি ধন্যবাদ দিই।

ধন্যবাদ দিই ৩৪ জন মেম্বারকে, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ১১ই এপ্রিল তারিখ থেকে। সেদিন এই সংবিধান কমিটি আমরা করি।

তখন দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলাম যে, দলমত-নির্বিশেষে আপনাদের যে কোন পরামর্শ, যে কোন মতামত থাকলে মেহেরবানি করে কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। যদিও দু-একটি কেউ কেউ দিয়েছেন, কিন্তু যাঁরা খবরের কাগজে বক্তৃতা করেন, তাঁরা একখানাও দেন নাই। তাঁদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, অন্য কর্মীদের কাছ থেকে, অন্য মানুষের কাছ থেকে, প্রফেসারের কাছ থেকে আরও অনেক পেয়েছি। তাতে অনেক সাহায্য হয়েছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র যাঁরা মানেন না, যাঁরা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, তাঁরা মেহেরবানি করে এক কলম লিখে পাঠাননি। এটা আমাদের অভ্যাস, এটা স্বাভাবিক। জাত যায় না মলে, খাসলত যায় না ধুলে।

জনাব স্পীকার, আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজ আবার স্মরণ করি আমার জীবনের সেই বিপদের কথা, যে-সব থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি। তার চেয়ে বড় কথা আমার জীবনের আজকে সবচেয়ে আনন্দের দিন– সে আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে, আমার দল যে ওয়াদা করেছিল, তার এক অংশ পালিত হল। এটা জনতার শাসনতন্ত্র। যে কোন ভাল জিনিস না-দেখলে, না-গ্রহণ করলে, না-ব্যবহার করলে হয় না, তার ফল বোঝা যায় না।

ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে, শহীদদের রক্তদান সার্থক হবে।

আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, জনাব স্পীকার। আজকে বিদায় নেওয়া হচ্ছে। তবে সদস্যরা আবার সংবিধানে স্বাক্ষর করতে আসবেন। তারপর, যাঁরা পাঁচ বছরের জন্য এসেছিলেন, তাঁরা সেই পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ না-হতেই চলে যাবেন। এইভাবে তাঁরা যে ত্যাগের প্রমাণ দিলেন, উদারতা দেখালেন সেটা পার্লামেন্টের ইতিহাসে বিরল। এর জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

খোদা হাফেজ! জয় বাংলা!

বাংলাদেশ ভারতের উপনিবেশ?*

সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয় লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খানের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

সাংবাদিক বন্ধুগণ

দেশ স্বাধীন হবার পর দশটি মাস অতিবাহিত হয়েছে। বিগত মার্চ মাসের একত্রিশ তারিখে একবার আমি একটি বৈঠকে আপনাদের সামান্য কয়েকটি কথা বলেছিলাম। বিরাট রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দেশে যে চরম বিশৃঙ্খলা জাতীয় জীবনকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, সে সম্পর্কে কতগুলি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলাম। জাতীয় পুনর্গঠনের প্রশ্নে সরকারকে জরুরী সমস্যা সমাধান ও দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচির রূপায়নের পার্থক্য অনুধাবন করতে বলেছিলাম। সমস্যা সমাধানে বিলম্ব হলে সঙ্কট উপস্থিত হয়, অপর পক্ষে কর্মসূচি রূপায়ণে বিলম্ব হলেও কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়না, এই যুক্তিও আমি তুলে ধরেছিলাম।

আইনশৃঙ্খলার অবনতি, আইনের শাসনের প্রতি অবজ্ঞা, গুরুতর খাদ্য সমস্যা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অচলাবস্থা, চোরাচালান ইত্যাদিকে আমি জরুরী সমস্যা বলে অবিলম্বে সরকারকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সমাধান করতে বলেছিলাম।

সরকার এদিকে দৃষ্টি না-দিয়ে দেশের সর্বত্র দালাল এবং কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে আদাপানি খেয়ে নেমে গেলেন। এটাই যেন সর্বপ্রথম কর্তব্য। বৃহৎ ও উদার মনোভাব নিয়ে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষকে এক কাতারে সারিবদ্ধ করে দেশের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োগ করাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ? স্বাধীনতা আন্দোলনে সাড়া দেয় নাই এমন কি যারা বিরোধী ছিল, অথচ জ্ঞানত কোন অপরাধ করে নাই, হত্যা, লুট, নারীধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগে অংশগ্রহণ করে নাই কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন বা ভ্রান্ত মত পোষণ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না।

তাই অনুরোধ জানিয়েছিলাম সর্বশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অপরাধে অপরাধীদেরই বিচারের সম্মুখীন করতে। কেননা, সকল বিপ্লবের পরই প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং উদারতার মধ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করে জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর করা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

---

* পুস্তিকা, ১১ নবেম্বর, ১৯৭২

দুর্ভাগ্যবশত আমার কথায় কর্ণপাত করা কেউ প্রয়োজন মনে করেন নাই। অতি উচ্চমহল থেকে বারবার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি আমি পেয়ে থাকলেও কার্যত এ বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। বরঞ্চ যতদিন গত হচ্ছে ততই যেন বেশি করে ডাইনী খোজা (witch hunting) শুরু হয়ে গেছে। অন্য কোন ক্ষেত্রে সরকার এবং সরকারি দলের এতটা তৎপরতা আগ্রহ ও একাগ্রতা লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা। অধিক সংখ্যক মানুষকে দালাল আখ্যা দিয়েই কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শুনছি তথাকথিত শান্তিকমিটির সব সদস্যকেই গ্রেফতার করার ঢালাও নির্দেশও নাকি দেওয়া হয়েছে। কে যে কিভাবে এই সব শান্তি কমিটির সদস্য হতে বাধ্য হয়েছে; কে যে পেটের দায়ে বা অবস্থার চাপে রাজাকার হতে বাধ্য হয়েছিল, এবং কেবলমাত্র প্রাণের দায়ে যারা পাকবাহিনীর সঙ্গ দিয়েছে, এসব প্রশ্নের বিচার বিশ্লেষণ করার আদৌ কোন ব্যবস্থা নাই। আমি নিজে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে দেখেছি কি অবস্থায় চেয়ারম্যানরা উপরের আদেশ পালন করে গ্রামের লোকদের শান্তি কমিটির সদস্যভুক্ত করেছে এবং কেমন করে দেশের সাধারণ মানুষ দারুণ ভীতি সন্ত্রাসের সময় শান্তি কমিটির নাম শুনে পরম আগ্রহে তাদের নাম লিখে নিতে বলেছে। তারপর হয়ত কোনদিন কেউ তাদের খবরও নেয় নাই এবং তারাও কোন কাজ করে নাই। কিন্তু মনে মনে ভেবেছে হয়ত এজন্যই অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে তারা রক্ষা পেয়ে গেছে।

যারা বর্তমানে সরকার পরিচালনা করছেন তারা দেশত্যাগ করে নিরাপদ পরিবেশে জীবনযাপন করেছেন, যারা এখানে শত্রুর কবলে রয়ে গেল, তাদের অবস্থা কল্পনা করার চেষ্টাও তারা করছেন না।

আমি অনেকের কথা জানি যারা ষোলই ডিসেম্বরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মনে-প্রাণে বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছে, হঠাৎ রাতারাতি তারা ভয়ানক দেশপ্রেমিক সেজে বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চ আসন দখল করে আছেন এবং নব-দীক্ষিতের আগ্রহ প্রকাশে অনেককে ডিঙ্গায়ে যাচ্ছেন। পক্ষান্তরে অনেকে আগাগোড়া বাংলাদেশের সমর্থক হয়েও গ্রহচক্রে কিংবা অবস্থার কঠিন চাপে পাক বাহিনীর সাথে সহযোগিতার ভান করতে বাধ্য হয়েছে, তারা আজ বিনা বিচারে দীর্ঘকাল ধরে বন্দী হয়ে আছে কিংবা পলাতক জীবনযাপন করছে। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস ছাড়া একে আর কি বলব? আমি এই দুই শ্রেণীর শত শত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পারি। দেশের বাইরে কিছুকাল অবস্থান করে অনেক হোমরা চোমরার আমলনামার খবর জানতে পেরে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গিয়েছি।

দেশের মানুষ বর্তমানে ভয়ানক অস্থির ও আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে আছে। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মীরা রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, এমনকি বৈষয়িক প্রতিপক্ষকে নির্বিচারে এই সুযোগে হাজতে ভরে দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। সারা দেশে সরকারি হিসাব মত প্রায় অর্ধ লক্ষ মানুষ বিনাবিচারে আটক। আরও কয়েকলক্ষ লোক গ্রেফতারের আশঙ্কায় দিবারাত্র পেরেশান অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। এই সব বিপুল সংখ্যক মানুষের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মিলায়ে প্রায় অর্ধকোটি মানুষকে স্পষ্টতই চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। দেশের মধ্যে এমন একটি শ্রেণী তৈয়ার করা হয়েছে যাদের পক্ষে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে কিছুতেই সহজভাবে ও সানন্দে গ্রহণ করা

সম্ভব হয়ে উঠছেনা, কিংবা যাদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনের অথবা নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ায়ে নেবার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না।

এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দালাল আইন নামে একটি কালাকানুন প্রবর্তন করা হয়েছে। যে-সমস্ত মানবতাবিরোধী আইনকে আমরা এ যাবৎ কালাকানুন বলে আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি এই আইন সে সমস্ত আইন অপেক্ষা অনেক বেশি কালো। আইনটি এমন অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য। তারপর সম্প্রতি এর সংশোধন করে নিম্নতম শাস্তি নির্ধারণ, সাক্ষ্যআইনের প্রচলিত আইন পরিবর্তন, যাদের পূর্বেই সাজা হয়ে গেছে তাদের সাজা বৃদ্ধির ব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা সরকার এই আইনকে প্রতিহিংসামূলক আইনে পরিণত করেছেন। এমন অবৈধ নীতিবিরুদ্ধ আইন কোন সভ্য দেশে প্রবর্তন হয়েছে কিনা আমার জানা নাই। দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে লজ্জায় মাথা নত করেছি।

দালাল আইনের বিচারও প্রহসন বই কিছুই নয়। এই আইনের বলে কাউকে ধরে ফেললে তার খালাসের কোন সম্ভাবনা নাই। এমনি অমোঘ বিধান। সমস্ত আটঘাট বেঁধেই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিছুটা অসুবিধা দেখার ফলে সংশোধন করে তা দূর করা হয়েছে। অনেক উগ্রপন্থী বলেছে বিচারের কি দরকার? ধরে আনবে, সাজা দিয়ে দেবে। আমার মনে হয় তাই ভাল ছিল। বিচারের পবিত্রতা নিষ্কলুষ থাকত। অনর্থক সরকারি পয়সারও অপব্যয় হতনা। বিচারকরা অন্যান্য বিচারকার্যে ব্যস্ত থাকতে পারতেন। সরকার পক্ষ যে শতশত উকিল নিযুক্ত করেছেন তাদের দরুন অর্থও বেঁচে যেত।

এই আইন যে উদ্দেশ্যেই প্রণয়ন করা হোক না কেন বর্তমানে বিরোধীদলীয় অর্থাৎ সরকার ও তাদের আওয়ামী লীগ যাদের বিরোধী বলে কল্পনা বা অনুমান করেন তাদের গ্রেফতারের জন্য একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। এম, সি, এ, কিংবা আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা বা কর্মী যাকে বা যাদের বিরোধী ভাবাপন্ন মনে করে তাদের গ্রেফতার করবার নির্দেশ যথারীতি জারী করা হচ্ছে। অনেকের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ দাবী করে আংশিক আদায়ের পর বাকী অনাদায়ী অংশের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বার করা হয়েছে এমন ঘটনা আমি নিজে জানি। কে দালাল এবং কে নয় হঠাৎ এটা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। দেশে মোটামুটি দুইটি দালাল শ্রেণী বিরাজ করছে : একটি সরকারি অপরটি বেসরকারি।

সরকারি পর্যায়ে অনেক নেতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন এসব অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত এমন কোন অপরাধ করা হয় নাই, যা ক্ষমা করা হয় নাই। অবশ্য ক্ষমা করার জন্য মহৎ প্রাণের প্রয়োজন। ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষমা করতে অক্ষম। ক্ষুদ্র মন বৃহৎ রাষ্ট্র চালাতেও অক্ষম। যারা আজ ক্ষমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন কোন-না-কোনদিন তাদেরও যে ক্ষমার প্রয়োজন হবে না এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না। সেদিন কিন্তু তারা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত না-ও হতে পারেন। কারণ, যারা ক্ষমা করে না, তারা ক্ষমা পায় না।

বন্ধুগণ

গভীর পরিতাপের বিষয় দেশের সমস্ত মানুষের অটুট ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা যে মুহূর্তে অত্যন্ত বেশি, ঠিক সেই সময়ই সরকার ইচ্ছা করে, চেষ্টা করে অনৈক্য সৃষ্টির কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক–এক কথায় সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মন হতাশা-নিরাশা, আতঙ্ক-সন্ত্রাসে আচ্ছন্ন। মুষ্টিমেয় সরকারি অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের কথা আলাদা।

দেশ গড়ার কাজে যে উন্মুক্ত মনের প্রয়োজন, গোড়া থেকেই বর্তমান সরকার সে মনটাকে ভেঙ্গে ফেলেছেন। মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্কট ছাড়াও চিত্তের অস্থিরতা ও পরিবেশের অনিশ্চয়তা তাদের বিভ্রান্ত করে রেখেছে। সমগ্র জাতিটাকে প্রতিপক্ষ কল্পনা করে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে–ধমক দিয়ে আরও অস্থির করে তোলা হচ্ছে।

দেশের জনসাধারণের পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, রোগের ঔষধ নাই। মানুষের মনে প্রাণে স্বাধীনতার মর্যাদা ও মূল্যবোধের অনুভূতি আসন লাভ করতে পারে নাই। প্রাণহীন কাষ্ঠ-কঠিন মুক্তির আবেদন নয়–প্রাণবন্ত প্রাণের ডাক প্রীতির আহ্বান মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করবে, তবেই সে বুঝতে পারবে স্বাধীনতার মহিমা।

নেতৃবৃন্দ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নাই, এটাই সরকারের চরম ব্যর্থতা। সেই জন্য দেশ-গড়ার ডাকে একটি প্রাণীরও আন্তরিক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, যে মানুষ স্বাধীনতার ডাকে ধন-মান-প্রাণ সব বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই, সেই মানুষ স্বাধীনতার অল্পদিনের মধ্যে অসাড় ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল কেমন করে? এবং কেন? লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিসর্জন, মানসম্ভ্রম, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, এই বিভীষিকাময় ইতিহাস তার জীবনে একটুও রেখাপাত করে না?

আদর্শ ও মহিমায় উদ্বুদ্ধ মানুষ বর্তমানের অর্থনীতিক সঙ্কটের চাইতে আরও কঠিন সঙ্কটের মোকাবিলা হাসিমুখে করতে পারত। শান্ত পরিবেশে একাগ্রচিত্তে দেশগড়ার কাজে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে পারত। দ্রব্যমূল্যের অভূতপূর্ব ঊর্ধ্বগতি, জীবনধারণের অবলম্বনের নিদারুণ অভাব তাকে দমায়ে রাখতে পারত না। পেটে পাথর বেঁধে, লতাগুল্ম খেয়ে, গাছের বাকল পরিধান করে স্বাধীনতার মর্যাদা ও মহিমা অটুট রাখার নজির ইতিহাসে বিরল নয়।

সরকার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম; পথ নির্দেশ করতে অপরাগ। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, এত দিন যে স্বৈরাচারী পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীন হয়েছে, বর্তমান সরকার তাদের প্রায় প্রত্যেকটি আচরণ ও কার্যকলাপের হুবহু অনুকরণ করছেন। তারা যেন আগের অভ্যাস ভুলতে পারেন নাই। বজ্রমুষ্ঠি উত্তোলন করে পশ্চিমাদের তীব্র ভাষায় গালাগাল দেওয়া হয়েছে এতকাল; এখন চাঁদমারির অভাবে দেশের মানুষের উপর, তার আজমাইশ চলছে। এতেও তারা নিরস্ত হন নাই। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য রংবেরং এর বাহিনীর সৃষ্টিও হচ্ছে একটার পর একটা।

অথচ বিদেশী পত্র-পত্রিকা এই সরকারকে দুর্বল সরকার অক্ষম সরকার বলে অভিহিত করছে। স্বাধীন দেশ পরিচালনায় এরা অপারগ এই ইঙ্গিত করতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করছে না। এটা বড়ই লজ্জার কথা। জরুরী সমস্যা সমাধানে অহেতুক বিলম্ব হওয়ায়

দেশে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। আইনশৃঙ্খলার অবস্থা দশমাস পরও সঙ্কটজনক। মানুষের ধন প্রাণের কোন নিরাপত্তা নাই। কে কখন কি অবস্থায় প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে, কেউ বলতে পারে না। অনেকের হাতে এখনও বহু মারণাস্ত্র রয়ে গেছে।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি আকাশমুখী। ধান চাউল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যে বৃদ্ধি পেয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ কখনও হয় নাই। স্বাধীনতার পর প্রায় তিনমাস পর্যন্ত বাংলাদেশের ধন-সম্পদ বিশেষ করে ধান চাউল পাট অবাধে দেশের বাইরে চলে গেছে, যার ফলে অবস্থার এই পরিণতি ঘটেছে। যারা চাউলের মূল্য পঞ্চাশে উঠায় দেশে ভূখামিছিল বার করেছে, দুর্ভিক্ষ এসে গেছে, হাজার হাজার মানুষ মরে যাচ্ছে বলে আকাশ পাতাল ফাটায়ে তুলেছে আজ তারাই সিংহাসনে আরোহণ করে দিব্যি আরামে বড় বড় কথা বলে আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টায় মগ্ন।

দেশে দুর্নীতির পাহাড় গড়ে উঠেছে। সরকারি কর্মচারীদের ইতিপূর্বে যে দুর্নাম ছিল, তা এখন প্রায়ই ঢাকা পড়ে গেছে। সরকারি দলের সদস্য ও আওয়ামী লীগের সদস্যরা এই ব্যবসায় একচেটিয়া করে নিয়েছে। এখানে অন্যদের প্রবেশ নিষেধ। বিদেশী এক পত্রিকায় দেখলাম বাংলাদেশকে sea of corruption— দুর্নীতির সাগর বলে আখ্যা দিয়েছে। সরকারি এম সি এ-রা দিনে ডাকাতি করেছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। কর্তাব্যক্তিরা অনেকদিন পর্যন্ত এই অভিযোগ গ্রাহ্যই করেন নাই, বোধ হয় বিশ্বাসও করে নাই। শেষপর্যন্ত জনমতের চাপে এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দলের তাড়নায় অনেকগুলিকে অপসারণ করতে হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ মনে করে এরা খুচরা ব্যবসায়ী ছিল; যারা পাইকারী দুর্নীতি ব্যবসায় লিপ্ত ছিল বা আছে তাদের স্পর্শ করা হয় নাই। বোধ হয় করা যায় না বলেই। জাতীয় পরিষদ সদস্যরা ও আওয়ামী লীগের সদস্যরা এই ব্যাপারে বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছে।

বিদেশে সংগ্রামের সময় যারা দেশত্যাগ করে চলে গিয়েছিল তারা কেহই খালি হাতে এখান থেকে যায় নাই, যা পেয়েছে কুড়ায়ে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যায় গোড়া থেকেই। যে অর্থ তারা নিয়ে গেছে তার পরিমাণ নেহাত কম নয়। এক দল আর এক দলের গোপন তথ্য প্রকাশ করার হুমকি দিচ্ছে। সরকার এ-বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে আমাদের সন্দেহ দৃঢ়তর করে তুলেছেন। শোনা যায় অনেকে বিদেশে বাড়িঘর সম্পত্তিও অর্জন করেছেন। আল্লাহ আলিমুল গায়েব।

এখানে যারা মুক্তিবাহিনী করেছেন তারাও কম যান নাই। আমার বিশ্বাস, যারা আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়ে সংগ্রাম করেছে, সেই সব খাঁটি মুক্তিবাহিনীরা সমাজবিরোধী ক্রিয়াকার্যে লিপ্ত হবে বলে মনে হয় না। তবুও মাঝে মাঝে অভিযোগ শোনা যায়, যে সবাই যখন এই সব কাজে ব্যস্ত, তখন এরাও জামাতে শামিল হয়েছে কিঞ্চিৎ লাভ সংগ্রহ করার জন্য। মেকী বাহিনীর ত কথাই নাই। দৈবাৎ তাদের হাতে নানা ধরনের মারণাস্ত্র পড়েছে এবং সেই সব সদ্ব্যবহার করে তারা বেশ বিত্তবান হয়ে পড়েছে। এদের অর্থের কোন অভাব হয় না।

বন্ধুগণ!
ভারতের সাথে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে অনেক বাকবিতণ্ডা হচ্ছে। আমিও আমার দল বরাবরই ভারতের সাথে প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপন ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসারে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী। ছাপ্পান্ন সালে আমার বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং ঊনসত্তর সালে প্রকাশিত আমাদের দলীয় কর্মসূচিতেও তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

উপকারী বন্ধু প্রতিবেশীর সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় দেশের অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে আমরা কারুর চেয়ে কম আগ্রহী নই।

কিন্তু এই আগ্রহ কোন অবস্থায়ই দেশের ও জাতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার পর পরই ভারত-বাংলা মৈত্রীর নামে যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে আমি ইতিপূর্বে তার তীব্র প্রতিবাদ করেছি। সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া, প্রথামাফিক লেনদেন ব্যবস্থা চালু না-করে চোরাচালানীদের হাতে দেশের অর্থনীতি তুলে দেওয়া, কারণে-অকারণে দিল্লীর দরবারে ও কলকাতার বাজারে ধর্ণা দেওয়া, আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রশ্নে দিল্লীর আঁচলধরার হীনমন্যতা প্রদর্শন, ইত্যাকার ত্রুটিপূর্ণ, ভ্রান্ত ও অবিজ্ঞজনোচিত কার্যকলাপের দরুণ একদিকে যেমন দেশের অর্থনীতি অল্পদিনেই ধূলায় মিশে গেছে, অপরদিকে তেমনি জাতীয় জীবনে এসেছে অহেতুক ও অবাঞ্ছিত বিতর্কের ঝড়। যার ফলে দেশের অর্থনীতিক ব্যবস্থা রসাতলে যাবার উপক্রম হয়েছে।

এই সব কারণে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। দেশের একটি বা দু'টি দল নিজেদের ভারতপ্রেমিক হিসাবে তুলে ধরে অন্যদের ভারত-বিরোধী হবার উস্কানী দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। ভারত সম্পর্কে ছোটখাট সমালোচনাকে ও এই মহল বাংলাদেশ-বিরোধী বলে হুমকি দিয়েছে। অর্থাৎ ভারত-প্রেম ও বাংলাদেশ-প্রেম একার্থবোধক। একটাকে ভালবাসলেই আর একটাকে বাসতেই হয়। উভয়ের প্রতি আনুগত্য একই পর্যায়ের।

এই ব্যাপারে ভারত সরকারের অনুসৃত নীতিও নির্ভুল হয় নাই। ভারত আমাদের বিপদের বন্ধু, বিপন্ন নাগরিকদের আশ্রয় দিয়েছে, এই কথাগুলি বড় বেশি বেশি করে বলা হচ্ছে, যেন মুখস্থ করে ফেলতে হবে। উপকৃতকে বারংবার উপকারের কথা স্মরণ করায় দিয়ে বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক সৃষ্টি করা সম্ভব, কিন্তু তাতে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের অপমৃত্যু ঘটে, কারণ এই প্রচেষ্টা কৃত্রিম এবং বেশি টানাটানি করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। অনেককে তাই ব্যঙ্গসুরে বলতে শোনা যায়, আহা! ওরা কি বিনা মতলবে এ সব করেছে নাকি? পাকিস্তান ধ্বংস করা ছিল আসল উদ্দেশ্য, তার জন্যই এত সব!

মানুষের মুখে ত আর তালা লাগান সম্ভব নয়। হলেও কয় মুখে লাগাবেন। কথা ফুটে উঠবেই।

বাংলাদেশের আর্থনীতিক পুনর্বাসনে ভারত যে ভূমিকা পালন করছে তাতে সুনামের বদলে বদনামই হয়েছে বেশি। ভারতীয় পণ্যে বাজার ছেয়ে ফেললেও দ্রব্যমূল্য দিন দিন বেড়েই চলছে। অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে বাংলাদেশের কলকারখানাগুলি

পুরাদমে চালু করা, বাংলাদেশের বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্বহাল করা ইত্যাদি ব্যাপারে আরও দ্রুত ও কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু যে-কোন অজ্ঞাত কারণে তা করা হয় নাই।

স্বাধীনতার পর পরই বহু সম্পদ লোহা-লক্কর এদেশ থেকে ভারতে চলে গিয়েছে। অনেকে অনুমান করে কয়েক হাজার কোটি টাকার। কে দিয়েছে বা কে নিয়েছে সে প্রশ্ন অবাস্তব। সেনাবাহিনীরা অনেক সম্পদ নিয়ে গিয়েছে এই অভিযোগও করা হয়। আমাদের সরকার প্রথম তিনমাস এই সব ব্যাপার এবং চোরাচালানের ব্যাপারে একটি কনিষ্ট অঙ্গুলিও উত্তোলন করে নাই। জনসাধারণ সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তা সুনজরে দেখে নাই বরং সন্দেহ করেছে সরকারের সাথে ভারতের নিশ্চয়ই কোন গোপন চুক্তি হয়েছে যার ফলে বিধ্বস্ত দেশের শেষ সহায় সম্বলও ভারতে চলে যাচ্ছে।

ভারতের প্রতি বাংলাদেশের জনসাধারণের মনোভাবের অবনতি ঘটার আরও ছোটখাট কারণ আছে। মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছেই। পঁচিশে মার্চের আগে অনেক হিন্দুই এ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের অনেকে ফিরে এসে পূর্বে বিক্রীত জমিজমা দাবী করায় আইনশৃঙ্খলা ঘটিত প্রশ্নের উৎপত্তি হয়েছে এবং বিভিন্ন মহলে আতঙ্কও সৃষ্টি হয়েছে। পঁচিশের পরে যারা গিয়েছে, তাদেরও অনেকের অর্ব্বাচীন উক্তিও মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এরূপ খবর অনেক স্থান থেকেই পাওয়া গেছে সেখানে স্থানীয় মুসলমানদের বলেছে, মিঞা সাব এখন আর পাকিস্তান নাই বুঝে সুঝে চলেন। বার বার ধমক শুনে অনেক জায়গায় লোকজন বিরক্ত হয়ে উত্তর দিয়েছে তাই বলে কি হিন্দুস্থান হয়ে গেল নাকি? অনেক মুসলমান মনে করে যে ঐ উক্তির তাৎপর্য হল যে যেহেতু পাকিস্তান নাই সেইহেতু হিন্দুস্থান হতে বাধ্য। মুসলমান স্বভাবতই আঁৎকে উঠে।

ছোটখাট, এমন কি অনেক সময় হাস্যকর হলেও এইসব খুচরা ব্যাপারগুলিকে উড়ায়ে দেওয়া চলে না। জনসাধারণের মানসিক অবস্থা কি কারণে গঠিত হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখলে এসব কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

কলকাতার কোন কোন পত্রপত্রিকা নেহাত অবিজ্ঞজনোচিত প্রস্তাবও সময় সময় করেছে। বাংলাদেশের মুসলমানের ইসলামী নাম রাখার আর কি দরকার? বাঙালি নাম রাখাই ত উচিত। তাতেই বাঙালী জাতীয়তাবাদ বেশি করে ফুটে উঠবে। সংস্কৃতির ব্যাপারেও নানা ধরনের উদ্ভট প্রস্তাব তুলে ধরা হচ্ছে।

এই সব আচরণ, প্রস্তাবনা, সরকারের অতিমাত্রায় ভারত-নির্ভরতা মানুষকে ভারত বিরোধী করে তুলেছে। মানুষের মনে যদি একবার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে এই দেশে ভারতের কর্তৃত্ব নানাদিক দিয়ে বিস্তার লাভ করছে, তা হলে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে বাধ্য। একজন মন্ত্রী কয়েক মাস আগে আমাকে বলছিলেন যে আমাদের মাত্রাহীন বাড়াবাড়িই আমাদের দুই রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব বিনষ্ট করে দেবে। মন্ত্রীরা আগে যেমন ঘনঘন পিণ্ডি যাতায়াত করতেন, বর্তমানে আমাদের মন্ত্রীরা তেমনি লাইন ধরে ভারত ভ্রমণে যাবার জন্য উদগ্রীব আছেন। একজন-না-একজন ভারতে আছেনই। এর পর মানুষ যদি মনে করে যে, আমরা আগে যেমন পাঞ্জাব বা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিলাম, এখন তেমনি হয়েছি ভারতের, তা হলে তাদের দোষ দেওয়া চলবেনা। অন্য একজন মন্ত্রী এর

উল্টা উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, যারা বাংলাদেশ-বিরোধী, তারাই ভারত-বিরোধী। এই সব আচরণ ও উক্তিই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। যার ফলে ভারত-বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে।

বন্ধুগণ!

পাকিস্তানের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি হবে সেটাও গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। বিভিন্ন কারণে এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুতর এবং এর সমাধান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বলে মনে করি।

ভারতের মাটিতে নব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির অবস্থান, পাকিস্তানে প্রায় পাঁচ লক্ষ আটক বাঙালির দুর্বিষহ জীবনের পাশাপাশি উপমহাদেশের সাম্প্রতিক পটভূমিতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরূপণ করার জন্য আমাদের নিশ্চিত একটা strategy বা নীতি কৌশল নির্ধারণ করা একান্ত আবশ্যক। এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারটি যেন ভারত বা অন্যান্য বৃহৎশক্তির হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমার দল এই অবস্থার পরিবর্তন চায়।

আমরা মনে করি যুদ্ধবন্দী, পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের দেশে ফিরায়ে আনা এবং বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানিদের ব্যাপারে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনা কি একেবারেই অসম্ভব? ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সুদীর্ঘকালের শত্রুতা ও সম্মুখ সমরে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আলোচনা ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে স্বীকৃতি দেবার বহুপূর্ব থেকেই দুই দেশের প্রতিনিধি পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। ভিয়েৎনামের ব্যাপারেও আমরা দেখেছি দুইটি বিবদমান পক্ষ কি ভাবে শান্তি আলোচনার বৈঠকে যোগদান করছে।

পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল বা না-দিল এ প্রশ্নটি অবান্তর। পাকিস্তান স্বীকৃতি না দিলেও বাংলাদেশের কিছুই আসে যায় না। তবে একটি প্রশ্ন এখানে স্বভাবতই উঠতে বাধ্য। যদিও ভুট্টো সাহেব বারবার স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে পাকিস্তান জগৎসভায় একঘরে হয়ে থাকবে, কিন্তু তার দেশের অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্রে এই ভূখণ্ডকে পাকিস্তানের পূর্ব অংশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান বলে উল্লিখিত থাকায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিনিধি পূর্ণমর্যাদা লাভ করে আলাপ-আলোচনায় যোগদান করতে পারছেনা। যদিও নতুন খসড়া শাসনতন্ত্রে এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে কিন্তু এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তন না-করা পর্যন্ত আলাপ-আলোচনায় বাধা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার বিশ্বাস এই পরিবর্তন স্বীকৃত হয়ে যাওয়ার পর পরই উভয় দেশের প্রতিনিধি আলোচনায় মিলিত হতে পারে।

বন্ধুগণ,

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে গত মার্চ মাসে সাংবাদিক সম্মেলনে আমি অনেক কথাই বলেছিলাম। রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার অপরিহার্যতা আমি চিরদিনই বিশ্বাস করে এসেছি। উনিশশ উনসত্তর সালে জাতীয় ঘোষণাপত্রেই ধর্মনিরপেক্ষতার স্লোগান

তোলা হয়েছিল। তারও আগে আমি লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ করায় পশ্চিম-পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় আমাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিল। ধর্ম-নিরপেক্ষতার কদর্থ করে তারা বলেছিল যে আমি ধর্মহীন রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছি। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যে ধর্মহীনতা নয়, এ কথা তাকেও বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

আমি নিজে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় জীবনাদর্শে প্রগাঢ় বিশ্বাসী এবং আমার দলও ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ সংরক্ষণে আগ্রহী। রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে, অর্থাৎ কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করবেনা। অথচ দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ধর্মকে ঘৃণা করা, ধার্মিকের অবমাননা করা ফ্যাসনে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই যারা ধর্মবিরোধী প্রবণতা প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে শুনে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে, এই ভেবে যে ধর্মের নিগড় থেকে তারা মুক্তিলাভ করল। বলাবাহুল্য মুসলমানের সংখ্যাই এখানে অধিক। এরা অন্যধর্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত জ্ঞানলাভ করে থাকলেও ইসলাম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান লাভ করে নাই এবং ইসলাম-বিরোধী লেখকদের পুস্তক-পুস্তিকা পড়ে ইসলাম সম্বন্ধে শুধু অবজ্ঞা অর্জন করতে পেরেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার কদর্য এখন ধর্মহীনতার স্তর অতিক্রম করে ধর্ম-বিরোধিতার পর্যায়ে চলে এসেছে। তাও অন্য ধর্মের বিরোধিতা নয়। বিরোধিতা শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে। মুসলমান ধর্মের কথা তুললেই সাম্প্রদায়িক বা ধর্মান্ধ (communal & fanatic) আখ্যা লাভ করে! অন্যেরা তাদের ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে তাকে পণ্ডিত নাম দেওয়া হয়। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি যাদের ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং যারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে কোনরূপ আগ্রহ দেখান না, তারাও সময়ে অসময়ে অনর্থক ইসলামকে মডার্নাইজ অর্থাৎ আধুনিক করে তোলার সুপারিশ করে থাকেন। এতে করে অনেকের মনে এই ধারণা জন্মায় যে ইসলাম সত্যিসত্যিই সে কালের ধর্ম-বর্তমান কালের পক্ষে একদম অনুপযোগী ইত্যাদি। অর্থাৎ একে আধুনিক পোষাক পরাতে হবে।

প্রকৃত ধার্মিক, যে ধর্মেরই হোক না কেন, অন্যধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারেন না। যারা নিজের ধর্মকে অবজ্ঞা করে তারা পরের ধর্মকে ভাল চোখে দেখতে পারে না। তারাই দেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করে।

আমরা সাম্প্রদায়িকতার তীব্র নিন্দা করি। সাম্প্রদায়িকতা দেশকে উচ্ছন্ন করে দেয়। সাম্প্রদায়িক কলহ নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যেই ভারত ভাগ হয়েছিল। এইটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু পঁচিশ বছরে কলহ শেষ হয় নাই। পঁচিশ বছর পর্যন্ত উভয় জাতিই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হয়ে দেশের সুনাম নির্মমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। দেখা গেল, দেশ ভাগ করেও দুই জাতির মনোবৃত্তির পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। তবে বাংলাদেশে নতুন মানুষ নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি সাম্প্রদায়িকতা চিরদিনের তরে বন্ধ করে দিতে পারে তা হলে জাতীয় জীবনে আমরা এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করতে পারব।

বন্ধুগণ!

দেশের জরুরী সমস্যার সমাধান হোক-না-হোক, সরকার সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে খুব জোর গলায় প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। এটি রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ। এই বলেই অতি তাড়াতাড়ি মিল, কলকারখানা, বীমা ও ব্যাংক জাতীয় করে ফেলেছেন। জাতীয়করণ সমাজতন্ত্রের অতি প্রাথমিক একটি স্তর হতে পারে। কিন্তু বিচার বিবেচনা না-করে ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্প, ঋণে জর্জরিত বীমা কোম্পানি ও ব্যাংক সমুদয় জাতীয়করণ করায় দেশের অর্থনীতি উন্নতি লাভের পরিবর্তে অবনতি লাভ করেছে। বীমা কোম্পানিগুলি শত শত কোটি টাকা ঋণগ্রস্থ। এই সব জাতীয়করণ করার অর্থ সমাজের উপর এই ঋণের দায় চাপায়ে দেওয়া।

সুতরাং দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা হয় নাই। এ কথা আমি পূর্বেও বলেছিলাম। চালু যা করা হয়েছে, তাকে বড়জোর নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র বলা চলে। অনেকে আবার একে ষ্টেট ক্যাপিট্যালিজম অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। সরকার শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা বহাল রেখেছেন এবং এ ক্ষেত্রে কোন সীমারেখা ও নির্ধারণ করা হয় নাই। অথচ সরকারি নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তারা এমন ভাব দেখাচ্ছেন যে দেশে সমাজতন্ত্র এসেই গেছে। বাকী রয়েছে শুধু তার ফলভোগ করা।

আমার বিশ্বাস এই সব ভ্রান্ত ধারণার জন্যই তারা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনর্থক অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করেছেন।

সমাজতন্ত্র রাতারাতি কায়েম করা যায় না। কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিও এখন পর্যন্ত পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করতে সমর্থ হয় নাই।

আজকার বাংলাদেশে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ একেবারেই তুলে দেওয়া সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। সরকার ও পরিচালকবৃন্দ এ কথা মনে রেখে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পনীতি প্রণয়ন করলেই দেশের মঙ্গল সাধন হতে পারে।

ব্যক্তিগত তহবিলে যে কোন পরিমাণ অর্থসঞ্চয়ের সুযোগ রেখে কেবল শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করার ফলে আজ দেশে শিল্পোদ্যোগের পরিমাণ শূন্যের কোঠায়।

অথচ খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায় আবিশ্বাস্য হারে মুনাফা লুট করা সম্ভব। ফলে যাদের হাতে খাটাবার মত টাকা আছে তারা তা উৎপাদনশীল খাতে নিয়োগ না-করে আড়তদারী ও মজুদদারীতে নেমে পড়েছে। বিত্তবানদের জন্য এটা শাপে বর হয়েছে। অথচ এ কথাটা তারা ভেবে দেখে না যে নতুন শিল্পোদ্যোগ ছাড়া বাংলাদেশের এই বিরাট জনসমষ্টির কর্মসংস্থান অসম্ভব।

শ্রমিক সমাজ

সরকার সম্প্রতি আইন জারী করেছেন, তাতে ধর্মঘটের অধিকার রাখা হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক দেশে ধর্মঘটের অধিকার অবশ্য থাকে না। কিন্তু বাংলাদেশ এখনও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই, এই সত্য অস্বীকার করার ফলেই বোধ হয় সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

তবে এ সম্বন্ধে আমি এ কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে স্বাধীনতার পর পরই আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর এক অংশ যে-ভাবে রাতারাতি বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দাবী জানায়ে ঘেরাও ধর্মঘট মিছিল শোভাযাত্রায় নেমে পড়েছিলেন, তা কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে তা ভেবে দেখা একান্ত দরকার। এই ব্যাপারে আরও দুঃখজনক ব্যাপার এই যে সরকার সমর্থক জাতীয় শ্রমিক লীগ এবং আওয়ামী লীগের এবং আরও কোন কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা এতে ইন্ধন যোগায়েছেন। ফলে দীর্ঘ এক বছর যে কারখানাটি বন্ধ ছিল, কিংবা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি অচল হয়েছিল নতুন করে তার যাত্রা শুরুর প্রারম্ভেই তার খরচের অঙ্ক দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে যায়। ফলে আয়ের পরিমাণ নেমে আসে শূন্যের কোঠায়। এ যেন আণ্ডা খাওয়ার লোভে মুরগির পেট ছিঁড়ে ফেলার মত হয়েছে। আজ দেশে একটি শিল্পও লাভজনক পর্যায়ে আছে কিনা আমার ঘোর সন্দেহ। পরিণামে শ্রমিক শ্রেণীই যে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

বন্ধুগণ

সংবিধান ও সমাজতন্ত্র

ছয়দফার দাবী নিয়ে ইয়াহিয়ার আইনগত কাঠামোর অধীনে সত্তর সালের নির্বাচিত বর্তমান পরিষদের সদস্যদের স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র প্রণয়ন করার আইনত অধিকার আছে কিনা যে প্রশ্ন উত্থাপন না-করেও শাসনতন্ত্রের মর্ম ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর মতভেদ রয়েছে।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি বিবেচনা করে অনেকেই এই দাবী তুলেছিলেন যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে দলীয় ব্যাপার না-রেখে সকল দল ও মতের সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণ করার পর শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও গ্রহণ করা উচিত ছিল। সরকার এটা স্বীকার করেন নাই।

তাই গণপরিষদ একটি মাত্র দলের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় অন্য কোন মতবাদ ও যুক্তি বা প্রতিবাদের কোন অবকাশ শাসনতন্ত্র গ্রহণের বেলা দেখা যায় নাই। ব্যাপারটি নিছক দলীয় ব্যাপার ছিল। সেই জন্য কোন বিঘ্ন, বাধা বা জটিল সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন উঠেই নাই। একতরফা মোকদ্দমা। খালি পোষ্টে গোল দেবার মত সহজেইনির্বাহ করার ব্যাপার ছিল।

৪ঠা তারিখে শাসনতন্ত্র পাশ হয়ে গেলেও প্রায় দেড়মাস ঝুলায়ে রেখে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে প্রবর্তিত হবে বলে বলা হয়েছে। হয়ত ষোলই ডিসেম্বর একটি ঐতিহাসিক দিবস বলেই অপেক্ষা করা হয়েছে, নাকি এই অবসরে কোন মতলব সিদ্ধি করা হবে তা অবশ্য বোঝা কঠিন। কিন্তু সন্দেহ করা অন্যায় হবে না। শাসনতন্ত্র চালু হয়ে গেলে অনেক কাজই সরকার খুশী মত করতে পারবেন না।

তবুও একটি শাসনতন্ত্র রচিত হয়ে পাস হয়ে গেল। বিনা শাসনতন্ত্রে এতদিন সরকার যে হুকুম-হাকুম দিয়ে দেশ শাসন করেছেন তার অবসান হয়ত ঘটতে পারে।

কিন্তু শাসনতন্ত্রের নক্‌শাটি মোটামুটি আয়ুবী শাসনতন্ত্রের হওয়াতে ভয়ের অবকাশ নাই তা' বলা চলে না। আয়ুব শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট ছিল জনগণের প্রতি অনাস্থা। আমাদের শাসনতন্ত্রেও সে ইঙ্গিত বর্তমান। সর্বপর্যায়ের মানুষের দিকে যেন চোখ রাঙায়ে তাদের ভয় দেখান হচ্ছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পূর্ণমাত্রায় তাদের দিতে বেশ কার্পণ্য লক্ষ্য করা যায়। এক হাতে কিছুটা দিয়ে যেন অন্য হাতে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

আয়ুব শাসনের আর একটি বৈশিষ্ট ছিল একটি মানুষকে লক্ষ্য রেখে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। আমাদের এই শাসনতন্ত্রেও তাই করা হয়েছে।

ষ্টেট পলিসির ব্যাপারে ইসলামকে বাদ দিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষতা সংযোগ করা হয়েছে। কোন শাসনতন্ত্রে এরূপ উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। কমিউনিষ্ট শাসিত দেশে কমুনিজম বা সমাজতন্ত্রের কথার উল্লেখ নাই। কারণ কথা বা লেখার চাইতে কাজের দিকে তাদের লক্ষ্য বেশি।

মৌলিক অধিকারের ব্যাপারটি মোটামুটি আয়ুব শাসনতন্ত্রেরই সংশোধিত সংস্করণ। গোপন বিচারের অভিনব ব্যবস্থা নতুন সংযোজন। এটা সম্পূর্ণরূপে অগণতান্ত্রিক। বিচার সর্বদাই খোলাখুলিভাবে প্রকাশ্য আদালতে হয়ে থাকে। কোন বিশেষ মোকদ্দমার বিচার গোপনে করা উচিত কিনা সেটা বিচার করবেন আদালত। শাসনতন্ত্রে এইরূপ বিধান অতি অভিনব। সন্দেহ হয়, যে রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধীদের বিচার গোপনে করার ব্যবস্থা কার জন্যই এটা করা হয়েছে, যাতে করে সরকারের কোন গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে না পড়ে। জাপানী শাসনতন্ত্রে গোপন বিচারের একটা ব্যবস্থা আছে বলে মনে হয়। কিন্তু তাতে পরিষ্কার বিধান আছে যে সে ব্যবস্থাও করবেন আদালত। রাজনৈতিক অপরাধের বিচার কোন অবস্থাতেই গোপনে হতে পারবে না।

আর একটি অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর অধিকাংশ সদস্যদের আস্থা হারাবার পর। বলা হয়েছে এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হয় পদত্যাগ করবেন নতুবা প্রেসিডেন্টকে গণপরিষদ বাতিল করার পরামর্শ দেবেন এবং তিনি তা করতে বাধ্য হবেন। মনে হয়, শেষোক্ত বিধানই প্রধানমন্ত্রীর মনঃপুত হবে। যে মুহূর্তে তিনি অধিকাংশের আস্থা হারায়ে ফেলবেন, সেই মুহূর্তের পর তিনি আর প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন না। সে অবস্থায় তিনি কেমন করে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিবেন, আর প্রেসিডেন্টই বা সে পরামর্শ করতে বাধ্য হবেন। এই ব্যবস্থা অন্যায় অগণতান্ত্রিক ও নীতি বিরুদ্ধ।

সদস্যপদ বাতিল হবার যে ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে রাখা হয়েছে এটাও অভিনব। বিষয়বস্তু অভিনব নয়, পদ্ধতি অভিনব। আয়ুবও এটা শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করেন নাই। এটা ছিল পলিটিক্যাল পার্টি অ্যাকটে। এতে নতুন অঙ্গ সংযোগ করা হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের মহিমান্বিত মর্যাদা রক্ষা করা হয় নাই। বিভিন্ন দেশের সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও মর্যাদা যে পরিমাণে নির্ধারিত আছে তা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। হাইকোর্টের ১০২ ধারা অনুযায়ী যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা আয়ুব শাসনতন্ত্রের ৯৮ ধারাই কিঞ্চিৎ বিকৃত পরিবর্তন।

শাসনতন্ত্রে তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের পশ্চাদপদ অবস্থা দূরীকরণের জন্য কোন সংরক্ষণমূল ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অথচ মানবতার খাতিরে এটা প্রয়োজন ছিল।

শাসনতন্ত্রে আঠারোটি বিশেষ বিশেষ হুকুম যা আইনের মর্যাদা লাভ করেছিল, তাকে পরম যত্ন সহকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আয়ুব শাসনতন্ত্রেও অনুরূপ বিধান ছিল। কতগুলি সাময়িক আইন জরুরীব্যবস্থা স্বরূপ প্রবর্তন করা হয়েছিল, পরে শাসনতন্ত্রে তাকে চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের শাসনতন্ত্রে তারই অনুকরণে আঠারোটি আইন চিরস্থায়ী করেছে। শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারায় সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা থাকা সত্বেও এই ব্যতিক্রম ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন আদালত এই সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

এর মধ্যে সর্বপ্রথম হুকুমটি হচ্ছে দালাল আইন। এই আইনটি ভূতাপেক্ষ অর্থাৎ retrospective। নতুন অপরাধ সৃষ্টি করে নিরপরাধ কার্যকে অপরাধে পরিণত করার ব্যাপারে সভ্যজগতে আর নাই।

শাসনতন্ত্র দেশের সর্বোচ্চ আইন। যে ভাবেই করা হোক না কেন, বিষয়বস্তুর ব্যাপারে যতই ক্রটিপূর্ণ হোক না কেন একটি জাতির পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল এবং সেই হেতু অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র। কিন্তু দালাল আইনটি এই দলিলে চিরস্থায়ী রেখে এর পবিত্রতা কলুষিত হয়েছে। সরকার ও তার দল এই আইনের অপপ্রয়োগে যখন খুশী যে কোন মানুষকে যে কোন অবস্থায় বন্দী করে বিচারের সম্মুখীন করে রাখতে পারবেন। এই আইনের অপপ্রয়োগ মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিৎ বিঘ্নিত করবে।

এই আইনটি সংরক্ষণের ব্যাপারে একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। ছাপ্পান্ন সালে যখন আমরা জননিরাপত্তা আইন বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন আমার কেবিনেটের একজন বিশিষ্ট সদস্য বলেছিলেন কিছুদিন এই আইন বলবৎ রেখে পরে না হয় বাতিল করা হোক। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, এতকাল যারা এই আইনের অপপ্রয়োগ করে আমাদের অনেকের জীবন পঙ্গু করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করে তাদের বুঝতে দেওয়া হোক নিরাপত্তা আইনে আটক রাখলে তারা কেমন বোধ করেন। তাঁর এই প্রস্তাব আমি গ্রহণ করি নাই, কারণ এটা গণতন্ত্র-বিরোধী। বর্তমানেও কেউ কেউ আমাকে বলছেন, আপনি কেন আইন বাতিলের দাবী করছেন। আইনটি যেমন আছে, থাকুক। সে সময় হয়ত দূরে নয় যখন এই আইন পুনরায় অন্যপর্যায়ে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এর চেয়ে বেশি হতে পারে। আগের মতই এই প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করি। যাকে নিন্দা করি তা অন্যের জীবনে নিন্দনীয় হবে না এ কথা আমি স্বীকার করতে করি না। সুতরাং অন্য লোকের বিরুদ্ধে প্রয়োগের সুযোগ পাব বলে একে সংরক্ষণ করার পক্ষপাতী আমি কিছুতেই হতে পারি না।

বন্ধুগণ!

সরকার ঘোষণা করেছেন, আগামী সনের মার্চ মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অত্যন্ত আনন্দের কথা। আমাদের দেশে পূর্বেও নির্বাচনের দিন তারিখ ধার্যকরার পরও

নির্বাচন অনুষ্ঠান হতে পারে নাই। আমরা অবশ্য বিশ্বাস করি আগামী নির্বাচনে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হবে না।

নির্বাচন যদি সত্যি সত্যিই অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে কি ধরনের নির্বাচন হবে, সেটা অবশ্য জানা দরকার। গণতন্ত্র রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের নির্বাচন প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হবে সবাই এটা কামনা করে। কিন্তু যারা এই যজ্ঞের হোতা তারা কি চিন্তা করছেন সেটাও জানা দরকার।

অনেক আগে থেকেই সরকারি নেতৃবৃন্দ খুব দম্ভ করে বলছেন যে তারা শতকরা নিরানব্বই আটানব্বইটি আসন পেয়ে জয়লাভ করবেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের প্রতি কটাক্ষ করে বলছে যে কেউ কিছু করতে পারবেনা। অর্থাৎ খুব জোর শতকরা একটি বা দু'টি আসন যা সরকার দয়া করে ছেড়ে দেবেন, তাই পেতে পারে। এই সব উক্তি গণতন্ত্রবিরোধী। অন্তত গণতান্ত্রিক মনের পরিচয় এতে পাওয়া যায় না। এতগুলি আসনের তাদের কি প্রয়োজন? আর এতগুলি আসন তারা পেয়ে গেলে গণতন্ত্র নির্ঘাৎ বিপন্ন হয়ে পড়বে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। বিরোধী দল যত শক্তিশালী হয়, সরকার ততই বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী হয়। এই সত্য যদি তারা স্বীকার না-করেন তা হলে তারা যে গণতন্ত্রকামী তা বিশ্বাস করা সম্ভব হয় না। গণতন্ত্রের অর্থই হচ্ছে সংখ্যালঘুর সম্মতি নিয়ে সংখ্যাগুরুর শাসন পরিচালনা।

গণতন্ত্র বক্তৃতা নয় কিংবা লিপিবদ্ধ দলিল বা প্রবন্ধ নয়। গণতন্ত্র একটি আদর্শ ও মনোভাব। অনেকেই মুখে গণতন্ত্রের বুলি আউড়ালেও কাজেকর্মে অগণতান্ত্রিক তার প্রমাণ আমরা অনেক দেখেছি। কেউ আমাদের মোকাবেলা করতে পারবে না, সবার জামানত জব্দ হবে, এটা হচ্ছে স্বৈরাচারী উক্তি।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হলে সর্বাগ্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তার জন্য সরকারকে বিশেষ কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণে জনসাধারণ স্বভাবতই আতঙ্কগ্রস্থ। ধন-প্রাণের নিরাপত্তা না-থাকলে গণতন্ত্রের কোন মূল্য মানুষের কাছে থাকে না। শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সরকার যে চেষ্টা করেন নাই তা নয়, কিন্তু অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস সর্বস্তরে সর্বদলীয় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার সচেষ্ট হলে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া সম্ভব।

আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে একটি দাবী ছিল যে নির্বাচনের ছয়মাস পূর্বে সরকার ইস্তফা দিয়ে অন্যান্য সবার সাথে সমপর্যায়ে দাঁড়ায়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। অবশ্য বক্তৃতা বিবৃতিতে আমরা এই সময়ের পরিমাণ তিন মাসের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। আজ যারা সরকারে প্রতিষ্ঠিত, তাদের অনেকেই এই দাবীর অংশীদার। এই দাবীর কথা নিশ্চয়ই তাদের মনে আছে। তাই আমি দাবী জানাব, নির্বাচনের তিন মাস আগে মন্ত্রীত্ব ভেঙ্গে দিয়ে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সরকারি দল নানা সুযোগ-সুবিধা স্বভাবতই ভোগ করবেন, আর অন্যরা কোন কিছুই পাবে না, তা ত হতে পারে না।

সেই জন্য আমি দাবী করি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদপত্রসমূহ রেডিও টেলিভিশন প্রভৃতি প্রচারযন্ত্রসমূহে সরকার ও বিরোধীদলের বক্তব্যের সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ নির্বাচনে সরকারি গাড়ি সরকারি সম্পদ কোন দল-বিশেষের কাজে ব্যবহার করা হবে না এই আশ্বাস ও নিশ্চয়তা দিতে হবে।

সরকার প্রকাশ্যে এই আশ্বাস দেবেন যে কোন সরকারি কর্মচারী নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করলে তিনি দণ্ডনীয় হবেন। সরকারি দলের কর্মচারীর সাহায্য গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা দেয় এর প্রমাণ আমরা পূর্বেও দেখেছি।

শাসনতন্ত্রে সরকারি কর্মচারীদের শোচনীয় অবস্থা করা হয়েছে। তাদের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। স্বাধীনতার পর থেকেই সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে যে খেলা হচ্ছে তা খেলার পর্যায় ছাড়ায়ে প্রায়ই পাগলামির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারীদের নিরাপত্তা একটি প্রধান রক্ষাকবচ। তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেনা এটা ঘোর অবিচার। সরকারি চাকুরদের প্রায়ই গৃহভৃত্যের পর্যায়ে পরিণত করা হয়েছে। তাদের এই অবস্থায় রেখে তাদের দিয়ে যা খুশী তাই করায়ে নেওয়া সম্ভব। তারা উপায়হীন অবস্থায় সরকারের একান্ত অনুগত ও বংশবদ ভৃত্যের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হবেন। এমতাবস্থায় অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন কিছুতেই সম্ভব হতে পারবে না।

বন্ধুগণ

দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে ঐক্যের প্রয়োজন। বিরোধী দলমত নির্বিশেষে দলীয় একটি ঐক্যজোট স্থাপন করা অপরিহার্য। সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জাতীয় জীবনকে বর্তমান একদেশদর্শী সরকারের খামখেয়ালির হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আমি দেশের সবগুলি প্রগতিশীল দলকে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী জোট গঠন করে তোলার আহ্বান জানাই। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি লেলিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলা জাতীয় লীগ নবগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য একমনা নেতৃবৃন্দকে আমি আহ্বান জানাই আসুন জাতীয় জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য একযোগে অগ্রসর হই। বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ফল অত্যন্ত দুঃখজনক হতে বাধ্য। এটা সাধারণ জ্ঞানের কথা।

বন্ধুগণ

আপনারা সাংবাদিক। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের খ্যাতি বিদেশেও বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু সরকার বর্তমানে আপনাদের যে দুর্দশায় ফেলেছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

বিবেকসম্পন্ন ও ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিকের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও লিখার অবকাশ সঙ্কুচিত করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের চাপ আমরা আগেও দেখেছি কিন্তু বর্তমান সরকার যে পরিমাণ নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করেছেন, তার নজির আমরা দেখি নাই এবং কোন সভ্যজগতে আছে কিনা তাও জানি না।

এতদসত্ত্বেও আপনারা মাঝে মাঝে যে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আশা করি আপনারা আপনাদের মনোবল এমনি দৃঢ় রাখবেন।

উপসংহারে আমি বলতে চাই স্বাধীন বাংলাদেশ আজ বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন। কখন কি হয় বলা যায় না। ইতিহাসের গতিপথ অপ্রতিরোধ্য–কেউ তাকে নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুৎ করতে পারে না। আমার দেশের নেতারা এটা ভুলে গেছেন বলেই আমাদের দুর্গতির আশঙ্কা দিন দিন বাড়ছে।

বিগত দশ মাসে সরকার অসংখ্য ভুল করেছেন। সমস্যা সমাধান না-করে অনেক নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। বহু অবৈধ কার্য করেছেন। মানুষকে হতাশ-নিরাশ করেছেন। দেশের মানুষের মন অত্যন্ত অশান্ত। সর্বস্তরের মানুষ আজ শান্তি ও মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুর্নীতির চাপে দেশ জরাজীর্ণ–অশান্ত। দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী। শতকরা নব্বইজন লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। গায়ের মানুষ সাতদিনে এক বেলা পেটভরে খেতে পাচ্ছে না। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে বাঁচাতে হবে। আর সে জন্য চাই আদর্শনিষ্ঠ ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল।

আমাদের দলের একটি বর্ধিত সভা আহ্বান করেছি। সকল একমনা ব্যক্তি গ্রুপ বা দলকে এই সভায় আলোচনার জন্য আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাবো। দেশের সর্বত্র আমার দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধব যারা আছেন, আমি আজ তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা কামনা করছি। দেশের বুকে একটি আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক দল গড়ার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। জীবন-সায়াহ্নে আমি সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখে যেতে চাই। আমার দেশবাসীর দোওয়া এবং সহকর্মীদের সহযোগিতা পেলে সাফল্য সুদূরপরাহত নয় এ বিশ্বাস আমার আছে।

মুজিববাদ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান *

প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু, আমরা দীর্ঘকাল আপনার রাজনৈতিক জীবনের সংস্পর্শে থেকে লক্ষ্য করে এসেছি যে, বাংলাদেশের নিজস্ব ঐতিহাসিক ধারার বিকাশ ও বাঙালি জাতির চেতনার স্তর বিবেচনায় রেখে আপনি এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্যে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দিয়ে আসছেন, নিজস্ব একটি মতবাদ ব্যক্ত করে আসছেন। এখন আমার প্রশ্ন আপনি জিন্নাবাদ, গান্ধীবাদ, নাসেরবাদ, ইহুদিবাদ, মাওবাদ, টিটোবাদ, লেনিনবাদ ও মার্কসবাদের আলোকে আপনার মতবাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে কি ভাবছেন?

উত্তর : দেখুন, ছাত্রজীবন থেকে আজ পর্যন্ত আমার এই সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রাম কতিপয় চিন্তাধারার উপর গড়ে উঠেছে। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী তথা সকল মেহনতী মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাম্য প্রতিষ্ঠাই আমার চিন্তাধারার মূল বিষয়বস্তু। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। কাজেই কৃষকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে আমি জানি শোষণ কাকে বলে। এ দেশে যুগ যুগ ধরে শোষিত হয়েছে কৃষক, শোষিত হয়েছে শ্রমিক, শোষিত হয়েছে বুদ্ধিজীবীসহ সকল মেহনতী মানুষ। এ দেশে জমিদার, জোতদার, মহাজন ও তাদের আমলা-টাউটদের চলে শোষণ। শোষণ চলে ফড়িয়া-ব্যবসায়ী ও পুঁজিবাদের। শোষণ চলে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের। এ দেশের সোনার মানুষ, এ দেশের মাটির মানুষ শোষণে শোষণে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের মুক্তির পথ কি? এই প্রশ্ন আমাকেও দিশেহারা করে ফেলে। পরে আমি পথের সন্ধান পাই। আমার কোনো কোনো সহযোগী রাজনৈতিক দল ও প্রগতিশীল বন্ধুবান্ধব বলেন শ্রেণী সংগ্রামের কথা। কিন্তু আমি বলি জাতীয়তাবাদের কথা। জিন্নাবাদ এ দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিষবাষ্প। তার জবাবে আমি বলি যার যার ধর্ম তার তার–এরই ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা। সেই সঙ্গে বলি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সমাজতন্ত্র চাই। কিন্তু রক্তপাত ঘটিয়ে নয়– গণতান্ত্রিক পন্থায়, সংসদীয় বিধিবিধানের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করতে চাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

আমার এই মতবাদ বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করেই দাঁড় করিয়েছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, যুগোশ্লাভিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে, নিজ নিজ অবস্থা মোতাবেক গড়ে তুলছে সমাজতন্ত্র। আমি মনে করি

---

* 'মুজিববাদ' [ঢাকা : ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স ১৯৭২) পুস্তকের লেখক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস বইটি লেখার এক পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। বইয়ের শুরুতে এটি ছাপা হয়েছে 'লেখকের কতিপয় প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামায়। সেখান থেকে লেখাটি গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশকেও অগ্রসর হতে হবে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই চারটি মূল সূত্র ধরে, বাংলাদেশের নিজস্ব পথ ধরে।

আমার উপরোক্ত মতবাদকে অনেকে বলছে 'মুজিববাদ'। এ দেশের লেখক, সাহিত্যিক কিংবা ঐতিহাসিকগণ আমার চিন্তাধারার কি নামকরণ করবেন সেটা তাঁদের ব্যাপার, আমার নয়। নামকরণের প্রতি আমার কোনো মোহ নেই। আমি চাই কাজ। আমি চাই আমার চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণ। আমি চাই শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। আমি চাই আমার স্বপ্ন 'সোনার বাঙলা' নির্মাণের পূর্ণ বাস্তবায়ন।

প্রশ্ন : জাতীয়তাবাদ আপনার মতবাদের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু আপনি তো জানেন, জাতীয়তাবাদ উগ্রতা কিংবা সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হলে ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়? তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের প্রতি আপনি এতো গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?

উত্তর : আপনি ঠিকই বলেছেন যে, জাতীয়তাবাদ উগ্রতা কিংবা সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হলে হিটলারের জার্মানি, মুসোলিনীর ইতালি, ডক্টর ভেরউর্ডের দক্ষিণ আফ্রিকা, পাঞ্জাবী খানদের পাকিস্তান বা ইসরায়েলের ইহুদিবাদের মতো অতি জঘন্যরূপ ধারণ করতে পারে। সে জাতীয়তাবাদ দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ। কিন্তু আমার জাতীয়তাবাদ বামপন্থী ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ। নাৎসী জার্মানি, ফ্যাসিবাদী পাঞ্জাব, বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা ইহুদিবাদের মতো উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের চরিত্র ও তার বিকাশ ধারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ এবং আমলাতন্ত্রবাদ ও জঙ্গীবাদ উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মূল শক্তি। তারা গণতন্ত্রেরও শত্রু, সমাজতন্ত্রেরও শত্রু। তাদের জাতীয়তাবাদ শোষকদের জাতীয়তাবাদ। আমার জাতীয়তাবাদ শোষিতের জাতীয়তাবাদ। কারণ আমার জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে রয়েছেন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত আওয়ামী লীগ। কাজেই যে জাতীয়তাবাদ আমার মতবাদের অন্যতম প্রধান অঙ্গ, সেই বিপ্লবী ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত হবার কোন ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বাস্তব কারণ নেই।

প্রশ্ন : বিশ্ব সমাজকে একটি সমাজ এবং বিশ্ব মানবকে যদি একটি গোষ্ঠী ধরে নেই, তবে কি জাতীয়তাবাদের চেয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদ উন্নততর পর্যায় নয়?

উত্তর : সাম্প্রদায়িকতাবাদ এ দেশের মাটিতে গভীর শিকড় গেড়ে বসে আছে। যাকে নির্মূল করে তবেই এ দেশে শ্রেণী চেতনার বিকাশ সাধন সম্ভবপর। আর একমাত্র শ্রেণী চেতনাই আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ব শর্ত। এ দেশের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, শ্রেণী-চেতনা বিকাশের পথে সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রধান অন্তরায়। আর সাম্প্রদায়িকতাবাদ নির্মূল করার রণকৌশল হিসাবেই আমি জাতীয়তাবাদী দর্শন অনুসরণ করেছি। এই মতবাদ কার্যকরী হলে, আমার বিশ্বাস, এ দেশের ভাবীকালের মানুষ ক্রমে ক্রমে জাতীয়তাবাদের গণ্ডি পার হয়ে উত্তীর্ণ হবে বিশ্বমানবতাবাদী উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে।

প্রশ্ন : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা বলতে আপনি কি বুঝাতে চান?

উত্তর : দেখুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দুইটি পথের কথাই আমরা জানি। একটি হলো শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ, অপরটি সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ। লেনিন রাশিয়ায় এবং মাও সে-তুং চীনে প্রথমোক্ত লাইনে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ জীবনে সাম্প্রদায়িকতাবাদের অশুভ ভূমিকার দরুন এ দেশে শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে উঠেনি। এমনকি সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষেও সাম্প্রদায়িকতাবাদের ভূমিকা অতিশয় মারাত্মক। তদুপরি দেশটি শিল্পে পশ্চাৎপদ বলে এখানে শিল্প-শ্রমিকও তেমন সৃষ্টি হয়নি, সংগঠিতও হয়নি। এরূপ বাস্তব অবস্থায় বাংলাদেশে শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণী সংগ্রামের স্থলে গড়ে উঠেছে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য মেহনতী শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থনে বহু-শ্রেণী ভিত্তিক জাতীয় সংগঠন ও জাতীয় সংগ্রামী দল আওয়ামী লীগ। জমিদারি উচ্ছেদের পর এ দেশের সামন্তবাদ তেমন শক্তিশালী নয়। এখন রয়েছে সামন্তবাদের ভগ্নাবশেষ–জোতদার, মহাজন ও তাদের আমলা-টাউট। আইনের মাধ্যমেই তাদের উচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। ওদিকে আওয়ামী লীগের জাতীয় সরকার ব্যাংক-বীমা, বৃহৎ ও ভারী শিল্প এবং বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ জাতীয়করণ করার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী ও পুঁজিবাদের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে। তাদের এমন ক্ষমতা নেই যে, সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে। শোষক শ্রেণীকে দমন করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা দেশবাসীর আছে। সমাজতন্ত্র রাতারাতি হয় না– দীর্ঘদিনের ব্যাপার। শান্তিপূর্ণভাবে এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। রক্তপাত অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা দেশকে ঐক্য, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিতে চাই। এ কাজে আমি মনে করি শক্তির উৎস বন্দুকের নল নয়, শক্তির উৎস আমার জনগণ।

প্রশ্ন ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকে। আপনি কি মনে করেন যে, বাংলাদেশেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে?

উত্তর দেখুন, পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ-ব্যবস্থা ধ্বংসসাধনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা। কাজেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলবার চেষ্টা করে। তাদের সঙ্গে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে যুক্ত হয় শাসকদের আন্তর্জাতিক দোসর–সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ। বাংলাদেশেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বৈরী ভূমিকায় আমরা ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছি, কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করিনি। কারণ জাতীয় স্বাধীনতার বিরোধিতা করাই তাদের বিঘোষিত নীতি। তবে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহেও প্রগতিশীল সংগঠন ও ব্যক্তি আছেন। তাঁরাও তাঁদের দেশে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম করছেন। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা তাঁদের সক্রিয় সমর্থন লাভ করেছি। আশা করি আমাদের সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ও শান্তির সংগ্রামেও তাঁদের সক্রিয় সমর্থন আমরা লাভ করবো। এ প্রশ্নে দেশের অভ্যন্তরে আমরা সকল প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ। আন্তর্জাতিকভাবেও আমরা ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী।

বাংলাদেশ কৃষক সমিতি পূর্বাঞ্চল সম্মেলন*

১৬ ও ১৭ই বৈশাখ, ২৯ ও ৩০ শে এপ্রিল, '৭২

স্থান : শিবপুর, ঢাকা

(নরসিংদি স্টেশন হইতে আট মাইল উত্তরে)

প্রধান অতিথি : **মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী**

কৃষক ভাই ও বোনেরা,

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। জনগণের মূল অংশ দরিদ্র কৃষক-জনতার রক্ত, জীবন আর ত্যাগের বিনিময়ে দেশ আজ পাক হানাদার-কবলমুক্ত। দেশকে রক্ষা করিতে এ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সামনের সারিতে যাহারা ছিল; যাহারা অর্থ, আশ্রয়, সর্বপ্রকার সাহায্য দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে প্রতিমুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধকে আগাইয়া দিয়াছে তাহারা বাংলাদেশের গ্রামের গরীব কৃষক ও তাহাদের ছেলে-মেয়েরা। ইহাদেরই ঘর পুড়িয়াছে, মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট হইয়াছে। ইহারাই দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, আবার দেশে থাকিয়া ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। অন্যদিকে শত বিপদের ঝুঁকি লইয়া ফসল ফলাইয়াছে– দেশবাসীকে খাবার জোগাইয়াছে। স্বাধীনতার পর তাহাদের অবস্থা কি? তাহাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ঘর তাহারা পায় নাই। ঘরে খাবার নাই। চাল-ডাল-তেল-নুন-কেরোসিন-সাবান-মোটা কাপড়, সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তাহাদের নাগালের বাইরে। রিলিফ আসিয়াছে ঠিকই। কিন্তু তাহারা পাইতেছেনা। এমন কি টেস্ট রিলিফের মাটি কাটিয়া এক বেলা চাল তাহারা কিনিতে পারে না। অথচ কালো বাজারে সব জিনিসই পাওয়া যায়। চাল-ডাল, তরি-তরকারীও চোরাচালানে সীমান্ত পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে। গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃংখলার অভাবে গুম খুন, প্রকাশ্য খুন, ডাকাতি, রাহাজানি প্রতিদিনের ব্যাপার। যে কেউ যে কোন অজুহাতে খুশিমত কৃষকের নিকট হইতে টাকা পয়সা আদায় করিতেছে। রাজনৈতিক আশ্রয়ে ও অস্ত্র বলে জোতদার মহাজনেরা, গ্রাম্য টাউট মাতাব্বররা কৃষকের জমির ধান কাটিয়া লইয়াছে, এখন জমিও কাড়িতেছে। দরিদ্র কৃষক শরণার্থীরাও তাহাদের চাষের জমি, ভিটেমাটি ফিরিয়া পাইতেছে না।

অন্যদিকে বিগত লড়াইয়ের মধ্য দিয়া কৃষক সমাজ যে সকল এলাকায় নিজেরাই তাহাদের যে প্রশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাধীন গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত ও রিলিফ কমিটিসমূহ মুসলীম লীগ, আয়ুব-এহিয়া আমলের মুখচেনা দালাল বা তাদের লোকের হাতের মুঠায়। যে সকল পাক-দালাল পাক-সেনাদের টাকা-খাইয়া নারী যোগান দিয়াছে, গরীব ভূমিহীন কৃষককে টাকার লোভ আর জীবনের ভয় দেখাইয়া লুটেরা ও রাজাকার হইতে বাধ্য করিয়াছে,

---

* সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত প্রচারপত্র

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারাই আজ গ্রামীণ জীবনে সব ক্ষমতার মালিক হইয়া বসিয়াছে। কৃষকের কোন অধিকার সেখানে নাই, কথা বলিবার সুযোগ নাই। রিলিফ চুরি, ডাকাতি, গুম খুনের তাহারাই সর্দার। ইহারাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কৃষকের শোষকদের সাথে হাত মিলাইয়া চোরাচালান ও সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত রহিয়াছে। একই সাথে কৃষকের দেশী-বিদেশীশোষণ-বিরোধী চেতনাকে সাম্প্রদায়িকতায় ডুবাইয়া দিতে চাহিতেছে। আর আজ ইহা স্পষ্ট যে '৪৭-এর মত ইহাদের ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিতেছে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

নির্যাতিত কৃষক সমাজ,

ইহা সত্য যে বাংলাদেশ সরকার তাহাদের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু কৃষকের মুক্তি ভিন্ন তাহা ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হইতে বাধ্য। সার-বীজ সরবরাহের নীতি ঘোষণার মাধ্যমে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বলা হইতেছে, কৃষকের দুরবস্থা দূর করার ক্ষেত্রে তাহা কোনো দিকনির্দেশ করে না। কারণ কৃষক তাহার বিগত দিনের কাহিনী হইতে জানে যে, প্রজাস্বত্ব আইন, ঋণসালিশী বোর্ড, জমিদারী উচ্ছেদ আইন ইত্যাদির পরও "পাকিস্তান" হওয়ার পূর্বে বা পরে কোন সময়েই তাহারা জমি পায় নাই, ঋণও শোধ হয় নাই। বরঞ্চ বছরে বছরে সুদের বোঝা বাড়িয়াছে, তাহারা জমি-ঘর-বাড়ি হারাইয়াছে। ইহা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, আইন সভায় ইহা দূর করা সম্ভব নয়।

কৃষকের মুক্তির একটি মাত্র পথ হইল "কৃষকের হাতে জমি" এই নীতির ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা। কৃষককে জমির উপর অধিকার না-দিলে, ঋণ ও সুদের মহাজনী শোষণ থেকে মুক্ত করিতে না-পারিলে, পাট-আখ, ইত্যাদি ফসলের ন্যায্য মূল্য না দিলে, দুর্নীতি-ঘুষ বন্ধ না-হইলে, গ্রাম্য প্রশাসন ব্যবস্থাকে জোতদার-মহাজন, টাউট-মাতবরদের কবলমুক্ত করিয়া কৃষকের ইচ্ছামাফিক তাহাকে পরিচালিত করিতে না পারিলে এবং কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে না-পারিলে এবং এই ভিত্তিতে কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে না-পারিলে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

কৃষকের আজকের দাবী তাই জমির দাবী– কৃষকের আজকের দাবী তাই রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবী। শ্রমিক শ্রেণীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হইয়া শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার রাজ কায়েমের মধ্য দিয়াই সে স্বাধীনতার স্বাদ পাইতে পারে। স্বাধীনতাকে জনগণের পক্ষে রাখিতে পারে এবং সর্বোপরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

আজ ইহার জন্য প্রয়োজন কৃষক, বিশেষ করিয়া ভূমিহীন গরীব কৃষক-ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত হওয়া। তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম গড়িয়া তোলা। দেশগড়া-সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে শ্রেণী সংগ্রামের পথে তাই আজ কৃষককে সংগঠিত হইতে হইবে তাহার নিজস্ব সংগঠন কৃষক সমিতির পতাকাতলে। ১৯৫৮ সালে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ কৃষক সমিতি কৃষক শ্রেণীকে সেই আহ্বান দিয়াছে।

ইতিমধ্যে কৃষক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামের শত্রু বর্ণচোরা কৃষক দরদীরা কৃষক সমিতির নাম ব্যবহার করিতে চাহিতেছে। ইহাদের উদ্দেশ্য কৃষক আন্দোলনকে বিভক্ত করা, কৃষকের উপর ধনীর প্রভুত্ব কায়েম করা, দেশের স্বাধীনতা বিকাইয়া দিয়া তাহাকে পরাশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা।

কৃষকের সামনে আজ তাই কঠিন দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য কৃষকের সংগ্রামের রূপরেখা নির্ধারণ করিবার জন্য আগামী ১৬ ও ১৭ই বৈশাখ, ইং ২৯শে, ৩০ শে এপ্রিল ঢাকা জিলার মুক্তিযুদ্ধের মূল কেন্দ্র শিবপুরে বাংলাদেশ কৃষক সমিতির পূর্বাঞ্চল সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ কৃষক সমিতির আহ্বায়ক মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী উপস্থিত থাকিবেন। উক্ত সম্মেলনকে সামনে রাখিয়া জিলায় ব্যাপক কৃষক সমিতি গড়িয়া তুলুন এবং সম্মেলনে ব্যাপক হারে যোগ দিন।

বিনীত–

আবদুল মান্নান ভুইয়া

কেন্দ্রীয় সংগঠক,

বাংলাদেশ কৃষক সমিতি ও আহবায়ক

পূর্বাঞ্চল সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি

অহিংসা ও বিপ্লব*

আবদুল হামিদ খান ভাসানী

যে মত ও পথ বিশেষ করিয়া রাজনীতির ন্যায় সদা গতিশীল বিষয়ে মানুষের সমষ্টিগত শক্তিকে দুর্বল এবং স্থবির করিয়া ফেলে উহার সহিত আমার মানসিকতাকে কোনদিন খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারি নাই। মানবজাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি এবং আমার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যতটুকু শিক্ষা লাভ করিয়াছি উহাতে আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে অহিংসার বাণী এবং অহিংস কৌশল মানুষের বিপ্লবী চেতনাকে ভোঁতা করে মাত্র– দেশের শতকরা পঁচান্নব্বই জন মানুষের চিরস্থায়ী কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। তাই যখনই আমি দেখিতে পাই যে দেশবাসী অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া মানবীয় কল্যাণের কথা ভাবিতেছে তখন সত্যই আমার করুণা জাগে। কি আফিমই না তাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। দেশবাসীর এহেন বিনীত আরজের সুযোগে দেশের শতকরা মাত্র পাঁচজন লোক কি সুবিধাই না লুটিয়া থাকে। যে জনতা বিপ্লবের ঝাণ্ডা বহন করিয়া কৌশলীদের অপমৃত্যু ঘটাইয়া দিতে পারিত তাহাদিগের চোয়ালেই লাগাম আঁটিয়া দেওয়া হয়। তাহারা তখন কথা বলে ঠিকই কিন্তু যাহারা কোন দিনই তাহাদের মুক্তি দান করিবে না তাহাদের দরকারেই বলে। সেই জনতা তখন একটি তত্ত্বের দিকে ধাবিত হয় বটে কিন্তু উহা তাহাদিগকে কত পিছনে লইয়া যায় তাহার খোঁজই রাখে না। মোটকথা, অহিংসা শোষণের একটি মহৎ কৌশল— এই সত্যটি কেউ বুঝিয়া উঠে না। শোষণ মুক্তির বলিষ্ঠ ধাপ তথা বিপ্লবের পথে পা বাড়াইবার মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ কিংবা ধ্বংস করিবার মোলায়েম মত ও পথই হইল অহিংসা। তাই পূর্বেই আমি উল্লেখ করিয়াছি যে অহিংসার মন্ত্র যতই আপাতঃ মধুর হউক না কেন, যতই দর্শনসুলভ হউক না কেন—বাস্তবে উহাকে আমি কোনদিন বরদাশত করিতে পারি নাই। অহিংসার মন্ত্রকে ঘৃণাভরে পদাঘাত করিয়া বিপ্লবের কর্মসূচি যথাযথ রাখাতেই দেশের শতকরা পচান্নব্বই জন মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিহিত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শুধু সমষ্টিগত ভাবেই নয় ব্যক্তিগত পর্যায়েও অহিংসা মানুষের সমূহ ক্ষতি সাধন করে। অবশ্য যিনি অহিংসার মৌলিক চেতনায় গড়া প্রতিভা লইয়া জন্ম লইয়াছেন তাহার কথা আলাদা। তবে এমন প্রতিভা লইয়া প্রতি শতাব্দীতে কয়জনই বা জন্মগ্রহণ করে। তাহাদিগকে লইয়া তো আর সমাজ কিংবা রাষ্ট্র চলিতে পারে না। অহিংসা ব্যক্তির আত্মশক্তিকে খর্ব করিয়া ফেলে। অন্যায়-অবিচারের সহিত আপোষ করাটা একসময় তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাঁহার নিকট শক্তির দোহাই এবং সহ অবস্থান নীতি অতি বড় হইয়া দেখা দেয়। এইভাবে অহিংসার বাণী ব্যক্তির বেগবান সৃজন প্রবাহকেও মারাত্মকভাবে ব্যাহত

---

* সাপ্তাহিক হক কথা, ১৭ মার্চ ১৯৭২

করে। ব্যক্তিগত ভাবে অধঃপতিত হইয়াই সে বসিয়া থাকে না– অহিংসা বাণীর বদৌলতে নিরীহ জনসাধারণকে শোষণ করিবার পথও খুঁজিয়া বেড়ায়। ধার্মিকের বেশে দুনিয়াতে যেমন বহু রকমের ভণ্ডের আবির্ভাব ঘটিয়াছে ঠিক তেমনি অহিংস-পরায়ণ সাজিয়া মোনাফেক শোষক গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে বিপ্লবী মহলকে সচেতন ও সক্রিয় থাকিতে হয়। অনেকে মনে করেন অহিংসার রাজ্যে বিপ্লবী মহল কাজ করিতে পারে না। আমার মতে ধারণাটা ভুল। কারণ বিপ্লবী মন সবসময় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর—শুধু মুখের ভাষায়ই নয়—স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অস্ত্রের ভাষায়ও। কারণ বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে সে আশেপাশে অপারেশন চালাইয়া থাকে যেমনটি একজন দূরদর্শী ডাক্তার রোগীর একটি চক্ষু তুলিয়া ফেলিয়া অপরটিকে অক্ষত রাখেন। অবশ্য ইহাও সত্য যে বিপ্লবের নামে উদ্দেশ্যহীন ধ্বংস সাধন করিবার জন্য মহল বিশেষের আবির্ভাব ঘটিতে পারে। তবে তাহা একান্তই ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। খাঁটি বিপ্লবী দল তাহাদিগকে অচিরেই গ্রাস করিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। কিন্তু অহিংসার নামে সুবিধাবাদী মহল স্বার্থ উদ্ধার করিয়া সারিয়া উঠে এবং এমন কৌশলে জনতার ঘাড়ে চাপিয়া বসে যে অনেক মাশুল দান করিয়া তাহার কবল হইতে মুক্তি পাইতে হয়। তাই অহিংসায় ভালবাসার বাণী থাকিলেও তাহা কোনদিন বাস্তবায়িত হয় না। বিশেষ করিয়া ধনতন্ত্রবাদী সমাজ ব্যবস্থায় তাহা তো সম্ভব নয়ই। পক্ষান্তরে বিপ্লব যে আবেদন আর শক্তি লইয়া মানব সমাজে উপস্থিত হয়, তাহা আর কিছু বহন করুক বা না করুক—কুসংস্কার এবং শোষণের ধ্বংস প্রত্যক্ষভাবে লইয়া আসিবেই। তাই বিপ্লবে ভাওতাবাজীর কোন দ্বার খোলা থাকেনা—থাকে শুধু ব্যবস্থা বিশেষের মূলোৎপাটন—তা যে কৌশলেই হউক।

রাজনৈতিক আন্দোলনে গান্ধীর অহিংস নীতি প্রসঙ্গে আমরা বহুবার তর্কবিতর্ক করিয়াছি। বিশেষ করিয়া কারাগারে বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতৃবর্গের মধ্যে অহিংসতত্ত্ব লইয়া তর্ক বাধিয়া যাইতে দেখিয়াছি। অহিংসবাদী নেতাগণ বরাবরই সম্রাট অশোকের সাফল্য ও মহত্ত্বকে আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিতেন। আমি তখন বলিতাম, আজও বলি—সম্রাট অশোক অহিংসাবলে যে সাম্রাজ্য ও শাসন কায়েম করিয়াছিলেন তাহার মৃত্যুর পর উহা কয়দিনই বা টিকিয়াছিল? তদুপরি সম্রাট অশোক যতটুকু সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহার অন্যতম কারণ ছিল যুগের পরিবেশ। তৎকালে একে অন্যকে শোষণ করিবার রকমারি কৌশল আবিষ্কার হয় নাই এবং প্রয়োজনও পড়ে নাই। তাছাড়া সম্রাট অশোকের নীতি ও ব্যবস্থাপনায় আন্তরিকতা এবং অভিনবত্ব ছিল বলিয়া তিনি জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবই ঝুট মনে হয়েছিল। আমি এমন অনেক নেতার সাক্ষাত পাইয়াছি যাহারা ইসলামের নামে রাজনীতি করিতে নামিয়া অহিংসার দোহাই পারিয়া থাকেন। মওলানা মুহম্মদ আলী ঐসব নেতাকে লেখায় ও ভাষণে খুব ধোলাই করিতেন। তিনি অসংখ্য নজীর তুলিয়া ধরিয়া প্রমাণ করিতেন যে ইসলাম যুদ্ধংদেহী নীতির স্বীকৃতি দান করিয়াছে। একবার মওলানার এমনি একটি বক্তব্যের জবাবে গান্ধী তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন আপনার নবী সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তলোয়ার ধরিয়াছিলেন সত্য—কিন্তু বিনা তলোয়ারে অর্থাৎ প্রেম দিয়া জয়লাভকে তিনি বেশি পছন্দ করিতেন ইহাও সত্য। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সুকুমার বৃত্তিকে জয় করিতে

অহিংসা একটি মহৎ মাধ্যম হইতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের সহিত মানুষের যে ধরনের বৃত্তিসমূহ জড়িত থাকে সেগুলিকে জয় করিতে অহিংসার নয়— মারমুখী কৌশলেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল খলীফা হযরত ওমরের চরিত্রে বিনয় ছিল বটে, কিন্তু তিনি যাহা অলবম্বন করিয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন উহা আদৌ বিনয় নয়— শক্তি ও কঠিন্যই ছিল সেক্ষেত্রে সম্বল। অবশ্য শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি নীতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। তাহা হইল বর্ণে বর্ণে ইনসাফ বজায় রাখা। স্বীয় কার্যক্রমের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাহা বজায় রাখাও সম্ভব বটে। তবুও কেন যেন আমার মনে হয় রাসুলুল্লাহ (দ.) যদি মক্কা বিজয়ের দিন নবীসুলভ ক্ষমা প্রদর্শন না-করিতেন তবে ইসলামের গৌরবময় খিলাফত ত্রিশ বৎসরেই খতম হইয়া যাইত না। কারণ এই ক্ষমার মধ্য দিয়াই মোনাফেক মুসলমান শোষণের প্রশ্রয় পায় এবং সময় বুঝিয়া মাথাচাড়া দিয়া উঠে। পক্ষান্তরে মক্কার ধনিক-বনিক এবং ক্ষমতালোভী ষড়যন্ত্রপ্রিয় সম্প্রদায় নিহত কিংবা নির্বাসিত হইলে অঙ্কুরেই সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। অনেকে মনে করেন ইসলামের বিধান হইল শুধু আক্রান্ত হইলেই পাল্টা অভিযান শুরু করা যায়। কিন্তু মোটেই তাহা সত্য হইতে পারে না; যদি সত্যিই ইসলাম মানুষের কল্যাণ সাধন করিতে চায়। এই দিক দিয়া কমিউনিস্টদের কৌশল ও বিশ্লেষণ খুবই বাস্তবানুগ হইয়া থাকে। মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া মহান আদর্শ কায়েম করিতে কমিউনিস্টদের অভিযান তাই বিলম্বে হইলেও সর্বসাধারণে স্বীকৃত হয়। লেনিন ও মাও-সেতুং এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে গান্ধী ও টলস্টয়ের অহিংসা দর্শন লইয়া শিক্ষিত মহলে উন্নতমানের একটি সেমিনার জমিতে পারে—কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী, ধনতন্ত্রবাদী শাসন-শোষণের অবসান কল্পে সর্বহারা জনতার মুক্তিকল্পে কোন বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করা যাইবে না। ডক্টর মার্টিন লুথার কিং মার্কিন নিগ্রোদিগকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অহিংসনীতি নিগ্রোমুক্তি আন্দোলনের অনেক ক্ষতি করিয়াছে ইহাও সত্য। আমার মতে, চপেটাঘাতের বদলে পালটা চপেটাঘাত তো বটেই পারিলে পদাঘাতও করিতে হয়। মার্কিন ধনিক-বনিক সমাজ নিগ্রোদেরকে যেমনভাবে শাসন-শোষণ করিয়াছে তাহার দাদ উঠাইতে অহিংসার দর্শন হাস্যকর ব্যাপার বৈকি। আব্রাহাম লিঙ্কন যত মহান প্রেসিডেন্টই হউন না কেন গৃহযুদ্ধ না বাঁধিলে চোখও হয়তো খুলিয়া যাইত না। ১৮৫৭ সালে এই উপমহাদেশে বিদ্রোহ সংঘটিত হইবার পর স্যর সৈয়দ আহমদ মুসলমানদিগকে শিক্ষার পথ দেখাইয়া উপকার সাধন করিয়াছেন সত্য কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ নাগাদ এই জাতিতে যে বিপ্লবী চেতনা বিরাজমান ছিল তাহা ভোঁতা হইয়া সংস্কারধর্মী চেতনায় রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষাদীক্ষায় মুসলমানদের যতই অগ্রগতি হউক না কেন— বিপ্লবী অভিযানে তখন হইতেই তাহারা যেভাবে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছিল উহার প্রতিক্রিয়া আজ পর্যন্ত বর্তমান। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, শহীদ তীতুমীর, হাজী শরিয়তুল্লাহ প্রমুখ যে বিপ্লবের বাণী ছড়াইতেছিলেন তাহা সেই শতাব্দীরই শেষ ভাগে স্তিমিত হইয়া শান্তশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। উহা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে মানানসই ছিল বটে কিন্তু বিপ্লবী জাগরণের জন্য

মোটেই যুৎসই ছিল না। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী পেশোয়ারে যে স্বাধীন রাষ্ট্র এবং খেলাফত কায়েম করিয়াছিলেন তাহাই হয়ত গোটা উপমহাদেশের মুক্তির জন্য কাজ করিয়া যাইত: সেই সংগঠনই হয়তো সর্বত্র বিপ্লবের বাণী ছড়াইত। তাহা হইলে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইত না এবং স্যর সৈয়দ আহমদকে সংস্কারমুখী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত না। কিন্তু আফসোস, বিপ্লবী হইয়াও সৈয়দ আহমদ বেরেলভী বিশ্বাসঘাতক এবং মোনাফেকচক্রকে অহিংসার বাণী শুনাইলেন এবং ক্ষমার চোখে দেখিলেন। অবশেষে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক রাতারাতি শত শত বিপ্লবী কর্মীকে হত্যা করিয়া এই উপমহাদেশে বিপ্লবী জাগরণের কবর রচনা করিয়াছিল। যে যাহাই বলুক না কেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সাময়িক দুর্বলতা অর্থাৎ মোনাফেক আফগানদের প্রতি অহিংসা প্রদর্শন গোটা উপমহাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি বদলাইয়া ফেলিয়াছিল বলে আমি বিশ্বাস করি।

যাহোক, আমি ইতিহাসবেত্তা নই, রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাষ্যকারও নই। আমি হাড়ে হাড়ে রাজনীতিবিদ থাকিতে চাই এবং অহিংসার বাণীতে নয় বিপ্লবের মন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইতে চাই। ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্থান কালপাত্র ভেদে অহিংসার বাণী যেভাবে ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এখানে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। তবে যে পরিমন্ডলে আমি রাজনীতি করি তাহার অনুসারীদের প্রতি আমার অনুরোধ- তাহারা অহিংসার মন্ত্রে গদগদ হইয়া যাইবেন না। তাহা হইলে বিপ্লবী চেতনা হারাইয়া ফেলিবেন। তখন খুব বড়জোর একজন সৌখিন দেশপ্রেমিক সাজিতে পারিবেন–সর্বহারা জনতার জন্য কাজের কাজ কিছুই করিতে পারিবেন না।

দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্তদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা *

যারা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনালস) আদেশ (পিও নং ৮, ১৯৭২ সালের) বলে আটক রয়েছেন অথবা সাজা ভোগ করছেন তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের প্রশ্নটি সরকার আরও বিবেচনা করে দেখেছেন। সরকার এ সম্পর্কে এখন নিম্নোক্ত ঘোষণা করছেন :

১। দু নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তিদের ও অপরাধসমূহের ক্ষেত্র ছাড়া–

(ক) ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪০১ নং ধারা অনুযায়ী উল্লিখিত আদেশ বলে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের রেহাই দেয়া হচ্ছে এবং উল্লিখিত আদেশ ছাড়া অপর কোনো আইনবলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকলে তাদের [সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা] অনতিবিলম্বে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

(খ) কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে অথবা কোনো বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উক্ত আদেশবলে বিচারাধীন সকল মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল ও ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে প্রত্যাহার করা হবে এবং উল্লিখিত আদেশ ছাড়া অপর কোনো আইনে তাদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন কোনো মামলা বা অভিযোগ না-থাকলে তাদের হাজত থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

(গ) কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে উল্লিখিত আদেশ বলে আনীত সকল মামলা ও তদন্ত তুলে নেয়া হবে এবং উল্লিখিত আদেশ ছাড়া অপর কোনো আইনে বিচার ও দণ্ডযোগ্য আইনে সে অভিযুক্ত না-হলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। উল্লিখিত আদেশ বলে ইস্যু করা সকল গ্রেফতারী পরোয়ানা, হাজির হওয়ার নির্দেশ অথবা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুলিয়া

---

* ১৯৭২ সালের তিরিশে নবেম্বর স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে জারি করা প্রেসনোট।

* 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা প্রসঙ্গে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'ইতিহাসের রক্ত পলাশ পনেরই আগষ্ট পঁচাত্ত'র (ঢাকা : বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠি : তৃতীয় মুদ্রণ ২০০১) শিরোনামের বইয়ে আছে : '১৯৭৩ সালে ডিসেম্বর মাসে বিজয় দিবসের আগে বঙ্গবন্ধু আমাকে কলকাতা থেকে ডেকে পাঠান। ... তিনি আমাকে একান্তে ডেকে নিলেন। বললেন, এখনি একটা সরকারি ঘোষণার খসড়া তোমাকে লিখতে হবে। পাকিস্তানিদের মধ্যে যুদ্ধাপারাধী হিসেবে যারা দণ্ডিত ও অভিযুক্ত হয়েছেন, সকলের জন্যও ঢালাও ক্ষমা (জেনারেল এ্যামনেস্টি) ঘোষণা করতে যাচ্ছি। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, পালের গোদাদেরও ছেড়ে দেবেন।..... মুজিব হেসে বললেন, না তা হয় না। সকলকেই ছেড়ে দিতে হবে। আমার এ আসনে বসলে তোমাকেও তাই করতে হত। আমিতো চেয়েছিলাম নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্যদের ছেড়ে দিয়ে অন্তত ১৯২ জন যুদ্ধাপরাধী অফিসারের বিচার করতে। তাও পেরেছি কি? আমি একটা ছোট্ট অনুন্নত দেশের নেতা। চারিদিকে উন্নত ও বড় শক্তির চাপ। ইচ্ছা থাকলেই কি আর সব কাজ করা যায়।" (পৃ ১৩-১৪) এই লেখায় সন-তারিখের গোলমাল আছে। দালালদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা হয়েছিল ১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর আর যুদ্ধাপরাধীদের ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল। *

কিংবা সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেয়া থাকলে তা প্রত্যাহার বলে বিবেচিত হবে, এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা, অথবা হুলিয়ার বলে কোনো ব্যক্তি ইতিপূর্বে গ্রেফতার হয়ে হাজতে আটক থাকলে তাকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দেয়া হবে। অবশ্য সে ব্যক্তি উল্লিখিত দালাল আদেশ ছাড়া বিচার ও দণ্ডযোগ্য অপর কোনো আইনে তার বিরুদ্ধে যদি কোনো মামলা না থাকে তবেই।

যাদের অনুপস্থিতিতেই সাজা দেয়া হয়েছে অথবা যাদের নামে হুলিয়া বা গ্রেফতারী পরোয়ানা ঝুলছে তারা যখন উপযুক্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা প্রার্থনা এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করবে কেবল তখনই তাদের বেলা ক্ষমা প্রযোজ্য হবে।

দণ্ডবিধির ৩০২ নম্বর ধারা (হত্যা), ৩০৪ নম্বর ধারা, ৩৭৬ ধারা (ধর্ষণ), ৪৩৫ ধারা (গুলি অথবা বিস্ফোরক ব্যবহার) করে ক্ষতি সাধন এবং ৪৬৬ ধারা (ঘর জ্বালানী) এবং ৪৪৮ ধারায় (নৌযানে আগুন বা বিস্ফোরণ) অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্তগণ এক নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ক্ষমার আওতায় পড়বে না।

যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা ঘোষণার চুক্তি

গত মঙ্গলবার ৯ই এপ্রিল দিল্লীতে স্বাক্ষরিত উপমহাদেশের তিনটি দেশ–বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ১৯৫ জনকে ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ছাড়াও নাগরিক বিনিময়ের প্রশ্নে সর্বসম্মত কিছু মতৈক্য ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দারশরণ সিং এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আজিজ আহমদের মধ্যে ৫ই এপ্রিল থেকে ৫দিনব্যাপী একান্ত সহযোগীদের সাথে নিয়ে ব্যাপকতর আলোচনার পর এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ থেকে অবাঙালিদের পাকিস্তানে ফেরত নেবার ব্যাপারে ইতিপূর্বে স্থিরীকৃত ক্যাটাগরির অবাঙালি এবং দুর্দশাগ্রস্ত ২৫ হাজার অবাঙালিকে ছাড়পত্র দেবার পরও পাকিস্তান ইতিপূর্বে প্রত্যাখ্যান করা (গমনেচ্ছুদের) আবেদনপত্র নতুন তথ্যের ভিত্তিতে যে কোন সময় পুনর্বিবেচনার অঙ্গীকার দিয়েছে।

ক্ষমাপ্রাপ্ত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দী অন্যান্য যুদ্ধবন্দীর সাথে পাকিস্তানে চলে যেতে পারবে বলেও চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।

চুক্তির পূর্ণ বিবরণ নিম্নরূপ : "১৯৭২ সালের ২রা জুলাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী সিমলায় স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্থির করলেন যে, এতকাল ধরে দুদেশের সম্পর্ককে ব্যাহত করে আসছে যে সংঘাত ও মোকাবিলা দু'দেশ তার অবসান ঘটাচ্ছে এবং বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাবে।" ওই চুক্তি তাদের মধ্যকার বিরোধগুলো দ্বিপক্ষীয় আলোচনা অথবা পারস্পরিকভাবে স্বীকৃত শান্তিপূর্ণ পন্থায় নিষ্পত্তি করবে।

২। বাংলাদেশ সিমলা চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আপসনিষ্পত্তি, সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক এবং উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

৩। ১৯৭১ সালের মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর ফলে উদ্ভূত মানবিক সমস্যাবলি উপমহাদেশের দেশসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ও আপস-নিষ্পত্তির পথে বড় রকমের প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেয়। বাংলাদেশ সার্বভৌম সমতার ভিত্তি ছাড়া ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে যোগ দিতে পারে না বলেই স্বীকৃতির অনুপস্থিতিতে মানবিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য ত্রিপক্ষীয় বৈঠকও সম্ভব ছিল না।

৪। ১৯৭৩ সালের ১৭ই এপ্রিল ভারত ও বাংলাদেশ স্বীকৃতির রাজনৈতিক প্রশ্ন পৃথক করে দিয়ে মানবিক সমস্যাবলির ব্যাপারে অচলাবস্থা অবসানের একটি বড় রকমের

পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ওই তারিখে প্রকাশিত এক ঘোষণায় দু'দেশ উত্তেজনা প্রশমন, উপমহাদেশে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশ এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাবার সংকল্প ঘোষণা করে। দু'দেশ যুক্তভাবে প্রস্তাব করেছিল যে, কতিপয় অভিযোগে বিচারের জন্য বাংলাদেশ সরকারের দরকার হতে পারে, এ ধরনের পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের বাদ দিয়ে বাকী আটক ব্যক্তিদের যুগপৎ প্রত্যার্পণের মাধ্যমে মানবিক বিবেচনা থেকে আটক ও আটকে পড়া ব্যক্তিদের সমস্যা নিষ্পত্তি করা উচিত।

৫। এ ঘোষণার পর ভারত ও বাংলাদেশ এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে লাগাতার কয়েক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৩-এর ২৮শে আগষ্ট দিল্লীতে বাংলাদেশের সম্মতি নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অমীমাংসিত মানবিক সমস্যাবলি সমাধানের জন্য এক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

৬। এ চুক্তি অনুসারে ১৯৭৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ভিন্নমুখী লোকবিনিময় শুরু হয়। ইতিমধ্যে প্রায় ৩ লাখ লোক নিজ নিজ দেশে ফিরে গেছে, যার ফলে উপমহাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের পথ এবং আপসরফার এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

৭। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বীকৃতি দেয়া হলে দিল্লী চুক্তিতে প্রস্তাবিত সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশের যোগদানের সুযোগ ঘটলো। তদনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আজিজ আহমদ ৫ই এপ্রিল থেকে ৯ই এপ্রিল, ১৯৭৪ পর্যন্ত বৈঠকে মিলিত হন এবং দিল্লী চুক্তিতে বর্ণিত বিভিন্ন প্রশ্ন, বিশেষ করে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর প্রশ্ন এবং পাকিস্তানস্থ বাঙালি, বাংলাদেশস্থ পাকিস্তানি ও ভারতে অবস্থানরত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের স্ব-স্ব দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পাদনের প্রশ্নে আলোচনা করেন।

৮। মন্ত্রীত্রয় ১৯৭৩ সালের ২৮শে আগষ্ট স্বাক্ষরিত দিল্লী চুক্তি মোতাবেক ত্রিমুখী প্রত্যাগমনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত এত ব্যাপক সংখ্যক লোক তিন দেশে আটক থাকায় তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

৯। ত্রিমুখী প্রত্যাগমন সন্তোষজনক পরিসমাপ্তিতে নিয়ে আসার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহও মন্ত্রীত্রয় বিবেচনা করেন।

১০। ভারতীয় পক্ষ জানিয়েছেন যে, দিল্লী চুক্তি অনুসারে প্রত্যাগমন করতে বাকী প্রায় সাড়ে ছয় হাজার পাক যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক বন্দী ১৯শে এপ্রিল থেকে ট্রেনযোগে পাকিস্তানে চলে যেতে পারবে। এপ্রিল মাসের শেষ দিকেই যুদ্ধবন্দী প্রত্যাগমন সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১১। পাকিস্তানি পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের প্রত্যাগমন সমাপ্তির পথে। বাদবাকী বাঙালিরা নির্বিঘ্নেই ফিরে যেতে পারবে।

১২। বাংলাদেশে অবস্থানরত অবাঙালিদের ব্যাপারে পাকিস্তান পক্ষ বলেছেন যে, সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের ডোমিসাইল ছিল এ ধরনের অবাঙালি, কেন্দ্রীয় সরকারের

কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ, ডোমিসাইল নির্বিশেষে বিচ্ছিন্ন পরিবারের সদস্যদের পাকিস্তানে চলে আসবার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার ইতিমধ্যে ছাড়পত্র দিয়েছেন। দুর্ভোগ-দুর্দশার ব্যাপারে জড়িত ২৫ হাজার লোককে ছাড়পত্র দানের কাজও এগিয়ে চলেছে। পাকিস্তান পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করেন যে, প্রথম তিন শ্রেণীতে যে লোকেরা পড়বে সংখ্যাগত কোন সীমা ছাড়াই পাকিস্তান তাদের গ্রহণ করবে। যাদের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার অনুরোধ পেলে সুনির্দিষ্ট কোন আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণও জানাবেন। কোন বঞ্চিত আবেদনকারী নিজেকে উপরিউক্ত তিন ক্যাটাগরীর যে কোন একটি না অপরটির জন্য যোগ্য বলে মনে করলে তিনি তার ধারণার সমর্থনে পাকিস্তান সরকারকে নয়া তথ্য বা অধিকতর তথ্যাবলী সরবরাহ্ করতে পারলে যে কোন সময় তাঁর আবেদন পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো যাবে। এ ধরনের ব্যক্তির আবেদন কখনই তামাদি হবে না। পুনর্বিচারের ফলাফল প্রতিকূল হলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকার পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে তার মীমাংসা করতে পারবেন।

১৩। আপসরফার জন্য সরকার ত্রয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে উপমহাদেশে শান্তি ও মৈত্রীর স্বার্থে তিনজন মন্ত্রী ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীর প্রশ্ন আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন যে, এ সকল বন্দী যে বহুবিধ অপরাধ ও বাড়াবাড়ি করেছে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব, আন্তর্জাতিক কানুনের বিধি অনুসারে তা যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরুদ্ধ অপরাধ ও গণহত্যা এবং এ ব্যাপারে বিশ্বজনীন সাধারণ মতৈক্য রয়েছে যে, ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীর মত অপরাধের অভিযোগে আনীত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া উচিত। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, তারা যদি কোন অপরাধ করে থাকে তাঁর দফতর তার নিন্দা করেছেন এবং গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

১৪। এ প্রসঙ্গে তিনজন মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, আপসরফা ও নিষ্পত্তির জন্য দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিন দেশের দৃঢ় সংকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে। মন্ত্রীগণ আরো উল্লেখ করেন যে, স্বীকৃতি দানের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ পেলে তিনি বাংলাদেশ সফরে যাবেন এবং সৌহার্দ্য এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে অতীতকে ভুলে যেতে এবং ক্ষমা করে দেবার জন্য তিনি বাংলাদেশের জনগণের কাছে আবেদন জানাবেন। একইভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি চান জনগণ অতীতকে বিস্মৃত হয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করুক। তিনি বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের মানুষ ক্ষমা করতে জানে।

১৫। উপরিউক্ত অবস্থার আলোকে, বিশেষ ভাবে অতীতের ত্রুটি ক্ষমা করে দেবার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, ক্ষমা করে দেবার কার্যক্রম হিসেবেই বাংলাদেশ

সরকার বিচারের ব্যাপারে অগ্রসর না-হতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্থির করা হয় যে, ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে দিল্লী চুক্তির অধীনে বর্তমানে সম্পাদনাধীন লোকবিনিময় প্রক্রিয়ার অন্যান্য যুদ্ধবন্দীর সাথে পাকিস্তানে চলে যেতে দেয়া যেতে পারে।

১৬। মন্ত্রিগণ তাঁদের এ বদ্ধমূল ধারণা ব্যক্ত করেন যে, উপরিউক্ত মতৈক্যসমূহ ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত মানবিক সমস্যাবলি নিষ্পত্তিতে দৃঢ় ভিত্তি দান করবে। শান্তি ও প্রগতির প্রতি তিন দেশের ৭০ কোটি মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি তাঁরা পুনর্বার আস্থা ঘোষণা করেন এবং সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ও উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে নেবার জন্য তিন দেশের সরকারের প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

১৯৭৪ সালের ৯ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে তিনপ্রস্থ মূল লিপিতে প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক সমভাবে অনুসমর্থিত–

স্বা: (কামাল হোসেন)
পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকার।

স্বা : (শরণ সিং)
বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রী, ভারত সরকার।

স্বা : (আজিজ আহমদ)
প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পাকিস্তান সরকার।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যদের নাম*

লে. জেনারেল	আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি
মে. জেনারেল	নজর হুসেইন শাহ
মে. জেনারেল	মোহাম্মদ হুসেইন আনছারী
মে. জেনারেল	মোহাম্মদ জামশেদ
মে. জেনারেল	কাজি আব্দুল মজিদ খান
মে. জেনারেল	রাও ফরমান আলী
ব্রিগেডিয়ার	আব্দুল কাদির খান
ব্রিগেডিয়ার	আতা মুহাম্মদ খান মালিক
ব্রিগেডিয়ার	বশির আহমেদ
ব্রিগেডিয়ার	ফাহিম আহমেদ খান
ব্রিগেডিয়ার	ইফতেখার আহমেদ রানা
ব্রিগেডিয়ার	মঞ্জুর আহমেদ
ব্রিগেডিয়ার	মঞ্জুর হোসেইন আতিফ
ব্রিগেডিয়ার	মিয়া মনসুর মুহাম্মদ
ব্রিগেডিয়ার	মিয়া তাসকিন উদ্দিন
ব্রিগেডিয়ার	মীর আব্দুল নাঈম
ব্রিগেডিয়ার	মুহাম্মদ আসলাম
ব্রিগেডিয়ার	মুহাম্মদ হায়াত
ব্রিগেডিয়ার	মোহাম্মদ শাফি
ব্রিগেডিয়ার	এন. এ. আশরাফ
ব্রিগেডিয়ার	এস এ আনছারী
ব্রিগেডিয়ার	সাদ উল্লাহ খান এস. জে
ব্রিগেডিয়ার	সৈয়দ আসগর হাসান
ব্রিগেডিয়ার	সৈয়দ শাহ আবদুল কাসেম
ব্রিগেডিয়ার	তাজমাল হুসেইন মালিক
কর্নেল	ফজলে হামিদ

---

* এই তালিকায় ২০৯ জনের নাম আছে ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ১৯৫ কথা বলা হয়েছে। (এ বইয়ে পৃঃ ১৮২) সংখ্যাটি ১৯২ বলে শেখ মজিবের জবানিতে উল্লেখ করেছেন–আব্দুল গাফফার চৌধুরী। (এই বইয়ের পৃঃ ১৮০)

কর্নেল	কে. কে. আফ্রেদী
কর্নেল	মুহাম্মদ খান
কর্নেল	মুহাম্মদ মুশাররফ আলী
লে. কর্নেল	আবদুল গফুর
লে. কর্নেল	আফতাব এইচ. কুরেশী
লে. কর্নেল	আবদুর রেহমান আওয়ান
লে. কর্নেল	আবদুল হামিদ খান
লে. কর্নেল	আবদুল্লাহ খান
লে. কর্নেল	আহমেদ মুখতার খান
লে. কর্নেল	আমির মোহাম্মদ খান
লে. কর্নেল	আমির নওয়াজ খান
লে. কর্নেল	আমির মোহাম্মদ খান
লে. কর্নেল	এ. শামস উল জামান
লে. কর্নেল	আশিক হুসেইন
লে. কর্নেল	আজিজ খান
লে. কর্নেল	গোলাম ইয়াসিন সিদ্দিকী
লে. কর্নেল	ইসরাত আলী আলভী
লে. কর্নেল	মুক্তার আলম হীজাজী
লে. কর্নেল	মোস্তফা আনোয়ার
লে. কর্নেল	এম. আর. কে. মীর্জা
লে. কর্নেল	মতলব হোসেন
লে. কর্নেল	মোহাম্মদ আকরাম
লে. কর্নেল	মোহাম্মদ আকবর
লে. কর্নেল	মোহাম্মদ নওয়াজ
লে. কর্নেল	মুমতাজ মালিক
লে. কর্নেল	এম. এম. এম. বেইজ
লে. কর্নেল	মোহাম্মদ মতিন
লে. কর্নেল	মাজহার হোসেন চৌহান
লে. কর্নেল	মুক্তাহার আহমেদ সৈয়দ
লে. কর্নেল	মুস্তাফাজান
লে. কর্নেল	ওমান আলী খান
লে. কর্নেল	রীয়াজ হোসেন জাভেদ
লে. কর্নেল	রশীদ আহমেদ
লে. কর্নেল	শেখ মোহাম্মদ নাঈম
লে. কর্নেল	সারফাজ খান মালিক
লে. কর্নেল	এস. এফ. এইচ. রীজভী

লে. কর্নেল	এস. এইচ. বুখারী
লে. কর্নেল	সৈয়দ হামিদ সাফী
লে. কর্নেল	সুলতান বাদশা
লে. কর্নেল	সুলতান আহমেদ
লে. কর্নেল	এস. আর. এইচ. এস. জাফরী
লে. কর্নেল	জেইড আগা খান
লে. কর্নেল	এম. ওয়াই. মালিক
মেজর	আবদুল ঘাফরান
মেজর	আনিস আহমেদ
মেজর	আরিফ জাভেদ
মেজর	আত্তা মোহাম্মদ
মেজর	আবদুল হামিদ
মেজর	এ. এস. পি কোরেশী
মেজর	আশফাক আহমেদ চীমা
মেজর	আবদুল খালেক কায়ানী
মেজর	আবদুল ওয়াহেদ মোগল
মেজর	আবদুল হামিদ খাট্টাক
মেজর	আহমেদ হাসান খান
মেজর	আনিস আহমেদ খান
মেজর	আবদুল ওয়াহিদ খান
মেজর	সি এইচ. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর
মেজর	গোলাম মোহাম্মদ
মেজর	গোলাম আহমেদ
মেজর	গাজ্জানফার আলী নাসির
মেজর	হাদি হোসেন
মেজর	হাসান মুজতবা
মেজর	ইফতিখার উদ্দিন আহমেদ
মেজর	ইফতিখার আহমেদ
মেজর	শাহ মোহাম্মদ ওসমান ফারুকী
মেজর	খুরশীদ ওমান
মেজর	খুরশীদ আলী
মেজর	খিজার হায়াৎ
মেজর	মেহর মোহাম্মদ খান
মেজর	এম. আবদুল্লাহ খান
মেজর	মোহাম্মদ আফজল
মেজর	এম. ইছাক

মেজর	মোহাম্মদ হাফিজ রাজা
মেজর	মোহাম্মদ ইউনুস
মেজর	মোহাম্মদ আমিন
মেজর	মোহাম্মদ লোধী
মেজর	মীর্জা আনোয়ার বেগ
মেজর	এম. এ. কে. লোধী
মেজর	মাদাদ হোসেন শাহ
মেজর	মোহাম্মদ আয়ুব খান
মেজর	মোহাম্মদ শরিফ আরিয়ান
মেজর	মোহাম্মদ ইফতেখার খান
মেজর	এম. ইয়াহিয়া হামিদ খান
মেজর	মোহাম্মদ ইয়ামিন
মেজর	মোহাম্মদ গাজানফার
মেজর	মোহাম্মদ সারওয়ার
মেজর	মোহাম্মদ সিদ্দিকী
মেজর	মোহাম্মদ আসরাফ
মেজর	মোহাম্মদ আসরাফ খান
মেজর	মোহাম্মদ সাফদার
মেজর	এম. এম. ইস্পাহানী
মেজর	মোহাম্মদ জামিল
মেজর	মোহাম্মদ সফি
মেজর	মো. আজিম কোরেশী কোরেস
মেজর	মো. জুলফিকার রাঠুর
মেজর	মোস্তাক আহমেদ
মেজর	নাসির খান
মেজর	নাসির আহমেদ
মেজর	রানা জহুর মহিউদ্দিন খান
মেজর	রিফাত মাহমুদ
মেজর	রুস্তম আলী
মেজর	আর. এম. মমতাজ খান
মেজর	সরদার খান
মেজর	মোহাম্মদ আজম খান
মেজর	সাইফ উল্লাহ খান
মেজর	এস. টি. হোসেন
মেজর	এস. এম. এইচ. এস. বুখারী
মেজর	সাজিদ মাহমুদ

মেজর	শের-উর-রেহমান
মেজর	সালামত আলী
মেজর	সাজ্জাদ আখতার মালিক
মেজর	সেলিম এনায়েত খান
মেজর	সুলতান সাউদ
মেজর	সারফরাজ উদ্দিন
মেজর	শাওকাতুল্লাক খাত্তাক
মেজর	সুলতান সুরখরো আওয়ান
মেজর	সারফরাজ আলম
মেজর	সারওয়ার খান
মেজর	তাফির-উল-ইসলাম
মেজর	জাউমুল মালুক
ক্যাপ্টেন	আবদুল ওয়াহীদ
ক্যাপ্টেন	আফতাব আহমেদ
ক্যাপ্টেন	আরিফ হোসেন শাহ
ক্যাপ্টেন	আবরার হোসেন
ক্যাপ্টেন	আমজাদ সাব্বির বুখারী
ক্যাপ্টেন	আসাফ আহমেদ
ক্যাপ্টেন	আবদুর কাহার
ক্যাপ্টেন	আসরাফ মীর্জা
ক্যাপ্টেন	আবদুল রশীদ নায়ার
ক্যাপ্টেন	আমান উল্লাহ
ক্যাপ্টেন	আজিজ আহমেদ
ক্যাপ্টেন	গুলফ্রাজ খান আব্বাসী
ক্যাপ্টেন	ইকরামুল হক
ক্যাপ্টেন	ইজাজ আহমেদ চীমা
ক্যাপ্টেন	ইফতিখার আহমেদ গোন্দাল
ক্যাপ্টেন	ইসহাক পারভেজ
ক্যাপ্টেন	ইকবাল শাহ
ক্যাপ্টেন	জাভেদ ইকবাল
ক্যাপ্টেন	জাহাঙ্গীর কৈয়ানী
ক্যাপ্টেন	কারাম খান
ক্যাপ্টেন	মানজার আমিন
ক্যাপ্টেন	মুজাফফর হুসেইন নাকভী
ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ সাজ্জাদ
ক্যাপ্টেন	মুহাম্মদ জাকির রাজা (মুহাম্মদ জাকের খান, আর্টি)

ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ আরিফ
ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ আশরাফ
ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ ইকবাল
ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ রাফি মুনীর
ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ জামিল
ক্যাপ্টেন	নাঈম আকিব
ক্যাপ্টেন	শের আলী
ক্যাপ্টেন	সালমান মাহমুদ
ক্যাপ্টেন	শামশেদ সারোয়ার
ক্যাপ্টেন	শাহীদ রেহমান
ক্যাপ্টেন	সালেহ হুসেইন
ক্যাপ্টেন	শাওকাত নাওয়াজ খান
ক্যাপ্টেন	জাহিদ জামান
ল্যাফ.	মুনীর আহমেদ বাট
ল্যাফ.	জাফর জং
ক্যাপ্টেন	নাছির আহমেদ খান শেরওয়ানী
মেজর	ফায়াজ মুহাম্মদ
মেজর	মিয়া ফকরুদ্দিন
ক্যাপ্টেন	হেদায়েত উল্লাহ খান
ক্যাপ্টেন	মো. সিদ্দিকী
ক্যাপ্টেন	খলিল উর রহমান
মেজর	নাদির পারভেজ খান
ক্যাপ্টেন	হাসান ইদ্রিস

পাকিস্তান বিমান বাহিনী

এয়ার.	ইনাম উল হক খান
গ্রুপ ক্যাপ্টেন	এম. এ. মজিদ বেগ
ফ্ল্যাইট ল্যাফ.	খালিদ আহমেদ

পাকিস্তান নৌবাহিনী

রিয়ার. এডমিরাল	মুহাম্মদ শরীফ
কমোডর	ইকরামুল হক মালিক
কমোডর	খতিব মাসুদ হুসেইন

এখানে ২০৯ জনের নাম আছে। ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে (এই বইয়ের ৯৭-১০০ পৃষ্ঠা) ১৯৫ জনের কথা বলা হয়েছে। সংখ্যাটি ১৯২ বলে শেখ মুজিবের জবানীতে উল্লেখ করেছেন আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী। (এই বইয়ের ১৮০ পৃঃ)

সত্যিকারের স্বাধীনতা ও মুক্তির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।*

মুক্তিকামী ভাইবোনেরা!

রাশিয়া ও ভারতের শাসকেরা বলছে তারা আমাদের দেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে। আর তাদের দালাল শেখ মুজিব ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা এবং মনি সিং-মোজাফ্‌ফররা বলছেন যে, তাঁরা স্বাধীনতার লড়াই করে আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছেন, এক "স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ' কায়েম করেছেন।

বিরাট ধাপ্পাবাজী

অথচ, এ হচ্ছে এক বিরাট ধাপ্পা। বাস্তব ঘটনা এর ঠিক বিপরীত। বাস্তব সত্য হল, রাশিয়া ও ভারতের শাসকদের নিকট আওয়ামী লীগ নেতারা ও মণি সিং-মোজাফ্‌ফররা আমাদের দেশকে বেঁচে দিয়েছে।

"স্বাধীনতা সংগ্রাম"-এর ধাপ্পা দিয়ে শেখ মুজিব সুড়সুড় করে চলে গেলেন ইয়াহিয়ার জেলে; আর আমাদের নিক্ষেপ করলেন ইয়াহিয়ার অত্যাচারের মুখে। অন্যদিকে, তাঁর সাথে ইন্দিরা দেবীর আগে থাকতেই ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা এবং মণি-সিংরা তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে ভারতে আশ্রয় নিলেন। ভারত সরকারের কোলে বসে তাঁরা জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে "স্বাধীনতার' হুংকার ছাড়তে লাগলেন এবং জনগণের জন্য মায়াকান্না কাঁদতে লাগলেন। এই "স্বাধীনতা" ও মায়াকান্নার আড়ালে আওয়ামী লীগ নেতারা ও মণি সিং-মোজফ্‌ফররা আমাদের দেশকে রাশিয়া ও ভারতের নিকট বেঁচে দেওয়ার জন্য তলায় তলায় চক্রান্ত চালান এবং রাশিয়া ও ভারতের শাসকদের সাথে গোপনে এক দীর্ঘমেয়াদী সামরিক ও অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

এই গোলামির চুক্তির বলেই রাশিয়ার সাহায্যে ইন্দিরার সেনাবাহিনী "স্বাধীন" করার নামাবলী গায়ে দিয়ে আমাদের দেশকে গিলে খাওয়ার জন্য এগিয়ে এল, তারা আমাদের দেশের উপর করল বর্বর আক্রমণ। অন্যদিকে, আমেরিকার সমর্থনে ইয়াহিয়া আমাদের উপর চালালো বর্বর অত্যাচার। আমাদের জীবনে নেমে এল এক চরম দুর্দিন। আমরা দুইদিক থেকে আক্রান্ত হলাম। রাশিয়া, আমেরিকার ও ভারতের শাসকদের এবং তাদের পদলেহী মুজিব ও ইয়াহিয়ার স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হল আমাদের দেশ, বলি হলাম আমরা!

ইয়াহিয়াকে সরিয়ে নিজে গদিতে বসার উদ্দেশ্যে ভারত ও আমেরিকার শাসকদের সাথে চক্রান্ত করে শেখ মুজিব যে মীরজাফরী ভূমিকা নেন তার শেষ পরিণতিতে আমাদের দেশ হয়েছে রাশিয়া ও ভারতের পদানত। স্বাধীনতার বদলে আমরা পেয়েছি

---

* কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) পূর্ববাংলা পক্ষে মোঃ তোয়াহা কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারিত পুস্তিকা ৮ সেপ্টম্বর ১৯৭২

গোলামি। আর এই গোলামির চক্রান্তের যূপকাষ্ঠে আমরা কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তরা লাখে লাখে দিলাম প্রাণ, আমরা হলাম সর্বহারা ও বাস্তুহারা, আমাদের মা-বোনেরা হলেন লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা।

২৫ শে মার্চের পর নয় মাস যাবত আমরা যখন লাখে লাখে মরেছি ও আমরা সর্বস্বান্ত হয়েছি তখন শেখ মুজিবের সাঙ্গপাঙ্গরা এবং মণি সিং-মোজফ্‌ফররা ভারত সরকারের আশ্রয়ে আরামে দিন কাটিয়েছেন। তাঁদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নি। রাশিয়ার সাহায্যে ভারত আমাদের দেশকে জবর দখল করার পর মীরজাফরদের দল ভারতের হাওয়াই জাহাজে উড়ে এসে আমাদের কাঁধে চেপে বসেছেন। শেখ মুজিবও আমেরিকার সাহায্যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে লন্ডন ও ভারত পাড়ি দিয়ে পূর্ব বাংলায় এলেন। ইন্দিরার আশ্রিত পূর্ব বাংলার তিনি নিলেন সুবেদারী।

গদিতে বসেই তাঁর প্রথম কাজ হলো ইন্দিরার সাথে তথাকথিত "ভারত-বাংলাদেশ রক্ষা ও মৈত্রী চুক্তি" স্বাক্ষর করা। আমাদের দেশকে রাশিয়া ও ভারতের পদানত করার জন্য তাজউদ্দিন সাহেবরা ভারত সরকারের সাথে যে গোপনে চুক্তি করেছিলেন তার কয়েকটি ধারাকে শেখ মুজিব প্রকাশ্যে কার্যকরী করলেন। "ভারত-বাংলাদেশ রক্ষা ও মৈত্রী চুক্তি" করে তিনি ইন্দিরার নিকট গোলামির দাসখত লিখে দিলেন। সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তিনি আমাদের দেশকে করলেন ভারতের অধীন।

তাই বাস্তব সত্য হল আমাদের দেশের আজ কোন স্বাধীনতা নেই। আমাদের নেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক, কোন ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা। রাশিয়ার সাহায্যে ইন্দিরা তার সেনাবাহিনীর জোরে এবং আওয়ামী লীগ এবং মণি সিং-মোজাফ্‌ফরের সাথে যোগসাজশে আমাদের দেশকে দখল করে নিয়েছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতের একটি আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশ পরিচালিত হচ্ছে প্রধানত দিল্লী ও মস্কোর নির্দেশে। শেখ মুজিবের সরকার একটি স্বাধীন সার্বভৌম সরকার নয়। বস্তুত একটি পুতুল সরকার। মীরজাফরীর পুরস্কার হিসাবে শেখ মুজিব ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ভারতের বন্দুকের জোরে পেয়েছেন গদি এবং ওদের বন্দুকের জোরেই গদিতে টিকে আছেন। এই পুতুল সরকারকে সামনে রেখে রাশিয়ার পদলেহী ইন্দিরা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেশকে শাসন করছে, আর ধূর্ত রাশিয়ানরা আড়ালে থেকে পুতুল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে, নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, বৈদেশিক নীতি, সামরিক নীতি ও সংস্কৃতিকে। উপরন্তু, শেখ মুজিবই ডেকে এনেছে মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদেরও। এই হচ্ছে মুজিববাদ মার্কা "স্বাধীনতার" আসল রূপ।

"স্বাধীনতার" মোড়কে এই গোলামির বিষময় ফল আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। পাকিস্তান আমলের চাইতেও আমাদের অবস্থা আজ খারাপ। আমাদের দেশে বিদেশী দস্যুদের শোষণ ও লুণ্ঠন পাকিস্তান আমলের চাইতেও অনেক গুণ বেড়ে গেছে। বেড়েছে বিদেশী পুঁজির কব্জা। পৃথিবীর দুই অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাশিয়া ও আমেরিকা আমাদের দেশকে অবাধে লুটছে। ভারতের দস্যুরা চালাচ্ছে নজিরবিহীন লুণ্ঠন। তাঁরা গত দশ মাসে ১০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। রাশিয়া, ভারত

ও আমেরিকার দস্যুরা সাহায্যের পোশাক পরে এবং অসম-বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে লুণ্ঠন চালাচ্ছে। তারা এই লুণ্ঠন চালাচ্ছে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও এম. সি,এ দের সাথে যোগসাজশে। মন্ত্রী ও এম.সি-এ রা হচ্ছে বিদেশী দস্যুদের দালাল এবং জোতদার-মহাজন, চোরাকারবারী ও দালাল ধনিকদের সর্দার। আমাদের দেশকে শাসন ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে বিদেশী লুটেরাদের প্রধান সহায় ও সামাজিক ভিত্তি হলো এই দেশী শোষকেরা। বিদেশী দস্যুদের বিশেষভাবে ভারত ও রাশিয়ার শোষণ ও লুণ্ঠন এবং দেশের ভিতরে তাদের দালাল জোতদার মহাজন ও চোরাকারবীদের শোষণ ও লুণ্ঠনই আমাদের জীবনের ক্রমবর্ধমান দুঃখ-দুর্দশার জন্য সব চাইতে বেশি দায়ী।

এদের বেপরোয়া শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলেই আমাদের ঘরে ঘরে আজ হাহাকার। দেশে বিরাজ করছে দুর্ভিক্ষের অবস্থা। চাউল, ডাল, নুন, তেল, কাপড় প্রভৃতি প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর শেখ মুজিবের 'স্বাধীনতার আমলে" গড়ে তিন চারগুণ বেড়েছে। শেখ মুজিবের "স্বাধীন বাংলাদশে" আমাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, নেই আমাদের জীবিকার সংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সংস্থান, নেই আমাদের জীবনের নিরাপত্তা। আমরা শুকিয়ে মরছি, আরও গরিব হচ্ছি সর্বহারা। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছি প্রতিদিন।

আর আমাদের রক্তচুষে খেয়ে ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকার বিদেশী লুটেরারা এবং তাদের দালাল জোতদার-মহাজন ও দালাল ধনিকদের সর্দার মন্ত্রী ও এম. সি-এ রা তাদের সম্পদের পাহাড় জমাচ্ছে।

এই রক্তচোষাদের শাসন, শোষণ ও লুণ্ঠনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমাদের উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছে ফ্যাসিষ্ট সন্ত্রাসের রাজত্ব। আমাদের নেই কথা বলার স্বাধীনতা, প্রচারের স্বাধীনতা, নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন করার স্বাধীনতা, ধর্মঘট ও ঘেরাও করার স্বাধীনতা; কথায় কথায় আমাদের উপর চলছে গুলি।

মুজিববাদী "স্বাধীনতা, "গণতন্ত্র," "শোষণমুক্তি" ও "সমাজতন্ত্র"-এর বদৌলতে আমাদের জীবনে নেমে এসেছে এই দুর্ভোগ।

গণ-চীন বিরোধী যুদ্ধ ষড়যন্ত্র

উপরন্তু, আমাদের দেশের উপর নয়া-ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব কায়েম করে রাশিয়ানরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে আমাদের দেশে গণ-চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘাঁটি স্থাপনের জন্য।

চীনের শাসক হলেন শ্রমিক-কৃষকেরা। চীন হচ্ছে বিশ্ব বিপ্লবের দুর্গ। আমাদের স্বাধীনতা, মুক্তি, জন-গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামেও চীন হচ্ছে সব চাইতে দৃঢ় সমর্থক ও সহায়ক। চীন দাঁড়িয়েছে পূর্ব বাংলার জনগণের সমর্থনে; চীন দাঁড়িয়েছে রাশিয়ার সাহায্যে ইন্দিরা কর্তৃক আমাদের দেশের উপর অন্যায় আক্রমণ ও আমাদের দেশকে জবরদখলের বিরুদ্ধে, আমাদের দেশের ভিতরে রাশিয়া, ভারত ও আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। চীন বারবার বলেছে পূর্ব বাংলার সমস্যা পূর্ব বাংলার জনগণই সমাধান করবে। আমাদের দেশে জনগণের উপর যে বর্বরতা হয়েছে চীন কোনদিনই তা সমর্থন করেনি। আমাদের দেশের জনগণের স্বার্থেই চীন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে

পরিচালিত গোলামির আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। আমাদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও শান্তির স্বার্থেই চীন হামলাকারী ও জবরদখলকারী ভারত ও রাশিয়ার মুখোশ খুলে ধরছে। এই কারণেই আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও শান্তির এক নম্বর শত্রু রাশিয়া ও ভারতের শাসকেরা এবং তাদের এদেশী দালালরা চীনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে ও চীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছে।

এসবের উদ্দেশ্য হলো রাশিয়ার নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় গণ-চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘাঁটি স্থাপন করা। এর পূর্ণ প্রস্তুতি চলছে। রাশিয়া চট্টগ্রাম বন্দরে নৌ ঘাঁটি স্থাপনের জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। চীনকে ঘেরাও ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘাঁটি স্থাপন এবং সমগ্র এশিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাশিয়া "এশীয় রক্ষা জোট" গঠনের যে পরিকল্পনা নিয়েছে আমাদের দেশকে তার অন্তর্ভুক্ত করার চক্রান্ত চলছে। "ভারত-বাংলাদেশ রক্ষা ও মৈত্রী চুক্তি" তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ।

দুই অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধের ক্ষেত্রে

আমাদের দেশ দুই অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাশিয়া ও আমেরিকার বিরোধ ও ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রেও পরিণত হয়েছে। এই দুই অতি বৃহৎ শক্তি আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনকে দমন এবং গণ-চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে এক। কিন্তু, আমাদের দেশসহ এই অঞ্চলে প্রভুত্ব এবং শোষণ ও লুণ্ঠনের বখরা নিয়ে এদের মধ্যে চলছে কামড়া-কামড়ি। এই বিরোধ দিন দিন বাড়ছে। রাশিয়া তার নয়া ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব বজায় রাখা এবং আমেরিকার আবার নয়া ঔপনিবেশিক প্রভু হওয়ার জন্য চালাচ্ছে সুগভীর ষড়যন্ত্র। তাদের এই ষড়যন্ত্রকে কার্যকরী করার জন্য তারা নিয়োগ করছে তাদের হাজার গোয়েন্দাকে, নিয়োগ করেছে তাদের এদেশী দালালদের। রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে বিরোধের ফলে তাদের দালালদের মধ্যেও বিরোধ দেখা দিয়েছে। বিরোধ দেখা দিয়েছে শেখ মুজিবের নিজস্ব দল এবং সরকারের ভিতরেও; এই দুই অতি বৃহৎ ষড়যন্ত্রের যূপকাষ্ঠে আমাদের বলি দেওয়ার জন্য আজ চলছে সুগভীর চক্রান্ত।

যতদিন ভারত ও রাশিয়া আমাদের দেশের প্রভুত্ব করবে এবং তাদের পুতুল সরকার ক্ষমতায় থাকবে, যতদিন আমেরিকান দস্যুরাও শোষণ চালাবে, যতদিন বিদেশী দস্যুদের দালাল জোতদার-মহাজনদের ও দালাল ধনিকদের শাসন ও শোষণ বজায় থাকবে; ততদিন আমাদের দেশের মুক্তি ও অগ্রগতি হবে না; ততদিন আমরা মুক্তি পাব না; ততদিন দেশে গণতন্ত্র কায়েম হবে না; ততদিন দেশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি পাবে না ও দেশে শান্তি আসবে না; ততদিন আমাদের অনাহারে-অর্ধাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে, মরতে হবে গুলিতে; এবং ততদিন আমাদের রক্ত ঝরবে।

শত্রুদের ষড়যন্ত্র জাল

নিজেদের শাসন ও শোষণ টিকিয়ে রাখা এবং দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামকে দমনের উদ্দেশ্যে শত্রুরা একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে। একদিকে, তারা বন্দুক

হাতে স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রকামী জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে; অন্যদিকে, তারা নিয়েছে বিভেদ নীতির হাতিয়ার।

শত্রুদের প্রচণ্ড দমন নীতি সত্ত্বেও জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দমন করা যায় নি। ভারত ও তার পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ আজ তীব্র আকার ধারণ করেছে। স্বাধীনতার শত্রুরা বসে আছে গণ-বিক্ষোভের বারুদের স্তূপের উপর। শত্রুরাও তা বুঝতে পারছে।

তাই জনগণকে বিভক্ত, বিভ্রান্ত ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের সংকটাপন্ন শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে শত্রুরা নিচ্ছে নানা কৌশল।

গণ-বিক্ষোভকে বিপ্লব-বিরোধী খাতে প্রবাহিত করার জন্য সরকারি দলের লোকেরাও সরকার বিরোধিতার মুখোশ পরে মাঠে নেমেছে। তারা একদিকে সরকারের পদত্যাগ দাবি করছে, আবার অন্যদিকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে "বিপ্লবী সরকার" গঠনের দাবি তুলছে। কোন কোন সরকার-বিরোধী নেতা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে "সর্বদলীয় সরকার" গঠনের দাবি তুলছেন। বলা হচ্ছে শেখ মুজিব ভাল, তাঁর দলের অন্যরা চোর। চোরের সর্দার কি কখনও ভাল লোক হয়? চোরের সর্দার আওয়ামী লীগ নেতারা, মন্ত্রী ও এম, সি, এ রা চোরাকারবার ও চোরাচালান বন্ধ করার ধাপ্পা দিচ্ছে। মণি সিং-মোজাফফররাও বিক্ষুব্ধ জনগণকে বিপথগামী করার জন্য কিছু কিছু ব্যাপারে সরকার-বিরোধিতার মুখোশ পরে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধ্বজা নিয়ে মাঠে নেমেছে। তাদের সরকার বিরোধিতা বিন্দুমাত্র জনগণের স্বার্থে নয়। তাদের সরকার-বিরোধিতার মূল উদ্দেশ্য হলো শেখ মুজিবের সরকার যাতে পুরোপুরিভাবে রুশ-ভারতের গোলাম থাকে সে জন্য চাপ সৃষ্টি করা। অন্যদিকে, মার্কিন দালালরা জনগণের বিক্ষোভকে ব্যবহার করে পুরোপুরিভাবে মার্কিনের পদানত একটি সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেতারা, মণি সিং-মোজাফফররা এবং কোন কোন সরকার-বিরোধী নেতা বিক্ষুব্ধ জনগণকে বিপ্লবের রাস্তা থেকে সরিয়ে আনার জন্য আবার সংসদীয় গণতন্ত্র, ভোট ও সংস্কারবাদী আন্দোলনের টোপ ফেলছেন। ভারত-বিরোধিতার ধ্বজা নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাবারও প্রস্তুতি চলছে।

শত্রুদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করুন

শত্রুদের এই সব ষড়ন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। বিক্ষুব্ধ জনগণকে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের পতাকাতলে সমবেত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। দেশের প্রত্যেক দেশপ্রেমিক দল, গ্রুপ ও ব্যক্তির এই হচ্ছে আজ প্রাথমিক ও সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য।

তাই পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, দেশপ্রেমিক ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও মা-বোনসহ সকল দেশপ্রেমিকের নিকট, প্রাক্তন "মুক্তিবাহিনীর" দেশপ্রেমিক অংশের নিকট এবং বর্তমান সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও সরকারি কর্মচারীদের দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের নিকট আমাদের পার্টির আবেদন :

আসুন আমরা সকলে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াই; আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য চলুন আমরা সকলে মিলে এক লৌহদৃঢ় একতা গড়ে তুলি; রাশিয়া ও ভারতের কবল থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করা, আমেরিকান দস্যুদের বিতাড়িত করা এবং শেখ মুজিবের পুতুল সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য চলুন আমরা এক হয়ে দাঁড়াই।

স্বাধীনতা, খাদ্য, ফ্যাসিষ্ট দমননীতির অবসান ও জনগণের শাসন তথা প্রকৃত গণতন্ত্র চাই– হোক আজ আমাদের রণধ্বনি।

আসুন এই রণধ্বনি নিয়ে আমরা প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন এবং জনগণের বিপ্লবী সরকার কায়েমের জন্য জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

চলুন শত্রুর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা গণমুক্তি ফৌজকে আরো শক্তিশালী করি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান শক্তি হচ্ছে ভূমিহীন, গরিব ও মাঝারী কৃষক। ভূমিহীন ও গরিব কৃষকেরা সব চাইতে ভাল যোদ্ধা এবং তাঁরা সংখ্যায়ও পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে ৫ কোটি। চলুন তাঁদের উপর নির্ভর করে আমরা সশস্ত্র গণ-মুক্তি ফৌজকে শক্তিশালী করি।

আমাদের মুক্তি সংগ্রামের মূল ঘাঁটি হবে গ্রামাঞ্চল। প্রথমে গ্রামকে করতে হবে মুক্ত। গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিপ্লবী জনগণের রাজত্ব। এই উদ্দেশ্যে বিদেশী দস্যুদের সর্বপ্রধান দালাল জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে হবে সশস্ত্র শ্রেণী যুদ্ধ এবং এই দুশমনদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্যের কবর রচনা করতে হবে। গ্রামকে শত্রুমুক্ত করে, গ্রাম থেকে শহর ঘেরাও করে আমরা শহরগুলিকেও মুক্ত করব।

এই পথেই, এই দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র লড়াইয়ের জোরেই আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন এবং জনগণের শাসন কায়েম করতে পারব।

কমরেড ও বন্ধুগণ, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই, যদি আমরা অস্ত্র হাতে সংগ্রামে নামি, নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণের জন্য দৃঢ়সংকল্প হই, বিজয় লাভ পর্যন্ত সংগ্রামে অটল থাকি ও আত্মদানে সাহসী হই তাহলে পৃথিবীর কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। রাশিয়া, ভারত ও আমেরিকান দস্যুরা এবং তাদের দালালরা পরাজিত হবেই হবে। জনগণের জয় হবেই হবে।

* রাশিয়া ও ভারতের শোষকদের কবর রচনা করুন!
* মার্কিন দস্যুদের বিতাড়িত করুন!
* ভাত চাই, কাপড় চাই, মানুষের মত বাঁচতে চাই!
* পুতুল সরকারকে উচ্ছেদ করুন!
* জনগণের শাসন কায়েম করুন।

ব্যর্থ–অযোগ্য ও দেউলিয়া সরকারের পদত্যাগ চাই *

"বাংলাদেশ পাক ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠির কবল হতে মুক্তি লাভ করার পর বাংলাদেশ সরকার সর্ববিষয়ে ব্যর্থতা, অযোগ্যতা ও দেউলিয়াপনার পরিচয় দিয়েছে। তাই সরকারের কোন অধিকার নেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার। তাই আমাদের পার্টি দাবি করে অবিলম্বে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।

১। দেশের সম্পদ পাচার ও চোরাকারবার দমনের ক্ষেত্রে

সারা বাংলাদেশ চোরাকারবারী, মজুতদারদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত নয় এবং দেশের শিল্প ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত নয়, অথচ রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এমন ব্যক্তিবর্গই মজুতদারী-চোরাকারবারের সাথে জড়িত। ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় লাইসেন্স পারমিটও এদের দখলে।

স্বর্ণপ্রসবিনী বাংলাদেশের স্বর্ণ-সূত্র পাটের সিংহভাগ ও কাঁচা চামড়ার বেশিরভাগ চোরাকারবারের মাধ্যমে ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা হতে বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়েছে ও হচ্ছে। বুভূক্ষু বাংলার খাদ্যও চোরাচালানের মাধ্যমে ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে। দেশের সম্পদ রক্ষা ও চোরাচালান বন্ধ করতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

২। টাকার মূল্যমান রক্ষা করার ক্ষেত্রে

সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশের টাকার দাম ভারতের টাকার মানের সমান হলেও বেসরকারি বিনিময় মূল্য দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের ১০০ টাকা ভারতের ৫০ টাকার সমান। চোরাকারবারের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারতীয় পুঁজিপতিদের কবলিত হয়ে পড়েছে। চোরাকারবারের ফলেই অর্থের মূল্যমানের অবস্থায় ভারতীয় পুঁজিপতিদের পক্ষে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। মুদ্রার মূল্যমানের অসমহারের কারণে বাংলাদেশের সকল প্রকার পণ্য চোরাকারবারীরা ভারতে পাচার করে চলছে। ভারত হতে সরকারি পর্যায়ে আমদানিকৃত পণ্যও আবার ভারতে পাচার হচ্ছে। এইক্ষেত্রে সরকার সম্পূর্ণ দেউলিয়াপনার পরিচয় দিয়েছে।

৩। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে

বর্তমানে দেশে চলছে মহাদুর্ভিক্ষ। দেশের জনগণের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি অর্ধাহারে, উপবাসে দিন কাটাচ্ছে। প্রতিদিন উপবাসে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। অনেক মা-

* কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক ৩১ শে আগস্ট (৭২) ঢাকায় আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থাপিত লিখিত ভাষণ– (পুস্তিকা।)

বোন খেতে না পেয়ে ও বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণে অক্ষম হয়ে আত্মহত্যা করছে। রিলিফ দ্রব্যের বেশিরভাগই ক্ষমতাসীন দলের টাউটরা আত্মস্যাৎ করেছে।

এই বিষয়ে সরকার অক্ষম, হৃদয়হীন ও উদাসীন। যে সরকার দেশের মানুষকে নুন ভাত দিতে পারে না, সে সরকারের কোন অধিকার নেই–ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার।

৪। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে

দেশে আইনের শাসন নেই। পুলিশ ও প্রশাসনযন্ত্রকে সরকার দলীয় লোকেরা অবৈধভাবে অচল করে রেখেছে। জনগণের জান-মালের কোন নিরাপত্তা নেই। সারা দেশে লুটতরাজ, রাহাজানি, পাইকারি হারে ডাকাতি ও রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যার ব্যাপকতা বেড়ে চলছে।

লাল বাহিনী নামক এক বেসরকারি বাহিনী সংগঠিত করে ক্ষমতাসীন দল শিল্প শ্রমিকদের জীবনকে বিঘ্নসঙ্কুল করে তুলেছে। এদের সশস্ত্র ফ্যাসিবাদী হামলার ফলে এ যাবৎ শত শত শিল্প শ্রমিক শহীদ হয়েছেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও উপর্যুপরি হামলার ফলে শিল্পের উৎপাদন অনেক হ্রাস পেয়েছে। শিল্প অর্থনীতি গভীর সঙ্কটে পতিত হয়েছে। শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছেন।

৫। শ্রমিক শ্রেণীর মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে

বর্তমান সরকার শ্রমিক শ্রেণীর মৌলিক অধিকার অর্থাৎ ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর উপর এহেন স্বৈরতান্ত্রিক হামলা অতীতে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার তাদের শ্রমিক ফ্রন্টে শ্রমিক লীগকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রশাসনযন্ত্রকে পুরোপুরি ব্যবহার করছে। শ্রমিকদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার আজ কার্যত অস্বীকৃত। দেশ-গড়ার নামে সরকার শ্রমিক শ্রেণীকে তিন বছর পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধির দাবি না-তুলতে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। শ্রমিকদের বেতন যা ছিল তাই রয়ে গেছে। অথচ, দ্রব্যমূল্য আগের তুলনার গড়-পড়তা ৫ গুণ বেড়েছে। দেড়শত টাকা বেতন দিয়ে একটি শ্রমিক পরিবারের এক মাসের চালের দামও হয় না। অন্যদিকে সরকারের দলীয় লোকেরা রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছে রূপান্তরিত হচ্ছে।

এইক্ষেত্রে সরকার সমাজতন্ত্রের মুখোশ পড়ে শ্রমিক শ্রেণীকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছে।

৬। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে

বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত। সরকারের গণতান্ত্রিক নীতিকে তারা পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়েছে।

৭। খাজনা মৌকুফ করার ক্ষেত্রে

২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাপ করা হয়েছে বলে সরকার ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী সময়ে জানানো হয়েছে যে বাস্তুভিটা, বাগান ও পুকুরের খাজনা মউকুফ করা হয়নি এবং খাজনার নামে বিভিন্ন প্রকারের যে কর দিতে হয়, তাও মউকুফ করা হয়নি। ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের অনেকেরই বাস্তুভিটা এবং ভিটাসংলগ্ন সামান্য বাগান আছে, কিন্তু চাষের জমি আদৌ নেই বা সামান্য আছে। খাজনা মউকুফের নামে যা করা হয়েছে, তাতে মেহনতী গরিব জনতার কোন উপকার হয় নি। বিঘা প্রতি ৩/৪ টাকা খাজনা মৌকুফ করে সারের দাম ৮ টাকা হতে ২২ টাকায় বৃদ্ধি করে কৃষক-জনতাকে শুভঙ্করের ফাঁকি দিয়ে চিরাচরিত প্রথায় বোকা বানানোর প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

৮। কৃষকদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে

পূর্বে এক মণ পাট বিক্রয় করে দুই মণ চাউল কেনা যেত। বর্তমানে এক মণ চাউল কিনতে আড়াই মণ পাট বিক্রয় করতে হয়। অর্থাৎ আড়াই মণ পাট বিক্রয় করে যেখানে পূর্বে ৫ মণ চাউল কেনা যেত, সেখানে বর্তমানে এক মণ চাউল পাওয়া যাচ্ছে। ন্যায্যমূল্যে পাট ক্রয় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সরকার ঢাক-ঢোল পিটিয়েছেন। কিন্তু কার্যত এই সরকার পাক সরকারের ঐতিহ্য বহন করে চলছেন। সত্য কথা বলতে গেলে বর্তমান সরকারের পাটনীতি কৃষককুলকে পরিপূর্ণ ধ্বংস করার নীতি। কৃষকদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান করতে এই সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

৯। শরণার্থী পুনর্বাসন করার ক্ষেত্রে

ভারত-প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন করতে সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। শরণার্থীদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সিকিভাগও পুনরুদ্ধার করে দিতে সরকার সক্ষম হয়নি। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধন-দৌলত যারা আত্মসাৎ করেছে, জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে, নারীহরণ ও মা-বোনদের শ্লীলতাহানি করেছে, সেসব সমাজ বিরোধীদের শায়েস্তা করতেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে। অপরাধীদের অনেককে সরকারের প্রভাবশালী সদস্যরা আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করছে।

পাকবাহিনী ও রাজাকারের অত্যাচারে দেশের অভ্যন্তরে যারা গৃহহীন হয়েছেন, সম্পদ হারিয়েছেন, তাদেরও পুনর্বাসিত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের জন্য মঞ্জুরীকৃত সাহায্যদ্রব্যের সিংহভাগ সরকারের দলীয় লোকেরা আত্মসাৎ করেছে।

পাকিস্তান হতে যে সকল বাঙালি পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন, তাদেরও সরকার যথাযথ পুনর্বাসিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১০। আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে

সরকার পাকিস্তানে আটক ৪ লক্ষ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় নি। আটক বাঙালিদের দুঃস্থ পরিবারকেও সরকার কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করেনি। এই সম্পর্কে সরকার সাধারণ মানবতাবোধের পরিচয় পর্যন্ত দেয়নি।

১১। যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে

সরকার আজ পর্যন্ত যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করতে সক্ষম হয়নি। কার্যত যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতাও এই সরকারের নেই। সরকারের শত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও জনগনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের আদৌ আছে কিনা। এখন পর্যন্ত যুদ্ধ অপরাধীদের বাংলাদেশে আনা সম্ভব হয় নি।

১২। সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করার ক্ষেত্রে

আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে, দেশে ৮০ লক্ষ হিন্দু দেশ-প্রেমিক। তারা দেশদ্রোহী অথবা ভারত ও অন্য দেশের চর নয়। গত ২৪ বছর ধরে 'মুসলিম ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের' যাঁতাকলে তারা পিষ্ট হয়েছে। বাস্তবে এই দেশে তাদের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না (যেমনি নেই ভারতের মুসলমান এবং আমেরিকা, রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোদের)। পাক আমলে 'শত্রু-সম্পত্তি' ঘোষণা করে অন্যায়ভাবে বহু সংখ্যক হিন্দুর জমি দেশের বদ মাতব্বরদের দখল করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। আজো পাক আমলের সাম্প্রদায়িক আইন বাতিল করে প্রকৃত মালিকদের তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার পূর্বতন সাম্প্রদায়িক ও ঔপনিবেশবাদী সরকারকেই কার্যত অনুসরণ করছে।

১৩। সুষ্ঠু জাতীয় ভাবধারা অনুসরণের ক্ষেত্রে

বাঙালি জাতিকে শোষণমুক্ত করে সুখী-সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থা গড়ার নামে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল উগ্র, বিকৃত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে নব আকারে আর একটি সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে। তারই পরিণতিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়েছে, নিরীহ মানুষ মরেছে, নারী হরণ, সম্পত্তি দখল ও অন্যান্য ধরনের নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার শেষ ফল-স্বরূপ কয়েক লক্ষ নিরীহ অবাঙালি ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে যারা পাক সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছিল, রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তাদের প্রায়ই ভারতীয় বাহিনীর সাহায্যে ভারতে চলে যেতে সমর্থ হয়েছে, অবাঙালিদের মধ্যে যারা পাক ঔপনিবেশিক পশুদের সহযোগী ছিল, তাদের বিচার করে ফাঁসিতে ঝুলালেও সাধারণ ও নিরীহ অবাঙলিদের কোন আপত্তি থাকত না। অথচ, বাঙালিদের মধ্যে যারা প্রভাবশালী পাক সহযোগী ছিল, তাদের অধিকাংশই বহাল-তবিয়তে এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আগের চাইতে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। উগ্র ও বিকৃত জাতীয়তাবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের পরিপন্থী। সরকারি দলের লোকদের উগ্র ও বিকৃত জাতীয়তাবাদী নীতির পরিণতিতে পাকিস্তানে আটক বাঙালি ভাইবোনেরাও অকথ্য নির্যাতন ভোগ করছে। সরকারের উচিত ছিল অবাঙালিদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করা ও প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া। সরকার এইক্ষেত্রেও মানবিক ও আন্তর্জাতিক ন্যায়-নীতি লঙ্ঘন করেছে।

১৪। অবাঙালি সম্পত্তি দখল ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে

সরকার আজো পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করতে পারেনি। পরিত্যক্ত শিল্পে সরকারের দলীয় লোকেরা প্রশাসকরূপে নিয়োজিত হয়ে কোটি কোটি টাকায় উৎপাদিত পণ্য লুটপাট করে নিয়েছে এবং এখনো তারা সর্বপর্যায়ে কোটারী সৃষ্টি করে ভোগ করে চলছে। অবাঙালিদের দোকান-পাটেরও একটি বিরাট অংশ সরকার দলীয় লোকেরা ভোগ-দখল করছে। এই সকল সম্পত্তিকে প্রকৃত অর্থে জনগণের সাধারণ সম্পত্তিতে আনয়ন করা হয়নি। যে সকল সৎ অবাঙালি দেশে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করছে, তাদেরও জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাদের দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো জোর করে দখল করে এক শ্রেণীর লোক রাতারাতি বড়লোক হয়ে বসেছে। লুটপাটে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে লুণ্ঠিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

১৫। অচল নোট প্রসঙ্গে

সরকারি নির্দেশ কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রবাসী সরকার ১০০ টাকার নোটের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিল। পাক সরকার কর্তৃক বাতিল ঘোষিত এই টাকা জমা না-দেওয়ার জন্য জয়বাংলা বেতার হতে বারবার ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকারের প্রতি আস্থা স্থাপন করে অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছে। এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সরকারের রাজনৈতিক চরিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরেছে।

১৬। শিল্প উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রক্ষার ক্ষেত্রে

বাংলাদেশের চালু কল-কারখানাগুলোর উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। যুদ্ধকালীন সময়ে ভারত চট ও কাঁচা পাটের যে সকল বাজার দখল করেছে, সেগুলো আজো পুনর্দখল করা সম্ভব হয় নি। বর্তমান সরকারের আমলে হারানো বৈদেশিক বাজার কখনো পুনর্দখল হতে পারে না। পাট, চামড়া ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শিল্পের যেগুলো বন্ধ আছে অথবা আংশিকভাবে চালু আছে, প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও কেমিক্যাল আমদানি করে এগুলোকে পূর্ণ উদ্যমে চালু করার জন্য কোন উৎসাহ সরকারের কার্যকলাপের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে না, তাছাড়া সরকারের দলীয় লোকদের উদ্যোগে শিল্পের শান্তি ধারাবাহিকভাবে ব্যাহত হওয়ার কারণেও উৎপাদন অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। সরকারের এহেন কার্যকলাপ ভারতে শিল্পপতিদের স্বার্থের অনুকূলে চলে গেছে।

১৭। শিল্প কারখানা ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের লক্ষ্য অর্জ্জনের ক্ষেত্রে

পরিত্যক্ত শিল্প, দেশীয় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীসমূহ সূতাকল, পাটকল, চিনিকল আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের একাংশ যা আগে হতেই জাতীয়করণকৃত ছিল ইত্যাদি, জাতীয়করণ করছে। কিন্তু বিদেশী ব্যাংক, বীমা শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেনি। বাঙালি মালিকদের ক্ষতিপূরণ দানের নীতিও ঘোষণা করা হয়েছে। বৈদেশিক মালিকানা অব্যাহত রাখা ও দেশীয় মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিপন্থী কাজ।

জাতীয়করণকৃত শিল্পসমূহের ম্যানেজার, প্রশাসক, প্রশাসনিক অফিসার, লেবার অফিসারগণের বেশিরভাগই ক্ষমতাসীনদলের লোক অথবা ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদপুষ্ট। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে এরা কেউ বিশ্বাসী নয়। এদের লুট-পাটের ফলে শিল্পসমূহ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এতে করে দেশের শিল্প সম্প্রসারণের পথ অনেকটা রুদ্ধ হয়েছে। আমলাতন্ত্রের লুট-পাটের টাকা নতুন করে বিনিয়োজিত হয় না। আমলাতন্ত্রের অধীনে জাতীয়করণ সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ।

১৮। স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে

সরকার চলতি আর্থিক বছরের জন্যে যে বাজেট হাজির করেছেন তাতে শতকরা ৬৬ ভাগ আয় দেখানো হয়েছে আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে। এই ঋণ কার্যত সুদ ও শর্তমুক্ত নয়। এভাবে সরকার শুরুতেই দেশকে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশবাদী শক্তির উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি গ্রহণ করেছে।

১৯৬৯-৭০ আর্থিক বছরে চট বিক্রয় করে ভারত যেখানে ৭০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছিল, বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পাট শিল্প অচল হওয়ার সুযোগে বাংলাদেশ হতে চোরাকারবারের মাধ্যমে (ভারতীয় পত্রিকার ভাষায় "নানান প্রকারে") কাঁচাপাট অপহরণ করে ভারতীয় শিল্পপতিরা তাদের পাটকলগুলোর উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে সেখানে এক বছরে ২৮৯ কোটি টাকার চট রপ্তানি করে ডলার পাউণ্ড ও রুবলে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। বর্তমানে ভারতে আড়াই লক্ষ পাটকল শ্রমিক দৈনিক তিন সিফট কাজ করছে।

বাংলাদেশ হতে কাঁচা পাট ভারত এখনো পাচার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে বলে আমাদের হারানো বৈদেশিক বাজার আমাদের দখলে অন্ততপক্ষে বর্তমান সরকারের আমলে আর ফিরে আসবে না। পূর্বে বাংলাদেশের পাটের টাকায় পাকিস্তানের (পশ্চিম পাকিস্তান) শিল্প ও কৃষির উন্নতি হয়েছে। আর বর্তমানে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে চলছে। ২৪ বছর যাবৎ বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে জর্জরিত ভারতের কান্না আমরা শুনেছি। আর বর্তমানে ভারতের মুখে আমরা স্নিগ্ধ শীতল অথচ ক্রুর হাসি দেখতে পাচ্ছি। পাট রাজনীতির বাহুলতায় আমরা আটকে পড়েছি।

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন চামড়া শিল্পও আজ দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের কারসাজির ফলে বন্ধ হয়ে আছে। কাঁচা চামড়া পাটের মতই দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। পাকা-কাঁচা চামড়া রপ্তানির মাধ্যমেও আমরা প্রায় ৭০/৮০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সহজেই অর্জন করতে পারি।

আমাদের পাট ও চামড়া দেশের বাইরে পাচার বন্ধ করতে পারলে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে, তা'দ্বারা আমরা সর্বনাশা বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ না-করে স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ বাজেট তৈরি করতে পারি। এ পথেই দেশকে শিল্পায়িত করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়ে কলঙ্কজনক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

১৯। বৈদেশিক শোষণ ও জোতদারী মহাজনী শোষণ উচ্ছেদের ক্ষেত্রে

এই কথা আজ স্বতঃসিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি দেশকে শিল্পায়িত করতে হলে, স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে দুটি কর্মসূচি কার্যকরী করতেই হবে। একটি হচ্ছে বৈদেশিক শোষণ উচ্ছেদ করা এবং অপরটি হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শোষণ জোতদারী মহাজনী শোষণ উচ্ছেদ করা। এখনো আমাদের দেশের চা বাগানের ৭৩% ভাগের মালিক ব্রিটিশ কোম্পানীগুলো এবং বৈদেশিক মালিকানায় অনেক শিল্প ও সওদাগরী প্রতিষ্ঠান দেশকে শোষণ করে চলছে। এ সকল পুঁজি সরকার বাজেয়াপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তদুপরি লগ্নি পুঁজির শোষণের জন্য আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সামনে দেশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে গত ২৪ বছরের মত দেশ শিল্পে অনুন্নত থেকে যাবে। এতে বাঙালি ধনীক শ্রেণীর বিকাশের পথও বন্ধ হয়ে থাকবে।

কোন দেশকে বৈদেশিক শোষণ হতে মুক্ত করলেও সে দেশ শিল্পায়িত হয় না। কারণ শিল্পের বাজার মূলত দেশের অভ্যন্তরে। আমাদের দেশ কৃষকের দেশ।

কৃষকদের শতকরা ৭৬ জন ভূমিহীন ও গরীব। তন্মধ্যে ক্ষেত মজুর পরিবারের লোকসংখ্যা ২ কোটি ৮৫ লক্ষ, গরিব কৃষক ২ কোটি ৭৫ লক্ষ। মোট আবাদী জমির মাত্র শতকরা ১.৮৫ অংশের মালিক এরা। মোট আবাদী জমির ৩৪ ভাগ বর্গা প্রথায় চাষ হয়। শিল্পপণ্য কেনার ক্ষমতা এদের নেই। জোতদার ও মহাজনদের শোষণে কৃষক সমাজ জর্জরিত। জোতদারী-মহাজনী প্রথা উচ্ছেদ করে ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের হাতে জমির মালিকানা অর্পণ করলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থায় সচ্ছলতা আসবে। কৃষকদের অবস্থা যত বেশি সচ্ছল হবে শিল্পের জন্যে দেশের বাজারও ততবেশি সম্প্রসারিত হবে।

বৈদেশিক শোষণ ও জোতদারী মহাজনী শোষণ উচ্ছেদ করার আগে অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার আগে সমাজতন্ত্রের দিকে কখনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় না। অথচ, সরকার সমাজতন্ত্রের ফাঁকা বুলি আউড়িয়ে চলছে। বর্তমান সরকার বৈদেশিক শোষণ ও জোতদারী মহাজনী শোষণ উচ্ছেদ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

শোনা যাচ্ছে, এই সরকার পাকিস্তান ঔপনিবেশিক সরকারের ৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণের ভার বাংলার বুভূক্ষু মানুষের কাঁধে চেপে দেওয়ার জন্য রাজি হওয়ার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

২০। জাতীয় সেনাবাহিনী সংগঠিত করার ক্ষেত্রে

দেশের পাঁচ লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধার অধিকাংশই বর্তমানে বেকার জীবন কাটাচ্ছেন। ভূয়া মুক্তিবাহিনীর সার্টিফিকেটধারীরা সরকারের প্রভাবশালী লোকদের সহায়তায় চাকুরীতে নতুন নিয়োগের কোটা পূরণ করে চলছে। মুক্তিবাহিনীর বীরযোদ্ধাদের নিয়ে সরকার 'মিলিশিয়া' বাহিনী গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছিল। রহস্যজনক কারণে সরকার 'মিলিশিয়া' বাহিনী ভেঙ্গে দিয়েছে। বর্তমানে 'রক্ষী বাহিনী' নামে যে বাহিনী গড়া হচ্ছে, সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্থান নেই। ফলে পাঁচ লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ রাইফেল,

বেঙ্গল রেজিমেন্ট, আনসার, পুলিশ বাহিনী হতাশ ও বিক্ষুব্ধ এবং সরকারের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। দেশরক্ষায় ভারতের উপর নির্ভরশীল থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়।

২১। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে

বাংলাদেশের মূল সমস্যার অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বন্যা সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান ছাড়া বাঙালি জাতি কোনদিন শক্তিশালী জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। অথচ, এই বিষয়ে আজ পর্যন্ত সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি।

২২। স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে

ক্ষমতাসীন দলের বহু বিঘোষিত স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। 'শান্তি চুক্তির' নামে সরকার ভারতের সাথে গাটছড়া বন্ধনে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অনুরূপ চুক্তি ভারত ও রাশিয়ার মধ্যেও স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক রাশিয়া কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ভারত নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে দর্শক হয়ে থাকতে পারে না এবং বাংলাদেশও নিরপেক্ষ ভূমিকায় দর্শক হয়ে থাকতে পারবে না। কাজেই এই চুক্তির পর বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি বলা যায় না। তদুপরি এই চুক্তি দেশের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করেছে। যেমন, চুক্তির দশম ধারায় আছে "এই চুক্তির সাথে অসামঞ্জস্য হতে পারে এই ধরনের গোপনে অথবা প্রকাশ্যে এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন প্রকার অঙ্গীকার করবে না।" জনগণের চোখের সামনে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের এজেন্টরা কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে চলছে। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমেও বারবার তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে স্বকপোলকল্পিত কাহিনী প্রচার করে চলছে। এতে করে দেশের মর্যাদার যথেষ্ট হানি হয়েছে।

২৩। বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে

সরকার দেশের বিরাট বেকার বাহিনীকে কাজে লাগাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এবিষয়ে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত বেকার ও অর্ধ বেকার জাতীয় জীবনের অভিশাপরূপে বিরাজ করছে। কৃষি, শিল্প, দেশরক্ষা, শিক্ষা কিংবা জনস্বাস্থ্য কোন ক্ষেত্রেই বেকারদের কাজ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। দেশের শ্রম-সম্পদ ও কাঁচামালের সদ্ব্যবহার করার কোন পরিকল্পনার কথা এই সরকার চিন্তাও করছে না।

২৪। দেশের সংখ্যালঘু উপজাতীয় জনগণের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে

সরকার দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ উপজাতীয় জনগণের জীবন-জীবিকার অধিকার ও মৌলিক মানবিক অধিকার রক্ষা করে জাতির ও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সাথে তাদের একাত্মতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২৫। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে

দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কোন আইনগত অধিকার বর্তমান সরকারের না থাকলে ও তারা দীর্ঘদিন যাবৎ এখন তখন করে একটা শাসনতন্ত্রের খসড়া পর্যন্ত ঘোষণা করতে পারেনি। শাসনতন্ত্রের খসড়ার উপর সংশোধনী আসছে নয়াদিল্লী ও পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো হতে। এতেই বুঝা যায় দেশে কোন ধরনের সমাজতন্ত্র কায়েম হতে চলেছে?

পাক ঔপনিবেশিক পশুশক্তির কবল হতে দেশমুক্ত হওয়ার পর আমাদের পার্টি সরকারকে তার প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার সুযোগদানের জন্য এবং জনগণকে সরকারের চরিত্র সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকারকে শর্তাধীন সমর্থন ঘোষণা করেছিল।

এই সরকার সামগ্রিক দিক দিয়ে তাদের অযোগ্যতা, ব্যর্থতা ও দেউলিয়াত্বের প্রমাণ দিয়েছে। বর্তমানে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এই সরকারের উচিত নিজ উদ্যোগে পদত্যাগ করা। এই বিষয়ে পাকিস্তানের অতীত সরকারগুলো হতে সরকারের শিক্ষা নেওয়া উচিত। জোর করে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার পরিণাম শুভ হয় না। শোষিত-মেহনতী জনতাই দেশের মূল পরিচালিকা শক্তি। শেষপর্যন্ত জনতাই জয়ী হয়। বর্তমান সরকারের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কোন অধিকারই নেই।

* অবিলম্বে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।
* পদত্যাগের পূর্বে জাতীয় মহাসম্মেলন ডাকতে হবে।

জাতীয় মহাসম্মেলন পরবর্তী যাবতীয় করণীয় নির্ধারণ করবে।

জাতীয় মহাসম্মেলন গত মুক্তিযুদ্ধে যেই সকল রাজনৈতিক দল, শ্রেণী ও গণ–সংগঠন এবং সেনাবাহিনী, পুলিশ, মুক্তিযোদ্ধা যোগদান ও সমর্থন করেছিল তাদের সমবায়ে অনুষ্ঠিত হবে।”

পূর্ব বাংলার বীর জনগণ, আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি, পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান সংগ্রাম চালিয়ে যান!*

১. পূর্ব বাঙলার জনগণ বৃটিশ উপনিবেশিক দস্যু ও তাদের উপর নির্ভরশীল হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-জোতদার পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং এ শোষণ নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির জন্য পাকিস্তানে যোগদান করে।

সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার, জোতদার, পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্র ছিল কলিকাতা, পূর্ব বাংলা ছিল তার পশ্চাদভূমি। এ পশ্চাদভূমি হারিয়ে তাদের বিকাশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। তারা কখনও এ বিচ্ছিন্নতাকে মেনে নিতে পারেনি।

পাকিস্তানের সামরিক ফ্যাসিস্টরা পূর্ব বাংলার জন-গণের জাতীয় বিকাশ অবাধে চলতে দেওয়ার পরিবর্তে পূর্ববাংলাকে শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করে, একে তার উপনিবেশে পরিণত করে।

পূর্ববাংলার জনগণ এ উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির জন্য মহান সংগ্রাম পরিচালনা করে, লক্ষ লক্ষ জনগণ এ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

পূর্ববাংলার জনগণের এ মহান সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণী মণি সিং-মোজাফফর সংশোধনবাদী, পূর্ব বাংলার লিউশাওচী-ক্রুশ্চেভ হক-তোয়াহা, পূর্ববাংলার নাম্বুদ্রিপাদ-জ্যোতিবসু, দেবেন-বাসার, কাজী-রণ, পূর্ব বাংলার ট্রটস্কি-চে মতীন-আলাউদ্দীন প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। এরা সকলেই পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণী জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে!

ফলে পূর্ববাংলার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া সামন্তবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন আওয়ামী লীগ পূর্ববাংলার জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে; তারা এ সংগ্রামকে বিপথে পরিচালনা করে। প্রথমে তারা পার্লামেন্টারী নির্বাচনের কানাগলিপথে জনগণকে পরিচালনা করে, এ পথের দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হলে তারা জনগণকে অহিংস অসহযোগের ভুল পথে পরিচালনা করে, পাক সামরিক ফ্যাসিস্টরা জনগণের উপর ঝাপিয়ে পড়লে এ পথেরও দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হলে, জনগণ সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। তারা বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় কিন্তু তাও-ব্যর্থ হয়। শেষপর্যন্ত পূর্ব বাংলার জনগণকে অসহায় ভাবে রেখে তারা ভারতে পলায়ন করে।

---

* পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। (পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ১৯৭১ সালের ৩রা জুন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) মার্চ ১৯৭২

মীরজাফর ক্ষমতার লোভে বৃটিশ দস্যুদের নিয়ে আসে, তাদের হাতে শেষপর্যন্ত তুলে দেয় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা। এই ইতিহাস পরিবর্তিত অবস্থায় পুনরাবৃত্তি লাভ করে ১৯৭১ সালে। পূর্ববাংলার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও সামন্তবাদীরা নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে পূর্ববাংলা মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতার লোভে সাড়ে সাত কোটি জনগণের জাতীয় স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে; বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিকট বিক্রি করে দেয়, পাক সামরিক ফ্যাসিষ্টদের উৎখাতের জন্য তাদেরকে ডেকে আনে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা ও সমর্থনে এ সুযোগ গ্রহণ করে। তারা তাদের হারানো পশ্চাৎভূমি লাভের জন্যে তৎপর হয়ে উঠে। তারা পূর্ব বাংলা দখল করার জন্য বাংলাদেশে পুতুল সরকার গঠন করে একে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করায়, কামানের খোরাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য তার সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে তাবেদার মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে, তাদেরকে পূর্ববাংলায় নাশকতামূলক তৎপরতা চালাবার জন্য প্রেরণ করে। শেষপর্যন্ত তারা পাকিস্তান আক্রমণ করে এবং সশস্ত্র আগ্রাসী বাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলা দখল করে নেয়।

এভাবে পূর্ববাংলা ভারতের উপনিবেশে রূপান্তরিত হয় এবং পূর্ববাংলার জনগণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক জনগণের রক্তপাত বৃথা যায়।

আওয়ামী লীগ, তার নেতৃত্বাধীন মুক্তি বাহিনী ও অন্যান্য সংগঠন, মোজাফফর ন্যাপ, মনিসিং-মোজাফফর কমিউনিস্ট নামধারী সংশোধনবাদী বুর্জোয়া উপদল, এর নেতৃত্বাধীন সংগঠন সমূহের মধ্যকার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও সামন্তবাদিরা সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ এবং পূর্ববাংলার আমলাতান্ত্রিক পুজিবাদ সামন্তবাদ এই ছয় পাহাড়ের স্বার্থ রক্ষা করছে। এরা এই ছয় পাহাড়ের দালাল। বাংলাদেশ পুতুল সরকার এই ছয় পাহাড়ের স্বার্থ রক্ষা করছে। ভাসানি ন্যাপ, দেবেন-বাসার, কাজী-রণ জোতিবসু-নাম্বুদ্রিপাদ উপদল ছয় পাহাড়ের দালালদের তাবেদারে পরিণত হয়েছে, এবং ছয় পাহাড়ের দালালী করছে।

২. পূর্ববাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের একটি উদ্দেশ্য হলো পূর্ববাংলার পাট, চা, চামড়া ও অন্যান্য কাঁচামাল, মাছ, মাংস, ডিম, চাল, তরিতরকারী ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, সাতকোটি লোকের বাজার, সস্তা শ্রমশক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প,পূর্ব বাংলার গ্যাস, বিদ্যুত, প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমি (বিতাড়িত হিন্দুধর্মাবলম্বী সামন্তবাদীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে,) শিক্ষা সংস্কৃতি, প্রশাসনব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সকল ক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও তা লুণ্ঠন করা, ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট হ্রাস করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পূর্ববাংলায় উপনিবেশ স্থাপনের অপর এক উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম, নাগা-মিজো কাশ্মিরীদের মুক্তি-সংগ্রাম ধ্বংস করা, ভারত মহাসাগরে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভুত্ব করা।

সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে সহায়তা ও সমর্থন করেছে ভারতের উপর তার আধিপত্য জোরদার করা, পূর্ববাংলা লুণ্ঠনের বখরা নেওয়া, ভারত মহাসাগরে কর্তৃত্ব করা, এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করার জন্য।

৩. ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা নির্মম শোষণ ও লুণ্ঠন শুরু করে দিয়েছে।.এ শোষণ ও লুণ্ঠন আরো জোরদার করার জন্য তারা সীমান্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করছে।

পূর্ববাংলার মাছ-মাংস-ডিম-তরিতরকারী-ধান-চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রত্যহ ট্রাক, ট্রেন, জাহাজে ভারতে যাচ্ছে। বাজার করার জন্য কলিকাতা থেকে ভারতীয় নাগরিকেরা পূর্ব বাংলার সীমান্ত শহরগুলোতে আসছে। এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলার খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ব বাংলা দখলের সময় শতসহস্র মণ পাট, চা, চামড়া ও অন্যান্য শিল্পীয় কাঁচামাল লুট করে। ভারত কর্তৃক কাঁচামাল বিশেষ করে পাট ক্রয়ের উপর থেকে বাংলাদেশ পুতুল সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। এর ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অবাধে পূর্ববাংলার শিল্পীয় কাঁচামাল, পাট ক্রয় করা এবং বিদেশে রপ্তানির সুযোগ পাচ্ছে। এভাবে পূর্ববাংলার কাঁচামাল বিশেষ করে পাটের উপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ ও লুণ্ঠন প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের সাথে পূর্ববাংলার পাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়েছে। পূর্ববাংলার জনগণ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ববাংলার বহু গোটা শিল্প প্রতিষ্ঠান, যন্ত্রপাতি, খুচরা অংশ ভারতে পাচার করছে। পূর্ববাংলার অসংখ্য গাড়িঁ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পূর্ববাংলার বাজারের বৈদেশিক দ্রব্যাদিও তারা পাচার করেছে। এর ফলে বহু শিল্প-কারখানা চালু করা বা পুরোউৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

তারা পূর্ববাংলার বিদ্যুৎ-গ্যাস ভারতীয় শিল্পে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাচ্ছে।

এ সকলের উদ্দেশ্য হলো পূর্ববাংলার শিল্প-কারখানা ধ্বংস করা, এর বিকাশ ব্যাহত করা এবং ভারতীয় শিল্পের সাথে পূর্ব বাংলার শিল্প যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না-পারে তা নিশ্চিত করা।

তাদের অপর এক উদ্দেশ্য হলো পূর্ববাংলার শিল্পকে ভারতের উপর নির্ভরশীল করে তোলা। এ উদ্দেশ্যে তারা ভারত থেকে বিদ্যুত, তৈল, কাঁচামাল ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল করে পূর্ববাংলার সীমান্ত এলাকায় শিল্পসমূহ চালু করার চেষ্টা করছে।

ভারতীয় পণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে। এ সকল পণ্যদ্রব্য নিম্নমানের কিন্তু উচ্চ মূল্যের। পূর্ববাংলার জনগণ বাধ্য হচ্ছে এগুলো কেনার জন্য। এভাবে পূর্ববাংলার সাড়ে সাতকোটি জনগণের বাজার দখল করেছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা এবং কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটছে।

ভারত থেকে পণ্যদ্রব্য আমদানী, তা বাজারে বিক্রয় করা এবং পূর্ববাংলার অভ্যন্তর থেকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও ভারতে রপ্তানীর বিরাট প্রক্রিয়ার ফলে পূর্ববাংলার গোটা ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা আত্মসমর্পণকারী পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের শত শত

কোটি টাকার অস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ভারতে নিয়ে যায়। এভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের ন্যায্য পাওনা অস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য থেকে বঞ্চিত হয়।

পূর্ববাংলারা পুনর্গঠনের বিরাটাকার কাজগুলো টাটা কোম্পানি লাভ করছে। ফলে পূর্ববাংলার প্রতিষ্ঠানসমূহ বঞ্চিত হচ্ছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা, পাঠ্যপুস্তক পূর্ববাংলার বাজার দখল করছে এবং এ সকল ক্ষেত্রে নিয়োজিত পূর্ববাংলার প্রতিষ্ঠানসমূহ মারাত্মক সঙ্কটে পড়েছে।

তারা বৃটিশ উপনিবেশবাদ সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের উপর নির্ভরশীল প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী সংস্কৃতি-সাহিত্য দ্বারা পূর্ববাংলার বাজার দখলের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তাদের শোষণ ও লুণ্ঠন মেনে নেওয়ার পক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়, পূর্ববাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং তাদের আর্থিক লাভ হয়।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা বাংলাদেশের পুতুল সরকার দ্বারা মুদ্রামান হ্রাস করে এবং ভারতীয় মুদ্রা অবাধে চালু করে পূর্ববাংলার মুদ্রাকে ভারতীয় মুদ্রার উপর নির্ভরশীল করে ফেলেছে এবং বিরাটাকার মুনাফা লুটছে।

যৌথভাবে কাজ করা, পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা, সাহায্যদাতা প্রভৃতির ছদ্মবেশে তারা উদ্বৃত্ত কর্মচারি ও বেকার যুবকদের পূর্ববাংলার সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে নিয়োগ করে তা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সংশ্লিষ্ট ভারতীয় বিভাগের অধীনস্থ সংস্থায় রূপান্তরিত করছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা শরণার্থীর বেশে ভারতীয় নাগরিক, যুবকংগ্রেসের সশস্ত্র গুণ্ডা, গোয়েন্দাদের বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে। তারা ছাত্রলীগ, মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী, ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পুলিশদের মধ্যে তার এজেন্ট অনুপ্রবেশ করিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করছে।

ভারতে যায়নি এ অজুহাতে দেশপ্রেমিক মুসলীম কর্মচারীদের তারা পুতুল সরকারের মাধ্যমে ছাটাই করাচ্ছে। মুসলীম ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং বিভিন্ন পেশার লোকদের হয়রানী করছে, তাদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। পক্ষান্তরে তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী জমিদার-জোতদার,পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এবং টাউটরা মুসলীম জনগণের উপর মাতব্বরী শুরু করছে। সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে। তারা জোর করে তাদের বিক্রয় করা ধন-সম্পত্তি দখল করছে।

এভাবে মুসলীম জনগণের উপর ধর্মীয় নিপীড়ন শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী জোতদার-জমিদার পুঁজিপতি ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এবং টাউটদের উপর নির্ভর করে সাধারণ জনগণকে প্রতারিত করে পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলীম জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করে তাদেরকে শাসন ও শোষণ করার চক্রান্ত করছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা প্রচার করছে তাদের আগ্রাসী বাহিনী যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা সম্পন্ন হওয়ায় তারা ভারতে ফিরে যাবে। তারা যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা হলো পূর্ববাংলায় তার উপনিবেশ স্থাপন করা, তার তাবেদার ছয় পাহাড়ের দালালদের ক্ষমতায় বসানো। তার তাবেদার বাহিনী ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, মিলিশিয়া, পুলিশ তার স্বার্থরক্ষার মত যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় বিপুল পরিমাণে ভারতীয় সৈন্য রাখা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তারা বাঙালিদের দ্বারা বাঙালি দমন করে শোষণ ও লুণ্ঠন চালাতে চায়।

তারা শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা, গোয়েন্দা এবং তাবেদারদের মাধ্যমে পূর্ববাংলার উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চায়। উপরন্তু পূর্ববাংলার প্রতিরক্ষা ভারতের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পূর্ববাংলার প্রতিরক্ষা ভারতের নিয়ন্ত্রণে এ সত্য বাংলাদেশ পুতুল সরকার বহু বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে।

এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা পূর্ববাংলার সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, লুণ্ঠন, শোষণ ও নির্যাতন প্রতিষ্ঠা করেছে, পূর্ববাংলাকে তার উপনিবেশে পরিণত করেছে এবং পূর্ববাংলাকে তাদের পশ্চাদভূমিতে রূপান্তরিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার তার পুতুল সরকার ব্যতিত আর কিছুই নয়। ছয় পাহাড়ের দালালেরা প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তির মাধ্যমে এ শোষণ ও লুণ্ঠন-নিয়ন্ত্রণ, নির্যাতনের সুযোগ করে দিয়েছে, পূর্ববাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছে।

অতীতে জাপানী ফ্যাসিস্টরা এশিয়ায় সহউন্নত অঞ্চল গড়ে তোলার স্লোগানকে উপনিবেশ স্থাপনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। বর্তমানে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরাও তাদের অনুসরণে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার স্লোগানকে তার উপনিবেশ স্থাপনের অংশ হিসেবে ব্যবহার করছে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশে লুটের ভাগ বসাচ্ছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা। তারা ঋণ প্রদান, অসম বাণিজ্যচুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের লুণ্ঠন চালাচ্ছে।

এভাবে পূর্ববাংলার জাতীয় বিপ্লব অর্থাৎ পূর্ববাংলা থেকে বৈদেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের অবসান ও স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠা অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

সামন্ত জমিদার জোতদারদের উৎখাত করে কৃষকের মাঝে ভূমি বিতরণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান দায়িত্বও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ছয় পাহাড়ের দালালরা প্রতিক্রিয়াশীল গ্রাম্য সামন্ত জমিদার-জোত-দার-মহাজন, টাউট ও অত্যাচারীদের শাসন কায়েম করেছে। এদেরকে পাহারা দেওয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে ডাকাত দল গ্রামরক্ষা বাহিনী।

৪. পূর্ববাংলার ঘটনাবলি প্রমাণ করছে পূর্ববাংলার বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী বা সামন্তবাদী কোন শ্রেণীর পক্ষেই পূর্ববাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এরা নিজেদের ও জাতীয় স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, বিদেশের কাছে দেশ ও জাতিকে বিক্রি করে দেয় এবং দেশের মধ্যকার সামন্তবাদের সাথে আপোস করে।

কাজেই অনিবার্য ভাবেই পূর্ববাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান দায়িত্ব এসে পড়েছে পূর্ববাংলার সর্বহারা শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টির উপর।

পূর্ববাংলার কিছু সংখ্যক মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত পূর্ববাংলার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ী-শিল্পপতি-চাকুরিজীবী অর্থাৎ পূর্ববাংলার সমগ্র বাঙালি জাতি অচিরেই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ লুণ্ঠন ও তাদের তাবেদারদের শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বিরাটাকার সংগ্রাম পরিচালনা করবে। পূর্ববাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব হলো এ সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করা ও তাকে সঠিক পথে পরিচালনা ও সম্পন্ন করা।

পূর্ববাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের দখল কায়েম হওয়ার ফলে পাকিস্তানের সামরিক ফ্যাসিস্টদের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। পূর্ববাংলার সমাজের বিকাশের জন্য বর্তমানে নিম্নলিখিত মৌলিক দ্বন্দ্বসমূহ দায়ী :

১. ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

২. সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

৩. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

৪. পূর্ববাংলার সামন্তবাদের সাথে কৃষক-জনতার দ্বন্দ্ব।

৫. পূর্ববাংলার বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা তার সেনাবাহিনীর সাহায্যে আগ্রাসী যুদ্ধ চালিয়ে পূর্ববাংলায় তার উপনিবেশ কায়েম করেছে, এ কারণে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব উপরোক্ত দ্বন্দ্ব সমূহের মাঝে প্রধান দ্বন্দ্ব।

এ দ্বন্দ্ব সমাধানের উপায় হচ্ছে সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লব পরিচালনার মাধ্যমে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার পদলেহী কুকুর ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রুদের খতম ও উৎখাত করা, বাংলাদেশ পুতুল সরকারকে উৎখাত করা, পূর্ববাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করা।

এ বিপ্লবের অপর এক লক্ষ্য হবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের উৎখাতের সাথে সাথে পূর্ববাংলা থেকে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা, এদের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বের সমাধান করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক সামন্ত জমিদার-জোতদারদের জাতীয় শত্রু হিসেবে খতম ও উৎখাত করা, তাদের ভূ-সম্পত্তি ভূমিহীন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা, জাতীয় বিপ্লব সমর্থক সামন্তবাদীদের সামন্তশোষণ কমানো, শেষপর্যন্ত সামন্তবাদ উৎখাত করা। এভাবে পর্যায়ক্রমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করা।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের জাতীয় শত্রু হিসেবে খতম ও উৎখাত করা।

পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের দালাল জাতীয় শত্রুদের ভূমি কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা, তাদের অন্যান্য সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা, তাদের মধ্যকার ঘৃণ্যদের খতম করা।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় এ-বিপ্লব সমর্থক বুর্জোয়াদের রক্ষা করা, শ্রমিকদের আট ঘন্টা শ্রম সময় নির্ধারণ এবং তাদেরকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

পূর্ববাংলার এই অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌলিক পরিচালক শক্তি হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক-ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণী। সর্বহারা শ্রেণী হচ্ছে এ বিপ্লবের নেতা।

ইহা পরিচালনা ও সম্পন্ন করা সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী নির্মম গণযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। এই জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সূচনা করতে হবে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে, শ্রমিক-কৃষক-বিপ্লবীদের সমন্বয়ে শূন্য থেকে গেরিলা গ্রুপ গঠন করতে হবে, হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া যায় তাই দিয়ে ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রুদের খতম করতে হবে, শত্রুর অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে, গেরিলা যুদ্ধকে পূর্ববাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, গ্রাম্য এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন, নিয়মিত বাহিনী, স্থানীয় গেরিলা গ্রামরক্ষীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং শেষপর্যন্ত উন্নত পর্যায়ের সচল যুদ্ধ, বড় রকমের ঘেরাও, অবস্থান যুদ্ধ পরিচালনা করে শহরসমূহ দখল করতে হবে এবং সমগ্র পূর্ববাংলাকে মুক্ত করতে হবে।

সর্বহারা শ্রেণী কৃষক-শ্রমিক মৈত্রির ভিত্তিতে জাতীয় বুর্জোয়া এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, ধর্মীয়, ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করবে। একই সময়ে বুর্জোয়া সামন্তবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের আপোসমুখিতা, দোদুল্যমানতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার মনোভাব ও কার্যকলাপকে সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে।

এ বিপ্লব পরিচালনা করে সমগ্র পূর্ববাংলা মুক্ত করে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ববাংলা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রির ভিত্তিতে সকল দেশপ্রেমিক শ্রেণীর যৌথ একনায়কত্ব-মূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

এই বিপ্লব পরিচালনার প্রক্রিয়ায় মুক্ত এলাকায় স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ববাংলার প্রজাতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে হবে।

পূর্ববাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করে পূর্ববাংলার জনগণের অধিকাংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং ন্যায়সংগতভাবে পাকিস্তানের সাথে পূর্ববাংলার সম্পর্কের সমস্যার [পাকিস্তানের সাথে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, পশ্চিম পাকিস্তানস্থ বাঙালিদের ফিরিয়ে আনা, পূর্ব-বাংলার গণহত্যা ও ফ্যাসিষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের অপরাধে অপরাধী পাকিস্তানের শসকগোষ্ঠী ও সামরিক বেসামরিক ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তি প্রদান করা, পূর্ববাংলা থেকে গত ২৪ বৎসরে পশ্চিম পাকিস্তানে যে পুজি ও মূল্যবান সম্পদ পাচার হয়েছে তা সুদ সহ ফেরত আনা, পূর্ববাংলা থেকে পাচার করা ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি ফেরত আনা, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সমস্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন চালিয়েছে তার যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায় করা ইত্যাদি সমস্যার] সমাধান করা।

এ ভাবে জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লর পরিচালনা ও সম্পন্ন করে পূর্ববাংলার বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা ও পরিচালনা করা।

৫. পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই পাক সামরিক ফ্যাসিষ্টদের উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করে। পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ও গেরিলারা পাকিস্তান কাউন্সিল, মার্কিন তথ্যকেন্দ্র, বি, এন, আর এ বোমা বর্ষণ করে, চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে সর্বপ্রথম জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ সূচনা করে।

পঁচিশে মার্চের ও তার পরবর্তী সময়কার পাক সামরিক ফ্যাসিষ্টদের চরমতম ফ্যাসিষ্ট নির্যাতনের মুখেও পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন ভারতে পলায়ন না-করে জনগণের শক্তির উপর নির্ভর করে জনগণকে পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সঠিক পথে মুক্তিযুদ্ধে পরিচালনা করে। পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা জাতীয় শত্রু ও পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া অস্ত্রদ্বারা গেরিলা যুদ্ধ চালায়। অচিরেই বরিশাল, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, ঢাকা, পাবনা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলায় আটটির বেশি গেরিলাফ্রন্ট, মুক্তঅঞ্চল ও নিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠে, গেরিলাযুদ্ধ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে।

এ ভাবে আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ সঠিক পথে পরিচালনা করে সমগ্র বাঙালি জাতির সামনে সঠিক পথের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

পাক-সামরিক ফ্যাসিস্টদের কামানের গোলার শব্দের মাঝে গড়ে উঠে ৩রা জুন, ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলার জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য পূর্ববাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি "পূর্ব-বাংলার সর্বহারা পার্টি"।

ছয় পাহাড়ের দালালরা পূর্ববাংলায় ছয় পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন কায়েম এবং অব্যাহত ভাবে তা পরিচালনার পথে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে একমাত্র বাধা বলে গণ্য করে। তারা আমাদের আক্রমণ করে, আলোচনার ভাওতা দিয়ে আমাদের বহু গেরিলা, কর্মী, সহানুভূতিশীল জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা করে, তাদের রক্তে হাত কলঙ্কিত করে, আমাদের মুক্ত অঞ্চলসমূহ তারা দখল করে নেয়। এভাবে তারা সঠিক পথে পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামকে অস্থায়ীভাবে ব্যাহত করে।

পূর্ববাংলার প্রতিবিপ্লবী ক্ষমতা দখলের পর তারা তাদের নির্যাতন ও লুণ্ঠন জোরদার করেছে। তারা যত্রতত্র লুটতরাজ, হত্যা, ডাকাতি, অপহরণ, ধর্ষণ, অর্থসংগ্রহ, অগ্নিসংযোগ করছে–পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের মত তারাও 'বধ্যভূমি' তৈরি করেছে। সম্প্রতি তারা মুন্সিগঞ্জে রেকাবী বাজারে বারশত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়, জনগণকে হত্যা করে ধন-সম্পত্তি লুট করে। তারা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের নির্যাতন ও নিয়ন্ত্রণ করছে। এভাবে তারা মগের মুল্লুক কায়েম করেছে।

তারা অপরাধী-নিরপরাধী নির্বিশেষে উর্দুভাষাভাষি শিশু যুবক বৃদ্ধ-নারীদের হিটলারের ইহুদি নিধনের অনুরূপভাবে নির্মূল করছে।

তাদের প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে পূর্ববাংলার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্য হয়েছে, শত সহস্র লোক বেকার হয়ে পড়েছে। জনগণ অনাহারে অর্ধাহারে জীবনধারণ করছে।

অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করছে ছয় পাহাড়ের দালালরা যে গণতন্ত্র চায় তা হচ্ছে ছয় পাহাড়ের দালালদের ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব, তারা যে সমাজতন্ত্র চায় তা হচ্ছে ছয় পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন, তারা যে ধর্মনিরপেক্ষতা চায় তা হচ্ছে মুসলিম জনগণের উপর ধর্মীয় নিপীড়ন, পূর্ববাংলায় ভারতের উপনিবেশ বজায় রাখার পথে মুসলিম ধর্মের প্রতিবন্ধকতাকে দাবিয়ে রাখা, তারা যে জাতীয়তাবাদের কথা বলছে তা হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও জাতীয় পরাধীনতা এবং পূর্ববাংলার উপজাতি ও উর্দু ভাষাভাষিদের নির্মূল করা।

মুজিববাদ হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদ।

পূর্ববাংলার জনগণের মাঝে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। জনগণ উপলব্ধি করছেন পাক-সামরিক ফ্যাসিস্ট ও ছয় পাহাড়ের দালালদের মাঝে কোন তফাৎ নেই, তারা সাপের মুখ থেকে বাঘের মুখে পড়েছেন।

গত নয় মাসের বিপ্লবী ঝড়-তরঙ্গে পূর্ববাংলার জনগণের চেতনা খুবই উচ্চস্তরে পৌঁছেছে। তাঁরা উন্নত রাজনৈতিক মান অর্জন করেছেন, মৃত্যুকে তারা ভয় করেন না।

তারা ছয় পাহাড়ের দালাল ও তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন।

পূর্ববাংলার শ্রমিকরা ধর্মঘট, মিছিল, ঘেরাও সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন।

ছোট চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীরাও সংগ্রাম শুরু করেছেন!

কৃষকরা ছয় পাহাড়ের দালাল জোতদার-জমিদার-টাউটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করছেন।

এভাবে ছয় পাহাড়ের দালালরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তাদের মুখোস উন্মোচিত হচ্ছে, জনগণ তাদের ভাওতা ও মীরজাফরী বুঝতে পারছেন।

ছয় পাহাড়ের দালাল, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের প্রচণ্ড গণসংগ্রাম শুরু হয়েছে।

ছয় পাহাড়ের দালালদের নিজেদের মধ্যকার কামড়া-কামড়ি, প্রকট আকার ধারণ করেছে। এমনকি নিজেদের মাঝে সশস্ত্র সংঘর্ষ, হত্যা, অপহরণ চলছে।

তারা সংকট এড়ানোর উদ্দেশ্যে ভিক্ষার ঝুলি হাতে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে।

কিন্তু কোন কিছুই তাদের পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। জনগণ পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের মত এদেরকে ও তাদের প্রভুদের চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবে।

৬. তারা জনগণের উপর নির্যাতন জোরদার করার সাথে সাথে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ও সাম্রাজ্যবাদের 'নকশাল' দমন অভিযান, চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করার প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপে অংশগ্রহণ জোরদার করবে।

কাজেই পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের গোপনভাবে কার্য পরিচালনা করতে হবে, পার্টিপরিচিতি গোপন রেখে প্রকাশ্য কাজের সুযোগকে সশস্ত্র সংগ্রামে সহায়তার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে।

পূর্ববাংলার বিপ্লবীদের অবশ্যই ভারতের সর্বহারা বিপ্লবীদের সাথে ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতা স্থাপন ও দৃঢ়করণ, ভারতের সর্বহারা বিপ্লবীদের নেতৃত্বে জনগণের মহান সংগ্রাম, নাগা, মিজো, কাশ্মিরীদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাথে একাত্ম হতে হবে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উৎখাত করতে হবে।

ছয় পাহাড়ের দালাল ফ্যাসিস্টদের হাতে শহীদ কমরেড চুন্নু, যিনি মৃত্যু পর্যন্ত ধ্বনী দিয়েছেন স্বাধীন পূর্ববাংলা জিন্দাবাদ, পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি জিন্দাবাদ, কমরেড সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ, কমরেড হিরু, নজরুল, আনিস, শশাঙ্ক, জিল্লু, তাহের, পলাশ, সাঈদ, রইস এবং অন্যান্যদের, গেরিলা মান্নান, মজিদ ও অন্যান্যদের, পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত কমরেড পিন্টু ও অন্যান্যদের, দুর্ঘটনায় নিহত কমরেড শাহিন ও অন্যান্যদের, নিঁখোজ কমরেড ও গেরিলা এবং পূর্ববাংলার মুক্তি সংগ্রামে শহীদ লক্ষ জনতার কথা স্মরণ রেখে আসুন আমরা এগিয়ে যাই, পূর্ববাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পাটি পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি গড়ে তুলি, ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ সালে পেয়ারা বাগানে, পূর্ববাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে যে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠে তার পথ অনুসরণ করে পার্টির অধীন প্রধান ধরনের সংগঠন হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলি, কৃষক-শ্রমিক মৈত্রির ভিত্তিতে সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুলি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট, ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যাই, শহীদ কমরেড, গেরিলা ও বন্ধুদের রক্তের বদলা রক্ত নেই, সশস্ত্র সংগ্রামে লেগে থাকি। এর মাধ্যমে পার্টি, সশস্ত্রবাহিনী ও ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তুলি, বন্দুকের নলের মাধ্যমে গড়ে তুলি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র; সম্পন্ন করি পূর্ববাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি-জিন্দাবাদ
কমরেড সিরাজ সিকদার-জিন্দাবাদ

মিথ্যার মুখোশ উন্মোচিত করুন
জাতীয় মুক্তির পতাকাকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরুন *

দেশপ্রেমিক ভাই ও বোনেরা,

পূর্ব বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে আমরা আজ দাঁড়িয়ে আছি। অন্যায়, অত্যাচার আর অবিচারের করাল গ্রাসে পূর্ব বাংলার জনগণ ধুঁকে ধুঁকে মরছেন। সমগ্র দেশ জুড়ে আজ চলেছে নৈরাজ্য, বুভুক্ষা, হাহাকার আর অনাহারের রাজত্ব। পূর্ব বাংলার জনগণের এই দুঃখ-কষ্ট আর বিপর্যস্ত অবস্থা চঞ্চল করে তুলেছে প্রতিটি মুক্তিপাগল মানুষকে, প্রতিটি মানুষের চিন্তা-চেতনাকে। প্রশ্ন জাগছে কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত মেহনতী মানুষের মনে, প্রশ্ন জাগছে সমাজের শিক্ষিত সচেতন যুব সমাজের মনে—কেন আজ এই অবস্থা? এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথই বা কি?

এ কথা সবাই জানেন যে, ১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানকে আক্রমণ করে পাকিস্তানের পূর্ব অংশ পূর্ব বাংলাকে দখল করে নিয়েছে। এই দখলীকৃত পূর্বাঞ্চলে তারা কায়েম করছে "বাংলাদেশ" নামের এক সামাজিক উপনিবেশ আর বাংলার ইতিহাসের জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতক মুজিবকে দিয়ে এক পুতুল সরকার তারা খাড়া করেছে। এটা তারা করেছে তাদের চীন বিরোধী এবং আমাদের দেশের বিপ্লব ও বিশ্ববিপ্লব বিরোধী প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে কার্যকরী করার জন্যেই। সোভিয়েত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চায় চীনকে ঘেরাও করতে ও ধ্বংস করতে। ভারত এবং পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করে চীন-বিরোধী যুদ্ধচক্রান্তে সামিল করানো ছিলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা। সারা পঞ্চাশের দশক জুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নির্লজ্জ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করেই দক্ষিণ এশিয়ার এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিলো। অন্যদিকে এই সময়ের দলত্যাগী ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদী গোষ্ঠী সোভিয়েত রাষ্ট্র ও পার্টির নেতৃত্ব দখল করে। তারা "শান্তিপূর্ণ উত্তরণ", "শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও "শান্তিপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার" তত্ত্ব ফেরী করতে শুরু করে ও বিশ্বব্যাপী জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করে। সে সঙ্গে তারা গ্রহণ করে মার্কিনের সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতার নীতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই উপমহাদেশের ক্ষেত্রে মার্কিন নীতির শুরু হয় লক্ষণীয় পরিবর্তন একদিকে মার্কিনীরা পাকিস্তানকে নিজেদের খপ্পরে রাখার ও আরও দৃঢ়ভাবে নিজেদের যুদ্ধরথের সাথে জুড়ে রাখার প্রয়াস চালায়; অপর দিকে সোভিয়েত দলত্যাগীদের সংগে এক জোট এই অংশে তাদের চীন-বিরোধী রণনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে নির্দিষ্ট করে প্রধান ভূমিকা। লোকবলে শক্তিশালী ও সম্পদশালী ভারত স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের চেয়ে অধিক গুরুত্ব অর্জন করে এবং প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের প্রধান স্তম্ভে পরিণত হয়। '৬১ সালেই

---

* সংগঠনটি সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট দলটির (এম-এল) যুধবসংগঠন ছিল। পুস্তিকাটি ২৮/৬/৭৩ তারিখে প্রকাশিত হয়।

কেনেডী ক্রুশ্চেভ ও নেহেরু ভিয়েনায় একটি বোঝাপড়া করে ভারতকে প্রকাশ্য চীন-বিরোধী ভূমিকায় নামায়। অতি বৃহৎ দুই শক্তির সমর্থনে ভারত চীন-বিরোধী কার্যকলাপ শুরু করে ও '৬২ সালে চীন আক্রমণ করে। এভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের ব্যবহার করে দুই অতি বৃহৎ শক্তি ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে চীন-বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে।

ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধ চক্রান্তে সামিল করানো ছিলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা, কিন্তু এই পরিকল্পনা সফল হচ্ছিলো না, কারণ– ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব। পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদী জোটের সাথে নানা সূত্রে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাকে ভারতের। নেতৃত্বে চীন -বিরোধী যুদ্ধ চক্রান্ত ও শক্তিজোটে তাই ভেড়ানো যাচ্ছিল না। কারণ পাকিস্তান জানে এই যুদ্ধ চক্রান্ত শক্তিজোটে ভিড়লে অখণ্ড ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে তার অস্তিত্ব আর টিকে থাকবে না, ভারতবর্ষের রাঘব বোয়ালেরা তাকে গিলে খাবে। এই ভয় শুধু পাকিস্তানেরই নয়, নেপালের মত ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রেরও রয়েছে। পাকিস্তানকে এই চীন-বিরোধী চক্রান্তে ভেড়াবার উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালে মার্কিন ও রুশ সাম্রাজ্যবাদীরা উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষকে দিয়ে পাকিস্তান আক্রমণ করিয়েছিলো এবং চীন-বিরোধী তাসখন্দ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিলো। কিন্তু সে চুক্তি টেকে নি। কারণ তাসখন্দের ঐক্য ক্ষণস্থায়ী আর ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব স্থায়ী। কাজেই, মার্কিন রুশ পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। কিন্তু তারা হাল ছাড়লো না। নতুন কৌশল গ্রহণ করলো।

অভ্যন্তরীণক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীলরা হচ্ছে চরম গণবিরোধী। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতি জন্ম দিয়েছিলো ভারতবর্ষের জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস বিদ্বেষ সন্দেহ ও হানাহানি। এই নীতির ভিত্তিতেই তারা একদিন নয়া-ঔপনিবেশিক ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিলো। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে জাতিতে জাতিতে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদীরা সৃষ্টি করেছিলো সেই ঐতিহ্য নিয়ে সৃষ্ট নয়া-ঔপনিবেশিক পাকিস্তানে সমস্যার সমাপ্তি ঘটলো না। বরং পাকিস্তানের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থা এবং পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর মার্কিন নির্দেশিত অগণতান্ত্রিক নীতির ফলে সেসব সমস্যা উত্তরোত্তর প্রকট হতে থাকলো। তাই যুদ্ধ চক্রান্তে ভেড়বার জন্য বাইরের দিক থেকে পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক চাপ দিয়ে তারা যখন কামিয়াব হচ্ছিলো না তখন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ জাতি-সমস্যা ও আঞ্চলিক সমস্যাকে কাজে লাগিয়ে তারা প্রদেশভিত্তিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী হুমকীর সামনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে নতি স্বীকার করানো। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সেটা তো করলেই না বরং উল্টোদিকে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুললো। অবশ্য পাকিস্তানের জনগণের নিরাপত্তার কথা ভেবে, কিম্বা সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতি কোন নবজাগ্রত প্রীতি থেকেও নয় অথবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের বিরোধিতা করার জন্যেও নয় বরং স্বীয় সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থেই তারা এটা করেছিলো। যে আয়ুব সরকার পঞ্চাশের দশকে মার্কিন সিনেটে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলো– এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাঁড়াবার জায়গা না থাকলে পাকিস্তান-ই সেখানে রইলো বান্দুং নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন নির্দেশে পাক-ভারত যৌথ প্রতিরক্ষা প্রস্তাব তুলে যে ব্যক্তি একদিন চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল সেই আইয়ুব খানই ষাটের দশকে চীনের বন্ধুত্ব কামনা

করলো। চীনও সেদিন থেকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দুই সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ নাশকতামূলক কার্যকলাপ এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্বের উপর সব ধরনের হুমকীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন দিতে শুরু করলো। এই অবস্থায় মার্কিন রুশ পরিকল্পনা ব্যাহত হতে থাকে। পাকিস্তান ও ভারতের শাসকগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব হয়ে দাঁড়ায় এই উপমহাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে বিশ্ব বিপ্লবের পক্ষে ও সমাজতান্ত্রিক চীনের টিকে থাকার পক্ষে সহায়ক কিন্তু দুই অতি বৃহৎশক্তির কাছে তা হয়ে দাঁড়ায় ভয়ানক বাঁধাস্বরূপ। দুই বৃহৎ শক্তি এখন জোরেশোরে পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে; ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা এ পরিকল্পনায় সোৎসাহে সাড়া দেয় এবং তা কার্যকরী করার নির্দিষ্ট ভূমিকা লাভ করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব বাংলার শেখ মুজিবকে শিখণ্ডী হিসাবে খাড়া করে '৬৬ সালে তাঁর হাতে তুলে দেয় উগ্র জাতীয়তাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পতাকা। তখন থেকে মার্কিনীরা পাকিস্তান সরকারের চেয়ে মুজিবের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করতে থাকে এবং পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে তাদের খাস দালালদের দিয়ে এই পরিকল্পনার সহায়ক প্রয়োজনীয় নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। বাইরে থেকে মার্কিন নির্দেশে ভারতের প্রচারযন্ত্র ও প্রচার মাধ্যমগুলো নগ্নভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে মদত দিতে থাকে। ১৯৬৬-৬৯ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও মার্কিনীরা ব্যবহার করে এবং আন্দোলনে মুজিব তার উগ্র জাতীয়তাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের প্রচার মাধ্যম মারফত সামনে নিয়ে আসে। এভাবে মার্কিনীরা প্রত্যক্ষ চাপের মুখে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠিকে দিয়ে সত্তুরের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। নির্বাচনে দিগ্বিজয়ী মুজিবকে দিয়ে তারা তাদের পরিকল্পনাকে পরিণতির দিকে টেনে আনে। নির্বাচনে বিজয়ী মুজিব সেদিন দম্ভভরে বিদেশী সাংবাদিকদের বলেছিলেন একমাত্র সেই পারে পূর্ব বাংলাকে কমিউনিজমের হাত থেকে রক্ষা করতে। যাই হোক ভেতর ও বাহিরে উভয় দিক থেকে চরম বেগতিক অবস্থায় পড়েও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী স্বীয় শ্রেণীস্বার্থে ও অস্তিত্ব রক্ষার নীতিতে অটল থাকে এবং মার্কিন নির্দেশে শর্তহীনভাবে মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অসম্মতি জানায়। তাই মার্কিন সাম্রাজ্য এখন একটা পরিপূর্ণ সশস্ত্র বিদ্রোহ সংকটের দিকে এগুতে থাকে। সবারই মনে আছে এরূপ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ক্ষণে মার্কিন জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড ও মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের এডমিরাল বাইনস্ ঢাকা চট্রগ্রাম কক্সবাজার ও উপকুলীয় এলাকা পরিদর্শনে আসে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ঘন ঘন ব্যাংকক দিল্লি ঢাকা যাতায়াত শুরু করে, মুজিবের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠকে মিলিত হতে থাকে। এভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার বুকে এক সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করে। লক্ষ্যণীয় যে রুশ সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের দালাল মনি সিং মোজাফারেরা এই পরিকল্পনায় ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন দিতে থাকে। ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সরকার পাল্টা প্রতি আক্রমণ করে। পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রতিবিপ্লবী পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাস করে এবং ভারতের মাটিতে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার নামে এক পুতুল সরকার খাড়া করে ও আকাশবাণীর একটা অংশে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে ব্যর্থ বিদ্রোহকে চাঙ্গা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এদিকে

পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীলরা সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে বিরোধিতা করতে গিয়ে এক আত্মঘাতী পথ বেছে নেয়। তারা উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতি ও নির্বিচার জ্বালাও পোড়াও হত্যার নীতি গ্রহণ করে। ফলে ভারতের মাটিতে লক্ষ লক্ষ জনতা নিরাপত্তার আশায় যুদ্ধে সহায়তা করে।* পাকিস্তানের ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীলরা সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের ন্যায্য সংগ্রামকে জনগণের বিরুদ্ধেও পরিচালিত করে এই নীতির পরিণতিতে ব্যাপক জনতা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে উগ্র জাতীয়তাবাদের সহজ শিকারে পরিণত হোন। আর লক্ষ লক্ষ জনতা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের যুপকাষ্ঠে বলি হতে থাকেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের পূর্ব বাংলায় অবস্থানকালে মার্কিন যেখানে প্রধান ভূমিকা পালন করতো, ভারতে চলে যাওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পূর্ব থেকেই মার্কিনের চেয়ে সোভিয়েতের প্রভাব ভারতের উপর অধিকতর বেশি ছিলো। তাই 'বাংলাদেশ' আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কিনের প্রভাব এখন শিথিল বৃত্তে থাকে। এরূপ অবস্থায় সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ৭১ সালের আগস্ট মাসে ভারতকে এক অধীনতামূলক সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ করে এবং বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়। তখন থেকে চীন-বিরোধী পরিকল্পনা কার্যকরী করায় সোভিয়েতই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। রুশ-ভারত চুক্তি অনুযায়ী আসতে থাকে বিপুল সমরসম্ভার ও অস্ত্রশস্ত্র। পূর্ব বাংলার বিভ্রান্ত যুবসমাজকে দিয়ে সোভিয়েত ভারতের মাটিতে গড়ে তুলে তৎকালীন মুক্তিবাহিনী নামক ঝটিকাবাহিনী। এদেরকে পূর্ববাংলার অভ্যন্তরে প্রেরণ করে তারা নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালাতে থাকে এবং তাদের প্রত্যক্ষ ও নগ্ন আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে। এভাবে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে পাকিস্তানের উপর উলঙ্গ আক্রমণ চালায় এবং ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব বাংলাকে পদানত করে দখল করে নেয়।

পূর্ব বাংলা সোভিয়েতের সামাজিক উপনিবেশে পরিণত হওয়ার ফলে এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা এই উপনিবেশের তদারকী লাভ করার পরে বিগত দেড় বছর ধরে পূর্ব বাংলার জনগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও লুণ্ঠনের জ্বালা, পরাধীনতা ও দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে তাদের জীবন আজ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জাতীয় জীবনের দুর্দশা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এমনি এক পরিস্থিতিতে রবপন্থী ছাত্রলীগ তাদের জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেছে। পুতুলরাজ মুজিব ও তার প্রভু কোসিগিন ব্রেজনেভ এবং আড়কাঠি ইন্দিরার অন্যায় অবিচার আর শাসনশোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মুক্তিকামী বিদ্রোহী যুবসম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ ও বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে রবপন্থী ছাত্রলীগ দেশপ্রেমিক যুবসমাজের একটা অংশকে তাদের পতাকাতলে সমবেত করেছে। এই সম্মেলনকে উপলক্ষ করে তারা যে বক্তব্য পেশ করেছে তাতে তারা ইতিহাসকে জঘন্যভাবে বিকৃত করেছে এবং নানা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে তারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং বিচ্ছিন্নতা ও সাম্রাজ্যবাদী দখলকে তারা স্বাধীনতা বলে অভিহিত করেছে। দখলদারী সোভিয়েত ও তার আজ্ঞাবহ ভারতের জঘন্যতম কুকর্মকে তারা শুধু আড়ালই করে রাখছেনা, তাদেরকে তারা আমাদের দেশের জনগণের বন্ধু হিসেবে উপস্থিত করেছে। পূর্ব বাংলার জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা-

* অনুমিত পাঠ

অবমাননার জন্যে তারা দখলকারী ব্রেজনেভ-কোসিগিন ও পাচাটা ইন্দিরাকে দায়ী করছে না, দায়ী করছে তাদেরই শিখণ্ডী মুজিবকে। মুজিবের বিরুদ্ধে চিৎকার করেই যে শুধু তারা সোভিয়েত-ভারতকে আড়াল রাখছে তা নয়, সাথে সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের এই মুহূর্তের প্রধান শত্রু সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে সামনে না-এনে সামনে আনছে শুধুমাত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। সোভিয়েতের পুতুল মুজিবকে তারা বলছে মার্কিনের ক্রীড়নক।

অন্যদিকে পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান মুহূর্তের কর্তব্য জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বদলে তারা ডাক দিয়েছে "শ্রেণীসংগ্রাম" ও "সামাজিক বিপ্লবের"। পূর্ব বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা না রেখেই, সমাজ বিকাশের বর্তমান স্তর ধনবাদী না সামন্তবাদী সে সম্পর্কে কোন কিছু না বলেই তারা আহ্বান জানিয়েছে "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের'। এই বিপ্লবের শত্রু-মিত্র কারা তাও তারা নির্দিষ্টভাবে বলছে না। একদিকে তারা উগ্র জাতীয়তাবাদের পতাকা তুলে ধরেছে অন্যদিকে মার্কসবাদের নামাবলী গায়ে দিয়েছে। একদিকে বলছে 'বাংলার মেহনতী মানুষ এক হও', অন্যদিকে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগানও আওড়াচ্ছে। শুধুমাত্র নিজেদের প্রতিবিপ্লবী রাজনীতিকে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী স্বরূপকে ঢাকবার জন্যে নিজেদের বক্তব্যকে কতগুলো মাকর্সবাদী বুলির মোড়কে সংহত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এখন হচ্ছে এক বিরাট ধাপ্পা। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার প্রভু সোভিয়েতের বিরুদ্ধে কোন সুসঙ্গত বক্তব্যও তারা রাখছে না। কিন্তু তাদেরই কর্মী মহলের চাপে পড়ে মাঝে মাঝে ভারতীয় শোষকগোষ্ঠীর 'অংশ বিশেষ' ও সোভিয়েতের কোন কোন বৃহৎশক্তিসুলভ নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে। এটাও নেহায়েত লোক দেখানো, ছেলে ভুলানো কথার কারচুপি ছাড়া আর কিছু নয়।

এই পরস্পরবিরোধী খিচুড়ী রাজনীতি তারা কেন পরিবেশন করছে? উগ্র জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ পূজারী হয়েও কেন তারা মার্কসবাদের কথা বলছে। শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলছে? এর উত্তরও সবারই জানা আছে। যখন তারা দেখলো যে উগ্র জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে জনগণকে তারা আর ধরে রাখতে পারছে না, তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপ জনগণের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠছে তখন তারা সাত তাড়াতাড়ি ভোল পালটে ফেলে এবং মার্কসবাদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রামের ধ্বজা তুলে ধরে। এর প্রয়োজনে তারা তাদের মূল সংগঠন আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে আসে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে বানচাল করার জন্যে, সত্যিকারের জাতীয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রুখবার জন্যে এবং জনগণের স্তরে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যেই তারা এটা করেছে। সবাই জানেন যে- এরাই একদিন মুজিবকে সাড়ম্বরে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি দিয়েছিলো, "জাতির পিতা বানিয়েছিলো, "জয় বাংলার" উগ্র জাতীয়তাবাদী ধ্বনি তুলেছিলো, "মুজিববাদ" নামক আজব তত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে নিজেদের জাহির করার জন্য খুনোখুনি করেছিলো, মার্কিনের নক্সা করা "স্বাধীন বাংলার পতাকা' উত্তোলন করছিলো, "স্বাধীনতা ঘোষণার নামে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অগ্রসেনানী হিসেবে কাজ করছিলো, মার্কসবাদ আর শ্রেণীসংগ্রামের নাম শুনলে এই সেদিনও তারা চমকে উঠত, ৬৮-৬৯ এর গণআন্দোলনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্লোগানদাতাদের উপর এরাই হামলা চালাতো, সামরিক আইন ভঙ্গ করে ৭০-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর লালঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করার সময় বিপ্লবী যুবছাত্রদের উপর এরাই সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিলো।

রাতারাতি খোলস বদলে সেই ছাত্রলীগ নেতৃত্বই যখন আজ শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জন্যে লড়াই করার কথা, মার্কসবাদ, জনযুদ্ধ আর বিপ্লবের লাল পতাকা তুলে ধরার কথা বলে, মার্কিনের বিরোধিতা করে, তখন যেমন হাসিও পায় তেমনি তাদের দেশপ্রেম এবং সমাজতন্ত্র কায়েম করার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে ব্যাপক যুব সমাজ স্বভাবতঃই সন্দিহান না হয়ে পারেন না।

তাই ইয়াথ ফ্রন্ট মনে করেছে ছাত্রলীগ নেতৃত্বের মুষ্টিমেয় একটি অংশ আজ পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে অতি সুকৌশলে বানচাল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এদের কার্যকলাপ বক্তব্য ও কর্মসূচি এদেশের বুকে সোভিয়েতের ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলকে মজবুত করেছে। ইয়াথ ফ্রন্ট ছাত্রলীগ নেতৃত্বের মুষ্টিমেয় অংশ থেকে নিশ্চয়ই ব্যাপক কর্মীদের আলাদা করে বিবেচনা করে। ব্যাপক কর্মীকে তারা সৎ দেশপ্রেমিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সম্ভাবনাময় বিপ্লবী শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে। এসব কর্মীদের প্রতি ইয়াথ ফ্রন্টের আহ্বান আপনারা মিথ্যার রাজনীতিকে প্রতিহত করুন, চক্রান্তের রাজনীতির মুখোশ উন্মোচিত করুন, জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সশস্ত্রসংগ্রামের পতাকাতলে সমবেত হোন। সারা বিশ্বজুড়ে আজ দুই বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে যে মুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের ছোট ও মাঝারী দেশ ও জাতিসমূহের যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম চলছে সেই লড়াইয়ের কাতারে আপনারাও সামিল হোন।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সোভিয়েতের সামাজিক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করছে, সোভিয়েত ভারতের দাসত্বকে রক্ষা করছে এরূপ সকল দালাল ছাত্র যুবসংগঠনের বিপক্ষে পূর্ব বাংলার মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী যুবছাত্রেরা গড়ে তুলেছে গোপন বিপ্লবী যুবসংগঠন–ইয়াথ ফ্রন্ট ফর ন্যাশনাল লিবারেশন (YFNL)। ইয়াথ ফ্রন্ট জাতীয় মুক্তির পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরছে।

জাতীয় মুক্তি অর্জনের পথ হচ্ছে–শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে কৃষক জনতাকে বিপ্লবী জাতীয় যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা, কৃষকের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, ঘাটি এলাকা সৃষ্টি করা, গ্রামাঞ্চলকে ভিত্তি করে সমগ্র গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। এইভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলকে মুক্ত করে শহর অঞ্চলকে দখল করা ও দেশব্যাপী মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে বিজয় অর্জন করা।

ইয়াথ ফ্রন্ট এই লক্ষ্যে যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করছে। ইয়াথ ফ্রন্ট ঘোষণা করছে পূর্ব বাংলার বুক থেকে সোভিয়েত ও ভারতকে উচ্ছেদ করবেই, চীন বিরোধী পরিকল্পনায় দেশের জনগণকে কামানের খোরাকে পরিণত হতে দেবে না। চীনের বা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবে দেশকে ব্যবহার করতে দেবে না, ব্রেজনেভ কোসিগিনের এশীয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে নস্যাৎ করবেই।

তাই ইয়াথ ফ্রন্টের আহ্বান– আসুন মুক্তি ও স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনার জন্য কৃষকের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি পূর্ব বাংলাকে মুক্তি করি।

ইয়াথ ফ্রন্ট ফর ন্যাশনাল লিবারেশন*

এই দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন আর না হয় *

একুশে ফেব্রুয়ারি তেয়াত্তর সন। যে শ্রদ্ধা, যে পূত পবিত্র অনুভূতি ও মন লইয়া রাজধানীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শহীদ মিনারে সেদিন সমবেত হইয়াছিল, এক শ্রেণীর উচ্ছৃংখল ধরনের জঘন্য কার্যকলাপ শুধু সে মনকে ভারাক্রান্তই করে নাই–শহীদ মিনারের পবিত্র বেদীকে, অমর একুশের পুণ্যময় স্মৃতিদিবসকে মসীলিপ্ত করিয়াছে। মেয়েদের উপর বার বার হামলা হইয়াছে, অনেক মহিলার নিরাপত্তা, সম্ভ্রম ও ইজ্জত বিনষ্ট হইয়াছে, দুইটি তরুণীকে শহীদ মিনারের পাদদেশ হইতে 'হাইজ্যাক' করিয়া লাঞ্ছিত করার পর অর্ধচেতন অবস্থায় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে– সামগ্রিক অবস্থাদৃষ্টে বারবার সকলের মনকে নাড়া দিয়াছে একটিমাত্র প্রশ্ন—আইন, শৃংখলা, সভ্যতা, শালীনতা যেখানে এক শ্রেণীর উছৃংখল তরুণের মুষ্টির মধ্যে যেখানে শহীদ মিনারের পবিত্র পাদপীঠে স্মৃতি তর্পণের পরিবর্তে নোংরামি চলে সেখানে শহীদ দিবস পালনের সার্থকতা কোথায়? এই দিনের পবিত্রতাকে এক শ্রেণীর পশুর কুরুচিসম্পন্ন রসনার অনলে নিক্ষিপ্ত হইতে দিয়া 'মহান একুশে'-কে অপমানিত করার মধ্যে কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে?

বিশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর হইতেই শহীদ মিনারে ভিড় জমিতে শুরু করে–কিন্তু অন্যান্য বারের মত এবার শহীদ মিনারের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেই লওয়া হয় নাই। ফলে রাত্রি ১১ টার পর হইতে সেখানে অসংখ্য নারী-পুরুষের মধ্যে এক শ্রেণীর সুযোগ-সন্ধানীও সমবেত হইতে থাকে। গতবারের মত এবার শহীদ মিনারে আলোর ব্যবস্থা করা হয় নাই। অন্ধকারের সুযোগ লইয়া এই সুযোগ সন্ধানীর দল যথেচ্ছ কাণ্ড করিয়াছে। ঢাকা নগর আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার মিছিলটি যখন মধ্যরাত্রিতে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিতেছিলেন তখন মিনারের বাঁ পাশের কোণায় উচ্ছৃংখল যুবকদের হাতে তরুণী লাঞ্ছিতা হন। সবচাইতে জঘন্য ঘটনা ঘটে ভোর চারটা হইতে সাড়ে চারটার মধ্যে। এই সময় বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক প্রভাতফেরী শহীদ মিনারে আসিয়া উপস্থিত হয়। পুষ্পমাল্য অর্পণের ক্ষেত্রে অন্যান্যবারের মত এবার মহিলা ও পুরুষদের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা না-থাকায় দেখা যায় যে, উচ্ছৃংখল সুযোগ-সন্ধানীরা এক বিশেষ কায়দায় কয়েকটি মেয়েকে দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘিরিয়া শহীদ মিনারের পাদদেশে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের আচরণ এমন এক পর্যায়ে চলিয়া যায় যে, অনেক কিশোরী ও তরুণীর পরিধানের বস্ত্র পর্যন্ত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। শহীদ মিনারে যে সামান্য প্রদীপসদৃশ আলোর ব্যবস্থা ছিল ভেসপাযোগে কয়েকজন তরুণের উপস্থিতির মাত্র কয়েক মিনিট পরেই অজ্ঞাতকারণে সেগুলি নিভিয়া যায় এবং

---

* দৈনিক ইত্তেফাক ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

তখনই এই লংকাকাণ্ডের সূচনা হয়। শহীদ মিনারের পাদদেশে নারিন্দা হইতে আগতা জনৈকা কিশোরীকে অর্ধচৈতন্য অবস্থায় বাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৭ বৎসর বয়স্কা ও ২২ বৎসর বয়স্কা দুইটি তরুণীও এই সময় নিখোঁজ হয়। তাহাদিগকে নিগৃহীতা ও অর্ধচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং পরে তাহাদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসা করাইয়া হাসপাতাল হইতে লইয়া যাওয়া হয় বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে।

তখন বঙ্গবন্ধু শহীদ মিনারে–

জাতীর জনক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহ্‌মান যখন পুষ্পমাল্য অর্পণের জন্য শহীদ মিনারে আসেন তখনও উচ্ছৃংখল ব্যক্তিদের তৎপর দেখা যায়। ধাক্কাধাক্কির ফলে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা পর্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে।

এ দায়িত্ব কাহার?

শহীদ মিনারের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব কাহার? সরকারের এ ব্যাপারে অবশ্যই একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করার রহিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশে যেখানে স্মৃতিস্তম্ভের পবিত্র বেদী রহিয়াছে, সর্বত্রই তা সংরক্ষণ করার দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত।

লেনিন, কামাল আতাতুর্ক প্রমুখের পবিত্র দেহ যেখানে সমাহিত, সেখানে প্রতিদিনই দর্শক সমাগম হইতেছে। পরিপূর্ণ সরকারি দায়িত্বে ও সামরিক নিয়ন্ত্রণে সেখানকার শৃংখলা রক্ষা করা হয়। জাপানের হিরোসিমাতেও একইভাবে স্মৃতি সৌধের পবিত্রতা রক্ষা করা হয়। অথচ আমাদের দেশে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অনীহা কেন?

অনেকে মনে করেন, শহীদ মিনারের সমস্ত এলাকাটিকে সামরিক নিয়ন্ত্রণে আনিয়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শ্রদ্ধা নিবেদনকারীদের সমাবেশ এবং সেখান হইতে সুশৃংখল লাইন করিয়া শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমেও শহীদ বেদীর পবিত্রতা রক্ষা করা যাইতে পারে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের ক্ষেত্রেও যাহাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য সতর্ক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

শহীদ মিনারের পাশে গাঁজার আসর?

পবিত্র শহীদ মিনারের আশেপাশে গাঁজার আসর বসিয়াছিল একুশে ফেব্রুয়ারিতে। গঞ্জিকা সেবনকারীদের সকলেই তরুণ বয়সের। শহীদ দিবসকে যতরকমভাবে অপমানিত ও অপবিত্র করা যায় তাহার চেষ্টা হইয়াছে। উচ্ছৃংখল নৃত্যে গাঁজার আসর জমাইয়া তুলিয়া ‘দম মারো দম’ ফিল্মী গানে উচ্ছৃংখলতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে।

বাংলাদেশ গণ ঐক্যজোটের ঘোষণা*

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে আমরা মনে করি যে, স্বাধীনতার আগে আমাদের মাতৃভূমিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পরনির্ভরশীল করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরাধীন আমল হইতেই আমাদের জনগণের জীবনে গভীর সংকট চলিয়া আসিয়াছিল। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শত্রুরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছিল। তাই, স্বাধীনতার পর স্বাভাবিকভাবেই গণজীবনে আরো গভীর সংকট দেখা দিয়াছে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকার এসব সংকট মোচনের জন্য এবং দেশকে গড়িয়া তোলার জন্য কতকগুলি প্রগতিশীল নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে রহিয়াছে শিল্প জাতীয়করণ, ছিন্নমূলদের পুনর্বাসন, যোগাযোগ-ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, প্রগতিশীল বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন ও অনুসরণ এবং পাকিস্তান হইতে আটক বাঙালিদের ফিরাইয়া আনা প্রভৃতি। কিন্তু অতীতের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জের হিসেবে যে দুর্নীতিবাজ, মুনাফা-শিকারী, চোরা-কারবারী, মজুতদার, অর্থ-লোলুপ গণস্বার্থবিরোধী ব্যক্তিরা সমাজদেহে রহিয়া গিয়াছে, তাহারা আমাদের খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি স্বাধীনতা-উত্তর সমস্যাগুলোর সুযোগ নিয়া জনগণের জীবনের চরম দুর্গতির বিনিময়ে নিজেদের সৌভাগ্য গড়িয়া তোলার পথ বাছিয়া নিয়াছে। দেশের এ সংকটের মধ্যে সমাজবিরোধী দুস্কৃতিকারীরা সারাদেশে বিশেষত বাংলার গ্রামাঞ্চলে সুপরিকল্পিতভাবে লুট, গুপ্ত হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি নাশকতামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হইয়াছে।

দেশের এ-পরিস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্প্রতি দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন সমূহকে বিশেষত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতির সমস্যা ও শত্রুদের মোকাবিলার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

দেশের ও জনগণের বৃহত্তম স্বার্থে বঙ্গবন্ধুর এ-আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্যা ও শত্রুদের মোকাবিলা করা, আমরা আমাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।

---

* বাংলাদেশ গণ ঐক্যজোটের পক্ষে কেন্দ্রীয় কার্যালয় ১০নং সার্কিট হাউস রোড ঢাকা-২ হইতে প্রকাশিত। ১৯৭৩

আমরা মনে করি সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সমস্যাসমূহ জাতীয় সমস্যা। এসব সমস্যা ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় ভিত্তিতে মোকাবিলা করিতে হইবে।

পহেলা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবর্গের এক যুক্ত সভায় তিনটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে আমরা এ তিন দলের ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করিয়াছি।

এই ঐক্যজোটে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ভূমিকা থাকিবে এবং জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় স্বাতন্ত্র্য এবং নিজ নিজ আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজ করার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকিবে। কোন রাজনৈতিক দল ঐক্যজোটের আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ঐক্যজোটে যোগদান করিতে চাহিলে তাহাদের গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আমাদের এই ঐক্যজোট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ঘোষিত চারটি মূলনীতি–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দ্ব্যর্থহীন আনুগত্য ঘোষণা করিতেছে।

উল্লিখিত চারটি মূলনীতি সামনে রাখিয়া আমাদের ঐক্যজোটের উদ্দেশ্য হইবে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পথের বাধাসমূহ দূর করার জন্য জনগণের বিশেষত শ্রমজীবী, মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও যুব শক্তির সমাবেশ গড়িয়া তুলিয়া নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া।

এই লক্ষ্যে অগ্রসর হবার জন্য বাংলাদেশের জনগণের জীবনের আশু সমস্যাগুলো অবিলম্বে দূর করার উপর ঐক্যজোট বিশেষ গুরুত্ব দিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর। আর একই সংগে বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও প্রগতি তথা গণস্বার্থের বিরুদ্ধে যারা নানা চক্রান্ত ও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত রহিয়াছে, এইসব জাতীয় শত্রুদের প্রতিহত করার সংগ্রাম গড়িয়া তোলার জন্যও ঐক্যজোট দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করিতেছে।

এই ঐক্যজোট মনে করে যে, আশু কর্তব্য হিসেবে অবিলম্বে :

১। দেশে ডাকাতি, রাহাজানি, গুপ্তখুন ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ স্তব্ধ করিয়া দিয়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নততর করিয়া তোলার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। এইজন্য যেমন একাধারে জনগণ বিশেষত যুব শক্তিকে সংগঠিত করিয়া গ্রামে-গ্রামে, মহল্লায়-মহল্লায় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে, তেমনি প্রশাসন যন্ত্রকেও ত্রুটিমুক্ত ও অধিকতর তৎপর করিয়া তুলিতে হইবে।

২। শিল্প ও কৃষি উৎপাদন-বৃদ্ধির উপর আমাদের স্বাধীনতা ও প্রগতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে, নির্ভর করিতেছে জনগণের অন্ন-বস্ত্রের সংকটের সমাধান। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে জাতীয় স্বাধীনতা ও স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়িয়া উঠার ভবিষ্যত। তাই, উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনকে সবিশেষ গুরুত্ব

দিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির কল্পে সরকার এবং জনগণের মধ্যে বিশেষত শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। মুনাফাশিকারী, মজুতদার, চোরাকারবারী, পাচারকারী প্রভৃতি সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের কঠোর হাতে দমন করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সব সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে জনশক্তিকে সংগঠিত করিয়া তীব্র আন্দোলনও গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৪। সমাজের মারাত্মক ব্যাধি দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরেই দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে।

৫। দেশের প্রশাসন যন্ত্রে যেখানে অতীত আমলের জের হিসাবে দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিকতা, সাম্রাজ্যবাদী ও গণ-বিরোধী মনোভাব বিদ্যমান রহিয়াছে সেগুলোকে দূর করিয়া প্রশাসনযন্ত্রকে গণমুখী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তিনটি রাজনৈতিক দলের ঐক্যজোট মনে করে যে, উল্লিখিত কর্তব্যগুলো সম্পাদনের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ সরকারের সংগে ঐক্যজোটের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার। একই সংগে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক ও বিভিন্ন প্রগতিশীল গণ-সংগঠন সহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া তাদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে।

ঐক্যজোট বঙ্গবন্ধুর সরকারের বৈদেশিক নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত দল ও ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রগতিশীল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি বানচাল করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র বিশেষত ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে, দেশের স্বাধীনতা ও প্রগতির স্বার্থে তাদের রুখিয়া দাঁড়ানো জরুরী রাজনৈতিক কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মহলগুলো আসলে দেশ, জাতি ও জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে শত্রুর ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে যাহারা নস্যাৎ করিতে চাহিয়াছিল সে সব বিদেশী শক্তির সাথে আঁতাত করিয়া তাহারা জাতীয় স্বার্থবিরোধী চক্রান্তে নিয়োজিত রহিয়াছে। এই অশুভ চক্র বাংলাদেশের প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে ধ্বংস করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে। ইহারা গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করিতে চায়। গণজীবনের সংকটগুলোর সমাধানের প্রকৃষ্ট কোন পথ প্রদর্শন না-করিয়া সমস্যাগুলির সুযোগ নিয়া তথাকথিত আন্দোলনের নামে ইহারা আসলে তিরিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাকে তাহাদের বিদেশী প্রভু ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থে নস্যাৎ করিতে চায়। তাই এ শত্রুদের বাংলাদেশের পবিত্র মাটি হইতে উৎখাত করার জন্য সারাদেশে তীব্র সংগ্রাম গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ঐক্যজোট সকল দেশ-প্রেমিক কৃষক, ছাত্র, যুবক, মহিলা ও রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী ভাই-বোনদের কাছে আবেদন জানাইতেছে যে, সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও বিভেদ ভুলিয়া গিয়া বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চরম লক্ষ্য সামনে রাখিয়া ঐক্যজোটের কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠিত হউন এবং সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করুন।

দেশবাসী ভাই-বোনদের কাছে আমাদের আবেদন বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশের শত্রুদের প্রতিহত করুন এবং জাতীয় সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণ ঐক্যজোটের আহ্বানে সাড়া দিয়া দেশ গড়ার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

জয় বাংলা

বঙ্গবন্ধুর আবেদন*

গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী ভাই ও বোনেরা,
স্বাধীনতা যুদ্ধে ঢাকা নগরীতে আপনাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য আমার বিপ্লবী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আগামী ৭ই মার্চ দেশব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্বাচন বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনা। যেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের রায়ই হচ্ছে শেষ কথা, সেহেতু এই নির্বাচন হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসাবে গড়ে তোলার সক্রিয় সংগ্রামের দায়িত্ব কাদের হাতে দেয়া হবে তার উপর আপনাদের নতুন নির্দেশ। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড আমার অন্যতম বিশ্বস্ত সহচর ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি গোলাম মোস্তফাকে ঢাকা−১৩ নির্বাচনী এলাকা (রমনা ও লালবাগ) থেকে মনোনয়ন দিয়েছে।

গাজী গোলাম মোস্তফা আপনাদের কাছে কোন অপরিচিত নাম নয়। জেল, জলুম ও নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ছাত্রজীবন হতে আজ অবধি একজন অক্লান্ত কর্মী হিসাবে তিনি আমার সঙ্গে কাজ করছেন এবং তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। আমি যখন তার উপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করেছি, পরম কর্তব্যনিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে তিনি সর্বদাই তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক হিসাবে বৃটিশ খেদাও আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তানি শোষক চক্রের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালের ৯২ (ক) ধারা আন্দোলন হতে ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রক্তমাখা নয় মাসের সংগ্রামে তার ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা আজ আর কারো অজানা নেই। ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি অপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সকল প্রকার সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যে তার সহযোগিতার হস্ত সর্বদাই সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় বারবার তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই সকল গুণের স্বীকৃতি হিসাবেই গত বৎসর এই এলাকার ভোটারগণ বিপুল ভোটাধিক্যে তাকে জয়যুক্ত করেছিলেন।
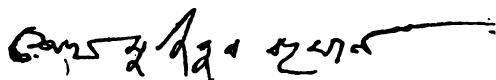
আজ বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও জনগণের সার্বিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য গাজী গোলাম মোস্তফার মত নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী ও পরীক্ষিত রাজনৈতিক

---

* ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে গাজী গোলাম মোস্তফার প্রার্থিতার পক্ষে প্রচারিত নির্বাচনী প্রচার পত্র। ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

নেতার প্রয়োজন। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং সমাজতন্ত্র ও প্রগতির সংগ্রামে আমার হস্তকে শক্তিশালী করার মানসে আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে ঢাকা-১৩ নির্বাচনী এলাকা হতে গাজী গোলাম মোস্তফাকে জয়যুক্ত করবেন বলে আমি আশা করি।

আপনাদের জন্য রইল অনাবিল প্রীতি, শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী অভিনন্দন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আগামী দিনে দেশগড়ার সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আমি আপনাদের আহ্বান জানাই।

আপনাদের স্নেহধন্য

শেখ মুজিবুর রহমান

১২/২/৭০

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য ১৯৭৩ সালে সেনাবাহিনীর অপারেশন*

১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে দেশের এক নাজুক পরিস্থিতিতে দিশেহারা মুজিব সরকার নেহায়েত অনোন্যপায় হয়ে আবার সেনাবাহিনীকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং দুষ্কৃতকারী দমন করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের জন্য তলব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কুমিল্লা সেনানিবাসের ব্রিগেড কমান্ডার তখন কর্নেল নাজমুল হুদা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত ছিলেন কর্নেল হুদা। সেই সুবাদে কিংবা অন্য যেকোন কারণেই হোক শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধ ভক্তি ছিল তার। তবে এ বিষয়ে সুশিক্ষিত কর্নেল হুদার মনে দ্বন্দ্বও ছিল যথেষ্ট। একই সাথে যুদ্ধ করেছি আমরা। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাকে ভীষণ আপন করে নিয়েছিলেন। আমাদের সম্পর্ক এত নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে, আমরা রাজনীতি নিয়ে অবাধে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করতাম। আমার স্পষ্টবাদিতায় অনেক সময় তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন। অনেক সময় বড় ভাইয়ের মত উপদেশ দিতেন বেফাঁস কথাবার্তা বলে আমি যাতে নিজেকে বিপদে না-ফেলি। তার আন্তরিকতায় আমি তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতাম। অপারেশন অর্ডার আসার পর আমি হুদা ভাইকে একদিন বলেছিলাম '৭২ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। তিনি নিজেও সে বিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ঠিক করা হল চীফ অফ স্টাফকে অনুরোধ জানানো হবে যাতে তিনি সশরীরে কুমিল্লায় এসে অপারেশন সম্পর্কে সবকিছুই বিস্তারিত খুলে বলেন। এতে করে আমরাও জানার সুযোগ পাবো এবার সরকারের উদ্দেশ্য কি? প্রধানমন্ত্রী কি এবার সত্যিই তার 'চাটার দল' ছেড়ে জনগণের কল্যাণ চান? এর জন্যই কি তিনি আমাদের সাহায্য চাইছেন? সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল শফিউল্লাহকে কর্নেল হুদা কুমিল্লায় আসার অনুরোধ জানালেন। এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কনফারেন্সে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "৭২ সালের মত সেনাবাহিনীকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে নাতো এবারও?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "This time 'BangaBandhu' means business. If even his dead father is found to be implicated in any crime then his body could be exhumed for trial. No exception this time whatsoever. This is what he told me personally and I have no reason to disbelieve him." খুবই ভালো কথা। শেখ মুজিব এবার সত্যিই চিনতে পেরেছেন তার সরকার ও দলকে। তিনি তাদের অন্যায়ের প্রতিকার চান। এদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত অর্থে জননেতা হবার জন্য দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইছেন তিনি। তার এই প্রচেষ্টায় অবশ্যই আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাকে সাহায্য

---

* রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্নেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম বীরউত্তম, যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি, (ঢাকাঃ ২০০১) পৃঃ ৪১২–৪১৯

করব, সব ঝুঁকি হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে; সে কথাই দেয়া হয়েছিল জেনারেল শফিউল্লাহকে। অপারেশনকে যেকোন মূল্যে সফল করে তুলবো আমরা। খুশি মনেই ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। কুমিল্লা ব্রিগেডকে দায়িত্ব দেয়া হল কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং সিলেটে অপারেশন পরিচালনার। আমাকে কর্নেল হুদা (হুদা ভাই) কুমিল্লা অপারেশনের দায়িত্ব দিলেন। সিলেট এবং নোয়াখালীর দায়িত্ব দেয়া হল মেজর হায়দার এবং মেজর রশিদকে। Combing Operation শুরু হল। সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্ট থেকে জানা গেল সব সেক্টরে আওয়ামী লীগ এবং দলের অঙ্গ সংগঠনগুলোর কাছেই রয়েছে বেশিরভাগ অবৈধ অস্ত্র। প্রভাবশালী নেতাদের ছত্রছায়াতেই নিরাপদে রয়েছে ঐসব অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা। তাতে কি? এবার মুজিব তার মরা বাপকেও ছাড়তে রাজি নন। আমরা যার যার এলাকায় সব প্রস্তুতি শেষে অপারেশন শুরু করলাম। সব জায়গাই খবর পাওয়া যাচ্ছিল এলাকার যত দাগী লোক, অবৈধ অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, খুনী, লুটেরাদের মাথা হল আওয়ামী লীগের নেতারা কিংবা নেতাদের পোষ্য মাস্তানরা। সব জায়গাতেই আবার আমাদের সরকারি দলের নেতারাও তাদের তৈরি সন্ত্রাসীদের নামের তালিকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তদন্তের ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাদের দেওয়া তালিকাভুক্ত লোকেরা প্রায়ই এলাকার সৎ এবং নীতিবান বলে পরিচিত। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকেই সরকার-বিরোধী রাজনীতির সাথে জড়িত কিংবা সমর্থক ছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হল দুস্কৃতকারীদের ধরা সে যেই হোক না-কেন। দলবিশেষের প্রতি আমাদের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। ধর-পাকড় করা হল অপরাধীদের স্থানীয় বেসামরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এবং প্রশাসনের সহায়তায়। যারা ধরা পড়েছিল তাদের বেশিরভাগই হোমরা-চোমরা চাঁই এবং নেতা-নেত্রী। সংসদ-সদস্যা মমতাজ বেগম থেকে কুমিল্লার জহিরুল কাইউম কেউই বাদ পড়লেন না। সিলেট, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল এবং দেশের অন্যান্য জায়গাতে আর্মির হাতে ধরা পড়ল শেখ নাছের, হাসনাত প্রমুখ অনেক নামী-দামী নেতা। সব জায়গায় একই উপাখ্যান। এলাকার দুষ্কৃতকারীদের বেশিরভাগই সরকার ও সরকারি দলের লোকজন। এই অপারেশনের সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা সরাসরিভাবে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা, পাতি নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। আর্মি অপারেশনের ফলে সারাদেশে চমক সৃষ্টি হল। লোকজন ভাবল শেখ মুজিব আর্মির সাহায্যে 'চাটার-দল' -এর সন্ত্রাস ও দুর্নীতির হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। ফলে সবখানেই জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন আর্মি অপারেশনে সাহায্য করতে। কয়েকদিনের দেশব্যাপী অভিযানের ফলে সন্ত্রাস কমে গেল অস্বাভাবিকভাবে। জনগণের মনে আশা ফিরে এল। দুঃশাসনের ফলে নির্জীব হয়ে পড়া জাতির মধ্যে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হল। ধরা পড়া সবার বিরুদ্ধেই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হল। কারো ব্যাপারেই কোন ব্যতিক্রম করা হল না। যদিও বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল থেকে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকেও অনেকের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল অনবরত। কিন্তু আমরা আমাদের নীতিতে সবাই অটল। কারো ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার করা হবে না। আইন সবার জন্যই সমান।

হঠাৎ সেনা সদর থেকে কয়েকজন আটক অপরাধীকে ছেড়ে দেবার জন্য নির্দেশ পাঠালেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কর্নেল হুদা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন কাউকে ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ শুধুমাত্র আইনই এখন তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। আইনকে নিজের হাতে নেবার কোন অধিকার তার নেই। ব্রিগেড কমান্ডারের এই জবাব জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন। কর্নেল হুদার কাছে ফোন এল প্রধানমন্ত্রীর। কর্নেল হুদা বিনীতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন প্রধানমন্ত্রী যেন তার রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েলকে পাঠিয়ে দেন চীফের সাথে সরেজমিনে অবস্থার তদন্ত করার জন্য। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে আর্মি কারো প্রতি কোন অবিচার কিংবা অন্যায় আচরণ করেছে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর যেকোন শাস্তিই তিনি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছেন Area Commander হিসাবে। প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন যখন আসে তখন দৈবক্রমে আমিও Control Room-এ উপস্থিত ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর ফোন তাই আমি রুম থেকে বের হয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু কর্নেল হুদার নির্দেশেই রুমে থেকে যেতে হয়েছিল আমাকে। কর্নেল হুদার চারিত্রিক দৃঢ়তা সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। নেতার প্রতি তার অন্ধ আনুগত্য এবং শেখ মুজিবের অতি বিশ্বাসভাজনদের একজন হয়েও কর্নেল হুদা (গুড্ডু ভাই) এ ধরনের জবাব প্রধানমন্ত্রীকে দেবেন সেটা সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন অতিসত্ত্বর তিনি লোক পাঠাচ্ছেন তদন্তের জন্য।

সেদিনই হেলিকপ্টারে করে এসে পৌঁছালেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। জনাব তোফায়েলকে কিছুতেই তিনি সঙ্গে আনতে রাজি করাতে পারেননি। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ জনাব তোফায়েল কুমিল্লায় এলে সবকিছু বিস্তারিত জানার পর মাথা হেঁট করে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর থাকত না তার। জেনারেল জিয়ার আগমনের পর কুমিল্লাসহ অন্য সব জেলার শীর্ষ নেতাদের যারা তখনও বাইরে ছিলেন তাদের সবাইকে সেনানিবাসে আমন্ত্রণ জানানো হল এক মধ্যাহ্ন ভোজে। ভোজপর্ব শেষে একে একে সব ধৃত ব্যক্তিদের কেন এবং কোন চার্জে ধরা হয়েছে প্রমাণাদিসহ তার বিশদ বিবরণ দিলেন Operation Commander-রা। কেউ কোনকিছুর প্রতিবাদ করতে পারলেন না। জেনারেল জিয়া কর্নেল হুদা এবং আমাকে সঙ্গে করে একই হেলিকপ্টারে ঢাকায় সেনা সদরে ফিরে এলেন। সেখান থেকে জেনারেল শফিউল্লাহকে সঙ্গে করে আমরা গেলাম ৩২নং ধানমণ্ডিতে শেখ সাহেবের সাথে দেখা করতে। সেখানে পৌঁছে দেখি প্রধানমন্ত্রী এবং জনাব তোফায়েল আহমদ আমাদের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। ঘরে ঢুকতেই কর্নেল হুদা এবং আমাকে দেখামাত্র শেখ মুজিব গর্জে উঠলেন,

–কি পাইছস তোরা? আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশে আর কোন দুষ্কৃতকারী নাই? জাসদ, সর্বহারা পার্টির লোকজন তাদের চোখে পড়ে না? অবাক হয়ে গেলাম। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী! কর্নেল হুদা জবাব দিলেন,

–স্যার আমরা আপনার নির্দেশে অপারেশন করছি প্রকৃত দুষ্কৃতকারীদের ধরার জন্য। আমরা নির্দলীয়। আমাদের কাছে সবাই সমান। বিভিন্ন এজেন্সীর দেয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং আমাদের নিজস্ব এজেন্সী দিয়ে ঐ সমস্ত রিপোর্ট ভেরিফাই করার পরই আমরা এ্যাকশন নিয়েছি। ধৃত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই যদি আওয়ামী লীগের হয় তাতে আমাদের

দোষ কোথায়? কথা বাড়তে না-দিয়ে জনাব তোফায়েল কয়েকজনের নাম করে তাদের অবিলম্বে ছেড়ে দিতে বললেন। তাকে সমর্থন করে আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বললেন,

–যা হবার তা হইছে। এখন এদের ছাড়ার বন্দোবস্ত কর। জবাবে আমি বললাম,

–ধরার বা ছাড়ার মালিক আমরা নই স্যার। চীফের মাধ্যমে আপনার নির্দেশই কার্যকরী করেছি আমরা। ধরার হুকুম দিয়েছিলেন আপনি; ছাড়ার মালিকও আপনি; তবে এ বিষয়ে আইন কি বলে সেটা আমার জানা নেই। ছেড়ে দেয়াটা যদি আইনসম্মত মনে করেন তবে হুকুম জারি করে আইন সংস্থাকে বলেন তাদের ছেড়ে দিতে। আমরা তাদের ছাড়বো কিভাবে? তারাতো এখন আমাদের অধীন নয়। সবাই এখন রয়েছে আইনের অধীনে। আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে। আমার জবাব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেনারেল শফিউল্লাহকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলে উঠলেন,

–বাজান! কিছু একটা কর নইলে দেশে আওয়ামী লীগ একদম শেষ হইয়া যাইবো। জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর 'বাজান' সম্বোধনে বিগলিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায় হাতজোড় করে বললেন,

– স্যার। আপনি অস্থির হবেন না। আমি অবশ্যই একটা কিছু করব। আপনি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। কথাগুলো শেষ করে বসতেও ভুলে গিয়েছিলেন সেনা প্রধান। প্রধানমন্ত্রীর ইশারায় আবার নিজের আসনে বসলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। আমরা সবাই নিশ্চুপ বসে থেকে তার মোসাহেবীপনার কৌতুক উপভোগ করছিলাম কিছুটা বিব্রত হয়ে। After all he is our Chief! ইতিমধ্যে জনাব তোফায়েল শেখ সাহেবের কানে কানে নিচুস্বরে কিছু বললেন। তার কান পড়ায় হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলে উঠলেন,

–কুমিল্লার ক্যাপ্টেন হাই, ক্যাপ্টেন হুদা, লেফটেন্যান্ট তৈয়ব, সিলেটের লেফটেন্যান্ট জহির এদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে হইবে। তারা বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। হুদা ভাইকে উদ্দেশ্য করেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন শেখ মুজিব।

–স্যার ওরা জুনিয়র Subordinate officer. ওরা যা করেছে সেটা আমার হুকুমেই করেছে। অত্যাচারের অভিযোগ সত্যি নয়। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তার পরেও যদি ওদের শাস্তি দিতে চান তবে সেটা সবার আগে আমারই প্রাপ্য। আমাকে ডিঙ্গিয়ে জুনিয়র অফিসারদের শাস্তি দিলে সেটা আমার জন্য অপমানকর হবে। সেক্ষেত্রে কমান্ডার হিসাবে অধীনস্থ সব অফিসার এবং সৈনিকদের কাছে আমি আর ফিরে যেতে পারব না। কর্নেল হুদার জবাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি এবং বললেন,

–ঠিক আছে। আইজ তোরা যা, ডালিম তুই রাইতে খাইয়া যাইস। আমাকে রেখে বাকি সবাই চলে গেলেন। শেখ সাহেব ও আমি বাড়ির অন্দর মহলে ঢুকলাম। রাত তখন প্রায় ১১টা। যথাযথ নিয়মে বারান্দায় খাওয়া পরিবেশন করা হল। খেতে খেতে শেখ সাহেব বললেন,

–তুই থাকতে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের এই দশা অইলো ক্যান?

–চাচা বিশ্বাস করেন আমরা কোন দল দেখে অপারেশন করিনি। চীফ কুমিল্লায় এসে আমাদের বলেছিলেন এবার নাকি আপনি আপনার মরা বাপকেও ছাড়বেন না। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করেছি। আপনি একবার কুমিল্লায় গিয়ে দেখেন লোকজন কি খুশি। সবাই মনে করেছে এবার আপনি সত্যি চাটার দল এবং টাউট বাটপারদের শায়েস্তা করতে চাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে নেতা হিসাবে জনগণের মনোভাবকেই তো আপনার প্রাধান্য দেয়া উচিত। আমিতো মনে করি আমাদের এই অপারেশনের পর আপনার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এখন যেকোন কারণেই আপনি যদি এদের ছেড়ে দেন তবে কি আপনার লাভ হবে? আমারতো মনে হয় ক্ষতিই হবে আপনার। আপনার পরামর্শদাতারা যে যাই বলুক না কেন আমার মনে হয় বিনা বিচারে কাউকেই ছাড়া আপনার উচিত হবে না। এতে ব্যক্তিগতভাবে আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সবচেয়ে বেশি।

–কিন্তু পার্টি ছাড়া আমি চলমু কেমনে? প্রশ্ন করলেন শেখ সাহেব।

–পার্টি আপনার অবশ্যই প্রয়োজন। মনে করেন না কেন এটা একটা শুদ্ধি অভিযান। খারাপদের বাদ দিয়ে সৎ এবং ভালো মানুষদের নিয়েওতো পার্টি চালানো যায়। কিছু মনে করবেন না চাচা; চোর, বদমাইশ, সন্ত্রাসী, লুটেরা, টাউট-বাটপারদের নেতা হিসাবে পরিচিত হওয়াটাকি আপনার শোভা পায়? যারাই ধরা পড়ছে তাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগার। তার মানে বর্তমানে আপনার দলে ভালো লোকের চেয়ে খারাপ লোকই বেশি। এদের বাদ দেন। দেখেন লোকজন কিভাবে আপনাকে সমর্থন জানায়। চুপ করে শুনছিলেন আমার কথা। মুখটা ছিল থমথমে। খাওয়ার পর পাইপ টানার অভ্যাস তার, পাইপটা টেবিলের উপর পরে থাকলেও আজ তিনি সেটা ধরাননি। চিন্তিত অবস্থায় হঠাৎ করে বলে উঠলেন,

–বাঙালি জনগণরে খুব ভালো কইরা চিনি আমি।

বুঝলাম না তিনি এই উক্তিতে কি বোঝাতে চাইলেন। কিছুক্ষণ পর শোবার ঘরে উঠে চলে গেলেন শেখ সাহেব। ওখানে তার কোন আত্মীয় অপেক্ষা করছিলেন। আমিও উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কামাল এসে উপস্থিত।

–বস দিলেনতো আওয়ামী লীগ শেষ কইরা। কাজটা ভালো করেন নাই। উত্তর দিলাম, criminals and bad elements যদি আওয়ামী লীগার হয় তার জন্য আমরা দায়ী না। সারা দিনের ধকলে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিলাম ৩২ নম্বর থেকে। বাসায় ফিরে দেখি আব্বা আমার ফেরার অপেক্ষায় তখনও জেগে বসে আছেন। বুঝতে পারলাম কুমিল্লা থেকে নিম্মী ফোন করে আমার ঢাকায় আসার খবর বাসায় জানিয়েছে।

আব্বা জিজ্ঞেস করলেন-কি হল? সবকিছুই খুলে বললাম তাকে। সব শুনে তিনি বললেন, "তোরা কি ভেবেছিলি? শেখ মুজিব সত্যিই অপরাধীদের ধরার জন্য তোদের মাঠে নামিয়েছে? আমি ওকে ভালো করে চিনি। যখন এসএম হলে জিএস ছিলাম তখন একসাথে মুসলিম লীগের রাজনীতিও করেছি। ওর নীতি বলে কিছু নেই। সারাজীবন ক্লিকবাজী আর লাঠিবাজীর মাধ্যমে নিজের সুবিধা আদায় করে নিয়েছে সে। চরম সুবিধাবাদী চরিত্রের ধুরন্দর শেখ মুজিব। তোদের মাঠে নামিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি

শিকার করতে চেয়েছিল শেখ মুজিব। একদিকে বর্তমানের তীব্র সরকার-বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিশেষ করে জাসদ, সর্বহারা পার্টির সদস্যদের খতম করা; অন্যদিকে সেনাবাহিনী এবং জনগণের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী অংশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীকে তার দলের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত করার জন্যই সে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তার চালকে বানচাল করে দিয়েছিস তোরা। দেখ এখন সে কি করে। তোদের নিয়েই আমার চিন্তা। I hope you and your other colleagues don't get victimised। আব্বার কথাগুলো শুনে জবাবে আমার কিছু বলার ছিল না। তার বক্তব্যের সত্যতা ভবিষ্যতেই প্রমাণ হতে পারে। আব্বা বুঝতে পেরেছিলেন আমি ভীষণ ক্লান্ত। তাই কথা না-বাড়িয়ে বললেন, "কুমিল্লাতে একটা ফোন করে শুয়ে পড়। Don't over estimate Mujib, he is just an average man. আব্বার কথায় কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে জেনারেল শফিউল্লাহ সেনাসদরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে দেখি কর্নেল হুদাকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। হুদা ভাই আমাকে বললেন, "Chief will go with us to Comilla to release all those people. ভীষণভাবে দমে গিয়েছিলাম এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে। হুদা ভাই ভীষণ Upset. ক্যাপ্টেন নূর জেনারেল জিয়ার ADC। তার কামরায় গিয়ে বললাম, বসের সাথে দেখা করতে চাই। নূরের মাধ্যমে খবরটা পেয়েই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনিও গম্ভীর। আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, "Well I know every thing. Don't loose heart. Allah is there. You have done your duty sincerely, so forget about the rest and be at ease." "চীফের সাথে একই হেলিকপ্টারে ফিরে এলাম কুমিল্লায়। চীফ নিজে গিয়ে বন্দীদের মুক্তি দিলেন। আমাদের সামনেই ফুলের মালা গলায় পরিয়ে সমবেত আওয়ামী লীগাররা সদর্পে মিছিল করে চলে গেল শেখ মুজিবের জয়ধ্বনি করতে করতে। বিব্রতকর অবস্থায় intolerable humiliation সহ্য করে নিতে হয়েছিল আমাদের সকলকে। ঢাকায় ফেরার আগে জেনারেল শফিউল্লাহ আমাদের সারমন দিলেন, "Prime minister's desire is an order."

এ ঘটনার ফলে সারাদেশে deployed আর্মির morale একদম ভেঙ্গে পড়েছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ল শেখ মুজিব শীঘ্রই আর্মি অপারেশন বন্ধ করে দিচ্ছেন। এরপর আমরা নামে মাত্র অপারেশনে Deployed ছিলাম। আরোপিত দায়িত্ব পালনে কোন উৎসাহ ছিল না কারোই। কোনরকমে সময় কাটাচ্ছিলাম আমরা।

গ্রেটবাংলা *

মাওলানা ভাসানী বলেন

"আমি বেঁচে থাকি বা না থাকি তোমরা যারা থাকবে, নোট করে রাখো –আমি বলছি– আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মনিপুর ও পশ্চিমবাংলা অবশ্যই দিল্লীর জিঞ্জির ছিন্ন করে স্বাধীন হবেই হবে।"

শেরে বাংলার স্বপ্ন

"বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদ-বুদ্ধি ও স্বার্থে 'বঙ্গ-ভঙ্গ' করে পাকিস্তান হোক এটা আমি চাইনি, বৃটিশের দালাল-কংগ্রেস, মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রকারী-চক্রান্তকারী মাড়োয়ারীরা দুর্বল করে শোষণ করার জন্য সাম্প্রদায়িক 'দ্বি-জাতিতত্ত্বের' দ্বারা বাংলাকে ভাগ করেছে। বাঙলার এই কৃত্রিম ভাগকে বজায় রেখে কোন বাঙালির কল্যাণ নেই, কোন উন্নতি নেই। যেদিন বাংলা এক হবে, 'বৃহৎ বাংলা' কায়েম হবে সে দিনই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, আমার আত্মা শান্তি পাবে।"

আলোচনা ও মতামত গ্রহণের জন্য সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের ঘোষণা পত্র ও গঠন-প্রণালী

বাংলাদেশ সরকার "সমাজতন্ত্র", "গণতন্ত্র", "ধর্মনিরপেক্ষতা" ও "জাতীয়তাবাদ" রাষ্ট্রের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের রং-বেরঙের সমাজতন্ত্রের নামে খাঁটি সমাজতন্ত্রকে দূরে ঠেলিয়া দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চলিতেছে এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে জনগণের সুষ্ঠু ধারণাকে নষ্ট করার প্রয়াস চলিতেছে। গণতন্ত্রের নামে ফ্যাসীজমকে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক এলাকা ভিত্তিতে গঠিত খণ্ডিত বাংলাদেশকে লইয়া ধর্মনিরপেক্ষতার নামে কার্যত সম্প্রদায়িকতাকেই লালন করিতেছে। বহুধা বিভক্ত বাঙালি জাতির একাংশ লইয়া "বাঙালি জাতীয়তাবাদে" ঢোল পিটাইতেছে। অপরদিকে প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক কর্মীগণ সাম্প্রদায়িকতার ও ফ্যাসীবাদের শিকারে পরিণত হইতেছে।

দেশে অসংখ্য নিত্য নূতন সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে এবং পুরাতন দলগুলির ভাঙাগড়া চলিতেছে। পুনর্গঠন ও পুনর্মিলনের মাধ্যমে যথার্থ পথও খুঁজিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সুষ্ঠু জাতীয়তাবাদ ও খাঁটি সমাজতন্ত্রের কর্মসূচিযুক্ত কোন সংগঠন না থাকায় জনগণের সত্যিকারের শোষণ মুক্তির কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। প্রায়

---

* সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের প্রচারপত্র-২ : দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, (সামসুল হক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রেমরঞ্জন দেব কর্তৃক প্রচারিত)।

সকলেই শোষণমুক্ত সমাজ-গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও বহু দল গঠনের মাধ্যমে, জনতা ও কর্মীগণ হতাশার অতল সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। এই সমস্ত দলের প্রতি জনতা ও কর্মীদের অশ্রদ্ধা যতই বাড়িতেছে শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর ফ্যাসীবাদী আক্রমণও ততই বাড়িতেছে।

সারা বাংলার নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগণের অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যার মৌলিক সমাধানের প্রশ্নকে 'পাকিস্তান' 'জয়বাংলা' 'মুসলিম বাংলা' 'আজাদ বাংলা' এবং 'নয়া পাকিস্তান' প্রভৃতি কৃত্রিম শ্লোগান দ্বারা বাঙালি জনগণকে বিশেষ করিয়া যুব সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়া তুলিতেছে। অপর পক্ষে যাহারা সাম্প্রদায়িক বিভাগকে স্বীকার করিয়া শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের কথা বলেন তাহাদিগকে ভাওতাবাজী বিপ্লবী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

মজলুম বাঙালি জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর বহু বিঘোষিত "সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ বাঙলা" গড়িয়া তোলার ব্যাপারে এ-পর্যন্ত কোন দল বা গোষ্ঠী উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। কার্যত মাওলানা ভাসানীর এই মহান স্বপ্ন অনেকের কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে।

মাওলানা ভাসানীর এই মহান স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে এই মুহূর্তে সত্যিকারের সর্বহারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ খাঁটি সমাজতান্ত্রিক কর্মীদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল সমূহের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া ঐক্যবদ্ধ করিতে না-পারিলে দেশ ও জনগণকে ফ্যাসীবাদ, সম্প্রসারণবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, সংশোধনবাদ, সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে রক্ষা করা যাইবে না, জাতীয় মুক্তি অর্জন করা যাইবে না এবং জনতার শোষণ মুক্তি কিছুতেই সম্ভব হইবে না।

তাই এই সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের প্রথম ও প্রধান কাজ হইবে :

(১) ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা, (২) জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ কর্মীদিগকে সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরে সংগঠিত করা (৩) যাহারা নেতৃত্বের মোহে নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হইতে চাইবে না জনতার সামনে তাহাদের মুখোশ উন্মোচন করা।

শিবিরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবির ইহাও ঘোষণা করিতেছে যে, কেবল নেতার ঐক্য এবং দলের ঐক্য দিয়া বাঙালি জাতির কোন সমস্যার সমাধান হইবে না। কারণ গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় পানি ঢালিলে যেমন গাছ বাঁচানো যায় না ঠিক তেমনি দেশকে টুকরা টুকরা করিয়া দ্বিজাতিতত্ত্বের "সাম্প্রদায়িক" গলাকাটা সীমান্তকে লালন-পালন করিয়া জাতীয় মুক্তি আসিতে পারেনা, জাতির কোন বিকাশও ঘাটিতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবির কবিগুরুর বৃহৎ বাংলার স্বপ্ন—"আমার সোনার বাংলা" গড়িয়া তোলা, মরহুম শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক; সি. আর. দাস; সুকান্তের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য, তাঁহাদের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার জন্য, বিদ্রোহী

কবি নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণাকে পাথেয় করিয়া এবং মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর নির্দেশিত পথ ধরিয়া "সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ বাংলা" কায়েম করার শপথ গ্রহণ করিতেছে।

* যাহারা সর্বহারা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ও খাঁটি সমাজতন্ত্র কায়েম করিতে চায় এবং যাহারা বাংলা ভাষাভাষী এলাকা তথা বাংলাদেশ, পশ্চিম বাঙলা, আসাম, ত্রিপুরা মেঘালয়, মনিপুর প্রভৃতি এলাকাকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া 'সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ বাংলা' গঠনে বদ্ধপরিকর, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে যে কোন বাঙালি এই সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরে যোগদান করিতে পারিবে।

এবং

* যাহারা সর্বহারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করিবে, যাহারা খাঁটি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে, যাহারা আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার মজলুম জনগণের অবিসম্বাদিত নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নির্দেশিত "সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ বাঙলা" গঠনের বিরোধিতা করিবে তাহাদিগকে এই শিবির সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, সম্প্রসারণবাদ, ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করিবে।

* সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবির 'সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ বাংলার' অভ্যন্তরে বিদেশী পুঁজি, ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদেশী সংস্থা এবং তাহার এজেন্ট-দালালদের উৎখাত করার সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।
* উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবির যে কোন গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে সহযোগিতা করিয়া কাজ চালাইয়া যাইবে।

খসড়া গঠন প্রণালী

* কমপক্ষে ৫ জন লইয়া একটি স্কোয়াড বা ইউনিট গঠন করা যাইবে।
* প্রতি স্কোয়াড বা ইউনিটের একজন নির্বাচিত দলপতি থাকিবে।
* দলপতিদের দ্বারা একটি "কেন্দ্রীয় সর্বোচ্চ পরিষদ" গঠিত হইবে।
* সর্বোচ্চ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন।
* সর্বোচ্চ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপদেষ্টাদের লইয়া চেয়ারম্যান পরিষদের কার্য পরিচালনা করিবেন।
* সর্বোচ্চ পরিষদের চেয়ারম্যানই সর্বোচ্চ পরিষদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

স্কোয়াড বা ইউনিট গঠনের যোগ্যতা

যে ব্যক্তি বা ৫ সদস্যবিশিষ্ট দল সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের "তথ্য সংগ্রহ অভিযানের' প্রাথমিক কাজ সম্পাদন করিতে পারিবে সেই ব্যক্তি অথবা সদস্য দলকে একটি স্কোয়াড বা ইউনিট গঠনের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

শৃঙ্খলা রক্ষা প্রসঙ্গে
কোন স্কোয়াড বা ইউনিট সম্পর্কে বা ইউনিটের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা লিখিতভাবে সরাসরি সর্বোচ্চ পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে প্রেরণ করিতে হইবে। চেয়ারম্যান খোঁজ খবর বা তদন্ত করিয়া যে কোন স্কোয়াড বা ইউনিটকে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন এবং তৎপরিবর্তে একটি নতুন স্কোয়াড গঠন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

যোগাযোগ কেন্দ্র
যাহারা সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের বক্তব্য, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও গঠন প্রণালী গ্রহণ করিয়া সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহাদের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের প্রধান সংগঠক জনাব বজলুস সাত্তার, বার-এট্-ল, অথবা আজাদ সুলতান, ৮৫নং মতিঝিল (বাণিজ্যিক এলাকা) ঢাকা–২ ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ করা যাইতেছে।

* সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের খসড়া ঘোষণা ও গঠন-প্রণালী সম্পর্কে মতামত ও পরামর্শ আহ্বান করা যাইতেছে।

সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের কেন্দ্রীয় সংগঠক হিসাবে এ পর্যন্ত যাহারা যোগদান করিয়াছেন
১। জনাব বজলুস সাত্তার বার-এট-ল, চট্টগ্রাম, (২) আল্‌হাজ্ব মাওলানা আরিফুর রহমান সুধারাম, নোয়াখালী, (৩) জনাব আজাদ সুলতান–বরিশাল, (৪) জনাব লুৎফর রহমান–সিলেট, (৫) জনাব শামসুল হক–ঢাকা (৬) জনাব জানে আলম চৌধুরী, মানিকগঞ্জ (৭) শ্রী প্রেমরঞ্জন দেব, (৮) রোকেয়া সুলতানা। (৯) জনাব হারুন-উর রশীদ–কুমিল্লা।

সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের শ্লোগান ও দেয়াল পত্র

* সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ বাংলা–কায়েম কর, কায়েম কর।

* বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মনিপুরকে–এক কর, এক কর।

* সর্বহারা বাঙালি জাতীয়তাবাদ–কায়েম কর, কায়েম কর।

* দুনিয়ার বাঙালি–এক হও।

* সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, সম্প্রসারণবাদ, সংশোধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ কর।

* হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই–বাঙালিদের মধ্যে বিরোধ নাই।

দেয়াল পত্র

* বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে এক করতে হবে,
নইলে বাঙালি মরতে হবে!

* "সাম্রাজ্যবাদী র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ গলাকাটা
সাম্প্রদায়িক সীমান্তকে ধ্বংস কর, হিন্দু-বাংলা,
মুসলিম বাংলার ক্ষত চিহ্নকে মুছে ফেল,
বাঙালি জাতীয়তাবাদ কায়েম কর।"

*

* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ বাংলার স্বপ্ন :
"আমার সোনার বাঙলাকে'
বাস্তবায়িত কর।

*

* "পাকিস্তানের পাঞ্জাবী আর হিন্দুস্থানের মাড়োয়ারী
শোষকদের কবল থেকে বাঙালিদের মুক্ত কর।"

*

* "সাড়ে সাত কোটির বাঙলা নয়– সাড়ে বার কোটির বাংলা চাই।"

*

"সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে, সাম্প্রদায়িকতাই সব আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেয়। বাংলাদেশ ও ভারতের শাসকগোষ্ঠী বৃহৎ বাংলার আন্দোলন ও জনতার ভাত-কাপড়ের আন্দোলনকে পণ্ড করে দেয়ার জন্য সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিচ্ছে।" –ভাসানী

*

সর্বহারা বাঙালি জাতীয়তাবাদ–জিন্দাবাদ।

সমাজতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের তথ্য সংগ্রহ অভিযান–১

আপনার ধারণা কতখানি সঠিক, আপনার সিদ্ধান্ত কতখানি নির্ভুল, আপনার কাজ কতখানি আন্তরিক তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আপনার এলাকা সম্পর্কে সঠিক জরিপ কার্য ও তথ্য সংগ্রহের উপর।

এই তথ্য সংগ্রহ অভিযান মারফত দুইটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা করা যাইবে : (১) কোন কর্মী অথবা কর্মীদলের নিজ এলাকার সাথে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; (২) স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন শ্রেণীর বাঙালিরা সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব পক্ষপাতহীন তথ্য, বিবরণ, বাস্তব অভিজ্ঞতাসমূহ সংগ্রহ করিয়া, সম্ভব হইলে ক্ষয়ক্ষতির, ধবংসস্তূপের ছবি, কঙ্কালের ছবি, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের ছবি, মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি তুলিয়া প্রেরণ করিবেন।

গ্রাম বা ইউনিয়ন ভিত্তিতে সকল তথ্য বিবরণসমূহ "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ" নামক বুলেটিনে ধারাবাহিভাবে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের জবাব সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিতে হইবে :

(১) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে পাকিস্তানের দস্যু সৈন্যবাহিনী ও দালাল রাজাকার, আলবদর, আল-সামস, মোজাহিদ, হিজবুল্লাহ, এবং সি, আই, এ, প্রভৃতি ভাড়াটিয়া বাহিনীর পশুরা কত লোককে এর মধ্যে হত্যা করিয়াছে? এবং কি জঘন্য কায়দায় হত্যা করা হইয়াছে? কৃষক শ্রমিক, ছাত্র কতজন?

(২) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে কতজন লোককে বিকলাঙ্গ-অকেজো করিয়াছে?

(৩) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে কি পরিমান ফসল ধান-পাট নষ্ট করিয়াছে?

(৪) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে কি পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস করিয়াছে, জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দিয়াছে? হাট-বাজার দোকানের সংখ্যা, ক্ষতির পরিমাণ কত?

(৫) আপনার গ্রাম/ইউনিয়ন হইতে কি পরিমাণ জিনিসপত্র লুটপাট, চুরি, ডাকাতি করিয়া লইয়া গিয়াছে?

(৬) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে কতখানা ঘরবাড়ি, কতটা স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, লাইব্রেরী, ক্লাব, পাঠাগার ধ্বংস করা হইয়াছে, জ্বালাইয়া দিয়াছে, কিভাবে ধ্বংস করা হইয়াছে? প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম কি?

(৭) আপনার গ্রাম/ইউনিয়ন হইতে কত শত লোক দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল? কোন সম্প্রদায়ের কতজন?

(৮) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে কতজন মেয়েলোকের উপর ব্যভিচার চালাইয়াছে এবং হত্যা করিয়াছে, কতজন মেয়েলোক নিখোঁজ রহিয়াছে? তাহাদের নাম-ঠিকানা?

(৯) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নের কতজন লোক এ পর্যন্ত নিখোঁজ রহিয়াছে? নাম-ঠিকানা?

(১০) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে মুক্তিযুদ্ধ কালে খানসেনা ও দালাল বাহিনীর দ্বারা কত বধূ বিধবা হইয়াছে, কত ছেলেমেয়ে শিশু সন্তান অনাথ-এতিমে পরিণত হইয়াছে?

(১১) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নের কতজন লোক মুক্তিযুদ্ধ কালে না-খাইতে পাইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে, কতজন আত্মহত্যা করিয়াছে? কতজনের চিকিৎসার অভাবে এবং না-খাওয়া জনিত রোগে মৃত্যু হইয়াছে?

(১২) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে অত্যাচার-নির্যাতনে কতজন পুরুষ ও মহিলা পাগল হইয়াছে?

(১৩) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে হানাদার বাহিনীর হামলার ফলে কত আবাদী জমি খিল বা অনাবাদী রহিয়াছিল আনুমানিক কত টাকার ফসল হইতে পারিত?

(১৪) আপনার গ্রাম/ইউনিয়ন হইতে পাক দস্যু তস্কর বাহিনী ও সহযোগী দালাল বাহিনীর পশুরা কতটা গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, ডিম এবং কি পরিমাণ মাছ জোরপূর্বক লইয়া গিয়াছে?

(১৫) আপনার গ্রাম/ইউনিয়ন হইতে কতজন লোক প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করিয়াছে? এর মধ্যে কতজন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক রহিয়াছে? মুক্তিযুদ্ধ কালে কতজন শাহাদত বরণ করিয়াছে? নাম-ঠিকানা কি?

(১৬) আপনার গ্রাম/ইউনিয়ন হইতে প্রত্যক্ষভাবে কত লোক রাজাকার, আলবদর, আল-সামস, মোজাহিদ, হিজবুল্লাহ, জামাত ইত্যাদি দালাল-বাহিনীতে যোগদান করিয়া বাংলার জনগণের ক্ষতি সাধন করিয়াছে? তাহাদের নাম, ঠিকানা?

(১৭) আপনার গ্রাম/ইউনিয়ন হইতে মুক্তিবাহিনী কতটি দালাল সহযোগী ডাকাতদের হত্যা করিয়াছে? তাহাদের নাম ঠিকানা?

(১৮) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে মুক্তিযুদ্ধ কালে বিশেষ বিশেষ কি কি ঘটনা, অভিজ্ঞতা রহিয়াছে? যুদ্ধের গতি প্রকৃতি, রূপ, ধারা বিবরণ কি রকম ছিল?

(১৯) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে বর্তমানে কি পরিমাণ আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি রহিয়াছে? আবাদ করিবার ব্যবস্থা করিলে কি পরিমাণ টাকার ধান, চাউল, পাট বা তরিতরকারি হইতে পারে? কি কি কারণে আবাদ করা হইতেছে না?

(২০) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে কতজন ক্ষেত মজুর, ভূমিহীন, কৃষি বেকার, শিক্ষিত, অশিক্ষিত বেকার রহিয়াছে?

(২১) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে কতজন ভিখারী, অন্ধ, খঞ্জ, লুলা, বোবা, বিকলাঙ্গ লোক রহিয়াছে?

(২২) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে ধান-চাউল, সরিষার তেল, কেরোসিন তেল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বর্তমান দর কি?

(২৩) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নের মুজিববাহিনী কতজন নিরীহ লোক ও মুক্তিবাহিনীকে হত্যা করিয়াছে?

(২৪) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে কতজন লোক অভাবের তাড়নায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে?

(২৫) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে কি পরিমাণ ডাকাতি হইতেছে। মুজিববাহিনী অথবা রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার চলিতেছে কিনা, কিভাবে চলিতেছে দালাল আইনে কতজন আটক আছে?

(২৬) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে কোন রাজনৈতিক দলের শাখা আছে কিনা? কোন দল রহিয়াছে? কোন খবরের কাগজ যায় কিনা?

(২৭) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে রিলিফের মাল কি পরিমাণ গিয়াছে এবং গরিবদের মধ্যে বিতরণ হইতেছে কিনা?

(২৮) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কত?

(২৯) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে জমি, ঘরবাড়ি বে-দখল হইতেছে কিনা? কি ধারায় হইতেছে? কাহারা করিতেছে?

(৩০) আপনার গ্রাম/ইউনিয়নে কতটা গ্রাম আছে? গ্রামসমূহের নাম এবং সংখ্যা কত?

মওলানা ভাসানীর সত্য ভাষণ

গত ১৯৭২ সালের ১৯ শে অক্টোবর সন্তোষে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ
কৃষক সমিতির সাংগঠনিক কমিটির সভায় মজলুম জননেতা
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন

* স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অসংখ্য পত্র-পত্রিকা, নাটক, ড্রামার মাধ্যমে এবং অসংখ্য জনসভায় বহুবার প্রচারিত হয়েছে—"এপার বাংলা-ওপার বাংলা এক বাংলা। এক দেশ, এক ভাষা, এক কৃষ্টি, এক ঐতিহ্য, এক জাতিকে যারা ভাগ করে রাখতে চায়, মাতৃভূমিকে খণ্ড-বিখণ্ডিত করে রাখতে চায় তারা বাঙালি জাতির দুশমন।

* একথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, বৃটিশ ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষকরা এই দেশে তাদের শোষণ শাসনকে চিরস্থায়ী–পাকাপোক্ত করার জন্য হিন্দু-মুসলমান "দ্বিজাতিতত্ত্বকে" হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিল। বৃটিশ বেনিয়ারা ভারতে একমাত্র বাংলাকেই ভয় করতো কারণ, সহায় সম্পদে পরিপূর্ণ ও জন-বলে এমন শক্তিশালী বাংলাদেশ ও জাতিকে ভাগ করতে না-পারলে, ভাঙতে না-পারলে এই দেশে কিছুতেই টেকা যাবে না, বাংলার উপর তাদের কর্তৃত্ব থাকবে না। এই কারণেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই দেশের কতিপয় মীরজাফর পোষ্য নাইট-নওয়াব বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় বাংলাকে ভাগ করে দেয়।'

* ১৯৪৬ সালে শেরে বাংলা, আমি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, কিরণশংকর রায়, বিধান চন্দ্র রায়, মাওলানা আকরমসহ ১৮৬ জন বাঙালি একত্রিত হয়ে অখণ্ড বাংলার দাবি তুলেছিলাম।

* সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাজনীতিতে এক। তাই বলে সেকুলারিজমের নামে এক ধর্মের মানুষ কর্তৃক অন্য ধর্মের মানুষের ধর্মে-কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়।

* বাংলার জনগণের মধ্যে শত সহস্র বছরের একতা, বন্ধুত্ব, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, আদান-প্রদান, মিল মহব্বতের চাইতে ২৫ বৎসরের (১৯৪৭ সাল থেকে) সাম্রাজ্যবাদী কৃত্রিম বিভাগ ও বিচ্ছেদ, বিভেদকে আমরা আর বড় করে দেখতে চাই না।

* আমি বিশ্বাস করি-বাংলার মুসলমানের শত্রু হিন্দু নয়, হিন্দুর শত্রু মুসলমান নয়। এপার বাংলা আর ওপার বাংলার মিলিত হিন্দু-মুসলমানের একমাত্র শত্রু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও ফ্যাসিবাদ। শোষকের কোন জাত নেই, ধর্ম নেই একমাত্র শোষণ করা ছাড়া। শোষক হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মজলুম জনগণের হাতে তার কোন রেহাই নেই, কোন নিস্তার নেই।

* ঐতিহাসিক বাস্তব কারণেই আমি বিশ্বাস করি–অতীতে যেমনি বাংলার সাধারণ মানুষ মিলিত ভাবে হিন্দু-মুসলমান মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে ক্ষুদিরাম, সুর্যসেন, সুভাষ, তিতুমীরের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলার জন্য সংগ্রাম করেছে, জীবন দিয়েছে, যেমনি বাংলার মিলিত হিন্দু-মুসলমান পিণ্ডির শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ঠিক তেমনি নিখিল বাংলার হিন্দু-মুসলমান কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনগণ দিল্লীর সম্প্রসারণবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেই করবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী*

'বৃহৎ বাংলা চাই' : নির্বাচনে 'তবুও অংশগ্রহণ করিব'

গতকাল (সোমবার) অপরাহ্নে ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে একটি দলিলের ফটোস্ট্যাট কপি দেখাইয়া বলেন : "জনৈক মন্ত্রী গত ২৪-১০-৭২ তারিখে আনুমানিক ১২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ২০ হাজার টাকার স্ট্যাম্পের উপর রেজিস্ট্রী করিয়া জনৈক মনোরঞ্জন রায় চৌধুরীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন। এই সম্পত্তির মধ্যে ১৭ টি কামরাযুক্ত ৩৬ ডেসিমেল জায়গার উপর একটি দোতলা বাড়ি অন্যত্র ৪টি টিনের ঘর এবং আরও ৪৩ শতাংশ জমি রহিয়াছে।"

ন্যাপ প্রধান এই সম্পত্তির মূল্য ১২ লক্ষ টাকা বলিয়া দাবী করেন এবং বলেন উক্ত মন্ত্রী এত টাকার সম্পত্তি কিভাবে একদিনে ক্রয় করিতে পারেন এবং পূর্বে তাঁহার সম্পত্তির পরিমাণ কি ছিল সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একজন বিচারপতির কর্তৃত্বে একটি কমিশন গঠন করিতে হইবে।

মওলানা ভাসানী সাংবাদিক সম্মেলনে একটি প্রচারপত্রের ফটোস্ট্যাট কপিও পেশ করেন। এই প্রচারপত্র কেন্দ্রীয় 'ভারত বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত পরিষদ' কর্তৃক প্রচারিত এবং ইহাতে বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার অহ্বান জানান হইয়াছে। মওলানা ভাসানী এই ধরনের প্রচারপত্রের রহস্য উদঘাটন করিয়া অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি 'বৃহৎ বাংলার' দাবী জানাইয়া বলেন, 'বৃহৎ বাংলা' কোন সাম্প্রদায়িক দাবী নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৮৬ জন। বৃহৎ বাংলা হইলে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়াইবে শতকরা ৫০ জন। তবু বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বার্থেই বৃহৎ বাংলা গঠন করিতে হইবে। বৃহৎ বাংলা প্রস্তাবটি গণভোটে দিবার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন যে, প্রস্তাবটি বাতিল হইলে জীবনেও ও কথা তিনি আর উচ্চারণ করিবেন না। তিনি বলেন "পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ 'বৃহৎ বাংলা' চায়। আওয়ামী লীগের মেম্বারদের শতকরা ৭৫ জনই এর পক্ষে তাও আমার জানা আছে। তিনি বলেন; "মুসলিম বাংলা বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। বাংলাদেশে তো এমনিতেই শতকরা ৮৬ ভাগ মুসলিম রহিয়াছে। আবার নূতন করিয়া মুসলিম বাংলা গঠন করিতে হইবে কেন? বিদেশী চক্রান্তকারীরাই এসব করিতেছে। ভারতও করিতে পারে। আমি জীবন থাকিতে বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইতে দিব না।"

প্রশ্ন : 'মুসলিম বাংলা' প্রচারপত্র ছড়াইতেছে একথা কি সত্য নয়'?

---

* দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭২

উত্তর : 'আমার হাতে পড়ে নাই। তবে ইহা বিদেশী চক্রের কাজ হইতে পারে। বৃটিশ গভর্নমেন্টও 'ডিভাইড এন্ড রুলে'র জন্য এই ধরনের লিফলেট ছাড়িত।"

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন না যে, 'অখণ্ড ভারতে'র প্রচারপত্রটিও এই ধরনের একটি স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজি?"

উত্তর : "হইতে পারে। তবে অনুসন্ধান করিতে হইবে।"

মওলানা ভাসানী বলেন : আগামী ২৪ শে ডিসেম্বর আমি সন্তোষে মুসল্লী সম্মেলন করিতেছি। এই ব্যাপারে ঢাকায় লিফলেট বিলির জন্য চারজন কর্মীকে প্রহার করিয়া থানায় আটকানো হয়। এইমাত্র জয়কালী মন্দির রোডে লিফলেট বিলির অপরাধে একজন কর্মীর মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি সরকারের নিকট এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।

'বিজয় দিবস' সম্পর্কে মওলানা সাহেব বলেন এ স্বাধীনতা ভৌগোলিক স্বাধীনতামাত্র। জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়। লক্ষ কোটি টাকা খরচ করিয়া ঢাকায় বিজয় উৎসব না-করিয়া সমস্ত ইউনিয়নে ইউনিয়নে উৎসবের ব্যবস্থা করা যাইত।

ন্যাপ প্রধান অভিযোগ করেন যে, ভারতের ব্যাংকে বাংলাদেশের মন্ত্রীদের টাকা-পয়সা জমা রহিয়াছে। তিনি এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি রক্ষীবাহিনীর পোশাক পালটানোর জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। ভাসানী নিয়মিত সামরিক বাহিনীতে লোক নিয়োগ এবং বেকার মুক্তিবাহিনীকে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান। মওলানা ভাসানী বলেন, "আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিব। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাহাতে শতকরা ১০ জনের বেশি লোক ভোট দিবে বলিয়া মনে হয় না। নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হইবে বলিয়াও মনে হইতেছে না। তবু ইলেকশন করিব কারণ সকলকে জানানো দরকার আসলে নির্বাচনটি কেমন ধরনের হইবে।"

প্রশ্ন : আপনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন?"

উত্তর : 'না' "আমি নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ। এই বয়সে ইলেকশন করিয়া কি করিব"

এই পর্যায়ে পার্শ্বে উপবিষ্ট ন্যাপনেতা বলেন, এটা পার্টির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। হুজুর বলিতে পারেন না।"

মওলানা ভাসানী বলেন বাংলাদেশে কোনদিন সাম্প্রদায়িকতা স্থান পাইবে না। সেদিন শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি কোনদিন সাম্প্রদায়িক ছিলাম না; এখনো সাম্প্রদায়িক নই।'

তিনি অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের এবং পাকিস্তানে আটক সাড়ে পাঁচ লক্ষ বাঙালিকে অবিলম্বে ফেরত পাঠানোর জন্য ভুট্টোর প্রতি আহবান জানান।

সভাপতির ভাষণ*
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

মাননীয় প্রধান অতিথি, সুধীবৃন্দ, আমার সাথী ভাই ও বোনেরা,
সংগ্রামী মানুষের পক্ষ হয়ে আপনাদের জানাই আমাদের সংগ্রামী অভিনন্দন।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের তিনদিবস ব্যাপী প্রথম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে আমরা মিলিত হয়েছি। আমাদের এই মিলন সম্মেলন কয়েক হাজার ব্যক্তির মিলন কেবল নয়,–এখানে যারা আজ উপস্থিত, তারা প্রত্যেকই বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে থাকা সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতিনিধি। আজকের এ পরিসর ক্ষুদ্র হতে পারে, আয়োজন হয়ত সামান্য–কিন্তু এ সম্মেলন থেকে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে জাতিকে–এদেশের গরীব দু:খী মেহনতী জনতাকে। সে দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করতে হবে এবং সে কারণেই আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

গত ছয় মাসে আমরা বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, প্রতিটি থানা ও জেলা ভিত্তিতে কর্মী সম্মেলন ও জনসভায় বক্তৃতা করেছি। অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগে আমরা একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি, তা হলো এদেশের মানুষ নেতা সৃষ্টি করতে চায়না, চায় সঠিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে। আর সে সঠিক নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য যে সংগঠন, আদর্শ, কর্মসূচী, রণকৌশল ও কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন– সে চাহিদা পূরণ করতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল আদৌ সক্ষম হবে কিনা তা দেখার জন্য এদেশের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সুতরাং আর দশটি রাজনৈতিক দলের ন্যায় সনাতনী প্রথায়, বাতাসে কথার তুবড়ি–ও হুঙ্কার ছেড়ে আমরা যদি আমাদের এ সম্মেলন সমাপ্ত করি তা হলে অন্য সকলের মত আমরাও জনতাকে ধোঁকা দিচ্ছি বলে ধরে নেয়া হবে। সুতরাং জাতীয় জীবনের এ চরম দুর্যোগময় মুহূর্তে যেন আমাদের দায়িত্ব পালনে সামান্যতম দুর্বলতা প্রকাশিত না–হয়, সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য এবং সেই অনুযায়ী আমাদের মন, মানসিকতা ও কর্মধারা পরিচালিত করার আবেদন জানিয়ে আমি সংগঠনের সভাপতি হিসাবে আমাদের জাতীয় ও সংগঠনের বিভিন্ন সমস্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমার এ ভাষণে আলোকপাত করবো।

প্রিয় বন্ধুরা,
দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কয়টি বিষয় দেশের আপামর জনসাধারণের মন ভীষণ ভাবে নাড়া দিচ্ছে, এবং যে কয়টি বিষয় গোটা জাতিকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, সে সম্পর্কে

---

* প্রথম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা ১১ মে, ১৯৭৩

আমি সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাধানের পথ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

প্রথমত দেশের বর্তমান খাদ্যাভাব ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতি আলোচনা করছি। প্রথমেই বলে রাখছি যে,খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে সরকার প্রদত্ত তথ্য, পরিসংখ্যান ও বাজে অজুহাতের সংগে আমরা মোটেই একমত নই। কৃষকের উৎপাদন শক্তি না-বাড়িয়ে, অর্থাৎ কৃষিকে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল শক্তি হিসাবে গণ্য না-করে যত বড় পরিকল্পনার কল্পনাই করা হোক না কেন, সে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সরকার কৃষি বিষয়ক যে-নীতি অনুসরণ করছে, তাতে সারা দেশে খাদ্যাভাব প্রকট হওয়াটাই স্বাভাবিক। কৃষকের পরিশ্রমের মূল্যায়ন না-করে, কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষিজ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা ও প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও জলসেচের ব্যবস্থা না-করে এবং জমিদার, জোতদার ও বড় কৃষকের বহুমুখী শোষণ থেকে সত্যিকারের কৃষকদের মুক্তির বাস্তব পদক্ষেপ ছাড়া বড় বড় বক্তৃতা-বিবৃতি বা উৎপাদন-বৃদ্ধির ডাক দিলেই উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। আর, যেহেতু বাংলাদেশে বর্তমানে কৃষকের উন্নতির কোন প্রকার চেষ্টাই করা হচ্ছেনা সেহেতু আমরা বর্তমান খাদ্য সমস্যাকে কৃত্রিম ও বর্তমান সরকার সৃষ্টি বলে ঘোষণা করছি। বহু কৃত্রিমতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, অসৎ ব্যবসা, কালোবাজারী ও সীমান্ত চোরাচালানী–এইসবের ফলে খাদ্যসংকটের কৃত্রিমতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই সব কিছুর পিছনে রয়েছে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা। ভাত খেতে অভ্যস্ত বাঙালিকে গম খাবার উপদেশ দেওয়া সমস্যা সমাধানের কোন পথ নয়। সুতরাং চালের উৎপাদন হ্রাসসহ অন্য যে সব কারণে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে তার প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করলে সারা দেশ বর্তমান খাদ্যসমস্যা জনিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে

(ক) পরিবার পিছু সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ ২৫ বিঘা নির্ধারণ করে ‘মেহনত যার ফসল তার’ এ ভিত্তিতে জমি বণ্টন ও রাষ্ট্রীয় তত্বাবধানে কম দামে কৃষকের জন্য সার, বীজ সরবরাহ করতে হবে।

(খ) যৌথ খামার-ব্যবস্থা চালু করে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(গ) কৃষি ঋণ কৃষকের ঘরে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) চর এলাকাভুক্ত জমি ও পতিত জমিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে উৎপন্ন ফসল সরকারী গুদামজাত করতে হবে।

(ঙ) বেশি ফলানোর জন্য গবেষণা পরিচালনা করতে এবং গবেষণার ফল চাষীদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

(চ) কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ছ) কৃষকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক জ্ঞান সম্প্রসারিত করার জন্য রাজনৈতিক সংগঠকদের কৃষকদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

(জ) নিম্ন-আয়ের নাগরিকদের রেশনে পর্যাপ্ত চালের বরাদ্দ করতে হবে।

(ঝ) খোলাবাজারে চালের দাম নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

(ঞ) সীমান্ত এলাকায় পাঁচ মণের অধিক চাল আনা-নেয়া বেআইনী ঘোষণা করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ট) বেসরকারী যে কোন প্রকার চাল গুদামজাত নিষিদ্ধ করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা চালু করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত উপরোক্তভাবে দেশের খাদ্যাভাব দূর করা যেতে পারে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য একমাত্র দায়ী বর্তমান সরকারের অযোগ্যতা। অর্থনৈতিক জ্ঞান বর্জিত এই সরকার দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ও চাহিদার অনুপাত নির্ণয় না-করে, যে বেহিসেবী কারেন্সী নোট বাজারে চালু করেছে তার ফলে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি এবং সে কারণেই বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি থেকে গোটা জাতিকে মুক্তি দিতে হলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে :

(ক) দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ও চাহিদার সংগতি স্থাপন করতে হবে।

(খ) বর্তমানে প্রচলিত সকল প্রকার নোট অচল ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী 'গোল্ড রিজার্ভ' অনুপাতে নতুন কারেন্সী নোট চালু করতে হবে।

(গ) দেশী-বিদেশী সকল ব্যাংকে রক্ষিত–প্রত্যেক ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের একাউন্ট নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং 'ব্লাকমানির' সকল একাউন্ট বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

(ঘ) সকল প্রকার বিদেশী ভোগবিলাস সামগ্রী আমদানী বন্ধ ও ব্যবহার-নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

(ঙ) প্রাথমিক পর্যায়ে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মাথাপিছু পরিমাণ বেঁধে দিতে হবে এবং ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(চ) ক্ষমতাসীন দলীয় সদস্য ও সমর্থকদেরকে দেয়া সকল লাইসেন্স-পারমিট বাতিল করে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে সত্যকারের সৎ ব্যবসায়ীদের হাতে ব্যবসা ছেড়ে দিতে হবে।

আমরা মনে করি বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবল উপরোক্ত উপায়েই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

বন্ধুগণ,

এবার আমি দেশের বর্তমান নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির কথা আলোচনা করব। যে-কোন দেশের যে কোন পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে সে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সারাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অরাজকতা সমগ্র দেশ ও জাতিকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যে যুবসমাজ মাত্র পনের মাস আগে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলো, যে কৃষক ও শ্রমিক আত্ম-স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল এবং যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসহযোগী মনোভাবের জন্য তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে পাকিস্তানিদের শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়েছিলো, সে যুব সমাজের এক অংশ আজ কেন এত বেশি উচ্ছৃংখল ও লোভী, এবং সে কৃষক-শ্রমিক আজ কেন কারো উপর আস্থা আনতে পারছে না, সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ কেন এতবেশি হতাশ? উত্তর অতি সহজ এবং সে উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় এসব মানুষগুলোর সাথে নৈকট্য স্থাপন

করলেই। যে দেশের প্রায় গোটা জনসমষ্টি–সম্পূর্ণ মন-প্রাণ-দেহ ও পার্থিব সর্বস্ব কিছুর বিনিময়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কামনা করেছে এবং যে স্বাধীনতার পর সুখী ও সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে বলে আশা করেছিলো, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মাত্র পনের মাসের মধ্যে সে সব আশাই এক শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ উদ্ধার, ভোগবিলাস, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এবং দেশশাসনের নামে কুশাসন ও শোষণের ফলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। মানুষ আশা করেছিলো অস্ত্র দিয়ে জয় করে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় করা হবে, মানুষ আশা করেছিলো সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এদেশের প্রত্যেকেই আরো অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠবে, যার ফলে সকল শোষক ও শ্রেণীবিভক্তির বিলোপ ঘটবে এবং রক্ত চক্ষুর শাসনের ঘটবে চির অবসান। কিন্তু দুর্ভাগ্য এদেশের, দুর্ভাগ্য এ জাতির। স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে যাদের কোন সম্পর্ক ছিলো না, যুদ্ধ যারা করেনি বা অস্ত্র যারা ধরেনি, তারাই যখন দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো তখন থেকেই অর্থাৎ দেশশত্রুমুক্ত হওয়ার পর থেকেই যুবসমাজকে আখ্যা দেওয়া হলো স্বাধীনতার শত্রু হিসাবে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চিহ্নিত করা হলো দুস্কৃতিকারী হিসাবে। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসহযোগী মনোভাব পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়েছিলো, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের সাংসারিক বাস্তব অসুবিধার জন্য দেশত্যাগ করতে পারেনি, তাদের সকলকে 'দালাল' বলে আখ্যায়িত করা হলো। আর অন্যদিকে যারা বাঙালি নিধনযজ্ঞে পাকিস্তানিদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিলো, তারাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো। এখানেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। স্বাধীনতা-প্রত্যাশী যুবসমাজ, মুক্তিযোদ্ধা, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষক-শ্রমিক একদিকে আর অন্যদিকে রইল সমাজের গুটিকতক মানুষ। তারা সংখ্যায় নগণ্য হলেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কারণে তারা প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। এই দ্বন্দ্বের ফলেই আজ সারা দেশে গুপ্তহত্যা, অপহরণ, ভয়-ভীতি-সন্ত্রাস, হুমকি-গুণ্ডামী, রক্ষীবাহিনী সহ বিভিন্ন বাহিনীর নির্যাতন, শোষণ ও কুশাসন। যে তিরিশ লক্ষ মানুষ স্বাধীনতার জন্য শহীদ হয়েছে, তাঁদের অসমাপ্ত কাজ সমাধা করার জন্য আমরা যারা আজো বেঁচে আছি তাদের কি করণীয়? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, যুবক, মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করলো আপনাদের এই সংগঠন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। এই আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কি আমরা সকল সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছি? না, মুক্তি আমরা পাইনি– কিন্তু মুক্তি আমাদের সামনে। সে মুক্তি পাওয়ার জন্য সামাজিক বিপ্লবের ডাক দেয়া হয়েছে–বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণী-শোষণহীন সমাজ ও কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েম তথা সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার দীপ্ত শপথের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাই বর্তমান অরাজক পরিস্থিতি থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য কেবল বক্তৃতা-বিবৃতি নয়, নয় অযথা আস্ফালন–মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, বরং বাস্তবভিত্তিক ও গঠনমূলক কর্মসূচী ঘোষণা করতে হবে। সে কারণে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নিম্নলিখিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ :

(ক) গ্রাম পর্যায়ে সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটিয়ে শহরমুখী রাজনীতির পরিবর্তে শ্রেণী সচেতন রাজনীতি অর্থাৎ বিপ্লবের শক্তি হিসাবে কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগ্রামী অংশ ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সংঘবদ্ধ করা।

(খ) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ত্যাগী, আদর্শবাদী, সাহসী, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান কর্মী সমবায়ে সারাদেশে এক বিরাট কর্মীবাহিনীর সৃষ্টি করা।

(গ) আদর্শগত দিক থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বগত বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা এবং ব্যক্তিগত ও সংগঠনগতভাবে সেই তত্ত্বের অনুশীলন ও প্রয়োগ করা।

(ঘ) সংগঠনকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা এককেন্দ্রিক না-করে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রমুখী (Democratic centralism) করে গড়ে তোলা।

(ঙ) সমাজের প্রতিস্তরের মানুষের সমস্যাবলির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সঠিক সমাধান খুঁজে বের করা।

(চ) সমস্যাভিত্তিক আন্দোলন সৃষ্টি করে সারাদেশে গণআন্দোলন সৃষ্টির মাধ্যমে গোটা জাতির প্রচণ্ড প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা–যে গণআন্দোলন পরিবর্তিকালে আরো অধিক শক্তির অধিকারী হয়ে সামাজিক বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করবে।

(ছ) সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ও বিদ্রোহ ঘোষণা করা।

(জ) সংগঠনের কর্মী বাহিনীকে সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করার দীক্ষা দেওয়া।

উপরোক্ত পন্থাসমূহ অবলম্বন করলেই আমরা এদেশের মানুষকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বর্তমান অরাজকতামূলক পরিবেশ থেকে মুক্ত করতে পারবো বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় সাথীরা,

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি চরমভাবে মার খেয়েছে। এক কথায় বলা যায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি চরম দেউলিয়াত্বের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের অধিষ্ঠিত কর্তাব্যক্তিদের অপ্রয়োজনীয় ও অসংলগ্ন উক্তি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারসাম্যরক্ষার ব্যর্থতাই আজ বাংলাদেশকে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট হাসির খোরাকে পরিণত করেছে। যে বাংলাদেশ তার পঁচিশ বছরের সংগ্রামী জীবনে, বিশেষ করে নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্র ও মুক্তিকামী জনতার আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, সে বাংলাদেশ আজ কেন 'ভিক্ষুক বাংলাদেশ' নামে বিশ্বের নিকট পরিচিত। যে বাংলাদেশ ও তার সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংগ্রামের সপক্ষে বর্তমান বিশ্বের আড়াইশত কোটিরও বেশি লোক নৈতিক ও সক্রিয় সমর্থন জুগিয়েছিলো, সে বাংলাদেশ সম্পর্কে কেন আজ বিশ্বের মানুষের এত অনীহা? এর জন্য দায়ী বাংলাদেশের সংগ্রামী জনসাধারণ নয়, দায়ী বাংলাদেশের বর্তমান সরকার।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের মানুষকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কর্মবিমুখ করে রাখার ফলে যে সমস্যা ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম ভাঙ্গিয়ে সাহায্যের নামে

বাংলাদেশকে ভিক্ষুকে পরিণত করেছে। অন্যদেশের দয়া বা সাহায্যের উপরে কোন দেশই বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে; অথচ সত্যিই কি আমাদের দেশ ভিক্ষুকে পরিণত হওয়ার মত অবস্থায় বিরাজ করছে?

বর্তমান বিশ্বে কোন দেশই বিচ্ছিন্ন হয়ে একক ভাবে বাঁচতে পারে না বা টিকে থাকতে পারে না একথা সত্য। কিন্তু একদেশ অন্যদেশকে সাহায্য করবে কিসের বিনিময়ে? পারস্পরিক শ্রদ্ধা– না শোষণের বিনিময়? যে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি একে অন্যের সম্পূরক। কিন্তু যে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে চরম অরাজক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দেউলিয়াপনা বিরাজমান, রাষ্ট্র হিসাবে সেদেশের স্থান কোথায়? এমনি ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদেরকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে এবং সঠিক মতামত প্রকাশ করতে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া ও চীন –এই চারটি দেশ সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। এই চারটি দেশের মধ্যে ভারত ও চীন আমাদের প্রতিবেশী, আমেরিকা ও রাশিয়া বৃহৎ দুই শক্তি। এই চারটি দেশ তাদের নিজেদের এবং জাতীয় রাজনীতির প্রয়োজনে একে অন্যের প্রতি যে মনোভাবই প্রকাশ করুক না কেন, তা আমাদের আলোচনার বিষয় হতে পারে–কিন্তু তা যদি আমাদের আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। বাংলাদেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, চাহিদা, মানসিকতা ও ভৌগোলিক অবস্থানই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক রাজনীতির 'নিয়ামক' শক্তি হিসাবে কাজ করবে। কোন দেশের প্রতি অন্য কোনদেশের 'শত্রুতা' বা 'বন্ধুত্ব' যদি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে 'নীতিনির্ধারক' হিসাবে কাজ করে, তবে বাংলাদেশ তার আপন সত্তা ও বৈশিষ্ট্য হারাতে বাধ্য। দেশশত্রু মুক্ত হওয়ার পর গত ১৬ মাসে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা অনেক হারিয়েছি, কিন্তু লাভবান হইনি কোন একটি ক্ষেত্রেও। আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া ও চীন সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেলে জাতিকে এমন নাজেহাল হতে হত না।

আমেরিকা কেবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই নয়, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ব তার হাতে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মানবতার শত্রু। পৃথিবীর যেখানেই মুক্তিকামী জনতার নিরলস সংগ্রাম বিদ্যমান, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেখানেই তার পশুশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত রাখছে। বাংলাদেশের দিকেও মার্কিনীদের লোলুপ দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশে আগামী দিনের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতেই হবে–যেন সাম্রাজ্যবাদের শিকড় এদেশের মাটি থেকে উপড়ে ফেলা যায় প্রথম অবস্থাতেই। আরো একটি দিকে তত্ত্বগত প্রয়োজনেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে,সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে না-পারলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

ভারত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র; ভারতীয় জনগণের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। ভারতীয় জনগণের বন্ধুত্ব আমরা কামনা করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে

হবে, ভারতীয় উপনিবেশবাদী, নয়া উপনিবেশবাদী বা সম্প্রসারণবাদী কোন চরিত্রই যেন বাংলাদেশকে গ্রাস না-করতে পারে। ভারতে পুঁজিবাদ আজ স্পষ্ট–ভারতীয় শাসকগোষ্ঠির এক অংশ আজ প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের অধিকারী। এই দুই কারণে বাংলাদেশের জন্য ভারত একটি হুমকি স্বরূপ। ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণী ও শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশ কোন ভাবেই যেন বাংলাদেশে তাদের কোন প্রকার হীন ইচ্ছা চরিতার্থ না-করতে পারে, এজন্য অবশ্যই বাংলাদেশের জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এদেশ পাকিস্তানি শোষণমুক্ত হয়েছে, ভারতীয় শোষণকে স্থান করে দেবার জন্য নয়।

রাশিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সুতরাং রাশিয়ার সাহায্য ও সমর্থন আমরা মনেপ্রাণে কামনা করি কিন্তু যদি রাশিয়ার কোন আন্তর্জাতিক রাজনীতি আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাধা হিসাবে কাজ করে–সেটা হবে রাশিয়ার পক্ষে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পিছনে ছুরিকাঘাতের মত। আমরা আশা করবো রাশিয়া আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না-করে, আমাদেরকে সক্রিয় সাহায্য ও নৈতিক সমর্থন দেবে।

চীন পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র। চীন আমাদের প্রতিবেশী। চীন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শস্থান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, চীন তাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে আজও স্বীকার না-করে নেয়ায় চীন সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের মনে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশা করবো চীন অচিরেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাবে।

এ ছাড়া সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বের মেহনতী ও মুক্তিকামী মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের পরাজয় ঘটাতে বদ্ধপরিকর।

সুধীবৃন্দ ও আমার প্রিয় সাথীরা,

এবার আমাদের এই সংগঠন সম্পর্কে অর্থাৎ এই সংগঠনের ভিত্তি, রূপ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমি আলোচনা করবো। এই সংগঠনের ভবিষ্যত সম্পর্কে হাজার হাজার মানুষের ঔৎসুক্য যেমনি রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক প্রশ্ন। গত ৬ মাসের এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দেখেছি–কি আগ্রহের সাথে এদেশের কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা জনতা, ছাত্র ও যুব সমাজ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী মহল এই সংগঠনের শুভ কামনা করে স্বেচ্ছায় দলে দলে যোগ দিচ্ছেন এবং সমর্থন যোগাচ্ছেন। মাত্র ৬ মাস আগে মাত্র ৭ জন সদস্য নিয়ে এই দলটি আত্মপ্রকাশ করেছে। এই দলটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে গণপরিষদে জনৈক কর্তাব্যক্তি বলেছেন, '–অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে'। তাদের মুখে ছাই দিয়ে সেই সংগঠনের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে ৭ হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি ও কাউন্সিলার যোগ দিয়েছেন– এটা কি একটা বিস্ময়কর ব্যাপার নয়? সংগঠনের এই ব্যাপ্তির পেছনে কোন ব্যক্তির কৃতিত্ব নয় বরং সংগঠন পরিচালনা ও গড়ে তোলার জন্য যে বিজ্ঞানসম্মত কৌসল

ও দেশবাসীর কাছে সংগঠনের পক্ষ হতে যে বাস্তব ও বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে–তার কারণেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এদেশের একক বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে পরিণত হতে চলেছে। সংগঠনের কর্মী বাহিনীর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক শক্তি ও আশাতীত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবে বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস। কিন্তু সাংগঠনিক শক্তি ব্যতীত কেবলমাত্র জনপ্রিয়তা ও জন-সমর্থন সংগঠনের সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। সে হুঁসিয়ারী বাণীও সংগঠনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে আমি উচ্চারণ করছি।

মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু লোকের মনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সম্পর্কে যেসব প্রশ্নের উদয় হয় তা সম্পর্কেও আমরা সচেতন। অনেকে আমাদের কাছে সে সম্পর্কে প্রশ্নও করে থাকেন। যেমন, অনেকে প্রশ্ন করেন যে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বিপ্লবের সহায়ক শক্তি হলে–বিপ্লবের 'মূল শক্তি' কোথায়? এর উত্তরে এ কথাই বলবো–বিপ্লবের 'মূল শক্তি'–সচেতন কৃষক-শ্রমিক, সংগ্রামী ছাত্র-যুব সম্প্রদায় এবং প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংগঠিত হচ্ছে। সময়, সুযোগ ও প্রয়োজন অনুযায়ী 'মূল শক্তি-আত্মপ্রকাশ করবে। আবার কিছু কিছু প্রশ্ন শোনা যায়–এই সংগঠন আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য কেন উচ্চারণ করে না, এ প্রশ্নের উত্তরে বলবো, বক্তব্য আমাদের সুস্পষ্ট– ইচ্ছে করেই অনেকে এর স্পষ্টতা স্বীকার করতে চান না। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'ভারসাম্যহীন' উক্তি বা মন্তব্য মূল আন্দোলনের পক্ষে বাধাস্বরূপ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করে, সকল প্রকার বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত থেকে, অন্য যে কোন দেশের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ শক্তি সঞ্চয় করে আমরা আমাদের বৈপ্লবিক কর্মধারা অব্যাহত রাখবো। তাছাড়া আমরা ফলপ্রসূ নয়, এমন বক্তব্য উপস্থাপনের চেয়ে–বাস্তব ও কার্যকরী বক্তব্য উপস্থাপনে বিশ্বাসী।

অনেকে প্রশ্ন করেন আমরা কেন 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' বা 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' কথা না-বলে সামাজিক বিপ্লবের কথা বলছি। তার উত্তরে এ কথাই বলতে চাই, যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব', চীনে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' ডাক দেয়া হয়েছে– বাংলাদেশে কি সেই একই পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিদ্যমান? রাশিয়ার পরিবেশ ও পরিস্থিতি চীনে কি বিদ্যমান ছিল? এক দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতি কি অন্য দেশেও হুবহু এক হতে পারে? বাংলাদেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি মানুষের মানসিকতা, প্রয়োজন, চাহিদা, ভৌগোলিক পরিবেশ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমাজকাঠামো কি চীন ও রাশিয়া থেকে আলাদা ধরনের নয়? বাংলাদেশের জনগণ কি যথাযথরূপে শ্রেণীসচেতন? এখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ কি চরম রূপ লাভ করেছে? এইসব প্রশ্নের বিশ্লেষণাত্মক উত্তরের মধ্যে দিয়েই নির্ণীত হবে এদেশের আগামী দিনের বিপ্লবের রূপরেখা। তাহলে এদেশের শোষক শতকরা ৮ জনের বিরুদ্ধে শোষিত শতকরা ৯২ জনের লড়াইয়ের রূপ কি সামাজিক বিপ্লব নয়? আমরা এদেশের প্রয়োজনে সংগ্রামের স্তরকে 'সামাজিক বিপ্লব' আখ্যায়িত করে সামাজিক বিপ্লবকে পরবর্তী 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের' ভিত্তি হিসাবে গণ্য করি। তত্ত্ব ও বক্তব্যের প্রশ্নে আমরা অত্যন্ত

সুস্পষ্ট; আমরা অন্যত্র তার ব্যাখ্যা দিয়েছি। আমাদের সম্পর্কে এইসব প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলবো, এই সংগঠনের প্রতি মানুষের সমর্থন ও আস্থা এবং এই সংগঠনের কর্মী বাহিনীর প্রস্তুতির মধ্য দিয়েই যাচাই করতে হবে আমাদের বক্তব্য ও কর্মসূচীর ভিত্তি ও যৌক্তিকতা।

প্রিয় বন্ধুরা,
আরেকটি জাতীয় সমস্যার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতা সারা দেশে এক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যুগে যুগে শোষক শ্রেণী তাদের শোষণব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য মেহনতী জনতাকে বিভক্ত করে রেখে, মেহনতী জনতার বিপ্লবী ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে, তাদের সংগ্রামকে পিছিয়ে দেবার জন্য এমনি ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছে। মেহনতী মানুষ– সে হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক না কেন বা যে জেলারই অধিবাসী হোক না কেন–তার একটিমাত্র পরিচয়, সে শ্রমজীবী মানুষ, পরিশ্রমই তার একমাত্র মূলধন। কিন্তু বর্তমান সরকার ও ক্ষমতাসীন দল অতি কৌশলে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও জেলায় জেলায় আঞ্চলিক মনোভাব জিইয়ে রেখে আগামী দিনের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিঘ্নিত করার অপচেষ্টায় মত্ত। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, সাম্প্রদায়িকতা বা আঞ্চলিকতা সমাজতন্ত্রের শত্রু, আর একথা স্মরণ রেখেই সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে ও আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা চার লক্ষাধিক উপজাতীয়রা আজ চরমভাবে নিগৃহীত। প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশেই উপজাতীয়দের দাবী-দাওয়ার বিশেষ স্বীকৃতি থাকার নজীর আছে। কিন্তু বাংলাদেশের উপজাতীয়রা স্বায়ত্তশাসন ও নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা মনে করি উপজাতীয়রা তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই তাদেরকে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকের মর্যাদা দেয়া হবে।

আমাদের এ সংগঠনকে এদেশের মুক্তিকামী মানুষের নিজস্ব সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সকলকে আরো নিরলস ভাবে কাজ করে যেতে হবে। নেতা সৃষ্টি করে নয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সৈনিক হিসেবে ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মী সৃষ্টি করে প্রতিটি কর্মীকে আদর্শ ও দলীয় কর্মসূচি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে অসংখ্য সমাজতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ দরকার, তাও আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। অন্য দেশ থেকে ভাড়া করা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের জন-শক্তি থেকেই জন্ম দিতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞদেরকে। সেজন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা বিভাগ, রিসার্চ ব্যুরো, পাঠচক্র (Study circle) এবং ছায়া মন্ত্রীসভা গঠন করা প্রয়োজন। সংগঠনের পক্ষ হতে সংগঠনের কর্মী ও জনসাধারণের জন্য মৌল পাঠক্রম হিসেবে প্রচুর পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে। সংগঠনের কেন্দ্র হতে শুরু করে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করে

নিয়মিত লেখাপড়া ও আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। সংগে সংগে ব্যক্তিগত ও সংগঠনগত ভাবে দলীয়-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে এবং সমাজতান্ত্রিক নিয়মাবলির অনুশীলন ও তার যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই আমরা এই সংগঠনকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী একটি গণ-সংগঠনে রূপ দিতে সক্ষম হবো।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী আমার সাথী ভাই ও বোনেরা,
আমরা সকলেই এই সংগঠনের কর্মী–আমরা কেউ নেতা নই,– আমরা নিজেদেরকে সমাজতন্ত্রের সৈনিক হিসেবে পরিচয় দেবো, এটাই যেন আমাদের সংগঠনের সিদ্ধান্ত হিসেবে কাজ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

বন্ধুরা, অল্প সময়ের ব্যবধানে আহ্বায়ক কমিটি ও সাংগঠনিক কমিটির পর্যায় অতিক্রম করে আমরা জাতীয় কমিটি গঠন করার জন্য এ সম্মেলন আহ্বান করেছি। এই সম্মেলনে আজ আমাদের মাঝে অনেকেই নেই–অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন, অনেকে গত১৭ মাসে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন কিংবা জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন। আমাদের সংঠনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে জনাব আবদুল আওয়াল, রুহুল আমিন ভূঁইয়া, কবির আহমদ মধু, সাফায়েত আহমেদ, এরশাদ হোসেন, বিচ্চু আলম সহ আমাদের সমর্থক প্রায় আট হাজারেরও বেশি ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মুক্তিযোদ্ধা আজ কারাগারে বন্দী। এই সম্মেলনের পক্ষ থেকে তাদের সকলের উদ্দেশ্যে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা ও সংগ্রামী অভিনন্দন।

আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
জয় বাংলা।
জয় বাংলার মেহনতী মানুষ।
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

আপনাদেরই
মেজর এম. এ. জলিল
সভাপতি
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

তারিখ,
ঢাকা, ১১ই মে, ১৯৭৩

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি*

স্থল সীমানা চিহ্নিতকরণ প্রশ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্র সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির পূর্ণ বিবরণ।

দুই দেশের মধ্যকার বর্তমান বন্ধুত্বের সম্পর্কের কথা স্মরণ রেখে কতগুলো স্থানের সঠিক পরিচয় নির্ণয় এবং বাংলাদেশ ও ভারতের স্থল সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য দুই সরকার নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে একমত হয়েছেন। যথা :

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিচে বর্ণিত এলাকাগুলোতে বাংলাদেশ ও ভারতের স্থল সীমানা চিহ্নিত হবে।

(১) মিজোরাম-বাংলাদেশ সেক্টর বিভাগ পূর্বকালের সর্বশেষ নোটিফিকেশন ও রেকর্ডের ভিত্তিতে সীমানা চিহ্নিতকরণ সমাধা করতে হবে।

(২) ত্রিপুরা-সিলেট সেক্টর : উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে এই এলাকায় সীমানা চিহ্নিত করার কাজ অনেক দূর এগিয়েছে এবং একাজ যতশীঘ্র সম্ভব শেষ করতে হবে।

(৩) ভাগলপুর রেলওয়ে লাইন রেলওয়ে বাঁধের ভিত থেকে ৭৫ ফুট দূরত্ব সমান্তরাল করে সীমা-রেখা চিহ্নিত করতে হবে।

(৪) শিবপুর-গৌরাঙ্গলা সেক্টর : ১৯১৫-১৮ সালের জেলা জরিপ মানচিত্রের ভিত্তিতে ১৯৫১-৫২ সালে এই সীমান্তের চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছিল। সেই প্রক্রিয়াতেই এখানে সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।

(৫) মহুরী নদী (বেলনিয়া) সেক্টর : সীমানা চিহ্নিতকরণের কালে মহুরী নদীর মাঝামাঝি বরাবর সীমানা চিহ্নিত হবে। এই সীমানা হবে স্থায়ী। সীমানা চিহ্নিতকরণের সময় নদীর গতি যেমন থাকে তা যাতে পরিবর্তিত না-হয়ে স্থির থাকে সেজন্য দুই সরকারকে নদীর নিজ নিজ অংশে তীর বরাবর বাঁধ দিতে হবে।

(৬) ত্রিপুরা-নোয়াখালী ও ত্রিপুরা-কুমিল্লা সেক্টরের বাদ বাকী সীমান্ত : ১৮৯২-১৮৯৪ সালের চাকলা-রোশনাবাদ জমিদারী মানচিত্র অনুসরণে এই সেক্টরে সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। উক্ত মানচিত্রে যেসব এলাকা নেই সেক্ষেত্রে ১৯১৫-১৮ সালের জেলা জরিপ মানচিত্রের ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।

(৭) ফেনী নদী : সার্ভে অব ইন্ডিয়া ম্যাপ-এর ১৯৩৫ সালের ১ম সংস্করণে ৭৯ এম ১৫ নম্বর সীটএ ফেনী নদীর যে শাখাকে ফেনী নদী বলে উল্লিখিত, সীমানা চিহ্নিত করার সময়ে উক্ত ফেনী নদীর মাঝখান দিয়ে সীমারেখা টানতে হবে বর্ণিত মানচিত্রে আসালং সি বলে উল্লিখিত পয়েন্ট পর্যন্ত। এই পয়েন্ট থেকে ভাটিতে মাঝনদী বরাবর সীমানা চিহ্নিত করার সময়ে সীমারেখা টানতে হবে। এই সীমান্তটিও হবে স্থায়ী সীমান্ত।

---

* দৈনিক বাংলা, ১৬ মে ১৯৭৪

(৮) ত্রিপুরা-পার্বত্য চট্টগ্রাম সেক্টরের বাদবাকী এলাকা : ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে যে ফেনী নদীর কথা বলা হয়েছে সেই ফেনী নদীর মাঝখান দিয়ে গ্রিড রেফারেন্স ০০৯৭৭৯ (৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ম্যাপ শীট) পর্যন্ত এবং তার পর থেকে সর্বপূর্ব দিকের শাখানদীর মাঝখান দিয়ে সীমারেখা টানতে হবে। এই শাখা নদীর উৎসমুখ থেকে সীমারেখা চলে যাবে স্বল্পতম দূরত্বে বর্ণিত ম্যাপ-এ উল্লিখিত বেয়ান আসালং নদীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। তারপর উত্তরমুখী হয়ে মাঝনদী বরাবর এগিয়ে যাবে (আগে বর্ণিত মানচিত্রের গ্রিড রেফারেন্স (৪৬৮১০) পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত। এখান থেকে উক্ত পর্বত শ্রেণীর চূড়া বরাবর ভগবান ট্রিগ স্টেশন পর্যন্ত সীমারেখা টানতে হবে। ভগবান ট্রিগ স্টেশন থেকে যাবে বাংলাদেশ আসাম-ত্রিপুরা সীমান্তের সঙ্গমস্থল (খান তালাং ট্রিগ স্টেশন) পর্যন্ত, দুই দেশের নদী বরাবর সীমানা চলতে থাকবে।

মানচিত্র এবং স্থল ভাগ নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে স্থলেরটাই টিকবে। এই সেক্টরে সীমানা হবে স্থায়ী সীমানা।

(৯) বিয়ানী বাজার-করিমগঞ্জ সেক্টর : উমাপতি গ্রামের পশ্চিমের অ-চিহ্নিত সীমানা উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে চিহ্নিত হবে এবং উমাপতি গ্রাম ভারতেরই থাকবে।

(১০) হাকার খাল ১৯৫৮ সালের নেহরু-নুন চুক্তি অনুসরণে এখানে সীমানা চিহ্নিত হবে। হাকার খালকে ইছামতি নদী থেকে পৃথক করে বিবেচনা করতে হবে। এই সীমান্তটিও হবে স্থায়ী সীমানা।

(১১) বৈকারী খাল : বৈকারী খালে উভয়পক্ষের সম্মতিভিত্তি ও নীতির নিরিখে সীমানা চিহ্নিত হবে অর্থাৎ স্থলই প্রাধান্য পাবে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ল্যান্ডরেকর্ড এবং সার্ভে ডিরেক্টররা ১৯৪৯ সালে যে চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন তদনুযায়ী। এই সীমান্ত হবে স্থায়ী সীমানা।

(১২) বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহল এবং ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো দ্রুত বিনিময় করতে হবে। ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত ছিটমহলগুলো এর আওতায় পড়বে না। এরূপ বিনিময়ে বাংলাদেশ যে বাড়তি এলাকা পাবে তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে না।

(১৩) হিলি এখানে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ এবং মানচিত্রে তিনি যে লাইন টেনেছেন তদনুযায়ী সীমারেখা নির্ধারিত হবে।

(১৪) ১২ নম্বর দক্ষিণ বেরুবাড়ি ইউনিয়নের দক্ষিণার্ধ এবং ২.৬৪ বর্গমাইল আয়তনের সংলগ্ন ছিটমহলগুলো ভারতের হবে। বিনিময়ে দহগ্রাম এবং আংরাপোতা ছিটমহল বাংলাদেশেরই থাকবে। বাংলাদেশের পাটগ্রাম থানার পান-বাড়ী মৌজার সাথে দহগ্রামকে সংযুক্ত করার জন্য ভারত দহগ্রাম ও পানবাজারের মধ্যবর্তী 'তিন বিঘা' (১৭৪ মিটার × ৮৫ মিটার) নামক স্থলভাগটি চিরস্থায়ীভাবে বাংলাদেশকে ইজারা দেবে।

(১৫) লাঠিটিলা-ডুমাবাড়ী ওয়াই পয়েন্ট থেকে (সর্বশেষ চিহ্নিত সীমান্ত খুঁটি) পাথারিয়া হিল রিজার্ভ ফরেস্ট বরাবর দক্ষিণ দিকে সীমারেখা যাবে ডুমাবাড়ী মৌজার পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত। এরপর এই মৌজার সীমান্ত বরাবর সীমানারেখা চলতে থাকবে ডুমাবাড়ী, লাঠিটিলা এবং বড় পুরনিগাঁও মৌজার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত। এই রেখাটা যাবে ডুমাবাড়ী এবং লাঠিটিলা মৌজার সঙ্গমস্থলের মধ্যদিয়ে। এই পয়েন্ট থেকে সীমারেখাটি সামান্য এগিয়ে পুতনীচরা নদীর মাঝামাঝি স্থানে গিয়ে মিশবে। তারপর সীমারেখাটি

সাধারণভাবে পুতনীচরা নদীর মাঝ বরাবর দক্ষিণমুখো হয়ে সিলেট (বাংলাদেশ) এবং ত্রিপুরা (ভারত) সীমান্তে গিয়ে লাগবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিপূর্বে চিহ্নিত সীমানার এবং যার মানচিত্র এর মধ্যেই প্রস্তুত হয়েছে তেমন সীমানার ভিতরের গোলমেলে এলাকাগুলো উভয় দেশের মধ্যে সীমানা মানচিত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বিনিময় করতে বাংলাদেশ ও ভারত সম্মত হয়েছে। আনুষঙ্গিক মানচিত্র তারা যত শীগগীর স্বাক্ষর করবেন এবং কোন অবস্থাতেই ১৯৭৪ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের পরে নয়। এছাড়াও যে এলাকার সীমানা চিহ্নিত হয়েছে সে সব এলাকার সীমানা-মানচিত্র যত শীগগীর সম্ভব তৈরি করতে হবে। ১৯৭৫ সালের ৩১ শে মে'র মধ্যে এগুলো ছাপাতে হবে এবং তারপর দুই দেশের সর্বক্ষমতাসম্পন্ন দূতরা তা স্বাক্ষর করবেন যাতে কিনা ১৯৭৫ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে গোলমেলে এলাকাগুলোর বিনিময় সম্পন্ন হয়। যেসব অঞ্চলের সীমানা এখনো চিহ্নিত হয়নি, সীমানা-মানচিত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ বিনিময় করতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলো হস্তান্তরের পর তারা যে রাষ্ট্রের অংশ হল সেখানকার জনসাধারণ সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারবে বলে দুই সরকার একমত হয়েছেন।

সীমানা চিহ্নিত হওয়া এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এলাকা বিনিময় সাপেক্ষে এসব এলাকার লোকদের স্থিতাবস্থায় কোন বিঘ্ন ঘটানো যাবে না এবং সীমান্ত এলাকায় শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। এ সম্পর্কে দুই দেশের সীমান্তবর্তী স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই চুক্তির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিলে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে তা নিরসনে দুই সরকার একমত হয়েছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এই চুক্তি দুই সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ এবং যত শীগগীর সম্ভব অনুমোদনের দলিল বিনিময় করতে হবে। অনুমোদনের দলিল বিনিময়ের দিন থেকে এই চুক্তি কার্যকর হবে।

দুইটি মূল দলিলে ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে নয়াদিল্লীতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হল। দুটো দলিলই সমান সত্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে — প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের পক্ষে

(শেখ মুজিবুর রহমান)
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

(ইন্দিরা গান্ধী)
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

ছাত্র-সমাজের আহ্বান*
১০ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-গণ আন্দোলন গড়ে তুলুন

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

"দেশ আজ এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। দেশবাসীর জীবনে চলছে এক গভীর সংকট। দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী হয়েছে, বাজার থেকে ঘন ঘন নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র উধাও হয়ে যাচ্ছে। চরম খাদ্যাভাব ইত্যাদি দেশবাসীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। দেশব্যাপী দুর্বৃত্তদের উন্মত্ততা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সমাজ-বিরোধী মজুতদার, কালোবাজারী, মুনাফাখোররা বেপরোয়াভাবে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এইসব ঘৃণ্য নরপশুরা বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি ও প্রশাসন যন্ত্রে স্থায়ী আশ্রয় লাভের প্রচেষ্টা নিচ্ছে।

"দেশে আজ এক চরম খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকরী হচ্ছেনা। যেটুকু খাদ্য দেশে আছে সুষ্ঠুভাবে জনগণের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছেনা। পারমিটবাজ লাইসেন্সধারী অসাধু ব্যবসায়ীরা প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ছে।

"কলকারখানায় আজ এক অচলাবস্থা চলছে। শিল্প উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দেশের শত্রুরা পরিকল্পিতভাবে অন্তর্ঘাতি তৎপরতা চালাচ্ছে। খুচরা যন্ত্রপাতির অভাব পূরণ হচ্ছেনা এবং পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মারাত্মক ত্রুটি চলছে। শ্রমিকদের মধ্যে আঞ্চলিকতা, হানাহানি ও সংকীর্ণ অর্থনীতিবাদ উস্কানো হচ্ছে। জাতীয়করণ কর্মসূচি বানচাল হবার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

"ছাত্রসমাজের জীবনের সংকটগুলোও তীব্রতর হয়েছে। রাষ্ট্রীয় চারটি মূলনীতির লক্ষে নতুন গণমুখী ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষানীতি আজও প্রণীত হয়নি। এই সম্পর্কে ছাত্রসমাজকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে। স্বাধীন দেশের অধিকাংশ মানুষ আজও নিরক্ষরতার গ্লানি বহন করছে।

"মুক্তি সংগ্রামে পরাজিত শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসর বিভ্রান্ত মাওবাদী চীন ও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এবং তাদের দেশীয় অনুচরেরা তাদের চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে ধ্বংসের জন্য সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করা হচ্ছে। শত্রুরা জনগণের মধ্যে বিভেদের উস্কানি দিচ্ছে এবং মিত্র রাষ্ট্র ভারত-সোভিয়েতসহ অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বের ফাটল সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দেশবাসীর মনে আজ হতাশার ছায়া নেমে এসেছে।

---

* পুস্তিকা, তারিখবিহীন

"মুক্তি সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে সূচিত বিপ্লবী ধারার মুখে সরকার জাতীয়করণ, ভূমিসংস্কার, ভারত-সোভিয়েতসহ বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রী ও স্বাধীন জোট-বহির্ভূত সক্রিয় নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই সকল কর্মসূচির সাফল্যের পথে আজ বাধার সৃষ্টি হয়েছে এবং সরকার এই সকল বাধা প্রতিহত করে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন। দেশের শত্রুদের ষড়যন্ত্র আমলাতান্ত্রিক চক্রান্ত ইত্যাদি দেশের প্রগতির ধারাকে ব্যর্থ করে দিতে চাচ্ছে। সরকারি প্রশাসনের চরম দুর্নীতি সমস্যাকে চূড়ান্ত জটিলতার দিকে নিয়ে গেছে। এই শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করছে না। ফলে আজ এক সামগ্রিক সংকট আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে গ্রাস করে চলেছে।

"এই পরিস্থিতি আর চলতে দেয়া যেতে পারে না। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সমাজ দেশের এই জটিল, সংকটজনক অবস্থায় নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করবে না। আমরা সমগ্র ছাত্র-সমাজকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি। নিম্নলিখিত ১০-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র, গণ সংগ্রাম সূচনা করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

১০ দফা কর্মসূচি

(১) শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। ছাত্রসমাজকে এই কাজে বাস্তব সহায়তা দান করতে হবে এবং কৃষক-শ্রমিক মেহনতি জনতাকে এই কর্তব্য পালনে সচেতন করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমজীবী জনসাধারণের সকল ন্যায্য দাবি দাওয়া মেনে নিতে হবে।

(২) জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যে কোন মহলের বাধা চুরমার করে দিতে হবে এবং যে কোন মূল্যে জাতীয়করণ কর্মসূচি রক্ষা করতে হবে।

(৩) দেশ থেকে দ্রুত দারিদ্র্য মোচনের উদ্দেশ্যে জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহার ও উৎপাদনশীল পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কৃষকের হাতে জমির অধিকার, পর্যাপ্ত সার, বীজ, কৃষি ঋণ ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে এবং কৃষিতে ব্যাপকভাবে সমবায় ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৪) খাদ্যসামগ্রী, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও অন্যান্য পণ্যের বণ্টন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং অবিলম্বে দেশের সর্বত্র ন্যায্যমূল্যের দোকান সুষ্ঠুভাবে ও পরিপূর্ণভাবে চালু করতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদার, চোরাকারবারী কালোবাজারীদের তৎপরতা স্তব্ধ করে দিতে হবে। এইসব গণবিরোধী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক শক্তি ও প্রশাসন যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণের পথ সর্বতোভাবে বন্ধ করতে হবে। দেশের বুক থেকে দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি সফলভাবে নির্মূল করতে হবে।

(৫) দুর্নীতিবাজ, মুনাফাকারীদের খুঁজে বের করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং গণবিক্ষোভ সংগঠিত করতে হবে।

(৬) দেশের সমস্ত জায়গা থেকে বে-আইনী অস্ত্র পরিপূর্ণভাবে উদ্ধার করতে হবে এবং বে-আইনী অস্ত্রধারী 'আলবদরদের' কঠিন শাস্তি দিতে হবে। দেশের সর্বত্র পরিপূর্ণ আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয় পুনর্গঠনে নিয়োজিত করতে হবে এবং আরও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় ৪টি মূলনীতির লক্ষ্যে গণমুখী ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষানীতি চালু করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ছাত্র সমাজের অভিমত গ্রহণ করতে হবে।

(৮) দেশের বুক থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ নির্মূল করার জন্যে সর্বাত্মক অভিযান সংগঠিত করতে হবে।

(৯) রাষ্ট্রীয় ৪টি মূলনীতি ও দেশের প্রগতিশীল পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শত্রুদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্র এবং স্বাধীনতা ও প্রগতিবিরোধী প্রচারণা রুখে দাঁড়াতে হবে।

(১০) সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনেরা,

দেশের বর্তমান জটিল অবস্থায় ও দেশবাসীর চরম সংকটের দিনে আসুন আমরা আমাদের ঐতিহাসিক বিপ্লবী কর্তব্য সম্পাদন করি। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গ্রাম ও শিল্প এলাকায় ছড়িয়ে পড়ি এবং ১০-দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করি। সর্বত্র ১০ দফার ভিত্তিতে সংগঠিত জনমত গড়ে তুলি। আসুন ছাত্র সমাজের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করি, ছাত্রসমাজের জন্য কলঙ্কজনক সকল অসুস্থ প্রবণতা প্রতিহত করে দেশমাতৃকার ডাকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

দেশবাসী বন্ধুগণ,

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির সংকটের দিনে আসুন, ১০-দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দেশব্যাপী ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতার মিলিত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলি। বুকের রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। দেশে সংকট-সৃষ্টিকারী সমাজবিরোধীদের এবং স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদের সকল বাধা প্রতিহত করে সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

এবারের সংগ্রাম দেশগড়ার বিপ্লবী সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
(সহ-সভাপতি ডাকসু)
সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

শেখ শহীদুল ইসলাম
সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

আবদুল কাইয়ুম মুকুল
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

এম, এ, রশিদ
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

নুহ-উল আলম লেনিন
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

রাশেদুল হাসান
যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ; নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র-ডাকসু কার্যালয়, ঢাকা

পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের উদ্দেশ্যে*
সিরাজ সিকদারের

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি
ও পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনীর

জরুরী আহ্বান

বাঙালি জাতি এবং পূর্ব বাংলার জনগণের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।
আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের উৎখাত
করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণকে বাঁচান!
১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর অর্ধ দিবস হরতাল পালন করুন!
খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, চাকুরি, বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন!
শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কায়েম করুন!

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিষ্ঠুর শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে পূর্ব বাংলায় আজ ইতিহাসের চরমতম সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

সমগ্র দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। শহরে-গ্রামে-রাজপথে-টার্মিনালে-স্টেশনে ক্ষুধার্ত নগ্ন মানুষের ভিড়। একমুঠো ভাতের জন্য–একটি রুটির জন্য তাদের হাহাকারে পূর্ব বাংলার আকাশ বাতাস ভারি হয়ে আছে। প্রতিদিন শত শত বাংলার সন্তান না-খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ জনগণ মৃত্যুর প্রহর গুনছে। খাদ্যাভাব ও অপুষ্টির কারণে লক্ষ লক্ষ শিশু অন্ধ ও পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, সমগ্র জাতির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বাঙালি জাতি ও জনগণের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

পক্ষান্তরে, আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকরা কালোবাজারী, রাহাজানি, মজুতদারী, লাইসেন্স পারমিটের দৌলতে আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে। এ নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকরা এখনও ভারতে খাদ্য পাচার করছে, কালোবাজারী, মজুতদারী, চোরাকারবারীরা প্রতিদিনই খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে। এভাবে তারা কালো টাকা ও সম্পদের পাহাড় গড়ছে।

জাতি ও জনগণের প্রতি এদের বিন্দুমাত্র মমতা নেই, এদের বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম নেই।

---

* পুস্তিকা, ডিসেম্বর ১৯৭৪ (আনুমানিক)

এ বিশ্বাসঘাতকরা বিশ টাকা মণ দরে চাল, দশ টাকা মণ দরে গম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আর আজ তিনশ টাকারও অধিক দরে চাল, দুইশ টাকারও অধিক দরে গম বিক্রি হচ্ছে।

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকরা এ সংকটের জন্য দোষ দিচ্ছে বন্যাকে, আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধিকে, ইয়াহিয়ার হামলাকে। বন্যা, আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধি এর আগেও ঘটেছে, তদুপরি পাকিস্তানের শোষণ ও লুণ্ঠন থাকা সত্ত্বেও এ অবস্থা কখনো হয় নি।

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিষ্ঠুরতম শোষণ ও লুণ্ঠনই তার জন্য দায়ী।

দেশের এ চরমতম সংকটজনক অবস্থা পূর্ব বাংলার প্রতিটি জনগণের বিবেককে নাড়া দিয়েছে। আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের বিরুদ্ধে চরমতম ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

পূর্ব বাংলার জনগণের উপর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার তাঁবেদার আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের এ নিষ্ঠুর শোষণ, লুণ্ঠন ও নির্যাতনের পাহাড় চেপে বসে ১৯৭১–এর ১৬ই ডিসেম্বর কালো দিবস থেকে। ঐদিন ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী বাহিনী আওয়ামী মীরজাফরদের সহায়তায় ঢাকাসহ পূর্ব বাংলা দখল করে নেয়।

ঐদিন থেকেই পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশ কায়েম হয়।

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তাদের প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের শোষণ, লুণ্ঠন এবং নির্যাতন চিরদিন পূর্ব বাংলার জনগণ মুখ বুজে সহ্য করবেন না।

ইতিমধ্যেই পূর্ব বাংলার ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক থেকে চাকুরিজীবী, সেনাবাহিনী, শ্রমিক-কৃষক অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা প্রতিবাদ মিছিল, কোথাও কোথাও খাদ্য লুট, আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের খতম করছেন।

পূর্ব বাংলার বীর জনগণ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে নূরুল আমিন সরকারকে উৎখাত করেন।

১৯৬৯-এর মহান গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খাঁকে উৎখাত করেন।

১৯৭১-এর মার্চের মহান গণঅভ্যুত্থান এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ইয়াহিয়া সামরিক ফ্যাসিষ্টদের উৎখাত করেন।

দুর্ভিক্ষপীড়িত লাঞ্ছিত নিপীড়িত পূর্ব বাংলার জনগণের প্রচণ্ড গণ-অসন্তোষের অবশ্যই বিস্ফোরণ ঘটবে এবং আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের উৎখাত করে কবরস্ত করবে।

পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, সেনাবাহিনী, বি. ডি. আর. পুলিশ, বিভিন্ন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, ব্যক্তি এবং পূর্ব বাংলার সকল জনগণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাচ্ছি–

আপনারা অতীতের গৌরবময় সংগ্রামী ঐতিহ্য অনুসরণ করে এগিয়ে আসুন, বাঙালি জাতি ও পূর্ব বাংলার জনগণকে বাঁচান! প্রকাশ্যে বা গোপনে আপনার নিজ নিজ এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন এবং নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করুন :

–কমিটির নেতৃত্বে সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করুন।

–খাদ্যদ্রব্যসহ সকল জিনিসের ভারতে পাচার বন্ধ করুন। পাচার হচ্ছে এরূপ দ্রব্য দখল করে জনগণের মাঝে বিনামূল্যে বিলিয়ে দিন।

–মজুতদারী, মহাজনী কালোবাজারী, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরদের খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দখল করে জনগণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করুন। এদেরকে শাস্তি বিধান করুন।

–সরকারি গুদাম, খাদ্য দখল করে বিনামূল্যে ক্ষুধার্তদের মাঝে বিতরণ করুন।

–সচ্ছল অবস্থাসম্পন্নদের থেকে চাঁদা, সাহায্য সংগ্রহ করে ক্ষুধার্তদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করুন।

–টাউট আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক, আত্মসাৎকারীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে জনগণের মাঝে বিতরণ করুন; ঘৃণ্যদের চরম শাস্তি দিন।

–ভুখা মিছিল, প্রতিবাদ সভা, ঘেরাও, ধর্মঘট, হরতাল, অভ্যুত্থান, সশস্ত্র-সংগ্রাম জোরদার করুন।

–সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, ইউনিট পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

১৯৭১–এর ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের ঢাকাসহ পূর্ববাংলা দখল এবং পূর্ববাংলায় তার উপনিবেশ কায়েমের প্রতিবাদে ১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর হরতাল পালন করুন।

অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, যানবাহন, হাট-বাজার ইত্যাদি অর্ধ দিবস বন্ধ রাখুন।

–মিটিং, মিছিল, হরতাল, ঘেরাও, বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান এবং সশস্ত্র সংগ্রামের সমন্বয়ের মাধ্যমে আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের উৎখাত করে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক, দেশপ্রেমিকদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করুন।

জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করুন :

১। আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের উৎখাত করা, তাদের কালো টাকা ও সম্পত্তি জাতীয়করণ করা, তাদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা। তাদের মধ্যকার ঘৃণ্য খুনীদের চরম শাস্তি প্রদান করা।

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা বন্দী সকল দেশপ্রেমিকদের মুক্তিপ্রদান, তাদের দেশ সেবার সুযোগ প্রদান।

কালোবাজারী, মজুতদারী, মহাজনী, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরদের কঠোর হস্তে দমন করা। এদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। মারাত্মক অপরাধীদের চরম শাস্তি প্রদান করা।

সীমান্ত সিল করা, ভারতে পাচার কঠোর হস্তে দমন করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের সাথে স্বাক্ষরিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী সকল প্রকার প্রকাশ্য, গোপন চুক্তি বাতিল করা, বিভিন্ন যৌথ কমিটি বাতিল করা।

সোভিয়েট-মার্কিনের সাথে স্বাক্ষরিত সকল অসম জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিল করা।

বেরুবাড়ীসহ ভারতকে প্রদত্ত পূর্ব বাংলার সমগ্র ভূখণ্ড ফেরত আনা। আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব কঠোরভাবে বজায় রাখা।

২। বাক স্বাধীনতা, ভোট প্রদানের স্বাধীনতা, সমাবেশ ও রাজনৈতিক কাজের স্বাধীনতা, মিটিং, মিছিলের স্বাধীনতা, পত্রিকা ও প্রকাশনার স্বাধীনতা প্রদান করা।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি জাতীয় পরিষদ নির্বাচন করা। এ জাতীয় পরিষদ সংবিধান প্রণয়ন করবে।

সরকার এ জাতীয় পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

৩। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, অনাহারে মৃত্যু ঠেকানোর জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪। ভূমি সংস্কার করা, নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত জমি বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা। জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের ভূমি বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে বিতরণ।

ব্যাপক জনগণকে সমাবেশিত করে বন্যা ও খরা সমস্যার সমাধান করা।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ফারাক্কা সমস্যার সমাধান করতে বাধ্য করা।

প্রতি ইঞ্চি অনাবাদী জমিতে আবাদের ব্যবস্থা করা, খাদ্যদ্রব্যের অপচয়, মজুতদারী, চোরাকারবারী বন্ধ করা।

কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা।

এভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধান করা।

৫। শিল্প কারখানায় আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের ও দালালদের কার্যকলাপ বে-আইনী ঘোষণা করা ও কঠোরভাবে বন্ধ করা।

পূর্ববাংলার শিল্প কারখানা পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কারিগর ও প্রশাসকদের সমন্বয়ে সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করা। অপচয়, শিল্প কারখানার সম্পদ আত্মসাৎ, চোরাকারবারী, কাজে ফাঁকি ইত্যাদি বন্ধ করা।

ব্যাপক শিল্পায়ন করা।

কুটির শিল্প ও হস্ত শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে রক্ষা করা ও সহায়তা করা।

দেশপ্রেমিক শিল্পপতিদের রক্ষা করা।

এভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া।

পর্যায়ক্রমে মূল্য কমিয়ে আনা।

৬। আমদানি-রফতানি বাণিজ্য জাতীয়করণ করা। এটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা। আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে দেশীয় প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া। আমদানি-রফতানি ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করা। বিদেশী মুদ্রা পাচারকারী, চোরাকারবারী, কালোবাজারী ও দুর্নীতিবাজদের কঠোর হস্তে দমন করা।

৭। কালো টাকা ও সম্পদ রাষ্ট্রীয়করণ, বিদেশী শোষণ ও লুণ্ঠনের অবসান, চোরাকারবার, পাচার, মহাজনী, মজুতদারীসহ সকল প্রকার সামাজিক দুর্নীতির অবসান, কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণ, পণ্যদ্রব্যের সুষ্ঠু পদ্ধতিতে বাজারজাত করা, বেকারত্বের অবসান, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক আহরণ, দেশীয় দ্রব্যের

ব্যবহার, বৈদেশিক আমদানি কঠোরভাবে হ্রাস করা, বৈদেশিক রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দ্রুত হ্রাস করা, দ্রব্যমূল্য কমিয়ে আনা, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা।

৮। মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য সত্যিকারের জনগণের স্বার্থে সেবক হিসেবে বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীকে পুনর্গঠন করা। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, রক্ষী বাহিনী এবং অন্যান্য প্রাইভেট প্রকাশ্য ও গুপ্ত বাহিনী, গণবিরোধী বাহিনীসমূহকে বেআইনী করা। আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের অস্ত্রধারী দলসমূহের ডাকাতি এবং অন্যান্য নির্যাতন বন্ধ করা।

এ ধরনের বাহিনীর ঘৃণ্যদের চরম শাস্তি দেওয়া।

সেনাবাহিনী কৃষি, শিল্প, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকবে, উৎপাদনে অংশগ্রহণ করবে।

তারা আঞ্চলিক অখণ্ডতা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব কঠোরভাবে রক্ষা করবে। সীমান্ত বন্ধ রাখবে, রাষ্ট্রবিরোধীদের দমন করবে।

সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার জন্য রাজনৈতিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা, অগণতান্ত্রিক নিয়ম-কানুন বাতিল করা। সেনাবাহিনী রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করবে।

৯। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের নেতৃত্ব বাতিল করা। সম্প্রসারণবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও অশ্লীল সংস্কৃতি বেআইনী করা।

–জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও শিক্ষার পদ্ধতি গড়ে তোলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন করা।

১০। শ্রমিক-মজুর ও বেসামরিক কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের চাহিদা পূরণ করা।

১১। নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, মাতা ও সন্তানদের রক্ষা করা।

১২। আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের হাতে শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা, তাদের পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করা, আহতদের চিকিৎসা, শারিরীক অক্ষমদের পুনর্বাসন করা।

১৩। সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের রিলিফ প্রদান।

১৪। আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের [অপসারণ করে] প্রশাসনের সাথে যুক্ত সৎ ও দেশপ্রেমিক কর্মচারীদের দেশসেবার সুযোগ প্রদান করা, যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় আচরণ করা।

১৫। প্রবাসী বাঙালিদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

১৬। পূর্ববাংলায় অবস্থানকারী বিদেশী নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ।

১৭। পূর্ববাংলার জাতিগত সংখ্যালঘুদের পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় সীমার মাঝে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান, তাদের দ্রুত উন্নতির ব্যবস্থা করা, বাঙালি শোষকদের অত্যাচার বন্ধ করা।

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

ধর্মীয়, ভাষাগত, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করা।

ধর্মীয়, ভাষাগত জাতিগত বিভেদ সৃষ্টিকারী, নির্যাতনকারীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা।

১৮। শান্তি, নিরপেক্ষতার বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, প্যালেস্টাইনসহ বিশ্বের নিপীড়িত দেশ ও জাতিসমূহের মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করা।

বাঙালি জাতি ও জনগণের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন; তাই সকল দেশপ্রেমিক জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে–বাঙালি জাতি ও জনগণকে বাঁচানো।

আসুন, আমরা আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের উৎখাত করি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তি আনয়ন করি, ক্ষুধার অবসান করি; চাকুরি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা বিধান করি। পূর্ববাংলার জনগণকে বাঁচাই।

দল-মত নির্বিশেষে প্রকাশ্যে ও গোপনে কর্মরত সকল দেশপ্রেমিক বিরোধী রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির নিকট আমরা আবেদন জানাচ্ছি– আপনারা পূর্ব বাংলার জনগণের এ চরমতম সংকটজনক মুহূর্তে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হোন, আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভুদের উৎখাত করে পূর্ববাংলার জনগণের বাঁচানোর কাজে শরীক হোন।

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উৎখাত করুন।

বাংলাদেশ পুতুল সরকারকে উৎখাত করুন।

জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করুন।

খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, চাকুরি, বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন।

শান্তি, স্বাধীনতা গণতন্ত্র কায়েম করুন।

বাঙালি জাতি ও জনগণের অস্তিত্বে আজ বিপন্ন; তাদেরকে বাঁচান।

সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করুন।

আওয়ামী বিশ্বাসঘাতকদের উৎখাত করুন।

বেরুবাড়ী ফিরিয়ে আনুন, ফারাক্কা সমস্যার সমাধানে ভারতকে বাধ্য করুন।

মজুতদারী, চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মহাজন, মুনাফাখোর, লাইসেন্স-পারমিটধারী, কালো টাকার মালিক আওয়ামী দুষ্কৃতকারীদের উৎখাত করুন।

১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর কালো দিনে অর্ধ দিবস হরতাল পালন করুন!
অফিস-আদালত, কল-কারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যানবাহন,
হাটবাজার ইত্যাদি উভয় দিন অর্ধ দিবস বন্ধ রাখুন!
পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট-জিন্দাবাদ!
পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি –জিন্দাবাদ!
পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী–জিন্দাবাদ!
সিরাজ সিকদার –জিন্দাবাদ!

এস, আর, ও, নং ১৯১ এল-৬ই জুন, ১৯৭৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিধানের ১১৭-ক অনুচ্ছেদের (৩) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের এই গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন :

রংপুর : কয়েকটি মুখ ক'টি দৃশ্য*

আমার এই প্রতিবেদনের ডেট লাইন– রংপুর। এই জেলায় এসেছি অক্টোবরের চার। তারপর ঘুরেছি এখান থেকে সেখানে– এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে। পথ চলতে দৃশ্যমান ছিল মৃত্যু আর বুভূক্ষা সর্বত্র তার যেন নাম লিখে রাখছে। ফুটপাত, খোলা মাঠ, বাড়ির বারান্দা, লঙ্গরখানা, রেলস্টেশন– সর্বত্র তাদের দেখেছি। শুনেছি অনেক কাহিনী। আমার আজকের প্রতিবেদন– বুভূক্ষু রংপুরের কতিপয় মুখ কতিপয় দৃশ্য :

কাহিনীটি বলেছেন গাইবান্ধা পৌরসভার চেয়ারম্যান খোন্দকার আজিজুর রহমান–

এক

গাইবান্ধা বড় মসজিদের সামনে ওরা বসেছিলেন। স্বামী আর স্ত্রী। দুজনেই কংকাল। সুমুখে একটি ছেড়া কাথার উপর নিঃসাড় আরেকটি শিশু কংকাল। খানিকক্ষণ আগে মারা গেছে। ওদের বাড়ি গাইবান্ধা থানার বোয়ালি ইউনিয়ন। মসজিদে তখন তারাবীর নামাজ চলছে। এক সময় নামাজ শেষ হলো। নামাজীরা বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। সিঁড়ির কাছে একটি মৃতদেহ। দুইটি কংকাল দাফন কাফনের জন্যে চাঁদা চাইছেন। বলছেন– 'হামার ছোলের দাফনের জন্যে তোমরা পয়সা দিয়া যান।'

খবর গেলো পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে। তিনি এসে ওদের বললেন, কাল সকালে আমি দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবো। তোমাদের চাঁদা তোলার দরকার নেই। লাশটাকে পাহারা দাও।

পরদিন সকালে চেয়ারম্যান সাহেব এসে দেখতে পেলেন– তারা তখনো চাঁদা তুলছেন। চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, চলো– লাশ নিয়ে কবরস্থানে যাই।

কিন্তু বাবা মা রাজী হলেন না। বললেন, 'লাশ হামি দিবার নই। বাঁচি থাকতেই যা কষ্ট পাইছে মরার পর আর কি কষ্ট পাইবে। লাশ হামি দিবার নই। পরে আইসেন। লাশ দিমু।'

চেয়ারম্যান সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন এখন দেবে না?

তারা জবাব দিলেন, 'পিন্দনের কাপড় নাই। লাশ দেখায়া এঠে চান্দা তুলবো। আপনি তুমি যান। পরে আইসেন।

দুই

রংপুর রেল স্টেশন। তারিখ অক্টোবর পাঁচ। এক বৃদ্ধ মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে অস্ফুট কণ্ঠে তিনি তার পরিজনদের বললেন, 'মুই মা'র গেনু। তোমরা সব খায়া বাঁচে। মোর মতো আর কারো যেন এমন না মরে।'

---

* হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, দৈনিক বাংলা। ধারাবাহিক রিপোর্ট, ১৭/১০/৭৪ থেকে শুরু

পরিজন বলতে স্ত্রী আর এক কন্যা। চিলমারী থেকে এসেছে। মৃতদেহের পাশে ভীড় জমেছে। পরিজনদের চোখে অশ্রু নেই, কান্নার শব্দে নেই কোন বিলাপ। খানিকপর ভীড়ের পানে হাত পেতে মেয়েটি বললো– 'হামাকে তোমরা কিছু পয়সা দেন। রুটি খাইম কুশার খাইম'।

তিন

গাইবান্ধা মডার্ন স্কুলের লঙ্গরখানা থেকে ফিরছিলাম। এমন সময় মেয়েটি প্রায় ছুটে এলো। দেহ এখনো পুরো কংকাল হয়নি। কিন্তু খানিকটা দৌঁড়াতেই হাফিয়ে গেছে। বছর পনের ষোল বয়স। হুবহু আমার এক বোনের মতো দেখতে। পরনে নীল শাড়ি। দুচোখে দারুন উৎকণ্ঠা। ওর বোধ হয় ধারণা হয়েছিল– আমি সবার নাম নিতে এসেছি– আমি কাপড় দেবো।

মেয়েটি বললো– 'পায়ে পড়ি– হামার নামটা নেখি নেও। বুড়া বাবা মা। হামরা এঠে এস্যে পড়ে রইছি। হামরা নাচার–পিন্দনের একখান কাপড় দেও'।

মেয়েটিকে বললাম, আমি কাপড় দেয়ার লোক নই। আমি শুধু তোমাদের খবর নিতে এসেছি। কিন্তু মেয়েটি বুঝেও বোঝে না।এর মধ্যে তার বাবা মাও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদেরও একই আবেদন। নিস্তার পাওয়ার জন্যে পরে বললাম, আমি কাল আবার আসবো তখন তোমাদের নাম নেবো।

খানিক পরের কথা। ঘাঘট নদীর পুলের কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকজন দুঃস্থ কৃষকের সঙ্গে কথা বলে রিকশায় উঠবো বলে পা বাড়িয়েছি। হঠাৎ মেয়েটি বললো– 'হামার একলা কথা শোন'।

তারপর মেয়েটি হঠাৎ বুকের কাপড় ফেলে দিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর ত্রস্তে কাপড়টি আবার তুলে নিয়ে বললো–'এখন হামাক একলা কাপড় দেও, না হয় একলা টাকা দেও'।

চার

তার নাম মোমেনা খাতুন। কুড়িগ্রাম শহরের কেন্দ্রীয় লঙ্গরখানায় তার সঙ্গে আবার দেখা। তিন সন্তানের মা। কোলে তখন সাত বছরের একটি সন্তান–কংকাল। মোমেনার স্বামীর নাম মোহাম্মদ আলী। বাড়ি ডিক্রীর চর। থানা কুড়িগ্রাম।

মোমেনা অনেকক্ষণ যাবৎ আমার পেছনে ঘুর ঘুর করছিল। দাবী শুধু একটি–তার স্বামীকে আমি যেন ফিরিয়ে এনে দেই।

মোমেনার স্বামী মোমেনাকে ছেড়ে গ্রাম থেকে চলে এসেছে। শুধু বলেছে–আমার আর সামর্থ নাই। আমি আমার পথে চললাম। তুমি তোমার পথ দেখো।

মোমেনা জীবনে তার বাপের বাড়ি ও স্বামীর বাড়ির বাইরে কোথাও যায়নি। কিন্তু এবার সে পথে নামলো। কুড়িগ্রাম শহরে এলো। তারপর স্বামীর সঙ্গে কুড়িগ্রাম শহরে তার দেখা হয়েছে। কিন্তু মোহাম্মদ আলী কোন কথা বলেনি। এড়িয়ে গেছে। মোমেনা আমায় বললো, স্বামী একদিন গোরস্থানের কাছে দাঁড়িয়েছিল। আমি ওকে দেখে

দাঁড়ালাম। ছেলেটি ক্ষীণ কণ্ঠে বাবা বলে ডাকলো। ও আমাদের দিকে তাকালো। কোন কথা বললো না। হাত দিয়ে এবার কবরস্থানের দিকে দেখালো। ও তখন কাঁদছে, কিন্তু আমার সঙ্গে কোন কথা বললো না।

একটি নয়–রংপুর জেলার অনেক লঙ্গরখানায় এই দৃশ্য আমি দেখেছি। রুটি আর দুধের জন্যে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নিয়ে লাইনে বসেছে ক্ষুধার্ত বাবা মা। খাবার দেয়া হলো। আর তারপর ছোমেরে শিশু পুত্র কন্যার হাত থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেললো বাবা, মা।

পাঁচ

তারা বাঁচার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। তাদের পেটে ক্ষুধার আগুন। সে আগুন কখনো কখনো চোখে ধিকিধিকি জ্বলে ওঠে। বুভুক্ষু রংপুরের বুভুক্ষু মানুষ– ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, বিত্তহীন দিনমজুর, দরিদ্র কৃষক– তারা আজ জীবনের জন্যে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। শুধু রংপুরে নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আজ একই ইতিবৃত্ত। তবে রংপুরের অবস্থা বোধকরি সবচেয়ে সংগীন। শুধু ভূমিহীন ক্ষেতমজুর আর দরিদ্র কৃষকই নয়– ক্ষুধার জ্বালা আর অনটনের বোঝা নিয়ে ধুকছে স্বল্পবিত্ত নিম্নবিত্ত আর নির্ধারিত আয়ের মানুষ। ফুটপাত, খোলা মাঠ, রেলস্টেশন আর লঙ্গরখানায় তারা সবাই এখনো লাইন দেয়নি; কিন্তু তাদের অবস্থাও সংগীন। এবং তা রংপুরে এলে যেন বেশি অনুভূত হচ্ছে; চোখের সম্মুখে হচ্ছে অনেক বেশি প্রকট।

অনাহার আর অপুষ্টিতে লোক মারা যাচ্ছে প্রতিদিন। তাদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যা সর্বাধিক। লাশের দাফন-কাফনও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে রংপুরে। লোক মারা গেছে রংপুরে গত দু'মাসে হাজার হাজার। অনাহারে মারা গেছে ও যাচ্ছে, ক্রমাগত অপুষ্টির জন্যে জীবনীশক্তিহীন ও প্রতিরোধহীন দেহগুলো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে কিছু খাওয়ার পর। যে অবস্থা রংপুরে দেখেছি, তাতে আশঙ্কা হচ্ছে, সরকার ও বিত্তবান জনগণ সর্বাত্মক সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ না-করলে, এখনো শুভবুদ্ধি আর মানবতাবোধ প্রার্থিতভাবে দেখা না-দিলে আরো হাজার হাজার লোক রংপুরে মারা যাবে। এবং আগামী ডিসেম্বর নাগাদ যদি মৃত্যুর হার আরো শংকাজনক রূপ নেয় তাহলেও উপযুক্ত ব্যবস্থা না-নেওয়া হলে ক্ষুধিত বাস্তুভিটাহীন দুর্গতদের উপর আবার আঘাত হানবে প্রকৃতির চাবুক। তাতেও বহুলোক মারা যাবে।

রংপুরে ক্ষুধার্ত বুভুক্ষু বাস্তুত্যাগী বস্তুহীন হাজার হাজার লোকের যে ছবি আমি দেখেছি তাতে ভাবতে কষ্ট হয়– এরা আসলে মানুষ কিনা। এমন কঙ্কালসার এবং এত বেশি কঙ্কালসার দেহ এর আগে আমি চোখে দেখিনি। ১৯৭০ সালের সেই প্রাকৃতিক মহাদুর্যোগের পর ধ্বংস আর মৃত্যুর বিভীষিকা দেখেছি। কিন্তু রংপুরে এসে আমার মনে হয়েছে– বুভুক্ষু রংপুরের আজকের এই বিভীষিকা নানা কারণে যেন তাকেও ম্লান করে দিতে চাইছে। ক্ষুধার এমন সর্বগ্রাসী আর সর্বব্যাপী রূপ আমার আগে কখনো চোখে পড়েনি।

বঞ্চনা, দীর্ঘদিনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রকৃতির নিষ্ঠুর থাবা আর বুভুক্ষার অজস্র ক্ষতচিহ্ন অঙ্গে নিয়ে আজকাল গুণছে রংপুর। কাল গুণছে বিভীষিকা আর বিপর্যস্ত সময়ের অনেক দৃশ্যকে তুলে ধরে।

বাঁচার জন্যে মানুষ যা পায় তাই খায় আর খেতে চায়– এই নির্মম সত্য রংপুরে না গেলে বোঝা যাবে না। ক্ষুধার্ত লোক যে কত অসহায় হয়ে বাৎসল্য, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি ভুলে যেতে পারে তা রংপুরে না-গেলে বোঝা যাবে না। আরো অনেক দৃশ্য আছে। প্রকৃতির নির্মম থাবা, বঞ্চনা, শঠতা, শোষণ এবং বুভুক্ষা রংপুরের কৃষিব্যবস্থা, অর্থনীতি, সামাজিক পরিবেশে এক নতুন ভাংচুর ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, যার আঘাত হবে সুদূরপ্রসারী। রংপুরে আমি দরিদ্র কৃষকদের কৃষিজমি ফেরি করতে দেখেছি। রংপুরের কৃষি ব্যবস্থা আর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে একটি নতুন মোড় ফেরার আশংকা রয়েছে।

দ্রব্যমূল্যের নানাবিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া পড়েছে রংপুরের কৃষি জমি ও কৃষি ব্যবস্থায়। ভূস্বামীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে নতুন প্রবণতা। ফসলের চাষের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা দৃশ্যমান।

চোরাচালান এক মারাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছে আর সব এলাকার মতো রংপুরে। আজকের এই বুভূক্ষার নেপথ্যে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে এই চোরাচালান। আগামী দিনগুলোর অনেক অশুভ প্রহরেরও ভিয়েন জোগাচ্ছে এই চোরাচালান।

রংপুরে বিশেষ করে কুড়িগ্রাম মহকুমায় চলতি আমনের প্রচুর ফলন– যাকে বলা বাম্পার ক্রপ হয়েছে। এত ফলন গত কয়েক বছর হয়নি। কিন্তু এই 'বাম্পার ক্রপ'ই শেষ কথা নয়। কীটনাশক ওষুধ আর চোরাচালানের সমস্যা একটি মারাত্মক প্রশ্নচিহ্নের মতো এই বাম্পার ক্রপের সামনে ঝুলছে।

রংপুরের আজকের এই বুভুক্ষা শিক্ষা ও শিল্পাঙ্গনেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সামাজিক শোভন মূল্যবোধে। বেওয়ারিশ শিশুদের ভবিষ্যৎ ও রক্ষণাবেক্ষণ একটি নতুন সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। আজকের বুভুক্ষা জন্ম দিয়েছে আরেকটি নতুন সমস্যা– 'স্ফীতক' বা ভাসমান জনসংখ্যা। আজকের বুভুক্ষা প্রতিক্রিয়া ফেলেছে প্রশাসনিক কার্যক্রমে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো– রংপুরের আজকের এই অবস্থা দেখে হাল ছেড়ে দেয়ার কোন কারণ নেই। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এখনো বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে যথার্থ শুভ বুদ্ধি ও যুক্তিযুক্ত কার্যক্রম নিয়ে এগোনো যায় তবে 'মেঘের আড়ালে সূর্যে'র অবশ্যি দেখা পাওয়া যাবে।

ছয়

রংপুরের আজকের এই বুভুক্ষা গত কয়েক বছরের দুর্যোগ দুর্নীতি কারচুপি ও টানাপোড়নের নির্মম পরিণতি। কোন একক বা তাৎক্ষণিক কারণের জন্যে বুভুক্ষার প্রেতচ্ছায়া আজ রংপুরে নেমে আসেনি। গত কয়েক বছর ক্রমান্বয়ে ছুরিতে শান বাড়ছে। আর আজ তা নেমে এসেছে এখানকার অধিবাসীদের ওপর। যেসব কারণ আজ রংপুরের এই অবস্থার জন্যে প্রধানত দায়ী তা হলো– (১) বন্যা, দুর্যোগ ও নদীর ভাঙ্গন (২)

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ভূস্বামীর মনোভাব পরিবর্তন (৩) নানাধরনের কারচুপি (৪) দুর্নীতি ও চোরাচালান। রংপুরেরর আজকের এই বুভুক্ষা যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবদান তেমনি মনুষ্যসৃষ্ট।

বন্যা এবং তিস্তা, ধরলা, ঘাঘট আর ব্রহ্মপুত্রের ভাঙন রংপুরের একটি পুরোনো অভিশাপ। বন্যার ছোবল রংপুরের অঙ্গে বারবার পড়েছে, তেমনি রয়েছে ভাঙ্গনের নির্মম থাবা। গত কয়েক দশকে ধরলা নদীর ব্যাপক ভাঙনের শিকার হয়েছে কুড়িগ্রাম। গত এক দশকে কুড়িগ্রাম পুরোনো শহরের বহু এলাকা খেয়েছে রাক্ষুসী ধরলা। নদীর ভাঙ্গনে গত কয়েক বছরে রংপুরের হাজার হাজার পরিবার নিঃস্ব হয়েছে, হয়েছে বাস্তুহীন।

কুড়িগ্রাম লঙ্গরখানায় আলাপ হলো জয়নুল আবেদীনের সঙ্গে। বাড়ি রৌমারী থানার খেয়ারচর গ্রামে। ৯ বিঘা জমি ছিল। ১৯৭৩ সালে এরমধ্যে কিছু নদীগর্ভে বিলীন হয়। বাদবাকী যা ছিল তা এবার আগস্ট মাসে থাবা মেরে ছিনিয়ে নিল নদীর রাক্ষুসী ভাঙন। শুধু কৃষি জমি নয়, নদী ছিনিয়ে নিয়েছে বাস্তুভিটা। আজ জয়নুল আবেদীন পরিবার-পরিজন নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কুড়িগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে। কাজকাম মেলে না, পেটে ক্ষুধার জ্বালা। দেহ হয়েছে কঙ্কাল। আলাপ হলো চিলমারী থানার জেরগাছ গ্রামের খায়বর আলীর সঙ্গে, উলিপুর থানার ধানসেন্নী গ্রামের ষাট বছরের বৃদ্ধ কসির, ফুলছড়ি থানার গোপীনাথ চর গ্রামের লুৎফর রহমানের সঙ্গে। আলাপ হলো– অনেকের সঙ্গে, যাদের জমি কেড়ে নিয়েছে নদীর ভাঙ্গন; কামলাগিরির কাজও জোটাতে না-পেরে যারা আজ লঙ্গরখানায় কাতারবন্দী।

বন্যার ছোবলে নিঃস্ব হয়েছে বহু পরিবার। গত বছরের চেয়ে এবারের বন্যার ভয়াবহতা ও ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশি। এবার রংপুরে বন্যা শুরু হয় জুনের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝ সময় পর্যন্ত বন্যার পানি ছিল অধিকাংশ এলাকায়। এ বছর রংপুরের কোনো কোনো এলাকায় বন্যা তিন-চারবার ছোবল হেনেছে। এবার বন্যার পানি নেমে গেছে কিন্তু আবার বেড়েছে। রংপুরের ডেপুটি কমিশনার আমাকে জানান, সেপ্টেম্বরের মধ্যসময় পর্যন্ত সমগ্র ব্রহ্মপুত্র এবং ঘাঘট নদী তার নিম্নাঞ্চলে বিপদসীমার উপরে ছিল। রংপুরের বিভিন্ন এলাকায় নদীর পানি বিপদসীমার নিচে নেমে গেলেও কোথাও কোথাও তা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেও ছিল বিপদ সীমার সামান্য নিচে। যেমন, তিস্তা নদী। এর বিপদসীমা হলো ৯৬ দশমিক ৫ ফুট। অক্টোবরের চার তারিখেও তিস্তা ছিল বিপদসীমার মাত্র দশমিক পাঁচ ফুট নিচে। অক্টোবরের নয় তারিখ গাইবান্ধার মহকুমার প্রশাসক আমাকে জানান, বন্যার পানি নেমে না-যাওয়ার জন্যে তখনো সাঘাটা থানার বেশ কটি ইউনিয়নে আমনের চাষ করা হয়নি।

রংপুরে এ বছর রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। এ বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে রংপুরে বৃষ্টি হয়েছে ১১৩ দশমিক ৫৬ ইঞ্চি। ১৯৭৩ সালে এ সময়ে বৃষ্টি হয়েছে ৮৬ দশমিক ৮৪ ইঞ্চি। রংপুরের ডেপুটি কমিশনারের মন্তব্য এই অঞ্চলে এটি সাম্প্রতিককালে রেকর্ড পরিমাণ অতিবর্ষণ যা রংপুরের উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে।

রংপুরে গত আউশ ফসল ভালো হয়নি। এ তথ্য ডেপুটি কমিশনারের। তিনি বলেন, এ বছর আউশ ফসল প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবিঘায় দেড় মণ দু'মণের বেশি ফলন হয়নি।

বিগত বছরসমূহে বিঘা প্রতি ফলন ছিল ছয় থেকে সাত মণ। এ বছর পাটের ফলনও ভালো হয়নি বলে ডেপুটি কমিশনার জানান। তিনি বলেন, আগে যেখানে প্রায় ৩ লাখ একর জমিতে পাটের চাষ করা হয়েছে সেখানে এবার মাত্র ১ লাখ ৯০ হাজার একর জমিতে হয়েছে পাটের চাষ।

ভূস্বামীদের মনোভাব

গত বছর থেকেই রংপুরে সম্পন্ন ভূস্বামীদের মধ্যে একটি নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাহলো, জমি আধি বা বর্গায় চাষের জন্যে বন্দোবস্ত না-দেয়া। জেলার বিভিন্ন মহল এবং বর্গাচাষীদের সঙ্গে আলাপ করে আমি এ খবর পেয়েছি। গত বছর এমনও হয়েছে, ভূমিহীন আধিচাষীরা আধিতে জমি চাষের জন্যে মহড়া দিয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। ভূস্বামীদের এই মনোভাব পরিবর্তনের কারণ তিনটি–(১) জমি হাত ছাড়া হয়ে যায় কিনা এই শঙ্কা (২) জমি বর্গায় না-দিয়ে পুরো ধান সংগ্রহ করে তা চড়ামূল্যে বিক্রি করে অধিক লাভ। আরেকটি কারণ হলো, চোরাচালানকারীদের সঙ্গে আতাঁত করে অথবা প্রত্যক্ষভাবে চোরাচালানে লিপ্ত হয়ে অধিক আয়।

১৯৭৩ সালে যে প্রবণতার শুরু ১৯৭৪ সালে তা আরো ব্যাপক হয়েছে। এবার বহু সম্পন্ন চাষী জমি আধিতে না-দেয়ার ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেন। এবার জমিতে কামলাও কম খাটানো হচ্ছে।

দুর্নীতি ও চোরাচালান

রংপুরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে, বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ করে মনে হয়েছে, দুর্নীতি ও চোরাচালান এই জেলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। হর করেছে এ জেলার জনগণের মুখের গ্রাস। মোগলহাট, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, রোমারী ইত্যাদি এলাকা চোরাচালানীদের স্বর্গে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগে পেয়েছি। বিভিন্ন স্তরের জনগণের সঙ্গে আলাপ করে মনে হয়েছে, ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে এই জেলায় ফসল ভালো হলেও তা দেশে থাকেনি। ফসল মাঠে থাকতেই তা বিক্রি হয়ে গেছে চোরাচালানকারীদের কাছে; তারপর চলে গেছে সীমান্ত পেরিয়ে। সীমান্তে চলেছে ও চলছে অবৈধ ও অসম বিনিময় বাণিজ্য।

খাদ্যমজুদ অবস্থাকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। রংপুর জেলা ন্যাপের (মোজাফফর) সম্পাদক জনাব আফজাল এক সাক্ষাৎকারে আমার কাছে অভিযোগ করেন,– পণ্যের বাজার মজুতদার, অসাধু ব্যবসায়ী ও জোতদার ধনী কৃষকের হাতে চলে গেছে। তার বিশ্বাস, চাল এখনো প্রচুর পরিমাণে মজুত রয়েছে। এগুলো উদ্ধারের ব্যাপারে 'পায়াস উইশ' ছাড়া তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

গত ৮ই জুলাই জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী শ্রী ফনী মজুমদার জানান যে বর্তমান বৎসর রংপুর জেলায় কোন খাদ্য ঘাটতি নেই। কৃষি দফতরের হিসাব মতে খাদ্যশস্য উৎপন্নের পরিমাণ ২ কোটি ৭০ লক্ষ ১০ হাজার ২৫ মণ। বিগত আদমশুমারী অনুযায়ী রংপুর জেলার লোকসংখ্যা ৫৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৭০০

জন। মাথা পিছু দৈনিক ১৫ দশমিক ৫০ আউন্স হিসেবে বাৎসরিক চাহিদা ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ২০ হাজার ৬১৮ মণ। কাজেই হিসাব মতো রংপুর জেলায় খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৩৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪০৭ মণ। তিনি আরো জানান যে রংপুর জেলায় উৎপাদিত খাদ্যশস্য শুধু ঐ জেলায়ই থাকে না, ব্যবসায়ীদের মারফত এক জেলার খাদ্যশস্য অন্য জেলায় চালান হয়ে থাকে। জেলার সমস্ত লোকের উৎপাদনযোগ্য জমি না-থাকায় তাদের কিনে খেত হয়। এছাড়া কল-কারখানার শ্রমিক, হাসপাতাল, পুলিশ, সরকারি চাকুরে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রভৃতি অগ্রাধিকার ভিত্তিক ভোক্তা এবং গরীব শ্রেণীর লোকদের জন্যে রেশনিং মারফত সরকার প্রতি মাসে খাদ্যশস্য বিতরণ করে থাকেন। তিনি জানান, গত জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ২০০ মণ খাদ্যশস্য এই জেলায় বিতরণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, কৃষি দফতরের উল্লিখিত হিসাব এবং রেশনে খাদ্যশস্য বিতরণের পরও রংপুরের এই অবস্থা কেন? বিভিন্ন মহল থেকে কেন অভিযোগ করা হচ্ছে? এ বছরের প্রথম থেকেই অনটনের চাবুক রংপুরে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

অক্টোবরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে রংপুরে চালের দর দেখেছি ২৭০ থেকে ৩৪০ টাকা। অন্যান্য জিনিসপত্রের মূল্যেরও সমান উর্ধ্বগতি। রংপুরের বাজারে তরিতরকারির সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অনেক কম। জেলা কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গ আমায় জানিয়েছেন, রংপুরে রেশনে মাল সরবরাহের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অনেক কম এবং অনিয়মিত। এমনও হচ্ছে– সপ্তাহের পর সপ্তাহ রেশনে মাল দেয়া হয় না। চাহিদার তুলনায় জেলার সরকারি গুদামগুলোতেও মালের স্টকের পরিমাণ দীর্ঘদিন যাবৎ সন্তোষজনক নয়। খাদ্য পরিবহন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ক্রটি সম্পর্কিত অনেক অভিযোগ শুনেছি। বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতির বহু অভিযোগ পেয়েছি।

চোরাচালান, দুর্নীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বারবার আঘাত, দ্রব্যমূল্য সাধারণের ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়া, বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব, কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত মনোভাবের পরিবর্তন ও ভাংচুর ইত্যাদি সব মিলিয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ যে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে চলছে তারই পরিণতি রংপুরের আজকের বুভুক্ষা।

সাত

ফেরি করে জমি বিক্রি ও মেয়ে বন্ধক রাখা হচ্ছে

রংপুরে আজ কোথাও কোথাও কৃষি জমি ফেরি করে বিক্রি হচ্ছে রংপুরে গিয়ে প্রথম যখন ঘটনাটি শুনি ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। কদিন পরের কথা। রংপুর সদর রেজিস্ট্রি অফিস প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। লক্ষ্য করছিলাম, এক বৃদ্ধ কিছু বলার জন্যে উসখুস করছেন। চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি এমন সময় বৃদ্ধ প্রায় ছুটে এলেন বললেন, বাবা। দয়া করে তুমি হামার একটা কথা শোনেন, হামার দুই দোন জমি আছে। তুমি নেন। টাকা তিনশো চারশো যা পারেন দেন। জমি হামার খাতাত আছে খুতিত আছে। বন্ধকীও নয় খায়-খালাসীও নয়...

বৃদ্ধকে বললাম, আমি জমি কেনার মহাজন নই, ক্রেতাদের দালালও নই। পত্রিকার কাজে এসেছি। বৃদ্ধ নিরাশ হলেন। তারপর বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন– 'হামাকের এটি তুমি আসছেন কেন? তুমি কীসের দেওয়ানী?' প্রথম কথাটার মানে বুঝিনি। পরে বুঝলাম, বৃদ্ধ ক্ষুব্ধ হয়ে আমায় গাল দিলেন। ক্ষুব্ধ হওয়ারই কথা। ভাগ্য ভালো, তিনি আমায় ধরে মার লাগাননি। ২৪ শতাংশে হয় এক দোন জমি। আবার ৩৩ শতাংশে হয় এক বিঘা ২ দোন জমি মানে দেড় বিঘা জমি। গত বছরের সাধারণ দর অনুযায়ী যে জমির দাম হওয়া উচিত সাড়ে চার হাজার টাকা, অভাবের তাড়নায় বৃদ্ধ সেই জমি বিক্রি করতে চাচ্ছেন মাত্র চারশো টাকায়। তাও বোধ হয় অনেকক্ষণ ঘুরে কোন গ্রাহক পাননি।

পরে রংপুরের আরো অনেক জায়গায় আমি এমনি ফেরি করতে দেখেছি কৃষি জমি। তাদের কণ্ঠে একাধারে ক্ষোভ, জ্বালা, অভাব আর উন্মুখ আগ্রহ- সব কিছু বাসা বেঁধেছে। কণ্ঠের সেই ভাষা লিখে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এক থেকে পাঁচ বিঘা জমির দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত কৃষকরা তাদের কৃষিজমি বিক্রি করে দিচ্ছে। এমন কি মাঠের ফসলসুদ্ধ বিক্রি করে দিচ্ছে। জমি কেনার জন্যে কৃষকদের পেছনে জোতদার ও মহাজনদের।

আর তেমন ছুটতে হচ্ছে না। দরিদ্র কৃষকরাই আজ হন্যে হয়ে ঘুরছেন, হত্যে দিয়ে পড়ে থাকছেন জোতদার আর মহাজনের বাড়িতে। রফা যারা বাড়িতে বসে করতে পারেননি তারা নিরুপায় হয়ে রাস্তায় নেমেছেন ফেরি করতে।

এরপুরো সুযোগ, বলা চলে ঘৃণ্যতম সুযোগ নিচ্ছেন এক শ্রেণীর জোতদার ও মহাজন। তাদের স্পষ্ট মনোভাব, ফান্দে এবার নিজে এসে ধরা দিয়েছে। আর কত ডানা ঝাপটাবে। প্যাচ কষে কষে নির্বিকার নির্লিপ্ত একটি ভাব চারধারে জড়িয়ে রেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আশা সামনে ঝুলিয়ে রেখে তারা দরিদ্র কৃষকদের কৃষি জমির দাম প্রায় পানির দরে নামিয়ে এনেছেন। এরপরও বঞ্চনা রয়েছে। জমি বিক্রির দলিল রেজিস্ট্রির সমুদয় খরচ যেমন নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের দাম, ডিড রাইটার অর্থাৎ দলিল লেখকদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি বহন করতে হতো ক্রেতাকে, এখন বহন করতে ইচ্ছে বিক্রেতা অর্থাৎ দরিদ্র কৃষককে। বেশ কিছু জোতদার ও মহাজন আরেকটি কারচুপি করছে। ১ দোন জমি কিনছে ২০০ টাকায় কিন্তু দলিলে লেখা হচ্ছে ২৫০০ টাকা। জমির দলিল পাছে ভবিষ্যতে আবার অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে কেনার জন্যে রদ না হয়ে যায় তাই আগেভাগেই এই ব্যবস্থা।

জোতদার ও মহাজনদের উদ্যত নখরের আরো কিছু পরিচয় আমি পেয়েছি। রংপুর জেলা রেজিস্ট্রার আমাকে বলছিলেন,– চোখ কান খোলা রাখুন, রেজিস্ট্রি অফিসগুলো চত্বরে ঘুরুন, অনেক অবিশ্বাস্য জিনিস দেখতে পাবেন। আমরা অনেক কিছুই দেখি শুনি। কিন্তু আমার নাচার।

মেয়ে বন্ধক

সত্যি কথাই বলেছিলেন জেলা রেজিস্ট্রার সাহেব। রেজিস্ট্রি অফিস চত্বরে অনেক ঘটনার হদিস পেয়েছি। শুধু জমি বিক্রি নয়, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, রংপুরের রেজিস্ট্রি অফিসগুলোর চত্বরে জমি বিক্রির দলিলের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী বন্ধক রাখার দর কষাকষি হয়। মানবদেহের বিনিময়ে বিকিকিনির অলিখিত দলিল হয় সম্পাদিত। একটি

ঘটনার কথা বলছি। রংপুর সদর রেজিস্ট্রি অফিসের অদূরে পুকুর পাড়ে একটি ছাউনি দেয়া গরুর গাড়িতে বসেছিল দুটি মেয়ে এবং একজন মাঝবয়েসী মহিলা। খানিক দূরে জীর্ণ জামা পরনে পোড় খাওয়া চেহারার একটি লোক সচ্ছল চেহারার একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। খানিকটা দূরত্ব রেখে দাঁড়ালাম। কথাবার্তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ওদের। তারপর যখন বুঝতে পারলো আমি ওখানকার লোক নই এবং মোটামুটি নিরাপদ ব্যক্তি তখন আবার দেহাতী ভাষায় কথাবার্তা শুরু করলেন। বুঝলাম দরকষাকষি হচ্ছে। সচ্ছল লোকটি জীর্ণ ভদ্রলোককে কিছু টাকা দিলেন। বোধ হয় শ'খানেক টাকা। বেশিক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। চলে এলাম। পরে শুনেছি সেদিন রংপুর সদর রেজিস্ট্রি অফিস প্রাঙ্গণে এক মর্মস্পর্শী বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। মেয়ে দুটিকে তাদের নতুন রক্ষকের হাতে ছেড়ে দেয়া হলে ওরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে চায়নি। কিন্তু যেতে হয়েছিল কারণ বাবা ওদের বন্ধক দিয়েছে। 'বিয়োগান্ত' শব্দটি ব্যবহার করলাম এজন্য যে মেয়ে দুটির ভাগ্যে কি ঘটবে কে জানে? রংপুরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাও আমাকে এই খবর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, রংপুরের অনেক পরিবার এমনিভাবে তাদের স্ত্রী ও বয়স্কা কন্যাকে বন্ধক দিচ্ছে এমনকি বিক্রি করছে। আগে রংপুরে জোতদাররা জমিতে দাদন এবং খতন দেয়ার বদলে মেয়েদের বন্ধক রাখতো। রংপুরে আবার সেসব কুটিল দিন ফিরে আসছে।

গরু-বাছুর বিক্রি

বন্ধক এবং কেনাবেচা হচ্ছে বাস্তুভিটা গরু-ছাগল এমনকি থালা-বাসন। রংপুরের কোন কোন এলাকায় মাস দেড়েক আগে থেকেই গরু নেমে আসে গরু, বাছুর, ছাগল, খাসী এখনো বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু বাজারে মাংসের দাম আবার বেড়েছে। এর কারণ হলো, জোতদার ও মহাজনেরা গরু-খাসীও এখন মজুদ করে রেখেছেন। রীতিমত বাগান বানিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। এমনও হয়তো হবে, তারা মওকা বুঝে হালের গরু পরে চড়া দামে বিক্রি করবেন।

দলিলের সংখ্যা

দরিদ্র কৃষকদের জমি বিক্রির প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি। রংপুরের জেলা রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালের তুলনায় এবার দৈনিক দলিল রেজিস্ট্রির হার হলো ২০ থেকে ২৫ গুণ বেশি। ১৯৭২-৭৩ সালে এ সময় দৈনিক যেখানে ২০ থেকে ২৫ খানা দলিল রেজিস্ট্রি হতো সেখানে দৈনিক আজ ৪৫০ থেকে ৫০০টি দলিল রেজিস্ট্রি হচ্ছে। জুলাই থেকে নবেম্বর মাস সাধারণত দলিল রেজিস্ট্রির জন্যে ডাল সিজন। এবার আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে (২৪-৮-৭৪) অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত একমাত্র রংপুর সদর রেজিস্ট্রি অফিসে ১৩ হাজার ২৯৫টি জমি বিক্রির দলিল রেজিস্ট্রি হয়েছে। ১৯৭৩ সালে এ সময়ে রেজিস্ট্রি হয়েছে মাত্র প্রায় ৩৩০টি দলিল। জেলার অন্যান্য রেজিস্ট্রি অফিসেও এমনি হারে দলিল রেজিস্ট্রি হচ্ছে। উল্লেখ্য, রংপুর জেলার ৩৩টি থানায় ২০টি সাবরেজিস্ট্রি অফিস রয়েছে।

কেন এমন হলো?

কেন এমন হলো? এর জবাব– 'দারুণ আকাল'। দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে জর্জরিত হচ্ছে আর সবার মতো রংপুরের দরিদ্র কৃষকরা গত দু'বছর যাবৎ। তাদের ক্রয় ক্ষমতা নেই। যে দরিদ্র কৃষকের তিন বিঘা জমি আছে তার পক্ষে জমির ফসলের আয়ে সংসার চালানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। শুধু ধানের দাম পেলে হয় না– অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার সামর্থ এদের থাকতে হবে। অভাব অনটনের জন্যে অনেকেরই আজ হালের গরু নেই। সার ও কীটনাশক ওষুধ কেনার পয়সা নেই। জমি প্রার্থিতভাবে চাষের সামর্থ নেই। তাদের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরা শুরু হয়েছে আগে থেকেই। এবারের আকাল তাদের চুরমার করে দিয়েছে।

সচেতন হওয়া প্রয়োজন

বিভিন্ন মহল দাবী করেছেন, বর্তমান অবস্থার আলোকে সরকারকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারের সর্বাত্মকভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এবারের এই জমি বিক্রি আগামী বছরগুলোতে অর্থনীতি ও কৃষির উপর মারাত্মক আঘাত হানবে। সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি ও কার্যক্রমের উপরও আসবে মারাত্মক আঘাত।

পরিত্যক্ত শিশু ও 'ভাসমান মানুষ' বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে

দারুণ আকালের শিকার হাজার হাজার নরনারী চলে এসেছে গ্রাম থেকে শহরে। এখনো আসছে। সময়ের নির্মম চাবুক খেয়ে উদভ্রান্তের মতো চলছে ভূমিহীন ও কর্মহীন ক্ষেতমজুর ও কারিগর, দরিদ্র কৃষক আর নিম্নবিত্ত এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে। যাচ্ছে জেলার এক মহকুমা থেকে আরেক মহকুমায়, রংপুরের লোক চলে গেছে দিনাজপুর ও বগুড়ায়। চলে এসেছে ঢাকায়।

'ভাসমান এই লোকগুলো' আশ্রয় নিয়েছে রেলস্টেশনে, ফুটপাতে, বাড়িঘর, অফিস-আদালতের বারান্দায়, লঙ্গরখানার চত্বরে। অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে হাজার হাজার। অপুষ্টির শিকার জীবনীশক্তিহীন বহু কঙ্কালসার লোক মারা গেছে কিছু খাওয়ার পর। এখনো মারা যাচ্ছে। জানি না আরো কত হাজার মারা যাবে। যারা এমনিভাবে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ভেসে পড়েনি তাদের অবস্থা যেমন সঙ্গীন তার চেয়ে বেশি সঙ্গীন এই 'ভাসমান লোকগুলো'র অবস্থা। লঙ্গরখানায় এক বেলা দেয়া দুটো আটার রুটি আর পাউডার গোলা এক মগ দুধের জন্যে তারা আজ উন্মুক্ত আগ্রহে কাতারবন্দী। তারা ভিক্ষা করছে। ডাস্টবিনের পাশে ভিড় করছে। তারা কাজ চাইছে। ক্ষুধার জ্বালা সইতে না-পেরে স্বামী তার স্ত্রীকে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে। বাবা-মা পালিয়ে যাচ্ছে তাদের শিশু সন্তানকে ফুটপাতে, বাড়ির বারান্দা, রেলস্টেশন আর লঙ্গরখানায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে।

আকালের শিকার এই 'ভাসমান জনগোষ্ঠীর আর 'পরিত্যাক্ত বেওয়ারিশ শিশু' দুর্ভিক্ষ কবলিত রংপুরে আগামীতে একটি বড় ধরনের মানবিক ইস্যু হিসেবে দেখা দেবে। এখন থেকেই এ ব্যাপারে সক্রিয় ভাবনা-চিন্তা প্রয়োজন। বাংলার ১৩৫০ সালের মহা মন্বন্তর আমি দেখিনি। তবে তার অনেক বিবরণ, অনেক কাহিনী শুনেছি। রংপুরে এসে আমার

বার বার মনে হয়েছে, ১৩৫০ সালের দৃশ্যগুলো আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কখনো মনে হয়েছে এবারের দৃশ্য যেন আরো ভয়াবহ। যথাযথ ব্যবস্থা না-নেয়া হলে দৃশ্যগুলো আরো ভয়াবহ, আরো মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেবে।

কত লোক ভাসমান?

ফ্লোটিং পপুলেশন বা রংপুরের এই ভাসমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কত? এখনো তা নিরূপণ করা হয়নি। তবে মোটামুটি একটা হিসেব নেয়া যেতে পারে। রংপুরের ডেপুটি কমিশনার আমাকে জানান পল্লীর জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ৩০ জন হলো ভূমিহীন কৃষক-ক্ষেতমজুর। শতকরা ২৫ জন হলো দরিদ্র কৃষক- ১ থেকে ৪ বিঘা জমির মালিক। এবারে বন্যা ও আকালের জন্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কুড়িগ্রাম মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল রৌমারী থানা, চিলমারী থানা এবং উলিপুর ও কুড়িগ্রাম থানার কিছু অংশ; গাইবান্ধা মহকুমার ফুলছড়ি ও সাঘাটা থানা এবং গাইবান্ধা ও সুন্দরগঞ্জ থানার পূর্বাংশ। তবে আকালের শিকার হয়েছে রংপুরের চারটি মহকুমার কম-বেশি সব এলাকা।

এবারের বন্যা পরবর্তী আকালের ফলে এই ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর, কারিগর ও দরিদ্র কৃষক গ্রাম ও বসতভিটা ত্যাগ করে শহরে চলে আসছে। এখনো সবাই আসেনি, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন না হলে একদিন সবাই হয়তো গ্রাম ছেড়ে জীবিকা ও ক্ষুধার অন্নের আশায় শহরমুখী হবে। ভেসে পড়বে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পথে। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের খবর, রংপুরের বিভিন্ন ইউনিয়নের লঙ্গরখানায় প্রায় নয় লাখ লোককে খাওয়ানো হচ্ছে। তখন জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে শুনেছি এর মধ্যে প্রায় এক লক্ষ লোক হলো 'ভাসমান জনগোষ্ঠী'—রংপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত। আরেকটি হিসেব দেয়া যেতে পারে। রংপুর শহরের জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ লঙ্গরখানায় প্রায় দশ হাজার লোককে খাবার দেয়া হয়। কুড়িগ্রাম শহরে কেন্দ্রীয় লঙ্গরখানায় প্রায় পাঁচ হাজার লোককে, গাইবান্ধা মডার্ন স্কুল লঙ্গরখানায় প্রায় চার হাজার লোককে খাবার দেয়া হয়। এরা সবাই ভাসমান লোক। রংপুর জেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নের স্থানীয় লোকদের জন্যে লঙ্গরখানা ছাড়াও জেলা সদর, মহকুমা সদর, থানা সদর পর্যায়ে কেন্দ্রীয় লঙ্গরখানাসমূহে এই ভাসমান লোকদের খাবার দেয়া হয়ে থাকে। মাত্র তিনটি লঙ্গরখানায়ই কর্তৃপক্ষীয় হিসেব মতো খাওয়ানো হচ্ছে প্রায় উনিশ হাজার লোককে। রংপুর জেলায় যে ভাসমান লোক রয়েছে তাদের সংখ্যা এই হিসেব থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। এছাড়া, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছে রংপুরের আরো হাজার হাজার দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক।

আরেকটি কথা, লঙ্গরখানায় লোকের মাথা গুণে ভাসমান জনগোষ্ঠীর পুরো সংখ্যা পাওয়া যাবে না। বাস্তুত্যাগী এমন বহু দরিদ্র কৃষক পরিবার রয়েছে যারা এখনো খাবারের জন্যে লঙ্গরখানায় লাইন দেয়নি। যেসব দরিদ্র কৃষক জমি বিক্রি করে দিচ্ছে তারা এখনো গ্রাম ছাড়তে শুরু করেনি। তবে অবস্থার পরিবর্তন না-হলে আগামী দুয়েক মাসের মধ্যে তারাও ভেসে পড়বে।

রংপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে গেলে ভাসমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যার চিত্রটি আরো স্পষ্ট হবে। গ্রামের-পর-গ্রাম নির্জীব নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে রয়েছে। গ্রামের সাপ্তাহিক হাট আগের

মতো জমে না। গ্রামের-পর-গ্রামে শত শত বাড়ি চোখে পড়বে– বিরান, কোন বাশিন্দা নেই।

কুড়িগ্রাম মহকুমার আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে চিলমারী, রৌমারি, ভুরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরী থানায় বহু লোক রয়েছে যারা বহিরাগত– ঠিক এই জেলার লোক নয়। এরা নোয়াখালি, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহের লোক। তারা নদীর পাড়ে সরকারি খাস জমির কাছাকাছি থাকে। এরা সবাই ভূমিহীন। এদের প্রকৃতি খানিকটা যাযাবর ধরনের। এ বছর এখানে আগামী বছর অন্যখানে অস্থায়ী আবাস পাতে। সুযোগ পেলে খাস জমিতে চাষ করে। এছাড়া জমিতে কামলাগিরি করে। এদের অনেকেই দশ–বারো বছর আগে এই অঞ্চলে এসেছে। এরাও আজ আবার আকালের দরুন ভেসে পড়েছে অনির্দিষ্ট পথ পানে।

ভেসে চলার শেষ কোথায়

ভাসমান এই লোকগুলোর ভেসে চলার শেষ কোথায়? ভাসমান লোকদের অনেকেই আমাকে এই প্রশ্ন করেছে। আমি কোন সঠিক জবাব দিতে পারিনি। এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে উদভ্রান্তের মতো এই ছুটে চলা, বেঁচে থাকার জন্যে এই ভেসে পড়ার ছবিও নানা ধরনের। ইতিবৃত্ত এক নয় অনেক।

তিস্তা জংশনে দেখা হলো আসিরউদ্দীনের সঙ্গে। বাড়ি নাগেশ্বরী থানার চৌদ্দঘড়ি। স্ত্রী ও তিন ছেলে, দুই মেয়ে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করেছেন। যাচ্ছেন নাগেশ্বরী থানা থেকে হাতিবান্ধা থানায়। ১২ বিঘা জমি ছিল আসিরউদ্দীনের। ১৯৭২ সালে ব্রহ্মপুত্র গ্রাস করতে শুরু করে। এবছর সব শেষ। গত বছরও পাঁচ মাসের খোরাক হয়েছিল। তারপর অন্য কাজ করেছেন। এবার কামলাগিরি ছাড়া পথ ছিল না। কিন্তু তার নিজেরও জোটেনি, স্ত্রী চেষ্টা করেছিলেন তারও কোন কাজ মেলেনি। এবার মাত্র দেড়মণ আউশ ঘরে তুলেছিলেন। তার পরের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন আসিরউদ্দীন। বাবার দেখাদেখি ছেলেমেয়েদেরও চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত। গত পনের বছরে গ্রাম ছেড়ে কুড়িগ্রাম শহরেও আসেননি আসিরউদ্দীন। কিন্তু আর পারলেন না। গ্রাম ছেড়ে পথে নামলেন, যাচ্ছেন আরেক থানার আরেক গ্রামে– হাতিবান্ধা থানার 'শেখ সুন্দর'। সেখানে আবদুর রশীদ নামে তার এক পরিচিত লোক আছেন। আশ্রয় নেবেন, আবার কাজের জন্যে চেষ্টা করবেন।

জিজ্ঞেস করলাম, এই গ্রামে কাজ পাবেন? সবখানেই তো প্রায় একই অবস্থা। যদি কাজ না মেলে?

আসিরউদ্দীন দেহাতী ভাষায় জবাব দিলেন,– কোনদিন শহরে যাইনি। শহরে যেতে ভালো লাগে না। এখানে আপাতত তো আশ্রয় মিলবে। কাজের চেষ্টা করবো। যদি না পাই শহরে যাবো। কিন্তু তারপর?

তারপরের জবাব আমি দিতে পারিনি। জবাব দিতে পারিনি উলিপুর থানার সমির হোসেনকে।

এক বিঘা জমি ছিল। এছাড়া জীবন ধারণের জন্যে আরো অনেক কাজ করতেন। কখনো মাঠে কামলাগিরি, কখনো বাজারে টুকিটাকি জিনিসের দোকানদারী, কখনো

লালমনিরহাট, তিস্তা আর কাউনিয়া রেলস্টেশনে পঁচিশ পয়সা দামের পদ্যপুস্তিকা মজমা জমিয়ে বিক্রি করে তার দিন চলছিল। সচ্ছল নয়, তবে মোটামুটি চলনসই। অর্থ আর প্রাচুর্যের জন্যে লালসা তার কোনদিন ছিল না। কিন্তু সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৪ সালের জুন মাসে সর্বনাশের পালা জমজমাট। দিন চলছিল না। দ্রব্যমূল্যের তাপে 'হামার শরীর পোড়া পোড়া হয়ে গেল'। জুলাই মাসে জমি বিক্রি করলেন। কদিন দম নিয়ে বাঁচলেন। তারপর আবার নাভিশ্বাস শুরু। সেপ্টেম্বরের সাত তারিখ গ্রাম ছাড়লেন বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, বোবা কালা এক ভাই আর চার বছরের শিশু কন্যা 'গোলাপ'কে সঙ্গে নিয়ে। সেপ্টেম্বরের সাতাশ তারিখ মা মারা গেলেন ঠিক কুড়িগ্রাম কবরস্থানের সম্মুখেই। মা'র মৃত্যুর দুদিন আগে থেকে স্ত্রী হঠাৎ লাপাত্তা হয়ে গেল। বুধবার দিন গেল, ফিরে এলো শুক্রবার জুমা বাদ। হাতে কারো দেয়া একটা শাড়ি আর সেই শাড়িত বাধা সের খানেক আটা, আটখানা বিদেশী বিস্কুট আর গোটা পাচেক শুটকে যাওয়া কলা। কঙ্কালসার বৃদ্ধা মা ছেলে বৌ'র হাতে ওসব জিনিস দেখে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর চীৎকার করে বলতে চাইলেন– এগুলো পেলি কোথায়? কিন্তু গলা দিয়ে পুরো স্বর বেরোল না। হিক্কা উঠলো। দশ মিনিটের মধ্যে মারা গেলেন। তারপর থেকে বোবা কালা ভাইটিরও কোন খোঁজ নেই। স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে রংপুরে চলে এলেন সমীর হোসেন। তিন তারিখ আলমনগরের এক বাড়ির বারান্দায় স্ত্রী মারা গেল। ৬ই অক্টোবর শনিবার সকালে রংপুর স্টেশনে সমীর হোসেনের সঙ্গে আমার দেখা। কঙ্কালসার সমীরের কোলে শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ। উদভ্রান্তের মতো চেহারা। রেলস্টেশনের বাজারের এক কোণে বসেছিল। আলাপ হলো। তার পরের মুহূর্তগুলোর কথা গুছিয়ে লেখার সাধ্য আমার নেই। একসময় সমীর বলে উঠলো সুর করে–আমার কান্দিবারি কপাল, কান্দি আমি আর কান্দিতে পারি না। তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। দুটি টাকা দিলাম। নিলেন না। বললেন– আমার গোলাপকে আপনারা নেন–আর একটা কামের জোগাড়'করে দেন, নইলে দুই টাকা দিয়ে এনড্রিন কিনে দেন।

কি বলবো আমি? এর কি জবাব দেবো? সাংঘাতিক মানুষ আমি; অনেক মৃত্যুর খবর লিখেছি। কখনো কাঁদিনি। কিন্তু সমীর হোসেন সেদিন আমার চোখেও জল আনলো কেন? এর জবাব আমি কার কাছে জানতে চাইবো?

গোলাপরা কি অকালে শুকোবে?

জানি না, সমীর তার গোলাপকে ফুটপাতে বা স্টেশনে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে পালিয়ে গেছে কিনা। হয়তো গেছে, যেমনি গেছে আরো অনেক গোলাপের বাবা-মা।

কুড়িগ্রামের এসডিও সাহেব আমাকে বলছিলেন–'জানেন। রাতে আমার ঘুম হয় না। ছোট ছোট বেওয়ারিশ ছেলেমেয়েগুলোর মুখ ভেসে ওঠে; রোজই সংখ্যা বাড়ছে। ওদের তো বাঁচাতে হবে। আপনারা সবাই মিলে পথ বাতলে দিন।'

রংপুরের ডেপুটি কমিশনার বললেন,–'আপনারা পত্রিকায় এদের কথা একটু ভালো করে লিখুন। বলুন তো লঙ্গরখানার রুটি, দুধ, খিচুড়িতে কি শুধু ওদের বাঁচানো যাবে? বিশ্বাস করেন, কি করবো আমি ঠিক দিশা পাচ্ছি না। আপনারা সবাই মিলে এগিয়ে

আসুন। আচ্ছা, কয়েকটা চাইল্ড কেয়ার খোলার প্রস্তাব আপনারা পত্রিকায় দিতে পারেন না? সবাই যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেন তাহলে উপায় একটা হবেই।'

গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরীতে বসে কয়েকজন আইনজীবীর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। তাদের একজন কথায় কথায় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, দোহাই আপনাদের–ওদের আপনারা বেওয়ারিশ অভিভাবকহীন বলবেন না। ওদের অভিভাবক তো সরকার। তারা কেন চুপ করে বসে আছে?

ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ ঘাস কাগজ নাড়িভুঁড়িও খায়–

ক্ষুধার জ্বালায় তারা গরু ছাগলের নাড়িভুড়ি খাচ্ছে। রাস্তা থেকে কুঁড়িয়ে আনা কাগজ খাচ্ছে। ঘাস খাচ্ছে ডাবের খোসা, কলার খোসা খাচ্ছে। মাছের এ টেকাটা, খাচ্ছে ।

ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ কত কি যে খেতে পারে তা নিজচোখে দেখেছি রংপুরে। এক নয়– অনেক দৃশ্য। দৈনিক বাংলায় গত মাসের গাইবান্ধার এক খবর বেরিয়েছিল। গাইবান্ধা রেলস্টেশনে বুভুক্ষু এক জ্যান্ত কংকাল মানুষের বমি খেয়েছে। খবর পড়ে আমরা শিউড়ে উঠেছি। রংপুরে এ-মাসের প্রথম দু-সপ্তাহ ঘুরে আমার মনে হয়েছে– যা দেখেছি তার বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। ক্ষুধার জ্বালা মেটানোর আরো অনেক প্রয়াস দেখেছি।

বুভুক্ষু নরনারীকে লঙ্গরখানা থেকে এক বেলা খাবার দেয়া হচ্ছে। দুটি আটার রুটি আর পাউডার গোলা দুধ। কোথাও খিচুড়ী। হাজার হাজার বুভুক্ষু নরনারীকে এই খাবার দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন লঙ্গরখানায় তা নিজের চোখে দেখেছি। একই সময় দেখেছি ক্ষুধার জ্বালা মোটানোর জন্যে নাড়িভুড়ি খেতে।

রংপুর রেলস্টেশন। ছেলেটিকে দেখতে পেলাম কাগজ খাচ্ছে। নাম শফিকুল। বাড়ি সাদুল্লাপুর থানা। বছর বার তের বয়স। পরনে কালো হাফপ্যান্ট। পকেট ভর্তি নানা ধরনের বাজে কাগজ। স্টেশন প্লাটফর্মে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে শফিকুল। আরপকেট থেকে কাগজ বের করে খাচ্ছে। শুনলাম, গত দুদিন যাবৎ কাগজই তার এক বেলার আহার্য। আমাদের ফটোগ্রাফার কামরুজ্জামান ওর ছবি তুললেন। জিজ্ঞেস করলেন, কাগজ খাচ্ছো কেন? শফিকুল আঙ্গুল দিয়ে পেট দেখালো। আবার জিজ্ঞেস করাতে বিরক্ত হলো। বললো, ক্ষিধে পেয়েছে– আর খাবো কি? কাগজ খেয়ে খেয়ে মরবো।

রংপুর আর্ট কাউন্সিল ভবনের সম্মুখে তিনি ঘাস খাচ্ছিলেন। বুকে পিঠে লেগে গেছে শরীর। কিন্তু চোখ দুটো যেন জ্বলছে। আর্ট কাউন্সিলের সামনে শানবাধানো রাস্তার উপর কয়েক মুঠো ঘাস ভেজা। মনে হলো পানিতে ধুয়ে বা ভিজিয়ে নিয়েছেন। আমি দাঁড়িয়ে থাকতেই এক মুঠো ঘাস মুখে দিলেন। কিন্তু ভাল করে চিবোনোরও শক্তি নেই। অথচ চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে– যেন এক জেদের বসে সে ঘাস খাচ্ছে, কারণ তাকে খেতে হবেই, খেয়ে বাঁচতে হবেই। আশেপাশে আরো কিছু লোক শুয়ে বসেছিল। তারা নির্বিকার। লোকটিকে তার নাম জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না। আশেপাশের লোকজনের কাছে শুনলাম– নাম নাকি আলম। বাড়ি ভুরুঙ্গামারী। বয়স প্রায় ত্রিশ বছর।

নাম অনেকেরই জিজ্ঞেস করতে পারিনি। কি করে জিজ্ঞেস করবো? বাজারে মাংসের দোকানের অদূরে বসে আছে কয়েকটি জ্যান্ত কংকাল। ক্ষুধার আগুন চোখেও ধিক ধিক করে জ্বলছে। কসাই জবাই করা খাসীর নাড়িভুড়ি ও পরিত্যাক্ত অংশ দোকানের সম্মুখে ফেলে দিল। জ্যান্ত কংকালগুলো সেই নাড়ীভুড়ি ইত্যাদি তুলে নিল। দেখতে পেলাম- একজনের হাত কাঁপছে থর থর করে। সে সেই কাঁচা নাড়ীভুড়িতে কামড় দিল। তাদের কাছে আমি কি করে খবরের জন্যে যাবো? গিয়ে জিজ্ঞেস করবো তার নাম। রংপুর শহরে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের সামনে দেখেছি–শুধুমাত্র পানিতে গরু খাসীর নাড়ীভুড়ি সেদ্ধ করা হচ্ছে। আর কিছু নয়– শুধু পানি। দুর্গন্ধে ভরে গেছে চারধার। বাবা-মা নাড়ীভুড়ি সেদ্ধ করছে– পাশে শুয়ে বা বসে রয়েছে কংকালসার ছেলেমেয়েগুলো। তাকিয়ে রয়েছে হাড়ির দিকে– কখন খাবার মিলবে। এমনি একটি নয়– তিনটি পরিবার। ওদের কাছে কি করে গিয়ে খবরের জন্যে দাঁড়াবো? কচি ডাবের ফেলে দেয়া খোসা কামড়ে কামড়ে খাওয়ার চেষ্টা করছিলেন লোকটি–রংপুরের ডেপুটি কমিশনারের অফিসের সামনে বসে। তার নামও জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

হামি কি মানুষ?

লঙ্গরখানাগুলোতে যাদের রুটি, দুধ বা খিচুড়ী খেতে দেখেছি তাদের নাম জিজ্ঞেস করা হয়নি। শুধু দেখেছি– আর মনে হয়েছে, এদের নিয়ে যদি আমায় হিউম্যান স্টোরী লিখতে বলা হয় তবে নাচার। এরা কি 'হিউম্যান বিয়িং?' একটি লোক লঙ্গরখানার লাইনে বসেছিল। দুধ রুটি নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা সামনে এলেন। লোকটা হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'হামাক তোমরা কায়ো কুত্তার খাবার দ্যান। হামি কি মানুষ? হামি মরি গেনু। উটি দুধ হামাক লিয়ে লয়। কুড়িগ্রাম লঙ্গরখানার ঘটনা। জানালেন একজন স্থানীয় আইনজীবী– লঙ্গরখানার সঙ্গে জড়িত।

হামাক কাটা দ্যাও

গাইবান্ধার একটি হোটেলে খেতে বসেছি। ভাত, মাছের ঝোল আর ডাল। খাওয়া তখন মাঝপথে। বোনপ্লেটে এতো কাটা। এক প্লেট ভাত বাড়তি নেয়া হয়েছিল। অর্ধেকটা প্লেটে তুলে নেয়া হয়েছে। এমনি সময় মেয়েটির দিকে চোখ পড়লো। হোটেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বছর সাতেক বয়স। কোন কথা নেই– চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলের বয় মেয়েটিকে ধমক দিল– 'এঠে থেকে ভাগ'। আমরা বাধা দিলাম। বারণ করলাম। খাওয়া ওখানেই শেষ। বয়কে বললাম, ভাত আর যেটুকু মাছ ডাল রয়েছে ওকে দিয়ে দাও। বয়টি ভাতের থালায় এটো কাটাও তুলে নিল। আমরা বললাম, করো কি। এগুলো দিচ্ছ কেন? ছি ছি ছি. ফেলে দাও ওগুলো। বয় কাটাগুলো তুলে আবার বোনপ্লেটে রেখে দিল।

খাবার নিয়ে মেয়েটি চলে গেলো না। তারপরও দাঁড়িয়ে রইলো। কাছে গেলাম। পঞ্চাশটা পয়সা দিলাম। মেয়েটি তখন বললো, 'মাছের কাটাগুলো হামাক দেবেন না? খাবো তো। হামায় কাটাগুলো দ্যান।

অক্টোবরের প্রথম দুই-সপ্তাহে আমি যখন ঘুরেছি তখনকার রংপুরের এই খবর। এরপর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে লঙ্গরখানার সংখ্যা আরো বেড়েছে। কিন্তু ক্ষুধায় সর্বভূক আগুনের দৃশ্যাবলি এখনো দৃশ্যমান।

হাজার হাজার মণ আখ খাচ্ছে ক্ষুধার্ত মানুষ

এত আখ এর আগে আর কোনদিন খাওয়া হয়নি। লঙ্গরখানায় জোটে একবেলা খাবার। তাতে ক্ষিধে মেটে না। তাছাড়া, লঙ্গরখানায় এখনো সবাই খাবারের জন্যে কাতারবন্দী হয়নি, হতে পারেনি। ক্ষুধার সর্বভূক আগুন আজ যা পায় তাই খায়। এরমধ্যে নাগালের ভেতর কম দামে রয়েছে একমাত্র সুখাদ্য– আখ বা কুশার। ৩০ থেকে ৫০ পয়সায় একটি আখ মেলে। চিবিয়ে কিছুক্ষণ থাকা যায়।

স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসনের বক্তব্য–এত বেশি পরিমাণ আখ গত ২৫ বছরে আর কোনবার খাওয়া হয়নি। এমনকি ১৩৫০ সালেও বোধ হয় নয়। রংপুরের মতো দিনাজপুরেও একই অবস্থা। রংপুরের মতো দিনাজপুরের ডেপুটি কমিশনার আমায় একথা বলেছেন।

আকালের শিকার রংপুরে আখ আজ অন্যতম আলোচিত খাদ্যবস্তু। আখ চাষী, আখের খুচরা বিক্রেতা, মিল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সাধারণ জনগণ, প্রভাবশালী মহল, বুভুক্ষু নর-নারী, জেলা প্রশাসন– বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। এবং আলাপ-আলোচনায় বেশকিছু মহল এবারের চিনি উৎপাদন পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। কিছু অশুভ পায়তারারও হদিস পেয়েছি। এসব আলাপ- আলোচনা ও বক্তব্য থেকে স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্তে চট করে পৌছোনো যায় না। বেশকিছু পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পেয়েছি।

আলোচনা ও বক্তব্যগুলো আমি তুলে ধরছি

এক. প্রতিদিন হাজার হাজার মণ আখ বিভিন্ন এলাকা থেকে আসছে বাস, ট্রাক, গরু ও মোষের গাড়ি, ঠেলাগাড়ি করে। আসছে প্রধানত রংপুরের গোবিন্দগঞ্জ, লালমনিরহাট থানা, দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহীর বানেশ্বর, হরিয়ান; বগুড়ার ক্ষেতলাল, শিবগঞ্জ, গাবতলী, শেরপুর, সারিয়াকান্দি ও সদর প্রভৃতি এলাকা থেকে। যাচ্ছে রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহীতে।

দুই. চিনিকল কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত প্রায় ৫৬ হাজার একর জমির আখ বন্যা পোকার আক্রমণে কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ৪টি মিলের আওতাভুক্ত এলাকায় আখের ফলন বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১১টি মিলের আওতাভুক্ত জমির আখ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিন. এ বছর চিনির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোতে না-পারার আশংকা রয়েছে। বেশকিছু চিনিকল এবার প্রার্থিত উৎপাদনে যেতে না-পারার সম্ভাবনা রয়েছে।

চার. উৎপাদন ঘাটতির কোন সম্ভাবনা এখনো নেই। লোক আর কত খাবে? চিনিকল কর্পোরেশন কয়েকটা মিলকে নির্ধারিত সময়ের আগেই চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পাঁচ. একশ্রেণীর মুনাফাখোর স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গুজব ছড়াচ্ছে। আকালের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা নতুন করে অবৈধ ও জনস্বার্থবিরোধী পথে অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা নিয়েছে।

ছয়. মিল বা চিনিকল কর্পোরেশন বাস্তব ঘটনা তুলে ধরার ব্যাপারে বিরত রয়েছে ইত্যাদি।

আলোচনা ও বক্তব্য থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আমি উপযুক্ত মহলের হাতেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু দুর্ভিক্ষকবলিত রংপুর ঘুরে আমি কিছু দৃশ্য চোখে দেখেছি, কিছু ঘটনার হদিস পেয়েছি। সেগুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এক. অধিকাংশ চাষী অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে আখ বিক্রি করে দিচ্ছে। তাদের কাছে এটা একাধারে একটি বড় সুযোগ হিসেবেও এসেছে। মিল কর্তৃপক্ষ আখের মণ ধার্য করছেন ৮ টাকা। অথচ বাইরে তারা বিক্রি করে এখন পাচ্ছেন মণ প্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফড়িয়ারা মাঠ থেকেই আখ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া, অনেক চাষীর মাঠের আখ লুট হয়ে গেছে। বুভুক্ষু লোকজন এসে আখ খেতে চেয়েছে। চাষী দেবে না বলতে পারেনি। অনেকের ক্ষেতের আখ চুরি হয়ে গেছে।

দুই. বুভুক্ষু নর-নারীর কাছে আখ এবার এসেছে বলা চলে 'রহমত' হিসেবে। আটার সের সাড়ে ছয় টাকা থেকে সাত টাকা। আটার রুটিরও একই দাম। আধপোয়া রুটির কম সাধারণত বিক্রি হয় না। মুড়ির সের এগার থেকে চৌদ্দ টাকা। চাল তো যেন চাঁদ ধরার ব্যাপার। তবে নাগালের মধ্যে সুলভ সামগ্রী হলো আখ। তিরিশ পয়সার জোগাড় হলেই আখ মেলে।

তিন. প্রশাসন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন– রংপুরে দৈনিক আনুমানিক দেড় থেকে দু'হাজার মণ আখ বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

দিনাজপুরেও অবস্থা প্রায় অনুরূপ। আগে বড়জোর দৈনিক কুড়ি মণ আখ বিক্রি হতো কিনা সন্দেহ।

চার. এর দরুন মিল চাহিদা মতো আখ পাবে কিনা সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

পাঁচ. এর পাশাপাশি আরেকটি পাঁয়তারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক শ্রেণীর প্রভাবশালী লোক চাচ্ছেন, আখ দিয়ে চিনির বদলে গুড় তৈরি করতে। এই মহলের বক্তব্য হলো, এটা বর্তমান অবস্থায় আখের সদগতি করার একটি ভালো পথ। এতে চাষী ভালো দাম পাবেন। মিল কর্তৃপক্ষ তার আওতাভুক্ত এলাকার সব আখ কিনেননি এ ধরনের যেসব ঘটনা অতীতে ঘটেছে তা এতে রোধ হবে। এর পাল্টা বক্তব্য হিসেবে বলা হচ্ছে যে, গুড় তৈরির প্রচেষ্টা আসলে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত নয়। এতে আখের বেশ অপচয় হবে। গুড় করতে পারলে তা চোরাচালানের জন্যে বেশ সুবিধাজনক। সীমান্তের ওপারে গুড়ের বেশ চাহিদা আছে। চোরাচালান করে মোটা টাকা কামাই করা যাবে।

বড় কথা আকাল

এসব আলোচনা, বক্তব্য ও বিবরণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব উপযুক্ত মহলের। কিন্তু আখ চাষী ও বুভুক্ষু জনগণের সম্মুখে বড় প্রশ্ন–আকাল আর অভাব।

আলাপ হলো লালমনিরহাট থানার খরাগাছ গ্রামের আখচাষী আবদুল মতিনের সঙ্গে। ১৯৭০ সাল থেকে তিনি দুই থেকে তিন একর জমিতে আখের চাষ করছেন। এবার করেছেন তিন একর জমিতে। ১৯৭০ সালে পেয়েছেন ৪০০ মণ আখ, ১৯৭১ সালে

২৫০ মণ, ১৯৭২ সালে ২৫০ মণ, ১৯৭৩ সালে ১৫০ মণ। এ বছর প্রায় ৪০০ মণ আখ হয়েছিল।

তারপর আখের পলান (পলায়ন) শুরু হলো। প্রথম দিকে বুভুক্ষু লোকজন এসে চেয়েছে। বারণ করতে পারেননি। তারপর যখন বারণ করেছেন, লোকজন এসে ক্ষেতের আখ দিনের বেলা জোর করে কেটে নিয়ে গেছে। রাতে আখ চুরি করে নিয়ে গেছে। এমনি করে প্রায় ১০০ মণ শেষ হয়ে গেছে। এদিকে সংসারে দারুন অনটন। কার্তিক মাস থেকে মিল আখ নিতে শুরু করবে। কিন্তু তার আগে থেকেই তিনি আখ বিক্রি করছেন। অপরিপক্ক আখও ফড়িয়ারা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। সাতই অক্টোবর পর্যন্ত ২০০ মণের বেশি আখ বিক্রি হয়ে গেছে। দর পেয়েছেন প্রতি মণ ১৪ থেকে ২১ টাকা।

আবদুল মতিনের মনে সংশয়, আখের টাকা ফুরিয়ে গেলে তারপর কী করবেন? কিছু লোক এসে বলে গেছে সে যদি গুড় বানানোর কাজ করতে চায় তবে তারা গুড় বানাবার কল জোগাড় করে দিয়ে যাবে।

আলাপ হলো ফুলছড়ি থানার গোপীনাথচরের লুৎফর রহমান ও আবদুল জলিলের সঙ্গে। গাইবান্ধা শহরে ঘাঘট নদীর পুলের কাছে আখ বিক্রি করছিলেন। আগে জমি ছিল। ভেঙে যাওয়ার পর কামলাগিরি করতেন। তারপর আকালে নিরূপায় হয়ে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আখ বিক্রি করছেন। ফড়িয়াদের কাছ থেকে কিনে আনেন প্রতি মণ ১৬ থেকে ১৮ টাকা দরে। খুচরা বিক্রি করে দিনে চার-পাঁচ টাকা থাকে। লুৎফর রহমান বলেন, তিনি গত কদিন যাবৎ দিনে দেড় থেকে দুমণ আখ বিক্রি করছেন। কিন্তু এতেও পারছেন না। সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। অথচ লঙ্গরখানায় যেতে মন চায় না। লজ্জা লাগে। কিন্তু আর কদিন। হয়তো লঙ্গরখানায়ই যেতে হবে।

শেষ বিকেলের পানাউল্লাহ

সেই ঘাঘট নদীর পুলের ধারে দেখা হলো পানাউল্লাহর সঙ্গে। ফুলছড়ি থানার উড়িয়া গ্রামের ৫৫ বছরের বৃদ্ধ পানাউল্লাহর সঙ্গে। অনাহারে ধুকছেন। শেষ বিকেলের ম্লান আলো তার মুখে। পরিবারের পোষ্য ছিল ৮ জন। এর মধ্যে ২ জন মারা গেছে। ঘরবাড়ি ছিল। আজ নেই। ইউনিয়নের লঙ্গরখানায় যাননি। মোটামুটি সম্মান ছিল তার। এখন লঙ্গরখানায় গেলে সম্মান থাকবে? আড়াই টাকা নিয়ে শহরে এসেছিলেন। পরিবারের সবাই দুবেলা অভুক্ত। ভেবেছিলেন, শহরে গিয়ে যদি আরো কিছু টাকা জোগাড় করা যায়। টাকা মেলেনি। আড়াই টাকায় আধসের আটাও জুটলো না। কি করবেন পানাউল্লাহ। তারপর পাঁচটি আখ কিনলেন। বার টুকরো করে বোঝা বাধলেন। তারপর যখন পা বাড়াবেন তখন পুলের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

মৃত্যু ভয় ছায়া ফেলেছে অনেকের মনে

চিঠিটির কথা আমায় বলেছেন রংপুরের ডেপুটি কমিশনার। মাহীগঞ্জ থেকে ডিসি সাহেবকে পাঠানো চিঠি। এক ভদ্রলোক ডিসি সাহেবের কাছে ছয় সের এনড্রিন চেয়েছেন। চিঠির বক্তব্য– আর দিন চলছেনা। পরিবারের লোকজনের পেটে ভাত আর

পরনের কাপড় দেয়ার আমার সামর্থ নেই। সাধ-আহলাদ তো অনেক দূরের কথা। সৎপথে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেও আজ আমি জীবনধারণের পথের নাগাল পাচ্ছি না। কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। মরে গিয়ে এবার বাঁচতে চাই। দয়া করে ছয় সের এনড্রিন পাঠিয়ে দেবেন।

চিঠির জবাব দিয়েছেন? ডিসি সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। হাসলেন। ম্লান হাসি। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, কি জবাব দেবো। আপনিই বলেন, এই চিঠির আমি কি জবাব দেবো? জানেন অফিসের লোকজনদের মুখের দিকে তাকাতে পারি না। লঙ্গরখানায় আসেনি। কিন্তু আমি তো জানি কি কষ্টে তাদের দিন চলছে। কি সঙ্গীন তাদের অবস্থা।

শুধু সরকারি অফিসের কর্মচারীই নয়। অবস্থা আজ সঙ্গীন কিছু ভাগ্যবান ছাড়া নিম্ন মধ্যবিত্ত, স্বল্পবিত্ত, নির্ধারিত আয়ের সকল লোকের। জীবনধারণের সামগ্রীগুলো সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে। বাজারে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার মাতাল দৌড়ের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ফড়িয়া, অসাধু, বা ব্যবসায়ী, মজুতদার মুনাফাখোরদের কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কোন বাস্তব চিত্র নেই। বাংলাদেশের সর্বত্র আজ একই অবস্থা। কিন্তু দারুণ, আকালের শিকার রংপুরের এই নির্মম বাস্তব আরো বেশি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

রংপুরের বিভিন্ন এলাকা ঘোরার সময় নিম্ন মধ্যবিত্ত, স্বল্পবিত্ত, নির্ধারিত আয়ের শহরের বাসিন্দা এবং এখনো গ্রাম ছাড়েননি এমন দুর্গত অধিবাসীদের মধ্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি দেখেছি–তাহলো ভয় এবং নিজের উপর আস্থার অভাব। চারপাশে প্রতিদিন প্রশ্নচিহ্নের মতো মৃত্যুর পর মৃত্যু দেখতে দেখতে দারুণ এক মৃত্যুভয় ঢুকে গেছে।

দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে জর্জরিত বেঁচে থাকা লোকগুলোর সবাই সর্বক্ষণ নির্মম বাস্তব থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু পালাবার পথ না-পেয়ে ত্রাসের জালে আবদ্ধ হচ্ছে।

এমন ব্যাপকভাবে মৃত্যুভয়, এমন ব্যাপকভাবে আস্থার অভাব আমি আমার সাংবাদিক জীবনে আর দেখিনি। এই ভয় এই আস্থার অভাব আর এই আকাল তার সর্বব্যাপী প্রেতচ্ছায়া ফেলেছে। অফিস-আদালতে প্রশাসনিক কাজকর্মের দৈনন্দিন অগ্রগতির হার অনেক কমে গেছে। অফিসে হাজিরার হার অনেক বেশি অনিয়মিত হয়েছে। তিনদিন গরহাজিরে থাকার পর একদিন অফিসে এসে গত তিনদিনের সই করে যাচ্ছে হাজিরা খাতায়। এর তত্ত্বাবধান করার মতো বাস্তব পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রেই নেই।

শহরের ওষুধের দোকানগুলোতে ঘুমের বড়ি ও ট্র্যাঙ্কুলাইজার জাতীয় ওষুধের চাহিদা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। চিকিৎসকদের কাছে আলাপ-আলোচনায় জেনেছি, বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। এমন সব রোগ দেখা যাচ্ছে যার অন্যতম প্রধান কারণ স্নায়ুবিক উত্তেজনা। স্নায়ুজাত বিভিন্ন রোগের প্রচলিত ওষুধের চাহিদা বেড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধিক হারে ড্রপ-আউটের আশংকা দেখা দিয়েছে। বহু গৃহশিক্ষক বেকার হয়ে পড়েছে। রংপুর শহর ও অন্যান্য মহকুমা ও থানা শহরসমূহের বিভিন্ন এলাকা খোঁজ নিলে দেখা যাবে—একমাত্র সেপ্টেম্বর মাসেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহভৃত্য কর্মহীন হয়ে পড়েছে। শহরগুলোতে যৌন অনাচারের সংখ্যা অনেক বেড়ে ড়েছে। আগে যা ছিল অপ্রকাশ্য তা ক্রমশ লজ্জাহীন ও আবরণহীনভাবে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শহরগুলোতে

চুরির সংখ্যা বেড়েছে। কুড়িগ্রামের মহকুমা প্রশাসক আমাকে জানান, একমাত্র কুড়িগ্রাম শহরে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ভাতের হাড়ি ও কাপড় চুরির সংখ্যার খতিয়ান নিলে দেখা যাবে তা গত ২৫ বছর কালের রেকর্ড সৃষ্টির দাবীদার। রেলওয়ে স্টেশন ও অন্যান্য পাবলিক প্লেসগুলো নির্জীব হয়ে পড়েছে। চা গরম বুট পালিশ, শির মালিশ.....চাই চানাচুর চীনাবাদাম....রুটি মিষ্টি....ইত্যাদি অতিপরিচিত হাকগুলো ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে রেলস্টেশন থেকে। এর পাশাপাশি আরো কিছু চিত্র রয়েছে। শহরের শুড়িখানাগুলো জমজমাট; বেশ্যালয়গুলোতে দিন দিন পা ফেলছে নতুন ধরনের খদ্দের। বিদেশী সিগারেটের প্রচুর কাটতি। কুড়িগ্রাম শহরে একটি মুদীর দোকানে দেখতে পেলাম তিন জাতীয় ভারতীয় তেল, নানা ধরনের সাবান। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, গাইবান্ধা স্টেশন রোডে একটি পানের দোকানে কাঁচভাঙ্গা শোকেসে দেখতে পেলাম দামী 'ইন্টিমেট' সেন্টের বাক্স। খোসার ভেতরে শিশি খালি নয়–ভর্তি। দারুণ আকালের শিকার রংপুরে এমনি বহু ঘটনা আর দৃশ্যের জন্ম দিচ্ছে– একটি মফস্বল শহরের পক্ষে যা একটু অস্বাভাবিক। সমাজবিজ্ঞানীরা রংপুরে সমীক্ষা চালালে দারুন আকালের সর্বব্যাপী আরো অনেক রূপ দেখতে পাবেন– যার উল্লেখ এই প্রতিবেদনে নেই।

রংপুর সফরকালে আরেকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে। আকালের শিকার রংপুরে সকল রাজনৈতিক দলের উপরই জনগণ কেমন যেন নিস্পৃহ হয়ে পড়েছে। অশিক্ষিত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর থেকে শুরু করে শিক্ষিত, সংবেদনশীল, রাজনীতিসচেতন লোকজনের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারীতে এর আগেও আমি গেছি। এসব শহরের যেসব জায়গায় আগে রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে চায়ের পেয়ালায় ঝড় তোলা থেকে শুরু করে সিরিয়াস আলোচনা হতো তেমন কয়েকটি জায়গায় এবার গিয়ে দেখলাম–আবহাওয়া অন্য মেজাজের, দৃশ্য ভিন্ন। পাবলিক লাইব্রেরীগুলোতে পাঠকের উপস্থিতির হার কমেছে। সাংস্কৃতিক বেশ কটি সংস্থা রংপুরে রয়েছে। তাদের মধ্যে দুয়েকটি ছাড়া আর সবগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। রংপুর শহরের দুটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে আমি গেছি– 'শিখা সংসদ' ও 'শতাব্দীর' আহ্বান। এদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। এবং আলোচনায় মনে হয়েছে, রংপুরের এই আকালের ফলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সম্ভাব্য বিপর্যস্ত অবস্থা সম্পর্কে তারা দারুণ বিচলিত। 'শিখা সংসদে' আমি যখন যাই তখন তারা ঈদের পরে মঞ্চায়নের জন্যে একটি নাটকের মহড়া দিচ্ছিলেন। কর্মকর্তারা বললেন, কি কি করা-যে এখন দরকার বুঝতে পারছি না। আপনাদের ঢাকায় যেসব বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিসেবী রয়েছে তারাও তো তেমন কিছু করছেন না। আচ্ছা, বলুন তো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আজকের এই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাটক করলে কেমন হয়? মানে– দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে জনগণকে সংগঠিত করার জন্যে? কিন্তু বুঝতে পারছি না– দুর্ভিক্ষের নাটক তো পথে ঘাটে প্রতিদিন আজ হচ্ছে। কি ধরনের নাটক যে দরকার ঠিক বুঝতে পারছি না।

লোকে কি ধরনের নাটক চায় তার সুস্পষ্ট জবাব ঠিক আমার পক্ষেও দেয়া সম্ভব নয়। তবে কুড়িগ্রামের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহের

ঘটনা। ঘটনাটি বলেছেন স্থানীয় এক আইনজীবী। কুড়িগ্রাম স্টেশনে একটি লোক সুর করে পদ্যপুস্তিকা পাঠ করিছিল মজমা জমিয়ে বিক্রির জন্যে। অদূরে শুয়েছিল বুভুক্ষু একটি লোক। উত্তেজক একটি প্রেমকাহিনী পদ্যের বিষয়বস্তু। মিনিট দশেক কেটে গেল। হঠাৎ বুভুক্ষু একটি ক্রুদ্ধ হাতে পাশে পড়ে থাকা একটা ভাঙ্গা ইট তুলে ছুঁড়ে মারলো পদ্যপড়নেওয়ালার দিকে। কপাল ফেটে দর দর করে রক্ত বেরোল। বুভুক্ষু লোকটি তখন বলছে–আগে ভাত দে।

রেশনিং-এর অব্যবস্থা

রেশনে নিয়মিত মাল পাওয়া যায় না। এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ নয়, এমন কি মাসের পর মাস। রংপুরে আমি বিভিন্ন মহল থেকে এই অভিযোগই পেয়েছি। এমন অনেক এলাকা আছে, যেখানে সপ্তাহ গড়িয়ে মাস পেরিয়ে গেলেও এক কণা রেশন মেলেনি। রংপুর জেলা সংশোধিত রেশনিং এলাকার অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ–রেশনে যে মাল তাদের পাওয়া উচিৎ ছিল তা তারা পাননি। রেশনের দাবীতে রংপুর শহরে কয়েকদিন আগে সরকারি কর্মচারীরা মিছিল পর্যন্ত করেছেন—পেশ করেছেন স্মারকলিপি, সভা করেছেন দাবী আদায়ের জন্যে। সব কিছু শুনে আমার মনে হয়েছে, রংপুর পরিস্থিতির অবনতির নেপথ্য কারণসমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো রেশনিং এর অব্যবস্থা। জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, চাহিদা অনুযায়ী গুদামে খাদ্যশস্য থাকে না। সরবরাহ অপ্রতুল; বরাদ্দকৃত ও সরবরাহকৃত মালের পরিমাণের সঙ্গে জেলা কর্তৃপক্ষ যে মাল পেয়েছেন তার মধ্যে ফারাক রয়েছে। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে রেশনের মাল নিয়ে দুর্নীতি, রেশনের মাল লোপাট করে দেয়ার একাধিক অভিযোগ পেয়েছি। সরকারি গুদামে মালের স্টকের পরিমাণ মাঝে মাঝে এমন পর্যায়ে নেমে এসেছে যে প্রায়োরিটি হোল্ডারদের রেশন সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

রেশনে মাল না-মেলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাজারে চালের দাম বেড়েছে। জেলার বিভিন্ন বাজরে আটার দারুন কোন অভাব চোখে পড়েনি। কিন্তু দাম নিদারুণ, প্রতি সের সাড়ে ছয় টাকা থেকে সাত টাকা।

রংপুর সংশোধিত রেশন এলাকায় খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে মাল বরাদ্দ এবং রংপুর জেলায় এই খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্তির বিভিন্ন হিসাব ও পরিসংখ্যান আমি দেখেছি। আমার চোখে গরমিল ধরা পড়েছে। প্রশ্ন জেগেছে, এই গরিমলের কারণ কি?

গমের কথাই ধরা যাক। ১৯৭৪ সালের ১৯শে জুলাই জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী (তখন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী) জনাব আবদুল মোমেন সংশোধিত রেশনিং বরাদ্দের পরিমাণ এবং রংপুর জেলায় চাল, গমসহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্তির পরিমাণের একটি বিস্তারিত ফিরিস্তি পেশ করেন।

মন্ত্রী জানান যে, ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত সংশোধিত রেশনিং-এ রংপুরের জন্যে গমের মোট বরাদ্দের পরিমাণ হলো ৭ লাখ ৫৯ হাজার ৫০০ মণ। অপর এক ফিরিস্তিতে তিনি জানান যে, ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই সময়ে বরাদ্দকৃত গমের মধ্যে রংপুর জেলায় প্রাপ্তির পরিমাণ হলো ৭ লাখ ২৩ হাজার

৫৮৩ মণ। অর্থাৎ যা বরাদ্দ হয়েছে তার চেয়ে ৩৫ হাজার ৯১৭ মণ রংপুর জেলা কম পেয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসনের কাজ থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানে আমি দেখতে পেয়েছি, ৭৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই সময়ে রংপুর জেলায় গম পেয়েছে ৬ লাখ ৬ হাজার ৯৫৩ মণ। অর্থাৎ রংপুর জেলা এই ৬ মাসে যে পরিমাণ গম পেয়েছে বলে সংসদে জানানো হয়েছে তত পরিমাণ গম রংপুর পায়নি। পেয়েছে তার চেয়ে ১ লাখ ১৬ হাজার ৬৪৮ মণ কম।

প্রশ্ন হচ্ছে– এই হিসেবের ভেতরে কি তথ্যের কোন গরমিল আছে? তা না-হলে এই ১ লাখ ৯৬ হাজার ৬৪৮ মণ গম গেল কোথায়? ১৯ শে জুলাই সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে মন্ত্রী জানান যে, যথেষ্ট পরিমাণ রেলওয়ে ওয়াগন না-পাওয়ায় এবং ফেরী চলাচল মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হওয়ায় বরাদ্দকৃত মাল সব সময় পুরোপুরি পাঠানো সম্ভব হয়নি। মানলাম, এজন্যে চলতি বছর প্রথম ছ মাসে গম যা বরাদ্দ হয়েছিল তার চেয়ে প্রায় ৩৬ হাজার মণ (সংসদে প্রদত্ত হিসাব মতে) কম পেয়েছে রংপুর।

এতো শুধু ছয় মাসের হিসাব এবং শুধু গমের হিসাব। বিভিন্ন মহল অভিযোগ করেছেন, ১৯৭২ সাল থেকে গত সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে আরো অনেক গরমিল বেরিয়ে পড়বে।

রংপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ থেকে আমি আরেকটি পরিসংখ্যান পেয়েছি। এতে দেখা যাচ্ছে–১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে গমের 'প্রোগ্রামড কোয়ানটিটি' অর্থাৎ চাহিদা অনুযায়ী প্রার্থিত পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৩০ হাজার মণ। সে মাসে পাওয়া গেছে ৯৬ হাজার' ৭৯১ মণ। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রোগ্রামড কোয়ান-টিটি ২ লাখ মণ, পাওয়া গেছে ৯৮ হাজার ৯৯৪ মণ, মার্চ মাসে ৭৪ হাজার মণের মধ্যে ৫২ হাজার ৯৫১ মণ, এপ্রিল মাসে ২ লাখ ১৬ হাজার ৯৯২ মণ, মে মাসে ২ লাখ ৬৪ হাজার ৫০০ মণের মধ্যে ১ লাখ ৩২ হাজার ১১৭ মণ, জুন মাসে ৩ লাখ মণের মধ্যে ১ লাখ ৯ হাজার ৯০ মণ। অর্থাৎ প্রোগ্রামড কোয়ানটিটি ১২ লাখ ১৮ হাজার ৫০০ মণের মধ্যে পাওয়া গেছে ৬ লাখ ৬ হাজার ৯৩৫ মণ গম।

জেলা প্রশাসকের দেয়া এই হিসেবে বলা হয়েছে, প্রায়োরিটি, মোডিফায়েড রেশনিং, নন লোকাল ও রিলিফ খাতে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ছয় মাসে রংপুর জেলায় চাল ও গমের মোট চাহিদা ছিল ১৫ লাখ ২৪ হাজার ৫০ মণ। ১৯শে জুলাই জাতীয় সংসদে প্রদত্ত হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৪ সালের এই ছয় মাসে রংপুর জেলায় বরাদ্দকৃত চাল ও গমের মোট প্রাপ্তির পরিমাণ হলো ৭ লাখ ৮৩ হাজার ৬২৬ মণ।

রংপুরের ডেপুটি কমিশনার এ মাসের প্রথম দিকে আমাকে জানান, শুধুমাত্র সাধারণ রিলিফ, প্রয়োরিটি হোল্ডার ও নন-লোকালদের জন্যে সেপ্টেম্বর মাসে তার জেলায় প্রায় ১ লাখ ৭৪ হাজার মণ গমের দরকার ছিল। এর মধ্যে জনসাধারণের চাহিদা ধরা হয়নি। রেশনে জনসাধারণকে গম দিতে হলে তার আরো ২ লাখ ২২ হাজার মণ গমের প্রয়োজন। বিশেষ চাহিদার সেই ১ লাখ ৭৪ হাজার মণ গমের মধ্যে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৭ হাজার মণ। ডেপুটি কমিশনার বললেন, রেশনে জনসাধারণকে গম কি করে

দেবো বলুন? তিনি জানান, অক্টোবরে ৫ লাখ মণ গম পেলে কোনভাবে সমস্যার সমাধান করা যাবে।

দুর্নীতি

রেশনের মাল যা পাওয়া গেছে তা নিয়েও দুর্নীতি হয়েছে। দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। লালমনিরহাট গিয়ে দেখতে পেলাম, দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার পৌরসভার কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী জানিয়ে। পোস্টারের মূল বক্তব্য– গম নিয়ে ছিনিমিনি করা চলবে না।

খোঁজ নিতে গিয়ে অভিযোগ পেলাম–পৌরসভার চেয়ারম্যান থেকে কমিশনার পর্যন্ত মোট ১১ জন কর্মকর্তার মধ্যে তিনজন ছাড়া সকলেরই বেনামীতে নাকি রেশন দোকান রয়েছে। এরা তাদের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে রেশন কার্ড কিনে নিচ্ছেন। পদ্ধতিটি অভিনব–পাঁচ বা দশ সের গম দেয়া হবে যদি রেশন কার্ড হোল্ডার সেই ভদ্রলোক এই গমের বিনিময়ে কার্ডটি বিক্রি করে দেন-অভিযোগ পেলাম, এভাবে নাকি তারা বহু কার্ড হস্তগত করেছেন।

কিছু সুপারিশ

রংপুরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ রেশন–ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি দাবী জানিয়েছেন। তাদের প্রথম দাবী হলো– ন্যায়ানুগভাবে তাদের জেলার জন্যে খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হোক এবং এই বরাদ্দের সঙ্গে সরবরাহের ও সরবরাহের সঙ্গে প্রাপ্তির যেন কোন গরমিল না-থাকে। মাল পরিবহনের জন্যে রেলওয়ে ওয়াগনের কোটা বাড়াতে হবে। সেনাবাহিনীর সাহায্যে খাদ্যসামগ্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। রেশনে যে মাল দেয়া হবে তার সুষ্ঠু বিতরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন*

বিগত ১১ই অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবীদের এক প্রাথমিক সভায় বর্তমান মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত বক্তব্য অনুমোদিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে আগামী পহেলা নভেম্বর বিকেল তিনটায় বায়তুল মোকার্‌রমে ঢাকা নগরীর বিভিন্ন পেশাগত প্রতিষ্ঠান, মহিলা সংগঠন এবং সর্বশ্রেণী ও পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের সমবায়ে এক গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হবে। গণজমায়েতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করবার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় উদ্যোগের জন্য আহ্বান জানানো হবে এবং একটি আশু কর্মসূচি নির্ধারণ করা হবে। উদ্যোক্তারা ঢাকা নগরীর বিভিন্ন পেশায় কর্মরত শ্রমজীবী নাগরিকদের এই জমায়েতে অংশীদার হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতি

বাংলাদেশে আজ ভয়াল মন্বন্তর, সর্বগ্রাসী আকাল ও মহামারী এবং চরম জাতীয় দুর্যোগের কবলে নিপতিত। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সংকট অতীতের সবচাইতে জরুরী সংকটকেও দ্রুতগতিতে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং ১৯৪৩ সালের সর্বগ্রাসী মন্বন্তরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

অথচ বাংলাদেশের সরকার জনসাধারণের দুর্দশার প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে বর্তমান পরিস্থিতিকে অভিহিত করেছেন 'প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা' বলে। অন্যদিকে মন্বন্তরের মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন সামাজিক শক্তিসমূহের উপর কোন প্রকার আস্থা প্রকাশ না করে সরকার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছেন কতিপয় বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ও ঋণের উপর এবং অভ্যন্তরীণ এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ, টাউট, বদ্‌মাতব্বর ও অনুশোচনাহীন আত্মসাৎকারীদের উপর।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের বর্তমান সংকটকে 'সাময়িক' বলে অভিহিত করেছেন এবং দুর্ভিক্ষের রাজনীতিতে লিপ্ত না–হবার জন্যে বিরোধী-দলগুলোর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তিতে কোনরকম দূরদর্শিতা ও বাস্তববোধের পরিচয় আছে বলে আমরা মনে করি না। কেননা এই মন্বন্তর ও মৃত্যু কোন সাময়িক পরিস্থিতি নয় এবং মানুষের বাঁচার অধিকার একটি মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার। লঙ্গরখানায় যে সামান্য ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন তা নিতান্তই ভাঁওতামাত্র। তদুপরি লঙ্গরখানার পরিবেশ 'নির্যাতন কেন্দ্রে'র পরিবেশের সামিল।

খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সংকট যে-কোন অনুন্নত দেশে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এতদঞ্চলে 'প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা' বলতে গেলে একটি সাংবাৎসরিক পরিস্থিতি।

---

* প্রচারপত্র, অক্টোবর ১৯৭৪

অন্যদিকে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত দুঃখ-দুদর্শা এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিজনিত সংকটের সংগে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পরিস্থিতির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। দুর্ভিক্ষ মানুষ দ্বারা সৃষ্ট এবং একটি বিশেষ অর্থগৃধ্নু শ্রেণীর অবাধ লুণ্ঠন ও সম্পদ পাচারের প্রত্যক্ষ পরিণতি। এই শ্রেণী যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রভাবশালী অংশের যোগসাজশে ও পৃষ্ঠ-পোষকতায় খাদ্য এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখনই শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারণের অধিকারকে পদদলিত করে তারা তাদের লুণ্ঠন-লিপ্সা চরিতার্থ করে। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে এই শ্রেণীর অংশীদার ছিল মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, জোতদার ও খাদ্যশস্য-ব্যবসায়ী। রাজনৈতিক ও প্রশাসনযন্ত্রের সরাসরি সহযোগিতায় তারা সেই মন্বন্তর সৃষ্টি করেছিল।

একই প্রক্রিয়ায় ১৭৬১ সালের মন্বন্তর সৃষ্টি হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতাদখল, কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের বাঙালি সহযোগিদের অবাধ লুণ্ঠন ও তস্করবৃত্তির যুগে সেই সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটেছিল। আজকের ১৯৭৪ সালের মন্বন্তরে কত মানুষ যে মারা যাবে এবং তার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আমাদের অনুমান করতেও ভয় হচ্ছে।

আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে বাংলাদেশের বর্তমান মন্বন্তর মনুষ্য-সৃষ্ট; এবং উৎপাদনযন্ত্রের সাথে সম্পর্কবিহীন এক শ্রেণীর মজুতদার, চোরাচালানী ও রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ব্যবসায়ীরাই এই মহামারী ও মন্বন্তরের জন্য দায়ী। এক কথায় বর্তমান শাসকগোষ্ঠি এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি এবং তাদের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত।

খাদ্যঘাটতি কখনই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হতে পারে না। এমনকি সামান্যতম খাদ্যঘাটতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিতরণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই অর্থগৃধ্নুও গণবিরোধী শক্তি দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে পারে। সরকার এবং এর কোন কোন মহল ১৯৭১-এর যুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী মূল্যবৃদ্ধি ও বর্তমান বছরের বন্যাকে আকালের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করছেন। এ-সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আমরা জাতির সামনে আমাদের মনোভাব প্রকাশ করতে চাই। আমরা মনে করি, যদি দেশের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা নিম্নতম ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত, দেশের প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিচারকে নিশ্চিত করবার সামান্যতম আন্তরিক চেষ্টাও থাকত, তাহলে যুদ্ধের তিন বছর বাদে এবং দু'হাজার কোটি টাকারও বেশি বৈদেশিক সাহায্য পাবার পর ১৯৭৪ সনের শেষার্ধে আজ বাংলাদেশে অন্তত অনাহারে মৃত্যুর পরিস্থিতি সৃষ্টি হোত না। গত তিন বছর ধরে মানুষ নামধারী একশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতাবান অমানুষের নির্লজ্জ শোষণ, তস্করবৃত্তি, সন্ত্রাসবাদ, চাটুকারিতা, প্রতারণা ও দুঃশাসনের যে প্রতিযোগিতা চলেছে, তারই ফল বর্তমান মন্বন্তর। এক কথায় বাংলাদেশের বর্তমান দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক সংকট গত তিনবছরের লুটেরা শাসন, শোষণ ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণেরই ফল।

সুতরাং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও মন্বন্তরের মোকাবিলা নিছক মানবিক প্রশ্ন নয়; এটি একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্ন। কাজেই সরকারি পর্যায়ে মানবিক সহানুভূতি, অশ্রুমোচন, দান প্রচেষ্টার 'মহৎ প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও উৎপাদন-সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ছাড়া এই মৃত্যু, এই শোষণকে

পরাস্ত করা যাবে না। বরঞ্চ এই খাদ্যাভাব ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে দেশের শ্রমজীবী কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের রক্তের বিনিময়ে উৎপাদিত সম্পদ আত্মসাৎকারী এই আমলা মুৎসুদ্দি শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ সমর্থনে শাসনযন্ত্রে আরো শক্তিশালী হয়ে বসবে। মরণোন্মুখ সব শ্রেণীর সাধারণ মানুষের বাঁচার স্তিমিত প্রচেষ্টাকে যৎকিঞ্চিত করুণা অথবা দানসামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে যতদিন জিইয়ে রাখা যায়, ততদিনই তা তাদের শ্রেণী স্বার্থের অনুকূল। সবাই যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচবার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, তখন সমবেত সংগ্রাম সংগঠিত করা নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ।

উল্লিখিত কারণে আজ বাংলাদেশে চরম হতাশা ও সংগ্রামবিমুখতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক নিষ্পেষণের দরুণ গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিগুলোও আজ বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত। আমরা বলতে চাই যে, শোষকশ্রেণী ও শোষণব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে অনাহার ও মৃত্যুকে পরাস্ত করা যাবে না। এরজন্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রয়োজন এবং সে-সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধভাবে।

মন্বন্তর মোকাবিলায় আশু পদক্ষেপ হিসেবে আমরা মনে করি, সরকার ও দেশের সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসূচি ও কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া রেশনিং-এর পরিধি আরো সম্প্রসারিত করে জনসাধারণের দুর্দশা কিছুটা লাঘব করা যেতে পারে।

আমরা যারা মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ, তারাও আজ খাদ্যাভাব ও দুষ্প্রাপ্যতার শিকারে পরিণত হয়েছি। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও গোষ্ঠি ব্যতিরেকে বাংলাদেশের সব শ্রেণীর মানুষই আজ বাঁচবার অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা মনে করি যে দেশের সব শ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সচেতন অংশকে আজ গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। বিভিন্ন পেশায় কর্মরত সচেতন মানুষকে বর্তমান সংকট নিরসনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে এবং এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।

আসুন আমরা দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে ও ক্ষমতাসীন দলের দেশপ্রেমিক অংশকে একতাবদ্ধভাবে এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্যে আবেদন জানাই। আসুন আমরা সোচ্চারে প্রতিবাদ করি–বলি-যে মজুতদার, চোরাচালানী ও সম্পদ পাচারকারীদের দ্বারা প্রভাবিত বর্তমান শাসনযন্ত্রের দুঃশাসনকে আমরা নীরবে মেনে নেব না।

এতদুদ্দেশ্যে আগামী পহেলা নভেম্বর বায়তুল মোকার্‌রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ছাত্র বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, আইনজীবী, প্রকৌশলী এবং শ্রমজীবী মানুষদের সমবায়ে একটি গণজমায়েতের আয়োজন করেছি। এই জমায়েতে আপনারা সবাই যোগদান করে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও কর্মসূচি গ্রহণে আমাদের সহায়তা করুন।

স্বাক্ষরকারীগণ

১। সিকান্‌দার আবু জাফর, সভাপতি, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি ২। ড. আনিসুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩। ড. আহমদ শরীফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪। মির্জা গোলাম

হাফিজ, আইনজীবী ৫। কামরুন্নাহার লাইলী, মহিলা সংসদ, ৬। ড. মহিউদ্দিন আলমগীর, সভাপতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ৭। বদরুদ্দিন উমর, সম্পাদক, 'সংস্কৃতি' ৮। প্রাণেশ সমাদ্দার, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ৯। গিয়াস কামাল চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক, ফেডারেল সাংবাদিক সমিতি ১০। আলী আশরাফ, সম্পাদক অভিমত ১১। মওদুদ আহমেদ, সম্পাদক, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি ১২। আমেনা বেগম, মহিলা সংসদ ১৩। হেলাল হাফিজ ১৪। ওয়াহিদুল হক, সাংবাদিক ১৫। এনায়েতুল্লাহ খান, সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব ১৬। লুৎফুন্নেসা, নারী মুক্তি সংসদ ১৭। সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশ লেখক শিবির ১৮। জেরিনা খাতুন, মহিলা সংসদ ১৯। মাহবুবা রাশিদা, নারী মুক্তি সংসদ ২০। মাহমুদ হাসান, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ২১। আনিছা করিম, মহিলা সংসদ ২২। অধ্যক্ষ এ, এম, মোঃ ইছহাক, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ২৩। মোঃ নূরুল ইসলাম, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৪। এ, বি, এম, খালিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৫। গগন তানু, অনির্বাণ শিল্পী গোষ্ঠি, ২৬। মোঃ আসাদুজ্জামান, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ২৭। আহমদ ছফা, বাংলাদেশ সংস্কৃতি শিবির ২৮। নাজিমুদ্দিন মানিক, সাংবাদিক ২৯। আহমেদ ইউনুস, বাংলাদেশ সংস্কৃতি শিবির ৩০। শাহ্‌নেওয়াজ, বাংলাদেশ সংস্কৃতি শিবির ৩১। আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩২। মনসুর মুসা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩। শেখ মোঃ জাকারিয়া, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ৩৪। ফয়েজ আহমেদ, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি ৩৫। বিনোদ দাশগুপ্ত, সাংবাদিক ৩৬। আসিরুদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পত্রিকা পরিষদ ৩৭। ইউসুফ আলী খান, এ্যাডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট ৩৮। সৈয়দ জাহাঙ্গীর, চিত্র শিল্পী, ৩৯। আজীজ মেহের, চলচ্চিত্র পরিচালক-প্রযোজক ৪০। শামীম ইসলাম, বাংলাদেশ লেখক শিবির ৪১। আবরার চৌধুরী ৪২। আলতাফ চৌধুরী, সাপ্তাহিক 'গ্রেনেড' ৪৩। স্বপন আদনান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৪। আবদুল্লাহ আল ফারুক ৪৫। মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৬। ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৭। কাজী নুরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৮। আলী নূর, সাংবাদিক ৪৯। আফতাবুদ্দিন আহমেদ সাংবাদিক ৫০। চন্দন চৌধুরী, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫১। আনোয়ার জাহিদ, সাংবাদিক ৫২। সায়েরা আহমেদ ৫৩। রেখা আহমেদ ৫৪। বিলকিস রহমান ৫৫। আসমা রহমান ৫৬। রীতা রহমান, মহিলা সংসদ ৫৭। শরফুদ্দিন খান মুকুল ৫৮। এ, ওয়াই মশিউজ্জামান ৫৯। রকিব আহমেদ ৬০। শাহ আজিজুর রহমান (২), ৬১। কাজী মোকলেসুর রহমান ৬২। খলিলুর রহমান আকন্দ ৬৩। মফিদুল ইসলাম ৬৪। ইস্রাফিল ৬৫। আবদুল বারেক ৬৬। এন, এইচ, খোন্দকার ৬৭। আসাদুজ্জামান ৬৮। মোজাফফর হোসেন, ৬৯। সেরাজুল আলম ৭০। লুৎফে আলম ৭১। গাজীউল হক ৭২। আবদুল হান্নান ভুঞা ৭৩। মোহাম্মদ আলী ৭৪। আবদুর রশীদ ৭৫। আহমেদ হোসেন খান ৭৬। এ, টি, এম, রফিকুল্লাহ ৭৭। এম, এ, মালেক খান ৭৮। মতিউর রহমান ৭৯। দেওয়ান লিয়াকত উদ্দিন ৮০। সৈয়দা আছিয়া খাতুন, মহিলা সংসদ ৮১। আহ্‌সানুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮২। আবদুল খালেক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি।

খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে জাতীয় সংসদে খাদ্যমন্ত্রী জনাব আবদুল মমিনের বিবৃতি*

জনাব আবদুল মমিন : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে আমরা গত অধিবেশনের প্রায় চার মাস পরে এখানে আবার অধিবেশনে মিলিত হয়েছি। গত অধিবেশন চলাকালীন এবং অধিবেশন শেষ হবার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই দেশে বন্যার ফলে এবং বন্যা-জনিত অবস্থার প্রেক্ষিতে খাদ্যসমস্যার সহিত অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। মাননীয় স্পীকার এবং মাননীয় সদস্যগণ তা অবগত আছেন। সেই কারণেই এই অধিবেশন চলাকালীন এক সময়ে বন্যার ফলে দেশে খাদ্যপরিস্থিতিসহ অন্যান্য যে-সমস্যাবলির উদ্ভব হয়েছিল, সে-সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার সাহেবের মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের অবগত করানো সরকারের কর্তব্য।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি অবগত আছেন, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রক্তক্ষয়ী যে সংগ্রামের পর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, সেই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী প্রায় এক কোটি লোক পাকবাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই এক কোটি লোকের মধ্যে অনেক কৃষক ছিল, যারা সেই বৎসর চাষাবাদ করতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে ১৯৭২ সালে আমাদের খাদ্য-ঘাটতি দাঁড়ায় ৩০ লক্ষ টন। সেই ৩০ লক্ষ টনের মধ্যে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য পেয়ে সাড়ে ২৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য যোগাড় করে বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

এর পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে খাদ্য-ঘাটতি ছিল ২৫ লক্ষ টন। এ বৎসর সরকার বিদেশ থেকে এবং বন্ধু-দেশসমূহ থেকে ২১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৭৪ সালে আমরা আশা করেছিলাম, grow more food campaign এবং ছোট ছোট বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার মাধমে খাদ্য-ঘাটতি দিন দিন কমিয়ে আনতে সক্ষম হব। কিন্তু মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি জানেন, ১৯৭২ সালে খরার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যে ঘাটতি হয়েছিল, তা আজও সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে আমরা সক্ষম হইনি। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত সরকার ৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করেছেন।

১৯৭৪-৭৫ সাল অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৫ সালের জুন পর্যন্ত আমরা খাদ্যশস্য আমদানীর যে লক্ষ নির্ধারণ করেছিলাম, তা ছিল ১৭ লক্ষ টন।

---

* জাতীয় সংসদ বিতর্ক, রিপোর্ট, খণ্ড ৩, সংখ্যা ৪, পৃ: ২০১-২১৪ তারিখ ২২/১১/৭৪

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এ ব্যাপারে একটা কথা উল্লেখ না করে পারি না। ১৯৭৪-৭৫ সালে শুধু আমাদের দেশে নয়—সারা বিশ্বব্যাপী যে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা আপনি অবগত আছেন। সারা বিশ্বে খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে গিয়েছে। জ্বালানী তেল এবং জাহাজের অভাবে পরিবহন-ব্যবস্থা এক চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, যার ফলে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করে দেশে আনা এক দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি অবগত আছেন, বাংলাদেশে বিল এবং হাওর এলাকায় বিপুল পরিমাণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। কিন্তু গত এপ্রিল মাসে অকাল বন্যার ফলে লক্ষ লক্ষ মণ ধান নষ্ট হয়ে গেল। যে-ধান চাষীরা সংগ্রহ করে আগামী বৎসরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত খোরাকী চালাত, সেই ধান নষ্ট হয়ে গেল।

সেই অবস্থা কাটাতে না কাটাতে আবার এক ভয়াবহ বন্যা, এক অভূতপূর্ব বন্যা দেখা দিল, যার নজির বাংলাদেশের ইতিহাসে শত বৎসরে বা হাজার বৎসরেও দেখা যায় নাই। সেই নজিরবিহীন ১৯৭৪ সালের জুন মাসের বন্যায় দেখা গেল যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা বন্যা-কবলিত হয়েছে।

আপনি অবগত আছেন যে, সেই ভয়াবহ বন্যায় আউশ ধানসহ প্রায় ১২ লক্ষ টন ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই বন্যায় বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা জলমগ্ন হয়েছে এবং দেশের অর্ধেক লোক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর পরোক্ষভাবে বলতে গেলে বাংলার প্রতিটি লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু ঘরবাড়ি, গরু-বাছুর ও গাছপালার বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সেই ভয়াবহ বন্যা বর্ণনার অবকাশ রাখে না।

সেই বন্যার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার মোকাবেলা করার জন্য আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম, যাতে মানুষের কষ্টের লাঘব হয়।

সরকারপক্ষ থেকে যেসব চেষ্টা করা হয়েছে, তার বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। বন্যার পূর্বে দেশে যে-ঘাটতি ছিল এবং বাইরে থেকে আমদানি করে যা পূরণের কথা ছিল, তার পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষ টন। বন্যার ফলে আরও ১২ লক্ষ টন খাদ্যস্য নষ্ট হওয়ায় ঘাটতির পরিমাণ দেখা গেল ২৯ লক্ষ টন। সেই ২৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে এক বৎসরে আমদানি করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং ঐ ঘাটতি বিদেশ থেকে সাহায্য দ্বারা পূরণ করাও হয়তো সম্ভব হবে না, এ কথা মনে করে আমরা দেশের মধ্যে কৃচ্ছতা সাধনের মাধ্যমে.....

জনাব স্পীকার : আধ ঘণ্টার জন্য সংসদের বৈঠক মুলতবী হইল।

[বিরতির পর সন্ধ্যা ৫টা ৫৭ মিনিটের সময় স্পীকার জনাব আবদুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে সংসদের কাজ আবার আরম্ভ হয়]

জনাব স্পীকার : জনাব আবদুল মমিন।

জনাব আবদুল মমিন : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি পূর্বেই বলেছি, এই আর্থিক বৎসরে আমাদের আমদানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৭ লক্ষ টন। বন্যার ফলে সেটা এসে দাঁড়াল ২৯ লক্ষ টনে।

আমরা কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে, উৎপাদনবৃদ্ধির মাধ্যমে কিছুটা food reserve রাখব বলে যে ধারণা করেছিলাম, এ বৎসর সেটা হয়তো সম্ভব হবে না। এই সব চিন্তা করে আমরা আমদানি লক্ষ্যমাত্রা ২৩ লক্ষ টন নির্ধারণ করেছি।

মাননীয়-স্পীকার সাহেব, এই প্রসঙ্গে জুলাই মাস থেকে আরম্ভ করে গত চারটা মাসের আমাদের খাদ্যের অবস্থা বর্ণনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, পূর্বে স্থিরীকৃত আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, সেই হিসাব অনুযায়ী আমাদের যে খাদ্য আমরা আমদানী করেছিলাম এবং যে খাদ্য এসে পৌঁছেছিল, সেই খাদ্যই দেশের স্বাভাবিক অবস্থার জন্য যথেষ্ট হবে বলে আমরা অনুমান করেছিলাম। কিন্তু তার পরে বন্যার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি তা অবগত আছেন। বন্যার ফলে দেশের প্রায় অর্ধেক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

বন্যার ফলে শুধু যে জমির ফসল নষ্ট হয়েছিল, তাই নয়—মানুষের মজুদ ধান-চাউল পানিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে জীবনে যাকে কোনদিন কিনে খেতে হয় নাই, তাকেও সস্তা দরে M. R. নিতে চেষ্টা করতে হয়েছে। এমন কি দেখেছি, যে কৃষকপরিবারকে কোনদিন ধান-চাউল কিনে খেতে হয় নাই, তাকেও রিলিফের জন্য হাত পাততে হয়েছে।

এই যে অবস্থা দেশের প্রায় অর্ধেক লোকের, এদেরকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে সাহায্য করতে হয়েছে। সেই সমস্যার মোকাবেলার জন্য তখন প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদের হাতে ছিল না।

তবু মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মাসে খাদ্যের যে বিলি-বণ্টন-ব্যবস্থা ছিল জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত, তারচেয়ে অনেক বেশি খাদ্য বণ্টন করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম। বিদেশ থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছিলাম। সাহায্যের মধ্যে খাদ্যশস্য আমরা সাহায্য পেয়েছি এবং ভবিষ্যতেও পাব বলে আশা রাখি।

কিন্তু মাননীয় স্পীকার সাহেব, খাদ্য সাহায্য ঘোষণা আর খাদ্য এসে পৌঁছানো এক কথা নয়। বিদেশ থেকে খাদ্য এসে পৌঁছাতে কমপক্ষে দেড় থেকে দুই মাস সময় লাগে। বিদেশ থেকে যে-খাদ্যশস্য আমরা পেয়েছি, আমাদের দেশে বন্যার ফলে পরিস্থিতি তখন ভয়াবহ হয়েছিল, সেই সময় সেই খাদ্যশস্য পৌঁছে নাই। আমাদের হাতে যে মজুদ খাদ্য ছিল, সেই খাদ্য দিয়েই আমাদের পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

আমি আগেই বলেছি, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টন খাদ্য এনেছি। তথাপি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম আমাদেরকে বণ্টন করতে হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনার অবগতির জন্য আমি নিবেদন করব, অতীতে খাদ্য যদি এক মাসে দুই লক্ষ টন বণ্টন করা হত, তাহলে সাধারণতঃ অর্ধেক খাদ্য বিভিন্ন জেলার গুদামে থাকত এবং অর্ধেক বন্দর থেকে বিভিন্ন জেলায় পৌঁছানো হত।

আজকে বন্যার ফলে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে দেশে মজুদ খাদ্যের যে-ঘাটতি তা পূরণ করার জন্য আমরা জাহাজ থেকে মাল খালাস করে সাথে সাথে পৌঁছে দিই। চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দরে গম কিংবা চাউল নিয়ে জাহাজ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছাতে চেষ্টা করি।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি অবগত আছেন যে, তৈল-সঙ্কট শুধু আমাদের দেশেই নয়— সারা পৃথিবীব্যাপী বিদ্যমান। এই তৈল-সঙ্কটের ফলে আমাদের আভ্যন্তরীণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে। তাছাড়া আপনি অবগত আছেন, সম্প্রতি বন্যার ফলে আমাদের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে, রাস্তা-ঘাট, পুল, রেল, ট্রাক, বাস ইত্যাদির ক্ষতি হয়েছে। পদ্মার স্রোত বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন জেলায় আমাদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, যোগাযোগ-ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দর থেকে দূরবর্তী এলাকায় আমরা খাদ্য পৌঁছাতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন মহকুমায় প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ ছিল না। আবার মজুদ থাকা সত্ত্বেও যোগাযোগের অসুবিধার জন্য সব সময় খাদ্য পৌঁছাতে পারি নাই—আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় নাই। সেই সমস্ত অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের হাতে যে খাদ্য রয়েছে, বিকল্প পথে সেটা পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

আপনি জানেন, যোগাযোগ যখন বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, রেলগাড়ি, ট্রাক যখন চলতে পারত না, বার্জ চলা যখন অসম্ভব হয়েছিল, তখন সামরিক বাহিনীর দ্বারা আমাদের হেলিকপ্টার দিয়ে আমরা খাদ্য পৌঁছিয়েছি। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি জানেন, হেলিকপ্টার দিয়ে খাদ্য পৌঁছানো অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তা সত্ত্বেও প্রতিদিন আমাদের Air Force- এর হেলিকপ্টার এবং রিলিফের যে দু-একটি হেলিকপ্টার আছে, তা দ্বারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খাদ্য পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, দেশে বন্যার দরুন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যের অভাবে যখন কষ্ট পাচ্ছিল, সেই সময় সেই ঘাটতি পূরণের জন্য যে-খাদ্যের দরকার ছিল, তখন আমাদের হাতে সেই পরিমাণ খাদ্য মজুদ ছিল না। স্বাভাবিক অবস্থা মোকাবেলার জন্য আমাদের হাতে যদিও যথেষ্ট খাদ্য মজুদ ছিল, কিন্তু ভয়াবহ অবস্থা মোকাবিলার জন্য আমাদের যথেষ্ট খাদ্যমজুদ ছিল না।

সেই বন্যাজনিত পরিস্থিতিতে আমরা বিদেশ থেকে সাহায্য পেয়েছিলাম। খাদ্যও তাঁরা আমাদের দিয়েছিলেন। কিন্তু পৌঁছিয়ে দিতে পারেন নাই। তথাপি বিভিন্ন দেশ বিমানযোগে কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন দেশ, যাঁরা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাদের যে সাহায্য দিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে বিস্কুট, দুগ্ধ, টিনজাত খাদ্য ইত্যাদি। ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ সেগুলি পেয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র দুঃস্থ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, এখানে আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমাদের নির্দেশ ছিল, ত্রাণ-সামগ্রী পৌঁছার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দুঃস্থ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। যাতা-য়াত-ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য হয়তো বা দু-একদিন কোন জায়গায় বিলম্ব হতে পারে, তার বেশি বিলম্ব এবার হয়নি।

মাননীয়-স্পীকার সাহেব, আপনি ও মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন, বন্যার ফলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অবস্থার মোকাবেলার জন্য ত্রাণ-মন্ত্রণালয়ের বাজেট ছিল মাত্র সাড়ে ৫৬ লক্ষ টাকা। বাজেট আমাদের অল্প ছিল বটে, কিন্তু আমাদের

সরকারের সীমিত সামর্থ্য থেকে সত্যিই আমরা সেই পরিস্থিতির মোকাবেলার চেষ্টা করেছি। আমাদের জাতির জনক—আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং আগ্রহের ফলে সমস্যা আমাদের যত বড়ই হোক না কেন সেই সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করেছি এবং যেখানে যেটুকু প্রয়োজন হয়েছে, আমাদের সরকারের সামর্থ্য যত সীমিতই থাক না কেন, ঐ দুঃস্থ মানুষের কাছে আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি, অর্থ নিয়ে সাহায্য নিয়ে হাজির হতে কখনও কুণ্ঠা করি নাই।

মাননীয় স্পীকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতার ফলে আমাদের বাজেট-বরাদ্দের চেয়েও অনেক বেশি টাকা বরাদ্দ পেতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম। বন্যার সময় আমরা সর্বমোট ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার মতো দিতে পেরেছিলাম। মাননীয় স্পীকার, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যখন লক্ষ লক্ষ লোক বন্যায় গৃহহারা হয়েছে, অনেকে সর্বহারা হয়েছিল, সেই অবস্থার মোকাবেলার জন্য এই টাকা মোটেই যথেষ্ট নয়। মাননীয় স্পীকার, নগদ সাহায্য, গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী, কিংবা বীজ-ধানের জন্য মঞ্জুরী, চিকিৎসার জন্য সাহায্য এবং কাজের মাধ্যমে সাহায্য ছাড়াও আমরা খয়রাতী গমও সাহায্য হিসাবে বিতরণ করেছিলাম।

মাননীয় স্পীকার, বন্যার শুরু থেকে আমরা ক্রমান্বয়ে সাহায্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। প্রথমে খয়রাতি গমের মাধ্যমে এবং বিভিন্নভাবে সাহায্যের চেষ্টা করেছি। আপনি অবগত আছেন, বন্যার সময় বাংলার বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন ছিল। অনেক এলাকা ছিল, যেখানে পানি প্রায় বাড়িরই ছাঁদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

হাওর এলাকায় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম পাঁচ থেকে দশ মাইল দূরে। সমস্ত বাড়িঘর পানির নিচে ছিল। মানুষ ঘরের ছাদে, গাছের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে কোন মতে জীবন-রক্ষা করেছিল। তাদের ঘরে যে খাদ্য মজুদ ছিল, তা রান্না করার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না।

মাননীয় স্পীকার, পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য ঢাকা থেকে প্রতিদিন সেই সমস্ত বন্যা কবলিত, জলমগ্ন এলাকায় আমরা হেলিকপ্টারযোগে রান্না করা খাদ্য, তন্দুর রুটি, পাউরুটি বিতরণ করেছিলাম। ৯ লক্ষ তন্দুর রুটি এবং পাউরুটি আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। মাননীয় স্পীকার সাহেব, এইভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে বাংলার মানুষকে বাঁচানোর জন্য সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

খয়রাতী গম সাহায্য করে যখন আমরা দেখলাম, বাংলার মানুষকে সমূহ বিপদ থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে না, তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সারা বাংলাদেশব্যাপী লঙ্গরখানা খুলে বাংলার মানুষকে বাঁচাবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনিও অবগত আছেন, ৫,৮৬২ টি লঙ্গরখানা আমরা চালু করেছিলাম।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের দেশে লঙ্গরখানা অতীতেও আমরা দেখেছি। দুই-একবার চরম অবস্থার সময় লঙ্গরখানা খোলার প্রয়াস দেখেছি, তখন সেই লঙ্গরখানা চলেছিল চাল-ডালের লঙ্গরখানা। আজকে দেশের চরম অবস্থার কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। চাল-ডালের লঙ্গরখানা খোলার অবস্থা আমাদের ছিল না। আমাদের আটা দিয়ে লঙ্গরখানা খুলতে হয়েছে। সে যে কী দুরূহ ব্যাপার, মাননীয় সংসদ-সদস্যরা তা উপলব্ধি

করেছেন। কারণ তাঁদের এবং আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক সমাজকর্মীদের সহযোগিতায় লঙ্গরখানা চলছিল এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করে বাংলার মানুষকে বাঁচাবার প্রয়াস তাঁরা পেয়েছেন।

এই যে লঙ্গরখানা খোলা—আটার লঙ্গরখানা—এ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বাংলার প্রতিটি ইউনিয়নে তিন-চারটি লঙ্গরখানা খুলেছি। প্রতিটি এলাকায় আটা পৌঁছে দেওয়া, সময় মতো যাতে গম পৌঁছে এবং গমকে আবার ভেঙ্গে আটা করা— এটা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, আমাদের দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলছে। সরকার বিদ্যুৎ-উন্নয়ন প্রচেষ্টাও চালাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ-বিভ্রাট রয়েছে। অনেক মহকুমায় গম ভাঙ্গবার মেশিন রয়েছে, কিন্তু বিদ্যুৎ-সরবরাহ চার-পাঁচদিন বন্ধ থাকার ফলে সময় মতো গম ভাঙ্গানো সম্ভব হয় নাই। সেই সমস্ত জায়গায় হেলিকপ্টার থেকে, নৌকা করে আটা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে যে সমস্ত লঙ্গরখানা আমরা খুলেছি, সে সব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমার সংসদ সদস্য ভাইয়েরা, এমন কি আমার পিছনে যারা বসে আছেন তাঁরাও, সকলে না হোক কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন, লঙ্গরখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার কাজে। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজনকে আমিও দেখেছি। লঙ্গরখানা চালু রাখার ব্যাপারে এম. পি. সাহেবরা, সর্বোপরি আমার প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের কর্মী ভাইয়েরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন আমার মনে হয় পৃথিবীতে সে ইতিহাস বিরল।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমরা বাংলার মানুষ বাড়িতেও আটার রুটি খেতে অভ্যস্ত ছিলাম না। আটার রুটি বানানো এবং প্রতিদিন বাংলার মানুষকে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। সেই দুরূহ ব্যাপার একমাত্র সম্ভব হয়েছে দেশপ্রেমিক কর্মী বাহিনীর প্রচেষ্টায়।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই লঙ্গরখানায় যাঁরা কাজ করে চলেছেন এবং রিলিফ-বিতরণে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ না-দিয়ে পারি না।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন-মন্ত্রণালয় ছাড়াও আমি আগেই বলেছি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শত কাজকর্মের মধ্যেও অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে ও গুরুত্ব দিয়ে এ-দেশের মানুষকে সাহায্য করেছেন; বন্যাকবলিত মানুষকে সাহায্য করার জন্য সব সময় ব্যস্ত থেকেছেন। আমাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ তদারক করে, উপদেশ দিয়ে তিনি সাহায্য করেছেন। এবং নিজস্ব তহবিল খুলে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক অবস্থাপন্ন লোক যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে বিতরণ করেছেন। তিনি গৃহনির্মাণ-মঞ্জুরী বাবদ সাহায্য, নগদ সাহায্য এবং কাপড় কিনে তাঁর তহবিল থেকে প্রায় ৪ কোটি টাকার সাহায্য বিতরণ করেছেন।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, তাছাড়া রেডক্রসে যাঁরা আছেন তাঁরা যে-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় যাঁরা দুঃস্থ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ না-দিয়ে পারা যায় না।

এছাড়া, বহু বিদেশী সংস্থা বিভিন্ন জায়গায় বহু সাহায্য করেছেন। তাঁরা বাংলাদেশের দুঃস্থ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের আমরা প্রশংসা করতে দ্বিধাবোধ করব না।

জনাব স্পীকার সাহেব, আপনি অবগত আছেন, বিভিন্ন এলাকায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, শুধু সরকারি সাহায্য দিয়ে সে অবস্থার মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে, স্থানীয় প্রতিপত্তিশালি লোকদের দানের ফলে এবং বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণের সহযোগিতায় বহু লঙ্গরখানা সরকারি সাহায্য ছাড়াই পরিচালিত হয়েছে। এ দ্বারা বাংলার মানুষ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। যারা দুঃস্থ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের কাছে সরকার কৃতজ্ঞ।

এ প্রসঙ্গে আমার সহকর্মী ও সংসদ্‌সদস্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ত্রাণ-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের আমি ধন্যবাদ না-দিয়ে পারি না। এ কাজে আমার প্রতিষ্ঠানের কর্মী, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী—বিশেষ করে যুবসমাজ, ছাত্র-সমাজ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আমাদের সাহায্য করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জনাব স্পীকার সাহেব, আপনি দেখেছেন, ছাত্ররা বিভিন্ন হলে অনেক সময় তাঁদের একবেলার খাওয়ার আটা সংগ্রহ করে রুটি তৈরি করে বিতরণ করেছেন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে কলেরা-বসন্তের টিকা-ইন্‌জেকশন দিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন সংস্থা মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এক কথায় সকল দুঃস্থ মানুষের সাহায্যে অনেকেই এসেছেন।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমি আমার সরকারি কর্মচারীদের ধন্যবাদ না-দিয়ে পারি না। আমার সরকারি কর্মচারী বিশেষ করে খাদ্য এবং ত্রাণ-মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ কর্মচারী district, sub-division এবং থানার সকল কর্মচারী, যাঁরা সারাক্ষণ মানুষের কাছে কাছে ছিলেন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন-মন্ত্রাণালয়ের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করার জন্য দিন-রাত্রি পরিশ্রম করে এসেছেন এবং দেশের সমাজ-কর্মী এবং রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অসহায় মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে সরকার যখন প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে গিয়েছিলেন, তখন আমার সাংবাদিক ভাইয়েরা বিভিন্ন জায়গা থেকে দরকারী খবর সংগ্রহ ও পরিবেশন করে আমাদের অনেক উপকার করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে দেশের লঙ্গরখানার খবর সংগ্রহ করে এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে তা পৌছে দিয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাছাড়া, বিভিন্ন সময় তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা আমি পেয়েছি, তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, বন্যার ফলে এই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো, এই বিরাট সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য সরকারের নিকট যে খাদ্য মজুদ ছিল, তা যথেষ্ট ছিল না। আজকে যোগাযোগ-ব্যবস্থায় বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। এই সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে তেলের দাম বাড়ার ফলে, জাহাজের অভাবে এবং সুয়েজ খাল বন্ধ থাকার দরুন। তার ফলে ইচ্ছা করলেই পনের দিনে বা এক মাসে বিদেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার আনা যায় না। তা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব তাড়াতাড়ি খাদ্য আনা হয়েছে।

অভাবের দরুন সৃষ্ট দেশের এই পরিস্থিতিতে কিছু সংখ্যক মানুষ তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিল। তাদেরকে দমনের জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ

করেছেন। অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যের দাম, বিভিন্ন জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটা ছিল ব্যবসায়ীদের কারসাজি। অধিকাংশ দ্রব্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিল।

খাদ্য যাতে মানুষের কাছে পৌঁছায়, খাদ্যের দাম যাতে অতিরিক্ত বাড়তে না পারে, সেজন্য ১৯৫৩ সালের Food Stuff (Price Control and anti-Hoarding) Order-অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। সে ব্যবস্থা হল কেউ দুই মাসের প্রয়োজনের অধিক ধান বা চাউল এবং প্রয়োজনীয় বীজ-ধানের বেশি মজুদ রাখতে পারবে না। এই নির্দেশ ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ব্যবসায়ীদের প্রতি নির্দেশ ছিল, পাইকারী ব্যবসায়ীরা চার শত মণের বেশি এবং খুচরা ব্যবসায়ীরা ৫০ মণের বেশি মজুদ রাখতে পারবে না।

বর্ডার এলাকার ১০ মাইলের মধ্যে কোন ব্যবসায়ীকে ১০ মণের অধিক মজুদ রাখার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। বর্ডার এলাকায় ১০ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত ধান-চাউলের ব্যবসায়ী রয়েছে, তাঁদের সবাইকে লাইসেন্স গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জনাব স্পীকার, আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ীদের আমরা ১০ মণের বেশি ধান-চাউলের ব্যবসা করতে হলে লাইসেন্স গ্রহণ করার নির্দেশ দিই। এই ব্যবস্থা করা হয় ধান-চাউল যাতে মজুদ থাকতে না-পারে, যাতে নাকি অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধান-চাউল মজুদ করতে না-পারে এবং বাজারে ধান-চাউলের যাতে অবাধ আমদানি ঘটে সেজন্য।

ধান-চাউলের দামের যাতে নিম্নগতি হয়, তার জন্য আমাদের সহকর্মী সংসদ-সদস্য ভাইয়েরা এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য কর্মী ও নেতারা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি বহু জেলায় তাঁরা এই কাজে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন, যার ফলে ধান-চাউলের দাম খুব একটা নিচে নেমে না-এলেও ঊর্ধ্বগতি রোধ করা সম্ভব হয়েছিল। অনেক জায়গায় ধান-চাউলের দাম যথেষ্ট পরিমাণে কমেও এসেছিল।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমরা খাদ্য বিভাগ থেকে রেশনিং এলাকায় রেশন দিয়ে এবং গ্রামে যারা গরীব আছে যাদের কিছু ক্রয়ক্ষমতা আছে তাদেরকে modified রেশনিঙের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ করেছি।

এবারের ভয়াবহ বন্যার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার মোকাবেলা করার জন্য, আমরা দুঃস্থ মানুষের কাছে যাতে অধিকতর খাদ্য পৌঁছে দিতে পারি, সেজন্য আমরা শহরের ভাইদের যাঁরা' শহরে থাকেন, তাঁদের কিছুটা অসুবিধা করে, তাঁদের রেশন থেকে কিছু অংশ নিয়ে সেই খাদ্যশস্য গ্রামে গ্রামে দিয়েছি। যেখানে তাঁরা প্রতি সপ্তাহে তিন সের করে রেশন পেতেন, সেখানে আমরা তাঁদের প্রতি সপ্তাহে পৌনে তিন সের এবং পরে আড়াই সের করে দিয়েছিলাম। সে বরাদ্দ আমরা কমিয়ে দিয়েছিলাম এইজন্য, যাতে গ্রামাঞ্চলে যারা বন্যা-কবলিত, দুঃস্থ মানুষ তারা যেন খাদ্য পেতে পারে। বিভিন্ন বন্যা-কবলিত এলাকায় আমরা যে খাদ্য পৌঁছে দিয়েছি সে খাদ্য সেখানকার দুঃস্থ মানুষদের বাঁচিয়েছে।

বন্যার ফলে বিভিন্ন এলাকার মানুষ তাদের ক্রয়-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। সর্বহারা হয়ে তারা অসহায় অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছিল। সেই মানুষকে বাঁচাবার জন্য আমরা লঙ্গরখানা এবং খয়রাতী সাহায্যের মাধ্যমে প্রায় ৩০ লক্ষ মণ গম বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করেছি। প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার মণ ধান আমরা খয়রাতী সাহায্য হিসাবে বিতরণ করেছি। ১১ হাজার মণ চাউল আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিতরণ করেছি।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমি আগেই বলেছি যে, বাংলাদেশের দুঃস্থ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা ছিল না। আমার যে খাদ্য মজুদ ছিল খয়রাতী গম এবং লঙ্গরখানায় দেওয়ার ফলে প্রচুর খাদ্য আমার হাতে ছিল না, যার জন্য যারা লঙ্গরখানায় যায়নি এবং যাদের কিছুটা ক্রয়ক্ষমতা ছিল, তাদেরকে অতিরিক্ত দাম দিয়ে খাদ্য কিনতে হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, আমরা তাদেরকে M. R. -এর মাধ্যমে পর্যাপ্ত সাহায্য করতে পারিনি। কারণ, যারা দুঃস্থ যাদের একেবারে ক্রয়ক্ষমতা ছিল না, যারা লঙ্গরখানায় খেত, তাদেরকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে। জনাব স্পীকার সাহেব, আমি আগেই বলেছি যে, যোগাযোগ-ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার ফলে চট্টগ্রাম, খুলনা থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় আমরা সময়মতো খাদ্য পৌঁছাতে পারি নাই। এবং বিভিন্ন এলাকায় খাদ্যশস্য মওজুদ না থাকায় আমাদের নানাবিধ দুর্ভাবনায় পড়তে হয়েছে। যেখানে খয়রাতী ধান মজুদ ছিল, সেখান থেকে কিছুটা ধান ঐসব এলাকায় দেবার ব্যবস্থা করেছি। এবং অনেক জায়গায় M. R. -এর মাধ্যমেও কিছুটা দেবার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম। সম্পূর্ণ জরুরী ভিত্তিতে সরকারের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সমস্ত কিছুই আমরা নিয়োজিত করেছিলাম বাংলার মানুষকে বাঁচাবার জন্য।

বন্যার ফলে মানুষ যে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, তাদের প্রতিটি ঘরে খাবার জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিদেশ থেকে তখন খাদ্য সময়মতো এসে পৌঁছায় নাই কিংবা পৌঁছানো সম্ভবপর ছিল না। তখন আমাদের হাতে সামান্য খাদ্য মজুদ ছিল। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় আমরা পড়েছি যে, বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোক না-খেয়ে মারা যাবে। দুই মাস আগে, মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি নিজে, সংসদের প্রতিটি মাননীয় সদস্য সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং আমরাও করেছি যে, এই অবস্থার মোকাবেলা আমরা কতটুকু করতে পারব। তবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমরা সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম, যাতে বাংলাদেশের একটি মানুষও না-খেয়ে মরে না-যায়। তার জন্য প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। তা সত্ত্বেও সবাইকে আমরা বাঁচাতে পারি নাই। আমরা সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যদিও লক্ষ লক্ষ লোককে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি, তথাপি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলাদেশে সাড়ে ২৭ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে অনাহার ও ব্যাধির ফলে।

এটা অনাহার এবং ব্যাধির ফলে মোট মৃত্যুর হিসাব। অনাহারে কত লোক মারা গেছে এবং ব্যাধির ফলে কত লোক মারা গেছে, সেটা ভাগাভাগী করা সম্ভব হয় নাই আমাদের পক্ষে। ভাগাভাগী করা হলে আগামী অধিবেশনে সঠিক সংখ্যা জানাতে পারব। অনাহার এবং ব্যাধির ফলে যে সাড়ে ২৭ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে রংপুর এবং ময়মনসিংহ জেলায় মৃতের সংখ্যা জেলাওয়ারী হিসাবে সবচেয়ে বেশি।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের যে খাদ্য-ঘাটতি ছিল এবং এই ঘাটতির জন্য খাদ্যদ্রব্য বিদেশ থেকে সময়মতো এবং সাহায্যকৃত খাদ্যও আমাদের বিদেশী বন্ধু-রাষ্ট্রগুলি সময়মতো আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে নাই।

এই অবস্থা যখন চলছিল, তার বহুদিন পরে বিদেশ থেকে আমাদের আমদানিকৃত এবং সাহায্যকৃত মাল নিয়ে জাহাজ আসতে আরম্ভ করে ১৯শে অক্টোবর থেকে। আপনি অবগত আছেন যে, ১৯শে অক্টোবর যে জাহাজ এসেছে, সে জাহাজ দ্রুতগতিতে না এলে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি এসে পৌঁছত। সরকারের প্রচেষ্টায় আমরা অনেক আগেই সে সমস্ত জাহাজ আমাদের দেশে ভেড়াতে সক্ষম হয়েছি।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই আভাস কিছুটা দিয়েছিলাম যে, অক্টোবর মাসের শেষ দিকে আমাদের অবস্থার উন্নতি কিছুটা দেখা দেবে। অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখ থেকে আরম্ভ করে অনেক জাহাজ আমাদের দেশে এসেছে। অদ্যাবধি প্রায় ২ লক্ষ টন খাদ্য প্রায় এক মাসের মধ্যে দেশে এসে পৌঁছেছে এবং ক্রমাগত আরও খাদ্য আসছে।

খাদ্য-পরিস্থিতির যে বর্ণনা করছিলাম, সেই প্রসঙ্গে জানাতে চাই যে, আমাদের আমদানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৯ লক্ষ টন। তার মধ্যে ৬ লক্ষ টন বাদ দিয়ে আমরা অনুমান করছিলাম যে, এই বছরে আমদানির লক্ষ্যমাত্রা ২৩ লক্ষ টন হবে। ২৩ লক্ষ টনের মধ্যে ১৩ লক্ষ টন খাদ্য আনার ব্যবস্থা আমরা চূড়ান্ত করে ফেলেছি। বাকী ১০ লক্ষ টন খাদ্য আমাদের চেষ্টা এবং বন্ধু-রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতায় আমরা আনতে সক্ষম হব বলে আশা পোষণ করি।

আজকে একটু আগে আমি বলেছি, বন্যার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অবস্থার ফলে আমার দেশের হাজার হাজার মানুষ কষ্ট করেছে, অনাহারে কাটিয়েছে। যাঁদের লঙ্গরখানায় খাইয়ে অতি কষ্টে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছি, আল্লার রহমতে যাঁরা বেঁচে রয়েছেন, তাঁরা আজ দেশের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে যার কাজে চলে যাচ্ছেন।

দেশের খাদ্য-পরিস্থিতির যে অবনতি বন্যার ফলে ঘটেছিল, বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় ফসল কিছু হবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। বন্যার পর অনেক এলাকায়—হতে পারে হয়ত দু-চার জেলায় আশানুরূপ ফসল হয়নি। আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে নিবেদন করতে পারি যে, সারা বাংলাদেশে এইবার ফসল ভাল হয়েছে। বাংলাদেশের সব জায়গায় ফসল ভাল হবার ফলে স্বভাবতঃ কারণেই গরিব মানুষ, দুঃস্থ মানুষ, যারা লঙ্গরখানায় খেত, তারা নিজ নিজ এলাকায় চলে যাচ্ছে। ধান কাটার কাজ করে জীবিকা-নির্বাহের জন্য নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাচ্ছে। দেশের সর্বত্র যে-অবস্থা আমরা দেখছি, তাতে অল্প দিনের মধ্যেই দেশের সমস্ত লঙ্গরখানা উঠিয়ে দিতে সক্ষম হব।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, এখানে আপনার অবগতির জন্য এ কথা জানাতে চাই যে, এতৎসত্ত্বেও কিছু লোক আছে, যারা অত্যন্ত বৃদ্ধ, যারা অনাথ শিশু, যাদের পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব হবে না, যাদের অন্য কোন আশ্রয় নাই, যাদের বাপ-মা নাই, সেই বৃদ্ধ, অনাথ শিশুদের আমরা ফেলে দিতে পারব না। তাদের ভরণ-পোষণের জন্য অবশ্যই আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যে সমস্ত দুঃস্থ শিশু, বৃদ্ধ মানুষ, যারা লঙ্গরখানার

রুটি হজম করতে পারে না, তাদের সাহায্য করার জন্য আমার রংপুরের ভাইদের জন্য, জামালপুরের ভাইদের জন্য আমরা হেলিকপ্টারে করে পাউরুটি পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি এবং কিছু দিন আগেও চার লক্ষ পাউরুটি পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া, সরু চাল যতটকু পেরেছি, চাল বিতরণের জন্য প্রচেষ্টা অবশ্যই করেছি।

যারা আগামী দুই মাসে মানুষের ধান কেটে পরিশ্রম করে কিছুটা উপার্জন করবে এবং তার পরে যারা কাজ পাবে না, তাদেরকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। তাদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে, লঙ্গরখানা উঠিয়ে দিলেও, খয়রাতী গম সাহায্য কিছু চালু রাখা হবে। তাছাড়া কাজের পরিবর্তে গম এবং টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে সাহায্য চালিয়ে যাওয়া হবে।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, টেষ্ট রিলিফের কাজ যাতে আগামী ফসল বৃদ্ধির সহায়ক হয় সেজন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা চলছে। আমি বিশ্বাস করি, সংসদে আমার মাননীয় বন্ধু যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সর্বদিক্ দিয়ে অতীতে যেমন লক্ষ্য রেখেছেন, এই টেষ্ট রিলিফের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় এবং দেশে যাতে আগামী ফসল বৃদ্ধির সহায়ক হয় তেমনি লক্ষ্য এবারও রাখবেন। এমনিভাবে তাঁদের কাজ হবে, যাতে আগামী বছর কম রিলিফ দিতে হয়, ফসল বৃদ্ধি হয়।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, বিদেশ থেকে অন্যান্য সাহায্যের মধ্যে কিছু কাপড় ও কম্বল পেয়েছিলাম। এবং তার বিতরণেরও ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। কিন্তু আমাদের হেলিকপ্টারগুলি ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকাতে আমাদের শীতবস্ত্র বা কম্বল সে সময় বিতরণ করা সম্ভব হয় নাই। এখন শীত আরম্ভ হয়েছে এবং কিছুদিন যাবৎ সে সমস্ত বিতরণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। অত্যন্ত দুঃস্থ এলাকার দুঃস্থ মানুষ, যারা লঙ্গরখানায় কোন মতে খেয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছে, শুধুমাত্র তাদের সহায়তায় কম্বল এবং দুঃস্থ শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

সর্বশেষে আমি এই কথা জানাতে চাই যে, বন্যার ফলে আমাদের যে খাদ্য-পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়েছিল সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে আমরা সমূহবিপদ কোন রকমে কাটিয়ে উঠেছি। আমরা বর্তমানে কিছুটা খাদ্য বাইরে থেকে আনার ফলে এবং দেশে ফসল ভাল হবার ফলে কিছুটা ভাল অবস্থার মধ্যে পড়েছি। সেই অবস্থাও, আগামী বছরের কথা আমরা যখন চিন্তা করি যথেষ্ট নয়।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস বাংলাদেশের সর্বত্রই একটা সুখের সময়। আজকে এই অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে আমরা যেন আগামী আশ্বিন-কার্তিক মাসের কথা ভুলে না যাই। আগামী বছরের জন্য আমদানিকৃত যে সমস্ত খাদ্য আনার প্রয়োজন, তা আনার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালাচ্ছি এবং আমরা এ ব্যাপারে সব সময় আশাবাদী।

আগামী বছরে আমাদের দেশের মানুষ খাদ্যের দিক দিয়ে কতটা সচ্ছল হবে, বাংলার মানুষকে খাদ্যাভাবে কষ্ট করতে হবে কিনা, এটা কিন্তু নির্ভর করছে আমরা বর্তমানে যে খাদ্য-সংগ্রহনীতি শুরু করেছি, সেটার সাফল্যের উপর।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি অবগত আছেন, দেশে খাদ্য কিছুটা ঘাটতি থাকার ফলে এবং বিভিন্ন জেলায় ও মহকুমায় মজুদ না-থাকার ফলে এবং বিভিন্ন যোগাযোগ-ব্যবস্থায় নানাবিধ অসুবিধা থাকার ফলে আমরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। এমন কি,

চট্টগ্রামে ও খুলনায় খাদ্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও রংপুরে সময়মতো খাদ্য পাঠানো সম্ভব হয় নাই।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, যদি রংপুর জেলায় খাদ্যশস্য মজুদ থাকত তাহলে আমরা সেখানে খাদ্য-পরিস্থিতির মোকাবেলা নিশ্চয় করতে পারতাম। এই অবস্থা চিন্তা করে সরকার compulsory procurement-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, মাননীয় সংসদ-সদস্যদের সার্বিক প্রচেষ্টার ফলে, দেশপ্রেমিক প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মী, বিশেষ করে আমাদের আওয়ামী লীগ-কর্মী, অন্যান্য সমাজকর্মী, যুব-সম্প্রদায়, ছাত্র-সম্প্রদায়, প্রতিটি মানুষের চেষ্টার ফলে যদি আমরা খাদ্য-সংগ্রহ-অভিযান সার্থক করে তুলতে পারি, তাহলে আমরা পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ করতে পারব। শুধু তাই নয়—আগামী বৎসরে খাদ্য-ঘাটতি দেখা দিলে সেটারও কিছুটা পূরণ করতে পারব।

মাননীয় স্পীকার সাহেব, সরকারের খাদ্য-সংগ্রহ-নীতি মাননীয় সদস্যদের জানা আছে। এই ব্যাপারে আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। মাননীয় সংসদ-সদস্যদের হয়তো ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তাঁরা ধৈর্য ধরে আমার বক্তৃতা শুনেছেন, সেজন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে, আবার অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সরকারের খাদ্যসংগ্রহ অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুরোধ করছি, যাতে বাংলাদেশের মানুষ অতীতে যে অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, সেই অবস্থার মধ্যে আর পড়তে না-হয়। প্রত্যেকটি মানুষ যেন এ বিষয়ে সচেষ্ট হয়, এই আবেদন রেখে, মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সংসদ-সদস্যদের ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জয়বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু।

অনাহার, বন্যা ও ব্যাধিতে মৃত্যুবরণকারীদের প্রতি সংসদের সহানুভূতি-জ্ঞাপন

জনাব মো: আবদুল্লা সরকার : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে এই পরিষদে একটি প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি চাচ্ছি। সেটা হল যে, হাজার হাজার, লক্ষাধিক লোক মারা গিয়েছে। মাননীয় খাদ্য-মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ২৭,৫০০ লোক অনাহারে এবং ব্যাধিজনিত কারণে মারা গিয়েছে। সত্যই এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে সংসদে ৫ মিনিটকাল নীরবতা পালনের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার : দুঃখ-প্রকাশে কোন বাধা নাই।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (শিল্প-মন্ত্রী) : মাননীয় স্পীকার সাহেব, যারা মারা গিয়েছে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি, তবে বিষয়টি প্রস্তাব-আকারে এই মুহূর্তে আনা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। আপনার কাছে সিদ্ধান্ত চাই, মাননীয় স্পীকার সাহেব।

জনাব আমীরুল ইস্‌লাম : মাননীয় স্পীকার সাহেব, মাননীয় সদস্য জনাব আবদুল্লা সরকার যারা দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছে, তাদের রুহের মাগফেরাতের প্রস্তাব করেছেন। দুঃখের সঙ্গে এ কথা বলতে হয়, বাংলাদেশে নানা কারণে, নানা সময়ে মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে— কখনও সেটা মানুষের সৃষ্ট কারণে, কখনও বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে।

মৃত ব্যক্তিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না। এই কথা আজকে আমাদের দলমতনির্বিশেষে মনে রাখতে হবে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষে আর একটি মানুষও যেন না-মরে এবং সেই কাজ শুরু করতে হবে। এইভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমাদের কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

এটা আজকে শুধু বাংলাদেশের কথা নয়, সারা বিশ্বব্যাপী যে খাদ্য-সম্মেলন হয়ে গেল রোমে, সেখানেও প্রতিজ্ঞাগ্রহণ করা হয়েছে, বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর সমস্ত ক্ষুধার্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ রোধ করতে হবে। এতে আমরা কতখানি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারি, তার মাঝে নিহিত রয়েছে মৃতদের রুহের মাগফেরাত এবং তাদের জন্য আমাদের আন্তরিকতা। সেই জন্য আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

আমাদের যোগ্য খাদ্য মন্ত্রী এই বিষয়ে নিরলস প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে যে বিবৃতি দিলেন তাঁর সেই প্রচেষ্টায় বহু লোককে বাঁচানো সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি বলেছেন যে, আমাদের আজকে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে যে, ভবিষ্যতে এমনি করে মানুষ যেন না-মরে।

খাদ্য মন্ত্রী বর্তমান অবস্থার যে কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, সেই কারণগুলি আমাদের খুঁজে বার করতে হবে এবং তা দূর করতে হবে। এর মধ্যে একটা কারণ হল খাদ্যের স্টকের অভাব। সেইজন্য খাদ্য-মন্ত্রী সাহেব খাদ্যের স্টক build up-এর কথা বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর খাদ্য-সংগ্রহ-নীতির মাধ্যমে এই খাদ্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করতে হবে।

বা'র থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে আমাদের অভাব পূরণের যে কথা রয়েছে, সেদিকে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে, পৃথিবীর শুধু বাংলাদেশ নয়—ভারতবর্ষ, সোহ্‌লান, আফ্রিকার কয়েকটি দেশেও ক্ষুধার্ত মানুষ রয়েছে।

World Food Conference-এ পৃথিবীর উন্নত ও উদ্বৃত্ত nation গুলি পৃথিবীর ক্ষুধার্ত দেশের মানুষকে খাদ্য supply-এর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে নিরাশ করেছে। এই মুহূর্তে তারা কোন....

জনাব স্পীকার : জনাব আমীরুল ইস্‌লাম please conclude।

জনাব আমীরুল ইস্‌লাম : প্রকৃত-প্রস্তাবে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা শুধু মৃতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শেষ করলে চলবে না। যাতে অনাহার ও ক্ষুধা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারি, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। খাদ্য-শস্যের অভাবকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা অর্জন করলে চলবে না। তাতে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না।

জনাব ময়নুদ্দিন আহমেদ (মানিক) : জনাব স্পীকার সাহেব, জনাব আবদুল্লা সরকার আজকে যে মানুষের সৃষ্ট, বাংলার শোষক-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে, তাদের রুহের মাগফেরাতের প্রস্তাব আনতে চাচ্ছেন তা আনা উচিত।

Firing squad আইনে মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে মজুতদারদের যখন শাস্তি দেওয়া হয় না, তখন এই আইন কাদের জন্য? ইয়াহিয়া খান এ দেশের ৩০ লক্ষ মানুষকে মেরেছে, আর....

জনাব স্পীকার : জনাব ময়নুদ্দিন, আপনি বসুন।

ডা: আসহাবুল হক : বৈধতার প্রশ্ন, জনাব স্পীকার সাহেব।

সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ৩০০ বিধি-অনুযায়ী খাদ্য-মন্ত্রী সাহেব বিবৃতি দেয়ার পর আর কোন আলোচনার অবকাশ থাকে না। রাজনৈতিক ফায়দা উঠাবার উদ্দেশ্যে এই বক্তৃতা বিধি-বহির্ভূত হয়েছে।

জনাব ময়নুদ্দিন আহমেদ (মানিক) : আমি জনাব স্পীকারের অনুমতিক্রমেই বলেছি।

জনাব স্পীকার : জনাব আবদুল্লা সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন, তাতে এই সংসদে কারও আদৌ আপত্তি নাই। বন্যা-জনিত কারণে বা খাদ্য-মন্ত্রী যা বলেছেন, দুর্ভিক্ষের জন্য বা ব্যাধির কারণে যে সাড়ে ২৭ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে সংসদে যদি কারও কোন অমত না-থাকে তাহলে honest wishes of the House proceedings-এ থাকবে। সংসদের ডেপুটি লীডারও তাতে অমত প্রকাশ করেন নাই।

দুর্ভিক্ষজনিত কারণে, অনাহারে অথবা বন্যায় অথবা ব্যাধিজনিত কারণে বাংলাদেশের যে সব মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রতি এই সংসদ সহানুভূতি প্রকাশ করছে।

সংসদ-অধিবেশন আগামীকাল বৈকাল ৩টা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

এই কি সোনার বাঙলা?
শেখ মুজিব জবাব দাও*

এই কি সোনার বাঙলা? এই সোনার বাঙলার জন্যই কি এত ত্যাগ, এতো তিতিক্ষা ও রক্তক্ষয়? শেখ সাহেব আপনি আমাদের ওপর নির্যাতন চালাতে পারেন, কারাগারে আটকে রাখতে পারেন; এমনকি বিভিন্ন বাহিনী লাগিয়ে হত্যাও করতে পারেন। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ রায়কে আপনি কেমন করে ঠেকাবেন? হিটলার-মুসোলিনি-জার-বাতিস্তা-চিয়াংকাইশেক কেউই তা পারে নি। আপনিও পারবেন না। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সামনে আজ জীবন-মৃত্যুর চরম মুহূর্ত। বুটের নিচে তাদের আপনি কদিন আর দাবিয়ে রাখবেন? সন্ত্রাস, প্রতারণা ও মিথ্যার বেসাতি দিয়ে সত্যকে কদিন ঢেকে রাখা সম্ভবপর? শেখ সাহেব জবাব আপনাকে দিতেই হবে। যেই জনতা আপনাদের জবাব নেবে সেই জনতা আজ জেগেছে।

বাংলাদেশে আজ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।
চাউলের মণ কোথাও কোথাও ২৫০ টাকা পর্যন্ত (অথচ এই শেখ মুজিবই একদিন বলেছিল ক্ষমতা পেলে ২০টাকা মণ দরে চাউল খাওয়াবে)।

কাপড়, ঔষধ, তেল, মসলা, সিগারেট, কেরোসিন সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আগের তুলনায় ৫/৭ গুণ পর্যন্ত।

ক্ষুধার্ত মায়ের বুকে দুধ নেই,বাজার থেকেও শিশুখাদ্য উধাও।

শতকরা ৯০ জন মানুষ হয় অনাহারে আছে, নয় আধপেটা খাচ্ছে।

এখনই দৈনিক অনাহারে মরছে প্রায় ১০০০ থেকে ১২০০ মানুষ; অচিরেই তা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

বাঙালির গড়ে আয়ু কমছে জনপ্রতি ১৫ বছর।

কলাপাতা দিয়ে মানুষের লাশ দাফন হচ্ছে; মেয়েরা কাপড়ের অভাবে গলায় দড়ি দিচ্ছে।

পেটের দায়ে মাত্র ৬০ টাকায় মা দু'টি সন্তান বিক্রি করছে।

প্রতি বছর খাদ্য লাগে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন।

বার্ষিক ঘাটতি পড়ে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টন।

সীমান্ত পাচার হয় আরও ২০ লক্ষ টনের ওপর।

এই মুহূর্তে খাদ্য ঘাটতি ২৮ লক্ষ টন, (আর ৬টি জাহাজে করে আসছে মাত্র ১ লক্ষ টনের মতো খাদ্য। এর অর্ধেক আবার পাচার হবে ওপারে।)

---

* প্রকাশের তারিখ নেই, আনুমানিক ১৯৭৪, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল কর্তৃক প্রকাশিত

সরকারের হাতে আছে উর্ধপক্ষে ৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। এর সবটা দিয়ে চাউল আনলেও সারা দেশের ৫ দিনের খাদ্য হবে কিনা সন্দেহ।

কৃষকের হালের গরুর দাম বেড়েছে ৪/৫ গুণ।

সারের দাম বেড়েছে মণ প্রতি ৫০ টাকা পর্যন্ত।

বিনা পয়সার কৃষি ঔষধের ওপর উচ্চমূল্য ধার্য করা হয়েছে।

অধিকাংশ কৃষক ঋণে জর্জরিত। (ঋণ পরিশোধে অসমর্থ কৃষকদের ওপর নির্বিচারে জারী হচ্ছে গ্রেফতারী পরোয়ানা)।

পেটের দায়ে বীজধানও অনেকে খেয়ে ফেলেছে।

ফলে আগামীতে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যাবে।

শিল্পের কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতির অভাব।

পাট ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার নেই; রফতানি আগের তুলনায় শতকরা ৬৫ ভাগ কমে গেছে।

শিল্প সংক্রান্ত উপযুক্ত পরিকল্পনা নেই।

শ্রমিক এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভয়, ভীতি ও সন্ত্রাস।

২৬ মাসে প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে, একমাত্র চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ডেই একরাতে ১২০০ শ্রমিককে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়েছে।

দালাল শ্রমিক নেতা ও শ্রমিক নামধারী গুণ্ডা পোষার জন্য এযাবৎ খরচ করা হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি টাকা।

দলীয় স্বার্থে প্রায় ১ লক্ষ দক্ষ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে।

শিল্প উৎপাদন কমেছে আগের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ; আগামীতে আরও কমবে।

পাকিস্তানি আমলে বাংলাদেশে প্রচলিত মুদ্রা ছিল ৩০০ কোটি টাকার মতো।

এখন উৎপাদন কমেছে বহুগুণ।

অথচ এখনই মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৮৯০ কোটি টাকার ওপর।

ফলে অর্থনীতি অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য ৫/৭ গুণ না বেড়ে পারে না।

মন্ত্রী, এম. পি. রক্ষীবাহিনী ইত্যাদির বেতন দেয়ার জন্য দেউলিয়া সরকার প্রতি মাসে ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা ছেপে বাজারে ছাড়ছে।

ফলে ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলেছে; যার দরুন দ্রব্যমূল্যও ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

৬ জনের পরিবারে মাসে চাউলই লাগে ২ মণ, যার দাম কমপক্ষে ৪০০ টাকা।

অথচ শ্রমিকসহ অন্যান্য কর্মচারীর ন্যূনতম মাসিক বেতন মাত্র ১৫৫ টাকা।

শ্রমিক ও সাধারণ কর্মচারীদের মাসিক বেতনে চলে বড় জোর মাসের ৫/১০ দিন।

ফলে তাদের হয় দুর্নীতির আশ্রয় নিতে, নতুবা ঋণে জর্জরিত হতে হয়।

শেখ মুজিব বলেছেন জনগণকে ৩ বছর কিছু দেবেন না।

কিন্তু তাঁর দলের অনেকেইতো ৩ বছরে কোটিপতি।

এই ৩ বছরে ৫ কোটি টাকার নয়া গণভবনও হয়েছে, শেখ মুজিবের নিজের বাড়িও ৩ তলা হয়েছে।

শুধু জনগণের জন্যই এসেছে দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা ও অকাল মৃত্যু।

বিদেশ থেকে ঋণ, সাহায্য ও রফতানি বাবদ এসেছে ১৬০০ কোটি টাকার মতো। (রিলিফ ও সাহায্য বাবদ প্রাপ্ত প্রায় ১০০০ কোটি টাকার নগদ অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী এখানে ধরা হয় নি। এর শতকরা ৫০ ভাগ কর্তা ব্যক্তিরা আত্মসাৎ করেছে এবং প্রায় ৩০ ভাগ পাচার হয়েছে ওপারে)।

জনগণের জানামতেই মুজিববাদী কর্তা ব্যক্তিরা বিদেশী ব্যাঙ্কে জমিয়েছে ৪০০ কোটি টাকার ওপর।

বধূ উৎসব ইত্যাদি বড়ো বড়ো উৎসব, যখন তখন সপরিবারে বিদেশে ভ্রমণ ইত্যাদি বাবদ খরচ হয়েছে আরও ৪০০ কোটি টাকার মতো।

বাকী ৮০০ কোটি টাকারও উপযুক্ত হিসেব নেই।

ফলে বিদেশীরা শেখ মুজিব সরকারকে আর ঋণ দিতে রাজী হচ্ছে না।

আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, এম. পি. নেতা, উপনেতা, আশ্রিত আমলা, ধনিক ও উঠতি ধনিকরা মিলে হলো দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮ ভাগ মাত্র, অথচ তারা ভোগ করে দেশের মোট সম্পদের শতকরা ৮২ ভাগ।

শ্রমিক কৃষকসহ বাকী গরিব শোষিত মানুষ হলো শতকরা ৯২ জন, আর তাদের জন্য বরাদ্দ দেশের মোট সম্পদের শতকরা মাত্র ১৮ ভাগ।

এটাই মুজিববাদী সমাজতন্ত্র।

দেশের মোট জনসংখ্যা সরকারি হিসাব মতোই সাড়ে সাত কোটি, আসলে তা অনেক বেশি।

বছরে জনসংখ্যা বাড়ে শতকরা ৩ জন (অর্থাৎ প্রায় ২৫ লক্ষ)।

অথচ বেকার শতকরা ৩৩ জন (শুধু বেকার মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাই ১লক্ষের ওপর)।

কৃষি শ্রমিকসহ অর্ধ বেকার আরও অন্তত শতকরা ৪০ জন।

দেশের মোট কৃষকের শতকরা ৪০ জনই সম্পূর্ণ ভূমিহীন; ৫৫ জন সামান্য বা নামেমাত্র ভূমির মালিক।

উদ্বৃত্ত মানুষকে কাজে লাগানোর কোন পরিকল্পনা এই সরকারের নেই।

গত ২৫ মাসে খুন ও গুম খুন হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার।

রক্ষীবাহিনী ও পুলিশের হামলা হয়েছে প্রায় ২৪ হাজার পরিবারে।

জেলে রাজবন্দী আছে ১৮ হাজারের ওপর।

হুলিয়া আছে প্রায় ২৫ হাজার নেতা ও কর্মীর নামে।

বাড়ি পুড়েছে প্রায় আড়াই হাজার।

নারী ধর্ষণ অসংখ্য।

প্রগতিশীল নেতা ও কর্মীদের গুমখুন করার জন্য এক ঢাকা শহরেই নামানো হয়েছে প্রায় দেড়শো স্কোয়াড।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ খুনের আড্ডা।

১৯৭৩ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যতো ভোট পেয়েছে তার শতকরা ৫২ ভাগ জাল, আর প্রায় ২০ ভাগ মানুষের দারিদ্রের সুযোগে লোভ লালসার মাধ্যমে ঠকিয়ে নেওয়া।

উপনির্বাচন এবং স্কুল কলেজের নির্বাচনও বস্তুত ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও বুলেট ব্যবহারের নির্বাচন।

সভা, জমায়েত, মিছিল, ধর্মঘট ইত্যাদি জনগণের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব ফরমান জারী করে সেগুলোও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন; যাতে জনগণ কুকুরের মতো মরতে থাকলেও আর প্রতিবাদ করতে না পারে।

যত্রতত্র জারী করা হয়েছে ১৪৪ ধারা; হয়রানি চলছে নিরীহ মানুষদের।

এটাই মুজিববাদী গণতন্ত্রের স্বরূপ।

পাকিস্তানি হানাদারেরা ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে, নারী ধর্ষণ করেছে, হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট করেছে।

৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে ধরা পড়েছিল ৯৩ হাজার পাক সৈন্য। শেখ মুজিবরা হুংকার ছাড়লো "বাঙলার মাটিতেই এদের বিচার হবে।"

হঠাৎ যুদ্ধ অপরাধীর সংখ্যা ৯৩ হাজার থেকে নামলো দেড় হাজারে; অবশেষে ১৯৫ জনে।

এদের বিচারের জন্য ঘটা করে আইন পাশ করানো হলো, ট্রাইবুন্যাল গঠন হলো এমনকি এই ভড়ং বাবদ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ও করা হলো। অথচ মেরুদণ্ডহীন সরকার এই ১৯৫ জনকেও আজ ছেড়ে দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ৩০ লক্ষ শহীদের পরিবারের কাছে জবাব কি? কি জবাব ধর্ষিতা রমণীকূলের কাছে?

কি জবাব পঙ্গু ও বেকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে?

কে দিয়েছে এই ক্ষমা করার অধিকার?

এসব প্রশ্নের জবাব নেই।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ পর্যুদস্ত।

আইন পাশ হয় বিদেশী নির্দেশে।

সীমান্তের ওপর আওয়ামী লীগ সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

ফলে শত শত কোটি টাকার পাট, চামড়া, চাউল, মাছ, এমন কি আমদানীকৃত দ্রব্যও পাচার হয়ে যায় ওপারে।

বিদেশীদের স্বার্থেই এ যাবৎ পাট পোড়ানো হয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার।

বিদেশী স্বার্থেই পাটচাষীদের ন্যায্যমূল্য দেওয়া হচ্ছে না এবং এই কৌশলে পাট চাষ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

দিনের পর দিন বাংলাদেশ ছোবড়া হয়ে যাচ্ছে।

আমরা দেখেছি এই ১৯৭৩-৭৪ সালেই কিভাবে আফ্রিকার ইথিওপিয়া, আপার ভোল্টা ইত্যাদি দেশের গ্রামকে গ্রাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সরকারি অথর্বতা ও দারিদ্রের কবলে পড়ে এসব দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করছে। বাংলাদেশেও সেই অবস্থা অত্যাসন্ন। শেখ মুজিবের "অলৌকিক ক্ষমতা"-র ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ মানুষ শুধু অনাহারেই মৃত্যুবরণ করবে। মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত বলে আর কিছুই থাকবে না। গরীব মানুষদের বাস্তুভিটাও উঠতি ধনিকদের কাছে পেটের দায়ে বিক্রি হয়ে যাবে।

এই অবস্থায় "আরও কিছুদিন দেখি", "আমাদের ভাগ্যেই বোধ হয় নাই', "বিরোধী দলে নেতা কোথায়?" "শেখ মুজিব যখন পারে নাই, কেউই পারবে না"–ইত্যাদি কথা বলার অর্থ নিজের অকালমৃত্যু ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধ্বংস। বীর্যহীন কাপুরুষেরাই শুধু এ ধরনের কথা বলতে পারে। আর যাদের বাস্তব অবস্থা বোঝার ক্ষমতা আছে, চেতনা ও মনুষ্যত্ব আছে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে

(ক) ভাগ্যের ওপর দোষ না দিয়ে অতীতের ভুল সংশোধন করা

(খ) সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের ওপর নির্ভর না-করে নিজেদের বিপ্লবী শক্তির ওপর নির্ভর করা

(গ) দুর্বার সংগ্রামের পথ গ্রহণ করা এবং

(ঘ) সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেরাই রাষ্ট্র ও সমাজের সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।

বাংলাদেশের মানুষের সামনে আজ দু'টি মাত্র বিকল্প : হয় মানুষের মতো বাঁচার জন্য মাথা তুলে দাঁড়ানো; নতুবা ইঁদুরের মতো করুণ অকাল মৃত্যু। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের বীর জনতা মানুষের মতো বাঁচার পথই গ্রহণ করবে।

বিপ্লব অত্যাসন্ন। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক ॥

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জাসদ

রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে অরুণা সেনের বিবৃতি*

গত ১৭ই আশ্বিন রক্ষীবাহিনীর লোকেরা আমাদের গ্রামের উপর হামলা করে। ঐ দিন ছিল হিন্দুদের দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিন। খুব ভোরেই আমাকে গ্রেফতার করে। গ্রামের অনেক যুবককে ধরে মারপিট করে। লক্ষ্মণ নামে একটি কলেজের ছাত্র এবং আমাকে তারা নড়িয়া রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার স্বামী শান্তি সেন এবং পুত্র চঞ্চল সেন কোথায়? তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, তাদের ধরিয়ে দিন। আরো জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্ধ্যার দিকে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। লক্ষ্মণকে সেদিন রেখে পরদিন ছেড়ে দেয়। সে যখন বাড়ি ফিরে, দেখি মারধোরের ফলে সে গুরুতর অসুস্থ। চার পাঁচ দিন পর আবার তারা রাত্রিতে গ্রামের উপর হামলা করে। অনেক বাড়ি তল্লাশী করে। অনেককে মারধর করে। কৃষ্ণ ও ফজলু নামে দুইটি যুবককে মারতে মারতে নিয়ে যায়। আজও তারা বাড়ি ফিরে আসেনি। তাদের আত্মীয়রা ক্যাম্পে গেলে বলে দিয়েছে তারা সেখানে নেই। তাদের মেরে ফেলেছে বলেই মনে হয়। এরপর থেকে রক্ষীবাহিনী মাঝে মাঝেই গ্রামে এসে যুবকদের খোঁজ করতো। কিন্তু তেমন কোন ব্যাপক হামলা হয়নি।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারি রাত্রি থাকতে এসে রক্ষীবাহিনীর বিরাট একটি দল সম্পূর্ণ গ্রামটিকে ঘিরে ফেললো। ভোরে আমাকে ধরে নদীর ধারে নিয়ে গেল। সেখানে দেখলাম গ্রামের উপস্থিত প্রায় অধিকাংশ সক্ষমদেহী পুরুষ এমন কি বালকদের পর্যন্ত এনে হাজির করেছে। আওয়ামী লীগের থানা সম্পাদক হোসেন খাঁ তদারক করছে। আমার সামনেই রক্ষীবাহিনী উপস্থিত সকলকে বেদম মারপিট করে। শুনলাম এদের সকলকে ধরতে যেয়ে বাড়ির মেয়েদেরও প্রচণ্ড মারপিট করেছে এবং অশ্লীল আচরণ করছে। তাদের একদফা মারপিট করে রক্ষীরা আমাকে বললো পানিতে নেমে দাঁড়াতে। সেখানে নাকি আমাকে গুলি করা হবে। আমি নিজেই পানির দিকে নেমে গেলাম। কিন্তু নদীর পানি দূরে সরে যাওয়ায়, হাঁটু সমান কাদাতেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। ওরা তাক করে রাইফেল ধরল গুলি করবে বলে। কিন্তু পরস্পর কি যেন বলাবলি করে রাইফেল নামিয়ে নিল। কাদার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। কমান্ডার গ্রেফতার করা লোকদের হিন্দু মুসলিম দুই ভাগ করে দুই কাতারে দাঁড় করালো। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বললো, "মালাউনরা আমাদের দুষমন। তাদের ক্ষমা করা হবে না। তোমরা মুসলমানরা মালাউনদের সাথে থেকো না। তোমাদের এবারকার মতো মাফ করে দেয়া হ'ল।" এই বলে কলিমদ্দি ও মোস্তফা নামে দু'জন মুসলমান যুবককে রেখে আর সবাইকে এক এক বেতের বাড়ি দিয়ে বললো, "ছুটে পালাও"। তারা ছুটে পালিয়ে গেল। আমার

---

* সংস্কৃতি (মাসিক), ১মবর্ষ ২য় সংখ্যা, মে-জুন ১৯৭৪ পৃঃ ৭৯-৮৭

পাকবাহিনীর কথা মনে হল। তারাও বিক্ষুব্ধ জনতাকে বিভক্ত করতে এমনি সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছিল। পার্থক্য তারা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিত আর এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা ভন্ডামির আশ্রয় নিচ্ছে।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওরা কলিমদ্দি ও মোস্তফা সহ ২০ জন হিন্দু যুবককে নিয়ে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হল। ৩ জন ছাড়া এরা সবাই জেলে। মাছ মেরে কোন রকমে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। আর তাদের মা বাপ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা আকুল হয়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। সে এক মর্মবিদারী করুণ দৃশ্য। সন্ধ্যার সময় কলিমদ্দি, মোস্তফার গোবিন্দ নাগ ও হরিপদ ঘোষ ছাড়া বাকী সবাই গ্রামে ফিরে এল। আমি গেলাম তাদের দেখতে। দেখলাম সবাই চলতে অক্ষম। সর্বাঙ্গ তাদের ফুলে গিয়েছে। বেত ও চাবুকের দাগ শরীরে কেটে কেটে বসে গেছে। চোখ মুখ ফোলা। হাত-পায়ের গিরাতে রক্ত জমে আছে। তাদের কাছে শুনলাম সারাদিন তাদের দফায় দফায় চাবুক মেরেছে। গলা ও পায়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে পানিতে বার বার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চুবিয়েছে। পিঠের নিচে ও বুকের উপর বাদ দিয়ে দু'দিক থেকে দু'জন লোক তার উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। মই দিয়ে ডলেছে। এদের কাউকে কাউকে ওদের আত্মীয়রা যেয়ে বয়ে এনেছে।

এদের অবস্থা দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম যারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও আজ একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, অনাহার, দুঃখ, দারিদ্র্যের জ্বালায় আজ অর্ধমৃত, তাদের "মরার উপর খাঁড়ার ঘা"র কবে অবসান হবে! যে শাসকরা মানুষের সামান্য প্রয়োজন, ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, শোষণ, নির্যাতন যারা বন্ধ করতে পারছে না, তারা কোন অধিকারে আজ নিঃস্ব মানুষের উপর চালাচ্ছে এই বর্বর নির্যাতন।

অবশেষে চরম নির্যাতন আমার উপরও নেমে এল। ৬ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি ভোর না হতেই রক্ষীবাহিনী আমাকে ঘুম থেকে তুলল। আমাকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এলে দেখলাম সেখানে রীনাও রয়েছে। আমাদের নিয়ে তারা প্রায় দুই মাইল দূরে ভেদরগঞ্জ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হ'ল। রাস্তায় রীনার প্রতি তারা নানা অশ্লীল উক্তি করছিল। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখলাম সেখানে কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ নাগ ও হরিপদ ঘোষও রয়েছে। চেহারা দেখেই বোঝা গেল তাদের উপর গুরুতর দৈহিক নির্যাতন হয়েছে। বিশেষ করে কলিমদ্দি ও মোস্তফাকেই বেশি অসুস্থ দেখলাম। কলিমদ্দি, মোস্তফা দুই ভাই; এদের সংসারে আর কোন সক্ষম ব্যক্তি নেই। অপরের জমি চাষ করে এরা কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের রয়েছে স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

আমরা ক্যাম্পে আসতেই অনেক রক্ষীবাহিনী এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। শুরু হল রীনার উপর অপমান বৃষ্টি। কেউ অশ্লীল মন্তব্য করে, কেউ চুল ধরে টানে, কেউ চড় মারে, কেউ খোঁচা দেয়, এমনি সব বর্বরতা। কিছুক্ষণ পর আমাদের রৌদ্রের মধ্যে বসিয়ে রেখে তারা চলে গেল। সন্ধ্যায় আমাদের একটি কামরায় ঢুকালো। অনেক রাত্রিতে রীনাকে তারা উপরের দোতলায় নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম রীনার হৃদয়বিদারী চীৎকার। প্রায় আধ ঘন্টা পর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে থেমে গেল। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার

ভেদ করে রীনাকে যখন তারা এনে কামরার মধ্যে ফেলল, রাত্রি তখন কত জানি না। রীনার অর্ধচেতন দেহ বেতের ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত। রক্ত ঝরছে। রীনার জ্ঞান এলে পানি চাইল। আমি তাকে পানি খাওয়ালাম। রীনা আস্তে আস্তে কথা বলতে পারলো। রাত্রি তখন ভোর হয়ে এসেছে। রীনার মুখে শুনলাম উপরে ভেদরগঞ্জ ও ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সম্পাদকরা এবং এই দুই স্থানের ক্যাম্পে কমাণ্ডাররা উপস্থিত ছিল। তারা শান্তি সেন ও চঞ্চল কোথায় আছে, তাদের ধরিয়ে দিতে বলে এবং অস্ত্র কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করে। রীনা কিছুই জানে না বলায় তাকে এমন সব অশ্লীল কথা বলে যা কোন সভ্য মানুষের পক্ষে বলা ত দূরের কথা, কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসা ও গালিবর্ষণের পর ভেদ্‌রগঞ্জ ক্যাম্পের কমাণ্ডার বেত নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোপাথাড়ী এমন পিটাতে থাকে যে পর পর তিনখানা বেত ভেঙ্গে যায়। আবার জিজ্ঞাসা করে শান্তি সেন ও চঞ্চল কোথায়? অস্ত্র কোথায়? রীনার একই উত্তর। ক্ষিপ্ত হয়ে রীনাকে তারা সিলিং-এর সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় এবং দুই কমাণ্ডার দুইদিক থেকে একসঙ্গে চাবুক চালাতে থাকে। মারার সময় রীনা বলেছিল "আমাকে এভাবে না মেরে একেবারে গুলি করে মেলে ফেলুন।" জবাবে তারা বলে, "সরকারের একটা গুলির দাম আছে তোকে সাতদিন ধরে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলব। এখন পর্যন্ত মারার হয়েছে কি? অল্প পরেই রীনা অচেতন হয়ে যায়। কিন্তু তারা ঐ দেহের উপরই চাবুক চালাতে থাকে। জ্ঞান এলে রীনা দেখে যে সে মেঝের উপর পড়ে আছে। পানি চাইলে তাকে পানিও দেয়া হয়নি।

৮ই ফেব্রুয়ারি রাতে প্রথম আমাকে এবং পরে রীনাকে দোতলায় নেয়া হয়। সেখানে দেখলাম ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী ফজলু মিয়া ও ভেদরগঞ্জের সেক্রেটারী হোসেন খাঁ চেয়ারে বসে আছে। আমাকে বলল, তোমার স্বামী ও ছেলেকে ধরিয়ে দাও। অস্ত্র কোথায় আছে বলে দাও। তারা ডাকাত, অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি করে। "আমি বলি, তারা ডাকাত নয়, তারা সৎ দেশপ্রেমিক। আমার স্বামী রাজনীতি করেন একথা কে না জানে। তিনি এদেশের সাধারণ লোকের অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়।" রীনাকেও তারা একই প্রশ্ন করে। রীনা জানে না বলায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ডামুড্যা ক্যাম্পের কমাণ্ডার করম আলী এবং ভেদ্‌রগঞ্জের ক্যাম্প কমাণ্ডার ফজলুর রহমান এরা সবাই আমাদের অশ্লীল গালাগালি দিতে থাকে। এবং আমাকে ও রীনাকে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে রীনার বস্ত্র খুলে নেয়। তারপর কমাণ্ডার দুজন দুদিক থেকে চাবুক মারতে থাকে। আমরা অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান হলে দেখি আমরা উভয়েই মেঝেতে পড়ে আছি। রীনার সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমার গায়ে কাপড় থাকায় অপেক্ষাকৃত কম আহত হয়েছি। তবু এই রুগ্না বৃদ্ধ দেহে এই আঘাতই মর্মান্তিক। সর্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জরিত। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। নড়বার ক্ষমতা নেই। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে নারকীয় হাসি হাসছে। ওদের হুকুমে দু'জন সিপাই আমাকে টেনে তুলল। আমি অতি কষ্টে দাঁড়াতে পারলাম। রীনা পারল না। দু'জন রক্ষী তার দুই বগলের নিচে হাত দিয়ে তাকে টেনে তুলে তার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিল ও টানতে টানতে নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। কমাণ্ডার পিছন থেকে নির্দেশ দেয়, "ওটাকে ভালো করে হাঁটা, নয়ত মরে যাবে।" সকালে কমাণ্ডার কয়েকজন রক্ষী সিপাইসহ রীনাকে

নিয়ে গ্রামের দিকে রওয়ানা হল। বললো, "বাঁচবি ত না, চল তোর মাকে দেখিয়ে আনি।" রীনার সর্বাঙ্গ ফুলে কালো হয়ে গিয়েছে। একটি পা ফেলবার ক্ষমতা নেই। সে অবস্থায় তাকে দু'হাতের দু'বাহুতে ধরে দু'জন রক্ষী প্রায় টানতে টানতে দু'মাইল দূরে বাড়ির দিকে নিয়ে চললো। ঠাট্টা করে বলছিল, "হাঁটলে গা ব্যাথা কমে যাবে।" বাড়িতে নিয়ে রীনার মা তাকে দেখেই ফিট হয়ে যান। কমাণ্ডার রীনাকে তার মার মাথায় পানি দিতে বলে। রীনার মার জ্ঞান এলে, রীনার চেহারা এমন কেন জিজ্ঞেস করায় কমাণ্ডার বলে, "পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে।" রীনাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য রীনার মা কমাণ্ডারের কাছে অনুনয় করলে কমাণ্ডার বলে, "খাসী খাওয়ালে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।" রীনাকে তারা দু'মাইল রাস্তা পুনরায় টানতে টানতে নিয়ে এল। ঐ দিন ছিল ৯ই ফেব্রুয়ারি। হনুফাকেও তারা ধরে নিয়ে এল ঐদিন। করিম নামে আরেকটি কৃষক যুবককেও তারা রামভদ্রপুর থেকে এনেছে দেখলাম। কিন্তু তাকে এতো মেরেছে যে অবস্থা তার সঙ্গীন। নড়িয়া থানার পণ্ডিতসার থেকেও একজন স্কুল শিক্ষক ও দুজন যুবককে এনেছে দেখলাম। বিপ্লব নামে একটি ছেলে নাকি মারের চোটে পথেই মারা যায়। রক্ষীবাহিনীর সিপাইরা বলাবলি করছিল। একজন জল্লাদ গর্ব করে বলছিল, দেখ এখনও হাতে রক্ত লেগে আছে। শুনেছি মতি নামে আর একটি যুবককেও তারা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। আর আমাদের ধরে আনার দু'একদিন আগে কৃষি ব্যাংকের পিয়ন আলতাফকে পিটাবার পর হাত পা বেঁধে দোতলার ছাদ থেকে ফেলে মেরে ফেলেছে।

নয় তারিখ দুপুরের অল্প পরে তারা হনুফা, রীনা ও আমাকে নিয়ে গেলে পুকুর ধারে। সেখানে আমাদের একদফা বেত দিয়ে পিটিয়ে চুবানোর জন্য পানিতে নামাল। প্রথম আমাদেরকে ওরাই সাঁতরাতে বাধ্য করল। আমরা পথশ্রান্ত হয়ে কিনারায় উঠতে চেষ্টা করি, ওরা আমাদের বাঁশ দিয়ে ঠেলে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়। পরিশ্রান্ত হয়ে যখন আমরা আর সাঁতরাতে পারছিলাম না, তখন পানি থেকে তুলে আবার বেত মারতে থাকে। শেষের দিকে আমরা যখন আর সাঁতরাতে পারছিলাম না, তখন আমাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে আমাদের দেহের উপর দু'পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। এমন তিনদফা আমাদের চুবানো ও পেটানো হয়। কিছুক্ষণ আগেই করিম মারের চোটে মরে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে আরো একটি অল্প বয়সের যুবককেও চুবিয়ে অচেতন করে ফেলেছিল। তাকে ঘাটলার উপর ফেলে রাখে। আমার আঁচল দিয়ে গা মুছানোর সময় হঠাৎ ছেলেটি চোখ মেলে তাকায়। "মা আপনি কে?" বলে করুণ কণ্ঠে ডেকে ওঠে। আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না। রক্ষীরা তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরে শুনেছি, ছেলেটিকে নাকি মেরে ফেলেছে।

সন্ধ্যার অল্প আগে আমাদের পানি থেকে তুলে ভিজা কাপড়েই থাকতে বাধ্য করল। দারুণ শীতে আমরা কাঁপছি। প্রচণ্ড জ্বর এসে গেছে সকলের। এমনি করেই রাতভর ছালার চটের উপর পড়ে থাকলাম। পরদিন রাতে রীনাকে আবার নিয়ে গেলো দোতলায়। সেখানে আবার তাকে ঝুলিয়ে বেত মারল। ১১ তারিখ রাতেও আবার রীনার উপর চলল এই অত্যাচার। রীনা জ্ঞান হারাল। রক্ষীসিপাইদের বলাবলি করতে শুনলাম, রীনা মরে গিয়েছে। রীনার কাছে শুনলাম, তার যখন জ্ঞান হল তখন সে দেখে, তার পাশে ডাক্তার

বসা। রীনা জিজ্ঞেস করে, আপনি কে, আমি কোথায়? ডাক্তার জবাব দেয়, আমি ডাক্তার, তুমি কথা বলো না। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার চলে গেলে রীনাকে তারা ধরাধরি করে নিচে আমাদের কাছে নিয়ে এলো।

একজন সিপাই রীনা ও হনুফাকে বলে, তোরা ত মরেই যাবি, তার আগে আমরা প্রতি রাতে পাঁচজন করে তোদের ভোগ করব। তারা অবশ্য 'ভোগ' শব্দটি বলে নাই। বলেছিল অতি অশ্লীল কথা। একদিন রাতে দুটি রক্ষী সিপাই ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দেয়। রীনা ও হনুফার মুখ চেপে ধরে। ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তারা ছুটে গিয়ে চীৎকার করে। চীৎকার শুনে, ক্যাম্পের অন্য রক্ষীরা ছুটে আসে। কমাণ্ডারও আসে। ওরা তাকে সব বললে সে বলে, খবরদার একথা প্রকাশ করো না, তাহলে মেরে ফেলবো।

রক্ষী সিপাইদের কারো কারো মধ্যে মাঝে মাঝে মানবতাবোধের লক্ষণ পাচ্ছিলাম। তারই একটি সিপাইকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছো?" প্রশ্ন শুনে সে যেন চমকে উঠল। বলল, "বাংলাদেশে লেখাপড়া শিখে কি করব? আমরা জল্লাদ, জল্লাদের আবার লেখাপড়ার দরকার কি?"–এই বলে সে দে ছুট। মনে হল যেন চাবুক খেয়ে একটি ছাগল ছুটে পালাল।

রক্ষী সিপাইদের কানাঘুষায় শুনছিলাম, আমাকে ও হনুফাকে অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দেবে আর রীনা ও অন্যান্য পুরুষবন্দীদের মেরে ফেলা হবে।

১২ই ফেব্রুয়ারি আমাকে ও হনুফাকে নিয়ে রক্ষীরা রওয়ানা দিল। আমরা রীনাকে ফেলে যেতে আপত্তি জানালাম। রীনাও আমাদের সাথে যেতে খুব কান্নাকাটি করছিল, কমাণ্ডারের কাছে অনুনয় বিনয় করছিল। কমাণ্ডার তার সহকর্মীদের সাথে কি যেন আলাপ করে সেদিন আমাদের পাঠানো স্থগিত রাখলো।

১২ তারিখেও ওরা রাত্রিতে আবার রীনাকে ঝুলিয়ে নিয়ে হান্টার দিয়ে পেটায়। ১৩ তারিখে তারা রীনাকে মারে না, কিন্তু নির্যাতনের নতুন কৌশল নেয়। দম বন্ধ করে রাখে, জোর করে ধরে নাকমুখ চেপে রাখে, এমনি করে জ্ঞান হারালে ওরা ছেড়ে দেয়।

১৯ শে ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ওরা আমাদের তিনজনকে নিয়েই রওয়ানা দিল প্রায় চার মাইল দূর ডামুড্যা রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পের দিকে। কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ ও হরিপদ থেকে গেল। রক্ষীরা বলাবলি করছিল, তাদের মেরে ফেলা হবে। আমরা কিছু দূরে এলে ক্যাম্পের দিক থেকে চারবার গুলির আওয়াজ শুনলাম। ভাবলাম ওদের বুঝি মেরে ফেলল্। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। তার উপর আমাদের শরীরের অবস্থা এমন ছিল যে হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তবু আমরা বাধ্য হচ্ছিলাম হাঁটতে। বোধ হয় আমাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে, বোধ হয় বেঁচে যাবো। এই চিন্তাই আমাদের হাঁটতে শক্তি যোগাচ্ছিল। অনেক রাতে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সেখানে কিছুক্ষণ রেখে স্পীড বোটে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সমস্তক্ষণ আমাদের কম্বল চাপা দিয়ে মুরদার মত ঢেকে রাখা হল। বেদনা-জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত শরীর। তার উপর গরমে কম্বল চাপা থেকে শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম। যেন জ্যান্ত কবর। আমাদেরকে মাদারীপুর রক্ষী ক্যাম্পে আনা হল। সেখানে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করল। সমস্ত দিন আমাদের ওখানেই রাখল। খেতে দিল না। শেষ রাতে জীপে করে আবার কম্বল চাপা দিয়ে ঢাকার

দিকে রওয়ানা হল। আবার সেই সুদীর্ঘ পথ– জ্যান্ত কবরের যন্ত্রণা। ঢাকায় আমাদের প্রথমে রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে গেল। সে আমাদের খুব ধমক লাগালো। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে গেল তেজগাঁ থানায়, তারপর লালবাগ থানায়। রাতে সেখানে থাকলাম। পরদিন পাঠাল সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে পাঁচদিন রাখার পর আমাদের নিয়ে এল তেজগাঁ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে। সেখানে পাঁচদিন রেখে জিজ্ঞাসাবাদের পর আবার সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়।

জেলে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কয়েদীদের মতো রাখা হত। একই আহার্য্য দেয়া হত। দিনরাত সেলে বন্দী। সেখানে রাজনৈতিক অভিযোগে আরও বন্দিনী আছেন। তার মধ্যে ১৭ই মার্চ গ্রেফতার জাসদ নেত্রী মমতাজ বেগম আছেন। অস্ত্র আইনে সাজাপ্রাপ্ত পারভীন। আরো একজন নাম রুমা—আছেন। সবাইকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করে রাখা হয়েছে এবং সাধারণ কয়েদীদের মতো খাটুনী করানো হচ্ছে। এর উপর জমাদারনীরা (মেয়ে সিপাই জমাদার) তাদের নিজেদের জামা কাপড় সেলাই, কাঁথা সেলাই, কাপড় চোপড় ধোয়ানো সব কিছুই মেয়ে কয়েদীদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। রাজনৈতিক বন্দিনীদেরও রেহাই দিচ্ছে না।

সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী উপলক্ষে জাতীয় সংসদে শেখ মুজিবের ভাষণ*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (প্রধানমন্ত্রী; সংসদ-নেতা) : জনাব স্পীকার সাহেব, আজকে আমাদের সংবিধানের কিছু অংশ সংশোধন করতে হল।

আপনার মনে আছে যে, সংবিধান যখন পাস করা হয়, তখন আমি বলেছিলাম যে, এই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয়, এই সংবিধানের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হবে।

জনাব স্পীকার সাহেব, আপনি জানেন যে, যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি পরাধীন ছিল। দু'শো বৎসরের ইংরাজ-শাসন, পঁচিশ বৎসরের পাকিস্তানি শাসন এবং শোষণ বাংলাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করেছিলাম বাংলার মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য। এ দেশের হাজার হাজার নেতাকর্মী ও জনসাধারণ শুধু কারাবরণ করেন নাই– তাঁদের অনেককে জীবন দান করতে হয়েছিল।

শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। আমরা বহুদিন চেষ্টা করেছিলাম এবং তাদের আঘাত বারবার আমাদের উপর এসেছিল। তারপর চরম আঘাত তারা হানে, যে আঘাতের বিনিময়ে আমাদেরও চরম আঘাত হানতে হয়। দুনিয়ার দিকে যদি আপনি দেখেন, তাহলে তাই দেখতে পারেন।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমাদের যে আওয়ামী লীগ পার্টি, তারা এত ত্যাগ স্বীকার করে সংগ্রাম করেছে, কিন্তু কোনদিন আদর্শ-বিচ্যুত হয় নাই। ক্ষমতার লোভে রাজনীতি করলে আমি বহুপূর্বে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম এবং আমার দলের নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী বা অন্যান্য পদে আসতে পারতেন। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম একটা শোষণমুক্ত সমাজ। আমরা চেয়েছিলাম, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। আমরা চেয়েছিলাম এই দেশের দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে।

জনাব স্পীকার সাহেব, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সেই সময় আমি যখন কারাগারে আটক ছিলাম, তখন এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক দেশ ত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরাজিত করি আমরা দুশমন-বাহিনীকে। নিশ্চয় আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ভারতের জনসাধারণ, তার সামরিক বাহিনী এবং তার সরকারের প্রতি, যাঁরা আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সেদিন এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করে চলে যায়। কোটি কোটি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিতে বাধ্য হয়। তবু আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে, দেশে যাঁরা রাজনীতি করতে চান, দেশকে ভালবাসতে চান, নিশ্চয় তাঁরা কাজ করবেন এবং তাঁদের একটা কর্তব্য রয়েছে।

---

* সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-২, পৃঃ ৬৭-৮১, তারিখ ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫

কোন দেশে কোন যুগে বিপ্লবের পরে বা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এভাবে মানুষকে সম্পূর্ণ অধিকার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সকল দলকে দেয়নি। আমরা দিয়েছিলাম। তার প্রমাণ আমাদের সংবিধান।

আপনি জানেন, স্পীকার সাহেব, কী দেখেছি আমরা। তিন বৎসর হল স্বাধীনতা পেয়েছি। আপনি জানেন, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। যারা দেশ ত্যাগ করে গিয়েছিল, তারা ফিরে এল। দেশে তাদেরকে rehabilitate করতে হল। রাস্তাঘাট সব ধ্বংসপ্রাপ্ত।

আমরা সরকার নিলাম–সাড়ে সাত কোটি মানুষের সরকার, যেখানে কাগজের নোট ছাড়া কোন কিছু ছিল না। তাকে back করার মতো আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না অথবা gold reserve'ও ছিল না। পাকিস্তানিরা সর্বস্ব এখান থেকে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কত কষ্টকর, সে কথা আপনি বুঝতে পারেন, অন্যরা বুঝতে পারে না।

এ সমস্ত বিপ্লবের পরে দেখা গেছে, অনেক দেশে লক্ষ লক্ষ লোক না-খেয়ে মারা গেছে, আশ্রয়হীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি বন্ধু-রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে তাদেরকে rehabilitate করার জন্য। কতদূর পেরেছি, না পেরেছি, জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমরা চেষ্টার ক্রটি করিনি।

বড় দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আজকে আপনি জানেন, এই সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। এর আগে Constituent Assembly-র যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকেও কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে। গাজী ফজলুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। নুরুল হককে হত্যা করা হয়েছে। মোতাহার মাস্টারকে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি, আমরা যা কোনদিন দেশে শুনি নাই– ঈদের নামাযের জামাতে এই সংসদের একজন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

কাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে, যারা স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা। কাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? যারা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল। কাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? পঁচিশ বৎসর এই বাংলাদেশে পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যারা কারা-নির্যাতন, অত্যাচার; অবিচার সহ্য করেছে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

কোন রাজনৈতিক দল– যাদেরকে আমরা অধিকার দিয়েছিলাম– একটা কোনদিন condemn তারা করেছে এদের বিরুদ্ধে? না, তারা condemn করেনি।

তারা মুখে বলেছে, অধিকার চাই। তারা মিটিং করেছে, সভা করেছে। পার্টি করতে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কী করেছে তারা?

আমরা বলেছি, যা আমাদের সংবিধানে আছে যে, ভোটের মাধ্যমে তোমরা সরকারের পরিবর্তন করতে পার। সে ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম বাই-ইলেকশনের মাধ্যমে। বাই-ইলেকশনসমূহ আমরা তিন মাসের মধ্যে দিয়েছি। জনগণ তাদের ভোট না দিলে আমরা কী করব!

তখন তারা বলেছে, এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। মুখে তারা বলেছে, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করি। তারা অস্ত্র যোগাড় করেছে–সেই অস্ত্র যে অস্ত্র দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের লোকদের কাছ থেকে আমরা অস্ত্র নিয়ে নিয়েছি। আর, তারা সেই অস্ত্র দিয়ে ঘরে ঢুকে শৃগাল-কুকুরের মতো মানুষকে হত্যা করেছে।

আমরা দেখেছি, প্রত্যেক দেশে নিয়ম আছে যে, আপনি যদি অধিকার ভোগ করতে চান, তবে অন্যের অধিকার রক্ষা করতে হয়। আপনি জানেন, You have a liberty, you have a responsibility এ কথা ভুললে চলবে না। কোন responsibility নিব না, এটা হয় না। এবং সেখানে যেয়ে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করবেন, আবার জনগণের মধ্যে অন্য কথা বলবেন। অস্ত্র যোগাড় করবেন এবং রাতের অন্ধকারে গিয়ে মানুষকে হত্যা করবেন। সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করবেন–এমনকি আমাদের উৎখাত করে দেওয়া হবে।

আমি যদি বলতাম যে, আপনারা যারা বক্তৃতার মধ্যে বলেন, উৎখাত করতে হবে–আপনারা কবে প্রস্তুত হয়ে উৎখাত করবেন? আর, আমাদের যে শক্তি আছে, সেই শক্তি দিয়ে আমরা দুই মিনিটে উৎখাত করতে পারি আপনাদের। তবু আমরা অধিকার দিয়েছি।

আজ আপনারা জানেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এটা একটা Hot bed of international clique হয়েছে। এখানে অর্থ আসে, এখানে মানুষকে পয়সা দেওয়া হয়, এখানে তারা বিদেশীদের দালাল হয়।

আজকে একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না, যে রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি, সে রক্ত দিয়ে, দরকার হলে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা হবে–স্বাধীনতাকে নস্যাৎ হতে দেওয়া হবে না। এবং তাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা যারা দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর মাথা নত না-করে বাংলার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য এবং দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এ দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারও নাই। অস্ত্র আইয়ুব খান নিয়ে এসেছিল, অস্ত্র এহিয়া খান নিয়ে এসেছিল, অস্ত্র ইস্কাকান্দার মীর্জাও নিয়ে এসেছিল; কিন্তু কোনদিন তাদের কাছে আমরা মাথা নত করি নাই।

আজ সত্যি আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। কারণ, আমরা কী নিয়ে শুরু করেছিলাম? ভুললে চলবে কেন যে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটা দেশ এটা। লোকসংখ্যা কত বেশি এখানে। ৫৪ হাজার square mile এলাকা এর। পঁচিশ বৎসরে সমস্ত সম্পদ পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছে। এখানে একটা কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। এখানে রেল-লাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখানে port ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখানে ব্যাংকে আমাদের gold reserve নাই, foreign exchange নাই। এখানে communication নাই। এখানে প্লেন নাই। এখানে গুদামে খাবার নাই। তাই নিয়ে আমাদের সরকার শুরু করতে হয়েছিল। কষ্ট আমাদের আছে। কষ্ট মানুষের অনেকদিন পর্যন্ত করতে হবে– যে-পর্যন্ত দেশ গঠন করা না-যাবে।

আজ আমরা নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব- তিন বৎসরে না-হলেও আমরা ২,১৫৩ কোটি টাকা বিদেশ থেকে এনেছি সমস্ত মিলে। Food aid, nonproject aid, project aid মিলে দুনিয়ার বন্ধু-রাষ্ট্ররা আমাদের সাহায্য করেছে। তারা দিয়েছে আমাদের ২,১৫৩ কোটি টাকা, এবং এ পর্যন্ত খরচ করেছি এ দেশের মানুষের জন্য ১,৪০০ কোটি টাকা। আর, আমাদের যে আয় প্রায় ৯০০ থেকে ১,০০০ কোটি টাকা, তাও আমরা ব্যয় করেছি। এই টাকা আমরা বাংলার মানুষের জন্য খরচ করেছি, যাতে মানুষের rehabilitation হয়।

আমাদের food কিনতে হয়। আমাদের food deficit কত? আমাদের এখন নানা রকম কাজ। মানুষ দুর্ভিক্ষে না-খেয়ে মারা যায়। আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম, তার পরে বাংলাদেশে হল draught। তারপর হল সারা দুনিয়া জুড়ে inflation। যেখানে একটা জিনিস আমরা কিনতাম এক টাকা দিয়ে সেখানে সে জিনিস কিনতে হয় আমাদের দুই টাকা দিয়ে। যে জিনিস কিনতাম এক শো টাকা দিয়ে, সে জিনিস কিনতে হয় দুই শো টাকা দিয়ে। আমাদের জিনিস যা বিদেশে বিক্রি করলাম, তার ন্যায্যমূল্য আমরা পেলাম না। আমরা যারা অনুন্নত দেশ, এই কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হয়। কারণ, আমাদের শোষণ করেই তারা বড়লোক হয়। তাদের কাছ থেকে যখন আমাদের জিনিস আনতে হয়, তখন অনেক পয়সা দিয়ে আনতে হয়। আর, আমরা যখন বিক্রি করি, তখন তার দাম আমরা পাই না। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশ চলছে।

তার পরেও আমাদের দেশ চালাতে হয়েছে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দুনিয়ায় ঘুরতে হয়েছে। সারা দুনিয়া থেকে খাবার আনতে হয়েছে। গ্রামে গ্রামে পৌঁছাতে হয়েছে।

সারা দুনিয়া জুড়ে inflation হয়ে গেল। শুধু আমরা না– সমস্ত দুনিয়ায় যারা অনুন্নত দেশ, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আসল ভয়াবহ বন্যা। এত বড় বন্যা আমার জীবনে আমি দেখেছি কিনা, সন্দেহ।

না ছিল খাবার। ৫,৭০০ লঙ্গরখানা করা হল এবং relief operation চালানো হল। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে, নিজেদের যা কিছু ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাঁচাতে পারলাম না সকলকে। ২৭,০০০ লোক না-খেয়ে মারা গেল। এখনও মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। গায়ে তাদের কাপড় নাই।

আমি জীবনভর ওদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। ওদের পাশে পাশে রয়েছি। কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছি। আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে ওদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার মানসে।

আমি একদিন তো বলেছি এই হাউসে, স্পীকার সাহেব যে, আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই। যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে, যারা বড় বড় অর্থশালী লোক, যারা বিদেশীদের পয়সা ভোট কেনার জন্য দেয়, তাদের গণতন্ত্র নয়– শোষিতের গণতন্ত্র। এটা আজকের কথা নয়– বহুদিনের কথা আমাদের, এবং সেজন্য আজকে আমাদের শাসনের পরিবর্তন করতে হয়েছে।

জনাব স্পীকার সাহেব, আজকে আমাদের কর্তব্য কতটুকু পালন করেছি– আমরা যারা এখানে লেখাপড়া শিখেছি? আজ দেশের মানুষ দুখী, না খেয়ে কষ্ট পায়, গায়ে কাপড়

নাই, শিক্ষার আলো তারা পায় না, রাত্রে একটু হারিকেন জ্বালাতে পারে না– নানা অসুবিধার মধ্যে তারা চলছে।

স্পীকার সাহেব, আমরা আমাদের কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি– আজ আমরা যারা শিক্ষিত, এম. এ. পাস করেছি, বি, এ. পাস করেছি? স্পীকার সাহেব, আপনি জানেন, এই দুখী বাংলার গ্রামের জনসাধারণ আমাদের এই অর্থ দিয়েছে লেখাপড়া শেখার জন্য। আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পাস করেছেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে পাস করেছি– আজ যারা লেখাপড়া শিখেছে, তাদের লেখাপড়ার খরচের একটা অংশ দেয় কে? আমার বাপ-দাদা নয়। দেয় বাংলার দুখী জনগণ। কী আমি তাদের ফেরত দিয়েছি? তাদের repay করেছি কতটুকু? তাদের প্রতি কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি? এটা আজকে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে।

আজ একজন ডাক্তার হয়। একজনকে ডাক্তারী পাস করাতে বাংলার দুখী মানুষের না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। একটা ইঞ্জিনিয়ার করতে না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ। একজন এগরিকালচার-গ্রাজুয়েট করতে না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। এইভাবে মানুষ তৈরি করতে, বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে অনেক টাকা লাগে।

এ দেশের দুখী মানুষের পেটে খাবার নাই, তাদের অর্থে এদের লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। আজ আমাদের বিবেচনা করতে হবে, কী আমি দিলাম তাদের? কতটুকু তাদের ফেরত দিয়েছ, যার অর্থে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছ, যার অর্থে আমরা আজকে বড় বড় গ্রাজুয়েট হয়েছি, যার অর্থে তুমি আজকে ডাক্তার হয়েছ, যার অর্থে তুমি scientist হয়েছ, যার অর্থে তুমি মানুষ হয়েছ, যার অর্থে তুমি প্রফেসর হয়েছ, যার অর্থে তুমি লেখাপড়া শিখেছ? তোমাদের প্রত্যেকটি শিক্ষার জন্য একটি অংশ বাংলার দুখী জনগণ দিয়েছে। সেটাই সরকারের টাকা এবং শিক্ষা বাবদ সেই টাকা ব্যয় করা হয়।

আজকে আত্মসমালোচনার দিন এসেছে– কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি, কতটুকু আমরা তাদের দিয়েছি। শুধু আমাকে দাও! দুখী জনগণ কী পেল? তোমরা কী ফেরত দিয়েছ, সেটাই আজ প্রশ্ন। আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

আজ দেশে শৃঙ্খলা আনতে হবে। তা না হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। আজকে এদের কর্তব্যবোধ বোঝাতে হবে যে, আমি আমার কী কর্তব্য পালন করেছি।

দুঃখের বিষয়, আজ শুধু আমরা বলি, আমরা কী পেলাম! তোমরা কী পেয়েছ? তোমরা পেয়েছ শিক্ষার আলো– যে শিক্ষা পেয়েছ বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কী দিয়েছ বাংলার মানুষকে– যে দুখী মানুষ না খেয়ে মারা যায়, যে দুখী মানুষের পরনে কাপড় নাই, যে দুখী মানুষ বহু কিছু করতে পারে না? যার রাস্তা নাই ঘাট নাই, যার হাড় পর্যন্ত দেখা যায়, তাদের তোমরা কী দিয়েছ– এই প্রশ্নই আজ প্রথম জেগে উঠে। বহুবার বলেছি।

আজকে corruption-এর কথা বলা হয়। আজকে বাংলার মাটি থেকে corruption উৎখাত করতে হবে। Corruption করি আমরা শিক্ষিত সমাজ–যারা আজকে এদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছি।

আজ যেখানে যাবেন corruption দেখবেন। দেখবেন, যেখানে আমরা রাস্তা করছি, সেখানে corruption। খাদ্য কিনতে যাই, corruption। জিনিস কিনতে যাই, corruption। বিদেশের টাকা উঠাতে corruption। কারা করে? আমরা যারা five percent, যারা শিক্ষিত– আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে corrupt people। আর, আমরা করি বক্তৃতা। আমরা লিখি খবরের কাগজে। আমরা এখানে এই করি।

আজকে আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এভাবে চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে, কবরে যেতে হবে– কী সে নিয়ে যাবে? তবু মানুষ ভুলে যায় যে, কেমন করে এই কাজ চলতে পারে!

বহু দুঃখে কাজ করতে হয়েছে বহু দিন পর্যন্ত। বিবেকের দংশনে জ্বলে মরে গেছি বহু দিন পর্যন্ত। আপোস করি নাই কোনদিন অন্যায়ের কাছে। মাথা নত করি নাই কোনদিন অন্যায়ের কাছে, জীবনভর সংগ্রাম করেছি। আর এই দুখী মানুষ রক্ত দিয়ে আজকে স্বাধীনতা এনেছে। তাদের রক্তে বিদেশ থেকে খাবার আনব–সেই খাবার চুরি করে খাবে। অর্থ আনব– সেই অর্থ চুরি করে খাবে। টাকা আনব– তা বিদেশে চালান দেবে। বাংলার মাটি থেকে তাদেরকে উৎখাত করতে হবে, জনাব স্পীকার সাহেব। এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি।

আজকে আমাদের কী অবস্থা? আজ আমাদের population কমাতে হবে– উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। আজ আমাদের শ্রমিক-আন্দোলন করতে হবে। কী করব? কারখানায় কাজ হবে না। কারখানায় কারখানায় production বন্ধ। ভিক্ষুকের জাত। ইজ্জত আছে? দুনিয়ায় জীবনভর ভিক্ষা পাওয়া যায়?

স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সেইজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। কাজ করব না, ফাঁকি দিব। ফ্রী স্টাইল চালাব। এর মানে গণতন্ত্র নয়। অফিসে দশটার সময় যাওয়ার কথা হলে বারটার আগে যাব না। পাঁচটায় ছুটি হবে– তিনটায় ফিরে আসব। কারখানায় কাজ করব না, অথচ পয়সা দিতে হবে।

আমার শ্রমিকরা খারাপ নয়। আমার শ্রমিকরা কাজ করতে চায়। আমার শ্রমিকরা আজকে কাজ করছে। Food production-এ তারা এগিয়ে গিয়েছে। আমরা বাধার সৃষ্টি করি। আমরা ষড়যন্ত্র করি। আমরা ধোঁকা দিই। আমরা লুট করে খাই। আমরা জমি দখল করে নিয়ে যাই। আজকে আমরা বড় বড় যারা আছি, তারা এই সমস্ত করি। তারাই করে, যারা এই দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, এই দেশের তথাকথিত লেখাপড়া জানা মানুষ, যাদের পেটের মধ্যে দু অক্ষর বুদ্ধি আমার বাংলার দুখী মানুষের পয়সায় এসেছে। তারা এ কথা ভুলে যায়।

আজকে কথা হল কী দিলাম। আমি কী পেলাম আর আমি কী দিলাম। আজকে সেটাই প্রশ্ন।

আমি বারবার বলেছি, আজকে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মসংযমের প্রয়োজন, আজকে আমাদের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। তা না হলে দেশকে ভালবাসা যাবে না, দেশের জন্য কাজ করা যাবে না এবং দেশের উন্নতি করা যাবে না। কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে আমার production বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না।

কি করে আপনি করবেন? যদি ধরুন, বছরে ২০ লক্ষ টন খাবার deficit হয়, আমাকে যদি প্রত্যেক বছর বিদেশ থেকে এই খাবার আনতে হয়, তাহলে কত হল? ২৭০ লক্ষ মণ? এই তিন বছর পর্যন্ত গড়ে এর চেয়ে অনেক বেশি খাদ্য আনতে হয়েছে। প্রথম আনতে হয়েছে ৩০ লক্ষ টন। অর্থাৎ ৫৪০ লক্ষ মণ খাদ্য যদি গড়ে প্রত্যেক বছর বিদেশ থেকে আনতে হয়, তাহলে তা কোথায় পাওয়া যাবে? কে দেবে? জাহাজ ভাড়া কোথায়?

যাই হোক, ২০ লক্ষ টন ধরে নিন। কারণ, হিসাব যখন এখানে করে আমি নাই– এক টনে ২৭ মণ হয়। সেটা হিসাব করে এখন বের করুন। এই তিন বছরে প্রত্যেক বছর ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন খাবার আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে। বন্ধু-রাষ্ট্ররা সাহায্য করেছে, grant দিয়েছে, loan দিয়েছে। খাবার আনছি, খাবার দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কতকাল দেবে? কতদিন দেবে?

মানুষ বাড়ছে। বছরে ৩০ লক্ষ লোক আমার নতুন বাড়ে। আজকে আমাদের population planning করতে হবে, population control করতে হবে। না হলে, ২০ বছর পরে ১৫ কোটি লোক হয়ে যাবে। ২৫ বছর পরে? ৫৪ হাজার বর্গ-মাইল। বাঁচতে পারবেন না। যেই ক্ষমতায় থাকেন– বাঁচার উপায় নাই। আজকে population control আমাকে করতেই হইবে। সেজন্য definite step আমাদের নিতেই হবে। বাংলাদেশে production বাড়াতে হবে। না-হলে মানুষ বাঁচতে পারবে না। এবং ঘাটতি পুরাবার জন্য তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে।

বিশৃঙ্খল জাতি কোনদিন বড় হতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ফ্রী স্টাইল। এটা হবে না, ওটা হবে না। আজ যাকে arrest' করব, বলবে যে, আমি অমুক পার্টির লোক। একে arrest করব–অমুক পার্টির লোক। ওকে arrest করব–অমুক পার্টির লোক। খবরের কাগজে বিবৃতি যে, এক জায়গায় দাম ১১০ টাকা হল। অথবা একদিনে হঠাৎ ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা হল– অমনি খবর ছাপা হয়ে গেল। সারা বাংলাদেশে তা ২০০ টাকা হয়ে গেছে। যেখানে সমস্ত কিছুর অভাব, যখন দুনিয়া থেকে সমস্ত কিছু আনতে হয়।

আমরা কলোনী ছিলাম। আমরা কোন কিছুতে self-sufficient না। আমরা food-এ self-sufficient না, আমরা কাপড়ে self-sufficient না, আমরা তেলে self-sufficient না, আমরা খাবার তেলে self-sufficient না, আমাদের raw materials কিনতে হবে, ওষুধে self sufficient না। আমরা কলোনী ছিলাম পাকিস্তানের। আমাদের সব কিছু produce করতে হবে। সব বিদেশ থেকে আনতে হবে।

আমরা কোথায় পাব বৈদেশিক মুদ্রা? ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে? না। আমাদের income করতে হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। যে মানুষ ভিক্ষা করে তার যেমন ইজ্জত থাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে, তাদেরও তেমনি ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং শৃঙ্খলা দেশের মধ্যে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

সংবিধানের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই, স্পীকার সাহেব। যারা জীবনভর সংগ্রাম করছে– একথা যেন কেউ মনে না করে যে, জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে গেছে। No, জনগণ যা চেয়েছে, এখানে সেই system করা হয়েছে। তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারগণ জনগণের দ্বারা ভোটে নির্বাচিত হবেন। যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তাঁকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার আছে।

আজকে বিচার-বিভাগের কথা ধরুন। আমরা আজকে একটা কোর্টে বিচারের জন্য গেলে, একটা সিভিল মামলা যদি হয়, আপনি তো উকিল, স্পীকার সাহেব– আল্লাহ্‌র মর্জি যদি একটা মামলা সিভিল কোর্টে হয়, তাহলে বিশ বছরেও কি সেই সিভিল মামলা শেষ হয়– বলতে পারেন আমার কাছে? বাপ মারা যাওয়ার সময় বাপ দিয়ে যায় ছেলের কাছে, আর উকিল দিয়ে যায় তার জামাইয়ের কাছে সেই মামলা। আর ক্রিমিনাল কেস হলে লোয়ার কোর্টের মামলা জজ-কোর্টে বিচার নাই। Justice delayed, justice denied, We have to make a complete change এবং system আমাদের পরিবর্তন করতে হবে, যেন easily মানুষ বিচার পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার পায়।

সমস্ত কিছুর পরিবর্তন দরকার। Colonial power- এর rule নিয়ে দেশ চলতে পারে না। Colonial power-এ দেশ চলতে পারে না।

নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হবে। সেখানে judicial system-এর অনেক পরিবর্তন দরকার। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। কোন কথা শুনব না।

কলে-কারখানায় কাজ করতে হবে। কাজ করে production বাড়াও। নিশ্চয় তোমরা তার অংশ পাবে। কাজ করবে না, আর পয়সা নেবে– তা হবে না। কার পয়সা নেবে? গরিবের পয়সা নেবে? গরিবের উপর ট্যাক্স বসাব? খাবার আছে তার? কাপড় আছে তার? তার উপর ট্যাক্স বসাব কোত্থেকে? আমি পারব না। তোমাদের কাজ করে, production করে পয়সা নিতে হবে।

ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে হবে। কোন জমি পড়ে থাকতে পারবে না। তোমাদের production বাড়াতে হবে।

জানি, আমাদের অসুবিধা আছে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ হয় নাই। আমাদের বন্যা হয় প্রত্যেক বছর। সাইক্লোন হয়। প্রত্যেক বছর natural calamity হয়। সেটা বোঝা গেল।

আজকে আমাদের কথা কি? আমাদের শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। এটায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজকে থেকে নয়– আপনি মেম্বার ছিলেন প্রথম দিন থেকে, স্পীকার সাহেব। আপনি জানেন, এই দল এই সংজ্ঞা নিয়ে সংগ্রাম করেছে। কারও কাছে কোনদিন আপোস করে নাই, মাথা নত করে নাই।

আজ দুর্নীতিবাজ ঘুষখোর, কালোবাজারী, নতুন পয়সাওয়ালা এদের কাছে আমার আত্মবিক্রয় করতে হবে? এদের অধিকারের নামে এদেরকে আমরা ফ্রী স্টাইলে ছেড়ে দিতে পারি না। কক্ষণো না। কোন দেশে, কোন যুগে তা দেয় নাই, দিতে পারে না।

যারা আমার মাল বাংলার মাটি থেকে বিদেশে চালান দেয়, চোরাকারবারীর মাধ্যমে দুর্নীতি করে, যারা মানুষের কাছ থেকে পয়সা নেয়, তাদেরকে এভাবে চলতে দেওয়া যায়

না। যারা তোমার মাইনা দেয়, তোমার সংসার চালায়, তাদের কাছ থেকে তুমি আবার পয়সা খাবে। Mentality change করতে হবে।

সরকারী কর্মচারী–মন্ত্রী হই, প্রেসিডেন্ট হই– আমরা যারা আছি, আমরা জনগণের সেবক, আমরা জনগণের master নই। এই mentality আমাদের change করতে হবে। আর, যাদের পয়সায় আমাদের সকলের সংসার চলে, যাদের পয়সায় আমাদের রাষ্ট্র চলে, যাদের পয়সায় আজ আমার embassy চলে, যাদের পয়সায় আমরা গাড়ি চড়ি, যাদের পয়সায় আমরা পেট্রোল খরচ করি, যাদের পয়সায় আমরা কার্পেট ব্যবহার করি, তাদের জন্য কী করলাম? সেইটাই আজ বড় জিনিস।

আমি সেদিন গিয়েছিলাম কুমিল্লা পর্যন্ত। একটিমাত্র প্রশ্ন করেছি : তোমরা না-খেয়ে মরছ, খাবার চাউল নাই, কারও গায়ে কাপড় নাই, তোমরা কেন আমাকে দেখতে এসেছ, তোমরা কেন আমাকে ভালবাস? আমি বুঝতে পারি না। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার লোক।

আমার মনে আছে, আমি সহকর্মীদের বারবার বলেছিলাম যে, আমি আমার কাজ করেছি, তোমরা এবার আমাকে ছুটি দাও। জনগণের কাছে বলেছি, আমাকে ছুটি দাও। আমি পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে– সেই ১৯৩৮ সালে– যখন বাচ্চা মানুষ, তখন থেকে জেলে যাই। তার পর থেকে একদিনও আমি বিশ্রাম করি নাই–আমি রাজনীতি করেছি। অত্যাচার, অবিচার আমি যা সহ্য করেছি, তা সব বাদ দিন। অনেক লোক মারা গেছে, আমার চেয়ে অনেক মানুষ বেশি ত্যাগ করেছে এ দেশে। আমি সংগ্রাম করেছি আমার সহকর্মীদের নিয়ে।

কিন্তু এখন, একটা খেলা পেয়ে গেছে। বাজার নিয়ে খেলা, দাম নিয়ে খেলা। বেশি অসুবিধা হলে গোপনে গিয়ে অমনি লিখে দেয় যে, এই খবরটা একটু ছাপিয়ে দিন। আর অমনি গোলমাল লেগে গেল। বক্তৃতা আরম্ভ করে দিল। ফ্রী স্টাইল চলে না।

সাড়ে সাত কোটি মানুষ, ৫৪ হাজার বর্গমাইল দেশ। বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়, কাপড় আনতে হয়– অনেক কিছুই আনতে হয়। এখানে ফ্রী স্টাইল চলতে পারে না।

Production করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, মানুষ হতে হবে। ছাত্র-সমাজকে লেখাপড়া করতে হবে, লেখাপড়া করে মানুষ হতে হবে, জনগণ টাকা দেয় মানুষ হওয়ার জন্য। সেই মানুষ হতে হবে। আমরা যেন পশু না হই। লেখাপড়া শিখে যেন আমরা মানুষ হই।

কী পার্থক্য আছে একটা জানোয়ারের সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে– যে জানোয়ার একটা বাচ্চা পেলে কামড়িয়ে ধরে খেয়ে ফেলে? আর একটা মানুষ বুদ্ধিবলে পয়সা নিয়ে অন্য মানুষকে না খাইয়ে মারে! কী পার্থক্য আছে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে? যদি মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমি মানুষ কোথায়?

প্রথমত আমাকে মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে, তবে আমি মানুষ হব। তা না-হলে মানুষ আমাকে কেন বলা হয়? কারণ, আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। যখন মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি, তখন তো আমি মানুষ থাকি না। আমরা মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলেছি।

আমি সকলের কাছে আবেদন করব, আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করব। আজ আপনারা Constitution সংশোধন করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন। আমার তো ক্ষমতা কম ছিল না। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সমস্ত ক্ষমতা আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন। আমার দুই-তৃতীয়াংশ majority দরকার। তা আমার আছে। মাত্র ৭ জন ছাড়া সমস্ত সদস্যই আমার। তবু আপনারা amendment করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছেন। এই সিটে আমি আর বসব না– এটা কম দুঃখ না আমার। আপনাদের সঙ্গে এই হাউসের মধ্যে থাকব না–এটা কম দুঃখ নয় আমার।

জনাব স্পীকার সাহেব, তবু আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি সংবিধানকে। কারণ, একটা সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা এ দেশে কায়েম করতে হবে, যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে, যেখানে মানুষ অত্যাচার, অবিচার হতে বাঁচতে পারে।

চেষ্টা নতুন। আজ আমি বলতে চাই, This is our Second Revolution। এই Revolution— আমাদের এই Revolution হবে দুখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য। এর অর্থ : অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

আমি তাই হাউস থেকে, জনাব স্পীকার, আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকে, দলমত-নির্বিশেষে সকলকে বলব, যাঁরা দেশকে ভালবাসেন, চারটি Principle কে ভালবাসেন– জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা– এই চারটিকে, তাঁরা আসুন, কাজ করুন। দরজা খোলা আছে। সকলকেই আহ্বান জানাচ্ছি– যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন। যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আসুন, কাজ করুন, দেশকে রক্ষা করুন। দেশকে বাঁচান, মানুষকে বাঁচান, মানুষের দুঃখ দূর করুন। আর, দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারীদের উৎখাত করুন।

আর, একটা দল– তাদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, কোন দেশে করে নাই, স্পীকার সাহেব, আপনি তো ছিলেন, কোন দেশের ইতিহাসে নাই। পড়ুন দুনিয়ার ইতিহাস, বিপ্লবের পরে যারা বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে, যারা শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, যারা দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, কোন দেশ তাদের ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম, সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম। বলেছিলাম, দেশকে ভালবাস, দেশের জন্য কাজ কর, স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নাও। থাক। কিন্তু অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা গোপনে বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা মনে করে যে, খবর রাখি না। এত বড় তারা bandit। মানুষকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে মনে করে যে, তাকে কেউ ধরতে পারবে না।

কোথায় সিরাজ সিকদার? তাকে যদি ধরা যায়, আর তার যে দলবল, তাদের যদি ধরা যায়, ধরতে পারব না কোন অফিসে কে ঘুষ খান? ধরতে পারব না কোন অন্ধকারে বিদেশের থেকে কে পয়সা খান? ধরতে পারব না কে কোথায় পয়সা লুট করেন? ধরতে পারব না কোথায় কারা hoarder আছেন? ধরতে পারব না কারা black marketeer আছেন? নিশ্চয় ধরতে পারব। সময়ের প্রয়োজন। যেতে পারবে না কেউ। ইনশাআল্লাহ্, পাপ একদিন ধরা দেবেই। এটা মিথ্যা হতে পারে না।

দুনিয়ায় কোনদিন পাপ আর পুণ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। পুণ্য চলে একদিকে, পাপ চলে অন্য দিকে। Vice and virtue cannot go together. We should not forget it.

আজকে তাদের ক্ষমা করেছিলাম। তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কটাক্ষ করে। বন্ধ করে দেওয়া হবে এ সব। তাদের অধিকার দেওয়া হবে স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য? কোন দেশে দেয় নাই। আমরা দিয়েছিলাম মাফ করে। মাফ যদি হজম করতে না পারা যায়, তাহলে কেমন করে কঠোর হস্তে দমন করতে হয়, তা আমরা জানি। আজকে দুঃখের সঙ্গে এ কথা বলতে হচ্ছে।

সেজন্য আমরা Amended Constitution-এ যে নতুন ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি এটাও একটা গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ কোনদিন বাংলার মাটিতে আসতে পারবে না, আমি allow করব না।

বাংলাদেশকে ভালবাসব না। বাংলার মাটিকে ভালবাসব না, বাংলার ভাষাকে ভালবাসব না, বাংলার কালচারকে ভালবাসব না। আর ফ্রী স্টাইল চালাব–এটা হতে পারে না।

যার যা ইচ্ছা লেখে। কেউ এ-নামে বাংলাদেশকে ডাকে কেউ ও-নামে বাংলাদেশকে ডাকে, বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে তারা লজ্জাবোধ করে। তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার– যেমন নাই চোরাকারবারী, ঘুষখোর, মুনাফাখোরদের যেমন নাই দুর্নীতিবাজদের। তেমনি নাই এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের– যারা মনে করে যে, তাদের কেউ ধরতে পারবে না। ভুলে যান, ভুলে যান। বাংলার মাটি বাংলার নাড়ি আমি জানি।

স্পীকার সাহেব, এইভাবে রাত্রিবেলা দুজনকে মেরে বিপ্লব করা যায় না। যদি তাই হত, তবে আওয়ামী লীগ বোধহয় দশ বছর, বিশ বছর আগেই আরম্ভ করতে পারত। দশটিকে মারলাম, পাঁচটিকে মারলাম– তাতে বিপ্লব হয় না। ওটা ডাকাতি হয় বা খুন হয়। এতে মানুষের জীবনকেই অতিষ্ঠ করা হয়।

সেদিন বাগেরহাটের একটা জায়গাতে চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাইকে রাত্রে এসে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এটা কি একটা political philosophy? এই philosophy দুনিয়ায় পচা, গান্দা-ডাস্টবিনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এই philosophy– তে কোন দেশের মুক্তি আসতে পারে না। এবং কোনদিন কেউ successful হতে পারে নাই– এটা ফেল।

আন্দোলনের মধ্যেই আমার জন্ম, আন্দোলন আমি জানি। কিন্তু আজ কী দেখতে পাচ্ছি? ফ্রী স্টাইল। ওরা কিন্তু Enjoying the full liberty। যার যা ইচ্ছা। বিদেশীরা আসে এখানে। আমাদের মিয়ারা গোপনে দু বোতল মদ খাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের ব্রীফ করে দেওয়া হয়। ওরা মনে করে, আমরা খবর রাখি না! আমরা খবর রাখি।

আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে নিশ্চয় এই তিন বছরের মধ্যে আমরা কিছু করেছি।

আপনাদের কি কোন গভর্নমেন্ট ছিল? কেন্দ্রীয় সরকার ছিল? ছিল কি আপনাদের foreign office? ছিল কি আপনাদের defence office? ছিল কি আপনাদের planning? ছিল কি আপনাদের finance? ছিল কি আপনাদের customs? কী নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম? We have now organized a national government— an effective national government, Insha-allah, and better than many countries. I can challenge.

বিদেশ থেকে খাবার আনতে আমাদের বহু সময় লেগে যায়। অনেক efficient government আমি দেখেছি। কিন্তু আমাদের যেখানে যোগাযোগ-ব্যবস্থা নাই, সেখানে পনর দিনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে ৫,৭০০ লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে বাঁচানোর মতো efficiency এ দেশের গভর্নমেন্ট দেখিয়েছে। আমরা কাজ করতে পারি না বলে? নিশ্চয় পেরেছি।

কেউ কোন দিন স্মাগলিং বন্ধ করতে পারে নাই। আমরা শতকরা ৯৫ ভাগ স্মাগলিং বন্ধ করতে পেরেছি– এ গর্ব আমাদের আছে। আমরা অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করেছি এবং অর্থনৈতিক কাঠামো set up করেছি। আজ আমরা আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, বি-ডি-আর সমস্ত organize করেছি।

আমরা কী নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম? আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন, জনাব স্পীকার সাহেব, এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে কী ছিল?

এ অবস্থার মধ্যে দেশকে চলতে দেওয়া যায় না বলে পার্টির মিটিং এ decision নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের দরকার। কিন্তু শুধু পরিবর্তন করলেই দেশের মুক্তি আসে না যদি মানুষের মেন্টালিটির পরিবর্তন না হয়।

আজকে আমরা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছি, যাঁরা জনপ্রতিনিধি, জনগণের ভোটের মাধ্যমে যাঁরা এখানে এসেছি, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে : জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে, দলমত-নির্বিশেষে, বাংলার জনগণ যে যেখানে আছেন– আজকে থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করে নতুন জীবন শুরু করব। আমরা নতুন বিপ্লব শুরু করব। কেন করতে পারব না? হয় নাই? ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত আমার ঘরে বসে তিন-চারজনকে নিয়ে সমস্ত বাংলার মানুষের non-cooperation movement আমরা চালাই নাই। তখন একটা চুরি হয় নাই, একটা ডাকাতি হয় নাই– ভলান্টিয়াররা কাজ করেছে।

তাই, আজকেও আমাদের নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে mobilize করতে হবে।

বাংলার মানুষ ভাল। বাংলার মানুষের মতো মানুষ কোথাও নাই। বাংলার গরিব ভাল, বাংলার কৃষক ভাল, বাংলার শ্রমিক ভাল। যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে তারা বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ। তারাই যত গোলমালের মূল। যত অঘটনের মূল তারাই। তার কারণ, তাঁরা হলেন vocal শ্রেণী। তাঁরা বক্তৃতা করেন, তাঁরা কাগজে লেখেন। তাঁদের একটু স্বার্থে আঘাত লাগলেই দু কলম লিখে ফেলেন। কিন্তু এই অবস্থায় দেশ চলতে দেওয়া যায় না। সেইজন্যই আজ এই সংবিধান আমাদের পরিবর্তন করতে হয়েছে।

এখন আমাদের সামনে কাজ কি? এক নম্বর দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে– কল-কারখানায়–সবখানে। Population planning আমাদের করতে হবে, population control করতে হবে। দুর্নীতি, ঘুষ, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, কাজ করতে হবে। আমাদের জাতিকে united করতে হবে। বাঙালি জাতি যে প্রাণ, যে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করেছিল, সেই প্রাণ, সেই অনুপ্রেরণা সেই মতবাদকে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

দেশের দুখী মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, তাদের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য আজকে, জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে বলব, যে যেখানে আছেন, যাঁরা দেশকে ভালবাসেন, সকলকে আহ্বান করব, আসুন, দেশকে গড়ি, দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাই। আসুন দেশের মানুষের দুঃখ দূর করি। তা না করতে পারলে ইতিহাস আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করবে।

স্পীকার সাহেব, বড় দুঃখ। এই হাউসের আমি Leader ছিলাম। এ পার্টির আমি Leader ছিলাম। এতদিন আমি এ সিটে বসতাম। আমার সহকর্মীরা আজ আমার মেম্বারশিপ কেড়ে নিয়েছেন। আমি আর মেম্বার থাকতে পারব না। আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন এবং আজকে নতুন system এ government form হতে যাচ্ছে।

System পরিবর্তন করেই আমরা সফল হতে পারব না যদি আপনারা চেষ্টা না করেন। আপনারা যদি নিঃস্বার্থভাবে, যেভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করেছিলেন, যেমন নিঃস্বার্থভাবে পঁচিশ বৎসর সংগ্রাম করেছিলেন, সেইভাবে যদি সংগ্রাম না-করেন অন্যায়, অবিচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে, তাহলে দেশগড়ার কাজে, production-এর কাজে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে।

তাই, আল্লার নামে, চলুন, আমরা অগ্রসর হই। 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে আল্লার নামে অগ্রসর হই। ইনশাআল্লাহ্ আমরা কামিয়াব হবই। খোদা আমাদের সহায় আছেন। এত বড় দুর্ধর্ষ, এত বড় শক্তিশালী, এত বন্দুক, এত কামান, এত মেশিনগান, এত পাকিস্তানি সৈন্য, এত বড় তথাকথিত শক্তিশালী আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইস্‌কান্দার মীর্জা বাংলার মানুষকে অত্যাচার করার চেষ্টা করেছে বন্দুক দিয়ে– তার বিরুদ্ধে বিনা অস্ত্রে আপনাদের নিয়ে সংগ্রাম করে যদি তাদের উৎখাত করতে পারি, তাহলে কিছু দুর্নীতিবাজ, কিছু ঘুষখোর, কিছু শোষক, কিছু black marketeer– কে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে পারব না, এ বিশ্বাস আমি করি না।

যদি সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণে নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির-নাজির করে, নিজের আত্মসংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে, 'ইনশাআল্লাহ্' বলে কাজে অগ্রসর হন তাহলে জানবেন, বাংলার জনগণ আপনাদের সাথে আছে, বাংলার জনগণ আপনাদের পাশে আছে। জনগণকে আপনারা যা বলবেন, তারা তাই করবে। আপনাদের অগ্রসর হতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ আমরা কামিয়াব হবই।

আজ আমি আপনাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। আমার পার্টি আছে এবং আপনারা পার্টির সদস্য। বহু দুঃখের দিন আমরা কাটিয়েছি। সুখের মুখ আমরা দেখি

নাই। এই ক্ষমতায় যে আমরা আছি– এই ক্ষমতা সুখের নয়। এ বড় কষ্টের, বড় কণ্টকাকীর্ণ এই ক্ষমতা।

স্পীকার সাহেব, আপনাকে ধন্যবাদ দিই, সকলকে ধন্যবাদ দিই, সদস্যদের ধন্যবাদ দিই, স্টাফকে ধন্যবাদ দিই, কর্মচারীদের ধন্যবাদ দিই, সহকর্মীদের ধন্যবাদ দিই। আমি আপনাদের একজন। আপনাদের একজন হিসাবে আমি আপনাদের পাশে থাকব, আপনাদের কাছে থাকব, আপনাদের মধ্যে থাকব এবং আপনাদের, নিয়েই কাজ করব। আমাদের সেই গভর্নমেন্ট থাকবে, মন্ত্রী থাকবে– সব থাকবে, কাজ-কর্ম করবে। কোন অসুবিধার কারণ নাই। তবে কথা হল এই– সবচেয়ে বড় কাজ আমাদের, we have to work sincerely and honestly for the emancipation of the poor people of this country. This is our aim, ইনশাআল্লাহ্।

আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

জয় বাংলা !

জনাব স্পীকার : Order, please!

সংসদের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আমাদের জাতির জনককে মোবারকবাদ জানাই। তিনি আমাদের পরিষদের নেতা ছিলেন, চিরজীবন আমাদের এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরিষদ-নেতা হিসাবে খুব ঘনিষ্ঠ থাকার দরুন পরিষদের স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, বা পরিষদ-সচিবালয়ের কর্মচারীরা এতদিন তাঁকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে, খুব নিকটে পেতেন। এখন তাঁরা কাগজে-কলমে দূরে হলেও জাতির জনক হিসাবে, বঙ্গবন্ধু হিসাবে এবং এই জাতির পথনির্দেশক হিসাবে তাঁকে আশা করি কাছেই পাবেন, যদিও বৃহত্তর দায়িত্বের ক্ষেত্রে তিনি একটু দূরেই চলে গেছেন।

এই পরিষদের নিশ্চয় একজন নতুন নেতা হবেন, সেই নেতা জাতির জনকের আশীর্বাদপুষ্টই হবেন ধরে নেওয়া যায় এবং যিনিই স্থলাভিষিক্ত হবেন, নেতার আশীর্বাদ থেকে এই সংসদ, সংসদের অধ্যক্ষ অথবা সংসদ-কর্মচারী, সংসদ-সচিবালয় বঞ্চিত হবে না, এ বিশ্বাস রাখি।

আমরা জাতির জনকের দীর্ঘায়ু কামনা করি, তাঁর সাফল্য কামনা করি। তাঁর শুভযাত্রার জয় হোক। এই বলে সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করলাম।

[অতঃপর প্রথম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশন সমাপ্ত হয়]

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের *
গঠনতন্ত্র

প্রথম ধারা : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত একক জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ–বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি বিধান, নর-নারী ও ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান এবং মানব-সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি, মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি, ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন, কৃষক ও শ্রমিকসহ মেহনতী ও অনগ্রসর জনগণের উপর শোষণ অবসানের জন্য পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণমুক্ত ও সুষম সাম্যভিত্তিক এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, সর্বাঙ্গীণ গ্রামীন উন্নয়ন ও কৃষি-ব্যবস্থার আমলে সংস্কার ও ক্রমিক যান্ত্রিকীকরণ এবং সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলন, কৃষি ও শিল্পের প্রসার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণে কৃষক-শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান, মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও অধিকতর কর্মসংস্থান, বিপ্লবোত্তর সমাজের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ গণমুখী সর্বজনীন সুলভ গঠনাত্মক শিক্ষাব্যবস্থা-প্রবর্তন, অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় স্বাস্থ্যরক্ষাসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণের মৌলিক সমস্যাবলির সুসমাধান, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ম্ভর অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, বিচার-ব্যবস্থা কালোপযোগী জনকল্যাণকর পরিবর্তন সাধন এবং গণজীবনের সর্বস্তর হইতে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা– এই সকল নীতিসমূহ ও উদ্দেশ্যাবলি সমগ্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত উদ্যম সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় বাস্তবে রূপায়িত করতে অবিচল নিষ্ঠা, সততা, শৃংখলা ও দৃঢ়তার সহিত সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবে।

(২) বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করিবে।

---

* দৈনিক বাংলা, ৮ জুন ১৯৭৫

দ্বিতীয় ধারা : প্রতীক

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতীক হইবে নৌকা।

তৃতীয় ধারা : পতাকা

দলের পতাকা হইবে দুই-তৃতীয়াংশ সবুজ এবং এক-তৃতীয়াংশ লাল। সবুজের উপর চারটি লাল বর্ণের তারকা খচিত থাকিবে।

চতুর্থ ধারা : সংগঠন

নিম্নলিখিত সাংগঠনিক কমিটি বা সংস্থাসমূহের সমবায়ে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (জাতীয় দল) গঠিত হইবে :

(ক) জাতীয় দলের কার্যনির্বাহী কমিটি,

(খ) জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটি,

(গ) দলীয় কাউন্সিল,

(ঘ) জেলা কমিটি,

(ঙ) জেলা কাউন্সিল

(চ) থানা/আঞ্চলিক কমিটি এবং

(ছ) ইউনিয়ন/প্রাথমিক কমিটি।

ব্যাখ্যা : (১) দেশে বর্তমানে প্রচলিত প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে গঠিত মহকুমাসমূহের প্রত্যেকটি জাতীয় দল সংগঠনের নিমিত্ত একটি জেলারূপে পরিগণিত হইবে। ভবিষ্যতে সৃষ্ট প্রশাসনিক জেলাসমূহ এই উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক জেলারূপে গণ্য হইবে।

(২) এই গঠনতন্ত্রে দল বলিতে জাতীয় দলকেই (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) বুঝাইবে।

পঞ্চম ধারা : সংগঠনের নীতি

জাতীয় দলের শক্তি, সংহতি, ঐক্য ও সুষ্ঠু বিকাশ এবং সচেতন নিয়মানুবর্তিতা অব্যাহত রাখিবার এবং নিশ্চিত করিবার জন্য সাংগঠনিক কার্যধারায় নিম্নলিখিতরূপে গণতান্ত্রিক প্রণালী অবলম্বন একান্ত কাম্য এবং অপরিহার্য :

(ক) এই গঠনতন্ত্রের একাদশ (৫) এবং দ্বাদশ (৪) (ঙ) ধারার বিধানসাপেক্ষে নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত দলের প্রতিটি কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হইবে।

(খ) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতানুসারেই সংগঠনভুক্ত কমিটিসমূহের সিদ্ধান্তবলি গৃহীত হইবে এবং তৎসমুদয় সকল সদস্যেরই অবশ্য পালনীয়। নিম্নতম সংস্থা উচ্চতর কমিটির নির্দেশ মানিয়া চলিবে। দলের নির্দেশ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

(গ) নিম্নতর কমিটিসমূহ উচ্চতর কমিটিগুলির নিকট নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করিবে এবং উহাদের পরামর্শ ও নির্দেশ গ্রহণ করিবে। উচ্চতর কমিটিগুলি নিয়মিতভাবে নিম্নতম কমিটিগুলিকে সামগ্রিক কার্যধারা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত রাখিবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবে।

(ঘ) উচ্চতর কমিটিসমূহ নিম্নতর কমিটিসমূহের এবং সাধারণ কমিটিসমূহের এবং সাধারণ সদস্যদের মতামত ও আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিবে।

(ঙ) দলের সকল স্তরে দলীয় নীতি, উহার প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা ও পর্যালোচনায় উৎসাহিত করা হইবে।

(চ) দলীয় সিদ্ধান্তসমূহ সাধারণত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হইবে। যদি তাহা সম্ভব না-হয় তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(ছ) দলীয় শাখা বা সংগঠনসমূহের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অবশ্যই দলের উদ্দেশ্য ও কর্মনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

(জ) নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে আদর্শ সচেতন একনিষ্ঠ কর্মী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ষষ্ঠ ধারা : সদস্যপদ

(১) আঠার বৎসর ও তদুর্ধ্ব বয়স্ক বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক প্রথম ধারায় বর্ণিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যসূচি মানিয়া চলিবে বলিয়া নির্ধারিত ফরমে লিখিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইলে, জাতীয় দলের যে কোন নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিলে, দলের যে কোন সংগঠনে কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিলে, নিয়মিত দলের নির্দিষ্ট চাঁদা পরিশোধ করিতে সম্মত হইলে এবং দলের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে রাজী থাকিলে এই ধারার (২) উপ-ধারায় উল্লিখিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্যপদ লাভ করিবার যোগ্য হইবেন, তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার (২) উপ-ধারার বিধানসমূহ কার্যকর করিবার অর্থাৎ তৎসমুদয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার দায়িত্ব জাতীয় দলের চেয়ারম্যান কিংবা তৎকর্তৃক মনোনীত বা নিযুক্ত কোন কমিটি বা প্রতিনিধিগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) কোন নাগরিক সদস্যপদের অধিকারী হইবেন না বা থাকিবেন না;

যদি–

(ক) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন।

(খ) তিনি দুর্নীতি বা নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে।

(গ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল)। আদেশের অধীনে যে কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং তিনি ঐরূপ কোন অপরাধের জন্য বিচারাধীন থাকা অবস্থায় বিচারের নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে কিংবা তাঁহার বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধরনের কোন অপরাধ সম্পর্কিত অভিযোগ কোন সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট রুজু হইয়া থাকে;

(ঘ) তিনি রাষ্ট্রের আদর্শবিরোধী, সমাজবিরোধী জননিরাপত্তাবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(৩) দলের সদস্য পদপ্রার্থীকে দলের প্রাথমিক বা শাখা কমিটির নিকট নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে এবং বার্ষিক চাঁদা মাত্র দুই টাকা দরখাস্তের সহিত প্রদান করিতে হইবে। প্রার্থীর সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত দুইজন সদস্য দায়িত্ব সহকারে উক্ত প্রার্থী সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদিসহ ঐ দরখাস্ত প্রত্যয়ন করিলে এবং প্রাথমিক বা শাখা কমিটি সদস্যদের সাধারণ সভায় প্রার্থীর সদস্যপদ অনুমোদন লাভ করিলে তিনি উক্ত অনুমোদনের তারিখ হইতে এক বৎসর পর্যন্ত প্রার্থী সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। প্রাথমিক কমিটি, থানা কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, জেলা কমিটি সরাসরিভাবেও কোন প্রার্থীর দরখাস্ত গ্রহণ করিতে এবং অনুরূপ উপায়ে তাঁহাকে প্রার্থী সদস্যপদ প্রদান করিতে পারিবে। দলীয় অঙ্গ সংগঠনগুলির নিম্নতম শাখা বা ইউনিট প্রার্থী-সদস্যদের জন্য শুধুমাত্র জাতীয় দলের সংশ্লিষ্ট শাখা বা ইউনিটের কাছে সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৪) প্রার্থী-সদস্যগণ আমন্ত্রণক্রমে দলীয় সভায় যোগদান করিতে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। তাঁহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাঁহারা বাধ্য থাকিবেন। তাঁহাদের কোন কমিটিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার, নির্বাচিত হইবার অথবা কোন প্রস্তাবের উপর ভোটদানের অধিকার থাকিবে না।

(৫) (ক) দলের যে কমিটি যাঁহাকে প্রার্থী-সদস্যপদ প্রদান করিবে সেই কমিটিকে ঐ প্রার্থী-সদস্যের দলীয় আদর্শগত শিক্ষা-দীক্ষার এবং দলের গঠনতন্ত্র, কার্যক্রম, কর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে দলের সিদ্ধান্তাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তিনি দলের যে কমিটির অন্তর্ভুক্ত উহাতে তাঁহার কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রার্থী-সদস্যপদের মেয়াদ পূর্ণ হইলে সংশ্লিষ্ট কমিটি উক্ত প্রার্থী সদস্যের উল্লেখিত শিক্ষাগত ও কার্যকলাপ সংক্রান্ত উৎকর্ষ বা উন্নতির মান বিবেচনা করিয়া তাহার পূর্ণ সদস্যপদ প্রদানের জন্য দলীয় সুপারিশ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে তাঁহার প্রার্থী সদস্যপদের মেয়াদ আরও এক বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে, অথবা তাঁহার প্রার্থী সদস্যপদ বাতিল করিতে পারিবে।

(খ) দলের নিম্নতম কমিটি বা ইউনিটগুলি উহাদের সংশ্লিষ্ট উচ্চতর কমিটি বা কমিটিগুলির মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট প্রার্থী সদস্যগণকে পূর্ণ সদস্যপদ দানের সুপারিশ করিবে, তবে উল্লেখ থাকে যে, উপরোক্ত সুপারিশের একটি অনুলিপি সরাসরি কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র অঙ্গ-সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রার্থী-সদস্যকে পূর্ণ সদস্যপদ দানের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে। এইরূপ প্রার্থী সম্পর্কে কার্যনির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা বা প্রাথমিক কমিটির পূর্ণ তথ্যসম্বলিত মতামত গ্রহণ করিবে।

(গ) একমাত্র কার্যনির্বাহী কমিটি দলের পূর্ণ সদস্যপদ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) কাহারও প্রার্থী-সদস্যভুক্তির আবেদনপত্র নিম্নতম কোন কমিটিতে প্রত্যাখ্যাত হইলে তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট তাঁহার আবেদনপত্র পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করিতে পারিবেন।

(৭) কাহাকেও প্রার্থী সদস্যপদ প্রদান করা হইলে তৎসম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কমিটি এবং কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটি বা জেলা কমিটি এই বিষয়ে নিম্নতম কমিটির সিদ্ধান্তের রদবদল করিতে পারিবে।

(৮) দলের কোন সদস্য তাঁহার নিজস্ব কমিটির অনুমতি লইয়া সদস্যপদ স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন, তবে জেলা হইতে স্থানান্তর দাবি করিলে জেলা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) জাতীয় দল কর্তৃক মনোনীত না-হইলে কেহ জাতীয় সংসদ বা স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের জন্য মনোনীত হইবেন না।

(১০) জাতীয় দলের চেয়ারম্যান বিশেষ বিবেচনায় যে কোন প্রার্থীকে সরাসরি পূর্ণ সদস্যপদ দিতে পারিবেন। কোন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, আইনবলে গঠিত সংস্থা ও কর্পোরেশন প্রভৃতির কোন কর্মচারী সদস্যপদ প্রার্থী হইলে তাঁহাকে সদস্যপদ কিংবা প্রার্থী-সদস্যপদ দানের ক্ষমতা জাতীয় দলের চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকিবে, তবে দেওয়ানী আদালতে বিচারকার্যে নিযুক্ত কোন কর্মচারী বা বিচারক আদৌ জাতীয় দলের সদস্যপদ প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(১১) পূর্ণ সদস্য পদপ্রার্থীকে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পালন করিতে হইবে এবং নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ ঘোষণাপত্রে দস্তখত করিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতে হইবে :

(ক) তিনি উনিশ বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক,

(খ) তিনি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই নীতিসমূহে বিশ্বাস করেন এবং তৎসমূহের বাস্তবায়নে কর্মরত আছেন;

(গ) তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে একটি ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড সমাজে বিশ্বাসী,

(ঘ) তিনি দলের কেন্দ্রীয় অথবা জেলা কমিটি কর্তৃক যে কোন নির্ধারিত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ;

(ঙ) তিনি বিষয়-সম্পত্তির সর্বোচ্চসীমা নিয়ন্ত্রক কোন প্রচলিত আইনের দ্বারা নির্ধারিত সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পত্তির অতিরিক্ত কোন সম্পত্তির মালিক নহেন;

(চ) তিনি দলীয় সভা কিংবা বৈঠকের মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোথায়ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রকাশ্যে বা গোপনে দলীয় সংগঠনসমূহের গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত কর্মনীতি অথবা কার্যক্রমের প্রতিকূল কোনরূপ সমালোচনা করেন না।

(১২) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশানুসারে, কিংবা তৎকর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলি অনুসারে থানা, আঞ্চলিক, প্রাথমিক কমিটি ও শাখাসমূহের প্রত্যেকটি উহার এলাকাধীন সদস্যগণের তালিকাসম্বলিত একটি রেজিস্ট্রি বই রাখিবে এবং ঐ তালিকার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট পাঠাইবে। জেলা কমিটিসমূহ সকল সদস্য তালিকার অনুলিপি কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট পাঠাইবে।

(১৩) কার্যনির্বাহী কমিটি পূর্ণ সদস্যের উপর বার্ষিক চাঁদা ছাড়াও নির্দিষ্টহারে অনুদান বা অবশ্য-দেয় অর্থ-সাহায্য ধার্য ও আরোপ করিতে পারিবে। দলের সদস্যগণের প্রদত্ত সাকুল্য চাঁদার একটি অংশ কার্যনির্বাহী কমিটি লইবে এবং অবশিষ্ট অংশ বিভিন্ন স্তরের কমিটির মধ্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং তদুদ্দেশ্যে বিতরণের হার ও পদ্ধতি স্থির করিবে। উপরোল্লিখিত অনুদান বা অবশ্য-দেয় সাহায্যের হার ও বণ্টনবিধি কার্যনির্বাহী কমিটিই নির্ধারণ করিবে।

সপ্তম ধারা : সদস্যপদের কার্ড এবং চাঁদা

(১) পূর্ণ সদস্যপদ লাভের পর সদস্যকে দলের সদস্যপদের কার্ড দেওয়া হইবে। পূর্ণ সদস্যদের কার্ড সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটি গ্রহণ করিবে।

(২) দলের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে কিংবা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রণীত নিয়মানুসারে প্রত্যেক পূর্ণ সদস্যকে তাঁহার আয়ের নির্দিষ্ট একটি অংশ দলের তহবিলে দান করিতে হইবে।

(৩) বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যপদের দেয় চাঁদা এবং অনুদান মওকুফ করিতে পারিবে।

অষ্টম ধারা : সদস্যের কর্তব্য

(১) দলের যে সংগঠনের তিনি সদস্য, সেই সংগঠনের কাজে তিনি নিয়মিতরূপে অংশগ্রহণ করিবেন। তিনি দলের নীতি, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ কার্যকরী করিবেন। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে থাকিয়া তিনি জনগণ ও দলের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করিবেন। তিনি জনসংযোগের মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হইবেন এবং তাঁহাদের বক্তব্য ও মতামত দলের নিকট রিপোর্ট করিবেন। পারস্পরিক মানবিক মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব লইয়া জনগণের সহিত মেলামেশা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ ও ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক তিনি গড়িয়া তুলিবেন। তাঁহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যকলাপে যাহাতে তাঁহার আচরণে সদাচার; সত্যপরায়ণতা, নৈতিকতা ও বিনয়-মাধুর্য প্রকাশ পায় সেইদিকে তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(২) তিনি দলের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করিতে সর্বদা তৎপর থাকিবেন, নিজের রাজনৈতিক এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান ও সচেতনতার মান উন্নয়নে সদা সচেষ্ট থাকিবেন, দলের প্রচারিত পত্রপত্রিকা ও সাহিত্য পাঠ করিবেন এবং প্রচার করিবেন। তিনি দলের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও গঠনতন্ত্র মানিয়া চলিবেন এবং দলের চাঁদা ও অনুদান নিয়মিতভাবেই পরিশোধ করিবেন।

(৩) তিনি গঠনমূলক আলোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য পরিচালনা পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করিবেন। সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উহা কার্যকর করিবার জন্য তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) তিনি নিষ্ঠা ও সততার সহিত নিজের পেশাগত কাজের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিবেন।

নবম ধারা : সদস্যদের অধিকার

দলের সদস্য নিম্নলিখিত অধিকার ভোগ করিবেন :

(১) তিনি দলীয় সংগঠনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে ও নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

(২) তিনি দলের কর্মনীতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত আলোচনায় স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) দলের সভায় যে কোন সংগঠন বা সংস্থা এবং সদস্য ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিবেন।

(৪) দলের সম্মেলনের এবং দলের যে কোন উর্ধ্বতন সংগঠনের নিকট তাঁহার কোন বিবৃতি, নিবন্ধ, প্রস্তাব ও আবেদন পেশ করিতে পারিবেন।

(৫) কোন সদস্যের দল হইতে পদত্যাগের অধিকার থাকিবে, তবে পদত্যাগেচ্ছু সদস্যকে নিজের সংগঠনের নিকট কারণ দর্শাইয়া দরখাস্ত করিতে হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে সংগঠন তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে পারে। পদত্যাগের পূর্বে সদস্য-কার্ড, কাগজপত্র ও দলের অন্যান্য সম্পত্তি দলকে ফেরত দিতে হইবে। যিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন তাঁহার বিরুদ্ধে দল হইতে বহিষ্কার করিবার মত কারণ থাকিলে এবং অভিযোগ আনয়ন করিলে তাঁহার পদত্যাগ বহিষ্কার বলিয়া গণ্য হইবে। এই বিষয়েও কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) উপযুক্ত কারণ ব্যতীত দলের কোন সদস্য একটানা ছয় মাস কাল পর্যন্ত দলের কাজ-কর্ম না করিলে এবং/অথবা প্রতি বৎসর দলকে দেয় চাঁদা পরিশোধ না-করিলে তাহার সদস্যপদ বাতিল করা যাইবে।

দশম ধারা : জাতীয় দলের কার্যনির্বাহী কমিটি

(১) দলের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য-সংখ্যা চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী জেনারেলসহ অনুর্ধ্ব পনের জন হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কার্যনির্বাহী কমিটি দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করিবে। চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় কার্যাবলির সাংগঠনিক কাঠামো এবং কার্যাবলি ও দায়িত্ব নিরূপণ করিবেন।

(৪) কার্যনির্বাহী কমিটি যৌথভাবে উহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং কমিটির প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে। সেক্রেটারী জেনারেল চেয়ারম্যানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবেন। তিনি চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কাউন্সিলের সভা আহ্বান করিবেন এবং কার্যবিবরণীর রিপোর্ট পেশ করিবেন। সেক্রেটারী ও কর্মকর্তা সেক্রেটারী জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৫) চেয়ারম্যান দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি উপ-কমিটি নিয়োগ করিবেন। এই উপ-কমিটির সদস্য কার্যনির্বাহী বা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হইবেন।

(৬) কার্যনির্বাহী কমিটির একটি উপ-কমিটি দলের পার্লামেন্টারী বোর্ড হিসাবে কাজ করিবে। এই উপ-কমিটি চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সদস্য দ্বারা গঠিত হইবে।

(৭) কার্যনির্বাহী কমিটি উহার কর্তব্য পালনের জন্য বিভিন্ন উপপরিষদ ও বিভাগ গঠন করিতে পারিবে। প্রয়োজনবোধে চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটির

সদস্যবৃন্দকে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আহ্বান করা যাইতে পারে, তবে তাহারা ভোট দিতে পারিবেন না। কার্যনির্বাহী কমিটি উহার অধীনস্থ বিভিন্ন উপ-পরিষদ ও বিভাগের কার্যের নিয়মাবলি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৮) কার্যনির্বাহী কমিটি দলের সদস্যদের অনুদান বা অবশ্য-দেয় অর্থের হার স্থির করিবে।

(৯) দলের পত্রিকা ও সাহিত্য প্রকাশনার দায়িত্ব কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং দলের নামে অন্য কোন কমিটি উহা প্রকাশ করিতে পারিবে না। কার্যনির্বাহী কমিটি দলের পত্রিকার সম্পাদক নিয়োগ করিবে।

(১০) কার্যনির্বাহী কমিটি দলের সদস্যদের কার্ড বিতরণের ব্যবস্থা করিবে।

(১১) কার্যনির্বাহী কমিটি জেলা কমিটিসমূহ অনুমোদন করিবে।

(১২) কার্যনির্বাহী কমিটি দলের কাউন্সিলে প্রতিনিধি প্রেরণের সংখ্যানুপাত নির্ধারণ করিবে।

(১৩) কার্যনির্বাহী কমিটি অঙ্গ সংগঠনগুলির জাতীয় সংগঠন কার্যালয়গুলিকে নিয়মিতভাবে সাহায্য, পরামর্শ ও নির্দেশ দান করিবে এবং উহাদের নীতি ও কার্যাবলির তত্ত্বাবধায়ন ও সমন্বয় সাধন করিবে।

(১৪) কার্যনির্বাহী কমিটি জেলা দফতরগুলির কার্যের তদারক ও সমন্বয় সাধন করিবে। কার্যনির্বাহী কমিটি জেলা কমিটিগুলির কাজে সাহায্য, পরামর্শ ও নির্দেশ দান করিবে।

(১৫) কার্যনির্বাহী কমিটি দলের কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(১৬) কার্যনির্বাহী কমিটি দলের তহবিলের হিসাব-নিকাশ রাখিবে।

(১৭) বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল (পার্লামেন্টারী পার্টি) কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকিবে।

(১৮) কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণত প্রতিমাসে একবার বৈঠকে মিলিত হইবে।

একাদশ ধারা : জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটি

(১) কাউন্সিলের দুই অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি হইবে দলের প্রধান সংস্থা। দলের কাউন্সিলে যে সকল সাধারণ নীতি ও কার্যক্রম গৃহীত হইবে উহার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন এবং কাউন্সিলের দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বদান এবং দলের নীতি ও গঠনতন্ত্র সংরক্ষণ কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় কমিটি উহার সমুদয় কাজের জন্য একদিকে দলের চেয়ারম্যানের নিকট এবং অন্যদিকে দলের কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকিবে। সরকারি, আধা-সরকারি, সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ও জনস্বার্থ সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সম্পর্কেই কেন্দ্রীয় কমিটি তদারক করিবে।

(২) বৎসরে অন্তত দুইবার কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করিতে হইবে।

(৪) কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির কাজের রিপোর্ট এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করিতে হইবে।

(৫) চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে সেক্রেটারী জেনারেল, একাধিক সেক্রেটারী, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং অন্যান্য দলীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন এবং তাঁহাদের কার্যভার নিরূপণ করিবেন।

দ্বাদশ ধারা : দলীয় কাউন্সিল

(১) কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে :

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্য,

(খ) কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য,

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোটা অনুসারে জেলা কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ,

(ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোটা অনুসারে অঙ্গ-সংগঠনগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ,

(ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোটা অনুসারে ষোড়শ (২) (খ) ধারায় বর্ণিত প্রাথমিক কমিটিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, এবং

(চ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশজন দলীয় পূর্ণ সদস্য।

কাউন্সিলের সদস্যদের কাউন্সিলার বলা হইবে এবং তাঁহারা পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য বহাল থাকিবেন।

(২) কাউন্সিলের আকার এবং বিভিন্ন জেলা কমিটি, অঙ্গ-সংগঠন ও সংস্থা ইত্যাদি হইতে দলীয় কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে কার্যনির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। তবে কোন অঙ্গ-সংগঠন জেলা কমিটি এবং প্রাথমিক কমিটি শুধুমাত্র পূর্ণ সদস্যদের মধ্য হইতে দলীয় কাউন্সিলার নির্বাচন করিবে।

(৩) কাউন্সিল ইহার মেয়াদকালে অন্তত দুইটি অধিবেশনে মিলিত হইবে। চেয়ারম্যান যে কোন সময়ে কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব ও অধিকার

(ক) দলের মূলনীতি, কার্যক্রম, কর্মপন্থা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দলীয় কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(খ) প্রয়োজনবোধে কাউন্সিল দলের কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র সংশোধন করিতে পারিবে।

(গ) কাউন্সিল কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত রাজনৈতিক, সাংগঠনিক এবং অন্যান্য রিপোর্ট প্রস্তাব প্রভৃতির উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। কাউন্সিলের অধিবেশনে যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক মূল দলিল কার্যনির্বাহী কমিটি উপস্থাপনা করিবে উহা কাউন্সিল অধিবেশনের অন্তত দুই মাস পূর্বে সমগ্র দলের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। এই সম্পর্কে দলের প্রতিটি স্তরে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি উহার কার্যাবলির একটি রিপোর্ট কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থাপন করিবে।

(৬) প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর কাউন্সিল কর্তৃক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হইবেন। কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের পূর্বে উহার মোট সদস্য সংখ্যা কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারণ করিবে।

ত্রয়োদশ ধারা : জেলা কমিটি

(১) জেলা কমিটি এই সম্মেলনের মধ্যবর্তীকালে জেলায় দলের কাজকর্ম পরিচালনা করিবে। এই কমিটি উহার কাজকর্মের জন্য জেলা কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকিবে।

(২) একজন সম্পাদক, প্রয়োজনবোধে অনূর্ধ্ব পাঁচজন যুগ্ম-সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য লইয়া জেলা কমিটি গঠিত হইবে। সম্পাদক জেলা কমিটির প্রধান হিসাবে কাজ করিবেন।

(৩) জেলা কমিটির সভায় উহার তহবিলের হিসাব-নিকাশ পেশ করিতে হইবে।

(৪) জেলা কমিটি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করিবে :

(ক) নিম্নতম কমিটি ও শাখাসমূহের কাজ পরিদর্শন ও উহাদের কাজের সাহায্যের ব্যবস্থা করা

(খ) জেলার বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা।

(গ) দলের পত্রিকা ও সাহিত্য প্রচার এবং উহার হিসাবরক্ষণ।

(ঘ) দলের তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ।

(ঙ) দলের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

(৫) জেলা কমিটি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করিবে।

(৬) জেলা কমিটি কোন সদস্যের আসন শূন্য হইলে তৎস্থলে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে একজন সদস্য নির্বাচিত করিতে পারিবে।

(৭) জেলাস্থ সকল অঙ্গ-সংগঠনগুলির কমিটি দলীয় জেলা কমিটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে।

(৮) প্রতি মাসে অন্তত একবার জেলা কমিটির সভা আহূত হইবে।

চতুর্দশ ধারা : জেলা কাউন্সিল

(১) জেলা কাউন্সিল জেলায় দলের সর্বোচ্চ সংস্থা। জেলা কমিটি প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর জেলা কাউন্সিল অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবে। এই কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে নিয়মাবলি কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। দলীয় সদস্য সংখ্যার অনুপাতে জেলা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারণ করিবে। কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে জেলার বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। পূর্বতন সম্মেলনের প্রতিনিধিরাই বিশেষ অধিবেশনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন।

(২) জেলা কাউন্সিলের দায়িত্ব ও অধিকার

(ক) জেলা কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট আলোচনা করা এবং সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা,

(খ) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া দলের ও জনসাধারণের মধ্যে দলীয় কার্যধারা নির্ধারণ করা,

(গ) দলীয় কাউন্সিল ও বিশেষ সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচন করা,

(ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রচারিত দলিল ও প্রস্তাবাদি সম্বন্ধে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ করা,

(ঙ) জেলা কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা,

(চ) জেলা কাউন্সিল অধিবেশন পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচন করা।

পঞ্চদশ ধারা : থানা/আঞ্চলিক কমিটি

(১) দলের থানা কমিটি থানায় দলের সর্বোচ্চ সংস্থা। প্রতি মাসে অন্যূন একবার থানা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। এই কমিটি জেলা কাউন্সিলের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে।

(২) থানা কমিটির সদস্য সংখ্যা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) একজন সম্পাদক, প্রয়োজনবোধে অনূর্ধ্ব তিনজন যুগ্ম-সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য লইয়া থানা কমিটি গঠিত হইবে।

(৪) প্রতি মাসে অন্তত একবার থানা কমিটির সভা আহূত হইবে।

(৫) জেলা কমিটি কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে আঞ্চলিক কমিটির এলাকা নির্ধারণ করিতে পারিবে। সাধারণভাবে প্রশাসনিক বিভাগ অনুসরণ করিয়া এই সীমানা নির্ধারণ করা হইবে। জেলা কমিটি থানা/আঞ্চলিক কমিটির কাজের তদারক করিবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নস্তরে কমিটিগুলির কাঠামো নির্ধারণ করিয়া দিবে।

ষোড়শ ধারা : ইউনিয়ন/প্রাথমিক কমিটি

(১) বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে দলের প্রাথমিক কমিটি গঠিত হইবে।

(২) (ক) দেশের কলকারখানা, শিল্প-সংস্থা, কৃষি-প্রতিষ্ঠান ও খামার, সমবায়, সমিতি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানভুক্ত দলীয় সকল সদস্য লইয়া সমবেতভাবে বা পৃথকভাবেও কমিটি গঠিত হইতে পারে।

(খ) চেয়ারম্যানের অনুমোদনসাপেক্ষে বিভিন্ন সরকারি বা আধা-সরকারি দফতর বা প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীসমূহে দলের প্রাথমিক কমিটি গঠিত হইতে পারে। কার্যনির্বাহী কমিটি এই সকল প্রাথমিক কমিটির সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(গ) দলের অন্যূন পাঁচজন পূর্ণ সদস্য লইয়া প্রাথমিক কমিটি গঠিত হইবে।

(ঘ) পূর্ববর্তী (খ) দফায় বর্ণিত যে সকল সরকারি, আধা-সরকারি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ও বাহিনীতে প্রাথমিক কমিটি গঠিত হইবে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনায় ও প্রশাসনে যাহাতে দলের নীতি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কমিটির সক্রিয় প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং কর্মে সততা ও বিশ্বস্ততা, আইনানুগত্য, দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা ও

উদ্যমশীলতার সঞ্চার হয় এবং আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের অবসান ঘটে সেইদিকে কমিটিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। পূর্বোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মধারায় কোথায়ও কোন দোষ-ত্রুটি দেখা দিলে এবং ছোট বড় কোন কর্মচারীর কাজে কোনরূপ গলদ ও শৈথিল্য পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট দলীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এবং প্রয়োজনবোধে চেয়ারম্যানকে সরাসরি কমিটি তাহা জানাইবে।

(৩) এলাকার জনগণের কিংবা প্রতিষ্ঠানের সদস্যবর্গের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করা এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণ-সাধনে সদা তৎপর থাকা, এলাকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংগঠিত করা, দলের গণভিত্তি দৃঢ় করা, সংশ্লিষ্ট কর্মকেন্দ্রে দলের কাজের সুসংহত সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ প্রসার ও শক্তি বৃদ্ধি করা এবং দলের নীতি কার্যকর করা প্রতিটি প্রাথমিক কমিটির দায়িত্ব।

(৪) দলের কাজের সুষ্ঠু অগ্রগতি ও সুবিধা বিধানের জন্য প্রাথমিক কমিটি কর্তৃক উহার সদস্যদের কয়েকটি শাখায় ভাগ করা চলিবে।

(৫) কমিটি শাখার সদস্যদের মধ্যে কাজ বণ্টন করিবে এবং কাজের তদারক করিবে। শাখাগুলির মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(৬) প্রাথমিক কমিটির সাধারণ সভায় ইহার সম্পাদক এবং একজন সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইবে। প্রাথমিক কমিটির সদস্য সংখ্যা কুড়িজনের ঊর্ধ্বে হইলে একটি কার্যকরী কমিটি নির্বাচন করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে জেলা কমিটির নির্দেশানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে।

(৭) প্রতি মাসে অন্যূন একবার প্রাথমিক কমিটির সাধারণ সভা বসিবে। এই সভায় সম্পাদক সকলের বিবেচনার জন্য একটি কাজের রিপোর্ট এবং প্রস্তাবাদি উপস্থাপন করিবে।

(৮) প্রাথমিক কমিটির সাধারণ সভা ঊর্ধ্বতন দলীয় সংগঠনের সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে।

(৯) পূর্ববর্তী (২) উপ-ধারায় বর্ণিত সরকারি ও আধা-সরকারি দফতর প্রতিষ্ঠানে এবং সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীতে গঠিত প্রাথমিক কমিটি সরাসরি কার্যনির্বাহী কমিটির তত্ত্বাবধানে কাজ করিবে।

(১০) প্রয়োজনবোধে প্রাথমিক কমিটির কোন সদস্য অন্য কোন কমিটির কাজের সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন, তবে সেখানে তাঁহার ভোট দানের অধিকার থাকিবে না।

(১১) প্রাথমিক কমিটি নিম্নরূপ কর্তব্য পালন করিবে

(ক) ঊর্ধ্বতন কমিটির নির্দেশ কার্যকর করা,

(খ) দলের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলির পক্ষে দফতর, এলাকা, সংস্থা ইত্যাদিতে জনমত সৃষ্টি করা,

(গ) নিজস্ব এলাকার জনকল্যাণকর কাজে নিয়োজিত হওয়া,

(ঘ) দলের পত্রিকা, সাহিত্য প্রকাশনা প্রভৃতি প্রচার ও বিক্রয় করা,

(ঙ) স্থানীয় কর্মীদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা,

(চ) প্রাথমিক কমিটির সদস্যবৃন্দ উৎপাদনমূলক ও জাতিগঠনমূলক কার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবেন।

সপ্তদশ ধারা : জাতীয় দলের বিশেষ সম্মেলন

(১) জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কোন জাতীয় সমস্যা আলোচনাকল্পে যে-কোন সময়ে চেয়ারম্যান দলের বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করিতে পারেন।

(২) চেয়ারম্যান, কাউন্সিলার এবং অন্যান্য ডেলিগেটগণের সমাবেশে বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। তবে বিশেষ সম্মেলনে মোট যোগদানকারী ডেলিগেটের সংখ্যা কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যার দ্বিগুণের অধিক হইতে পারিবে না এবং প্রত্যেক জেলা, অঞ্চল, সংগঠন ও কমিটি হইতে প্রেরিত ডেলিগেটের সংখ্যা উক্ত জেলা, অঞ্চল, সংগঠন, অঙ্গ-সংগঠন এবং সংস্থা হইতে নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য সংখ্যার অধিক হইবে না। কার্যনির্বাহী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য এবং সকল কাউন্সিলার দলের বিশেষ সম্মেলনে পদাধিকারবলে ডেলিগেট হইবেন।

(৩) বিশেষ সম্মেলনের স্থান, তারিখ, আলোচ্য কর্মসূচি ও ডেলিগেট নির্বাচন পদ্ধতি কার্যনির্বাহী কমিটি স্থির করিবেন, তবে পূর্বাহ্নেই এই সকল বিষয়ে দলের চেয়ারম্যানের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

অষ্টাদশ ধারা : কৃষক, শ্রমিক, মহিলা, যুব ও ছাত্র সংগঠন

(১) জাতীয় দলে নিম্নলিখিত অঙ্গ-সংগঠনগুলি থাকিবে এবং উহারা দলের আদর্শ ও নীতি মানিয়া চলিবে :

(ক) জাতীয় কৃষক লীগ,
(খ) জাতীয় শ্রমিক লীগ,
(গ) জাতীয় মহিলা লীগ,
(ঘ) জাতীয় যুবলীগ এবং,
(ঙ) জাতীয় ছাত্রলীগ।

(২) প্রয়োজনবোধে চেয়ারম্যান অন্যান্য ক্ষেত্রেও অঙ্গ-সংগঠন, সংস্থা বা উপ-কমিটি গঠন করিতে পারেন।

(৩) এই অঙ্গ-সংগঠনগুলি কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য সম্পাদন করিবে।

(৪) এই গঠনতন্ত্র কার্যকরী হওয়ার অব্যবহিত পর কার্যনির্বাহী কমিটি (১) উপ-ধারায় উল্লেখিত অঙ্গ-সংগঠনগুলির গঠন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে।

ঊনবিংশতি ধারা : নিয়মাবলি প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন

(১) প্রয়োজনবোধে দলের সর্বতোমুখী কার্যধারা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এই গঠনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) কার্যনির্বাহী কমিটি দলের সমগ্র কার্যাবলির সুষ্ঠু, সমন্বিত, সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনা নিশ্চিত করিবার জন্য আবশ্যক মনে করিলে নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করিতে পারিবে।

বিংশতি ধারা : দলীয় শৃঙ্খলা

(১) দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চেয়ারম্যান একটি উপ-কমিটি নিয়োগ করিবেন। কার্যনির্বাহী বা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এই উপ-কমিটির সদস্য হইবেন।

(২) কোন সদস্য দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, গঠনতন্ত্র, নিয়মাবলি ও দলের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিলে অর্থাৎ দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে শৃঙ্খলা উপ-কমিটি সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত করিয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যানের নিকট সুপারিশ করিবে।

(৩) শৃঙ্খলা সম্পর্কিত উপ-কমিটি কোন সদস্যের বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা-ভঙ্গের ও অসদাচরণের অভিযোগ সরাসরি গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) চেয়ারম্যানের নিকট যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে।

(৫) শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অন্তত পনেরো দিন মেয়াদী কারণ দর্শাইবার লিখিত নোটিশ দিতে হইবে।

(৬) কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে শাস্তি প্রদানের জন্য দলের নিম্নতম যে কোন সংস্থা লিখিত অনুরোধপত্র জেলা কমিটির নিকট পাঠাইবে। জেলা কমিটি এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উক্ত বিষয় বিবেচনাপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শৃঙ্খলা উপ-কমিটির নিকট পাঠাইবে। এতদ্ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে উপযুক্ত বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শৃঙ্খলা উপ-কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৭) শৃঙ্খলাভঙ্গমূলক কোন কাজ করিলে দলের কোন সংস্থা বা সংগঠন উহার অন্তর্ভুক্ত ও অধীনস্থ সদস্যকে সতর্ক করা, নিন্দা করা, এমনকি দল হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে। এই ব্যাপারে উর্ধ্বতন সংস্থা বা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। তবে অনুমোদন না-পাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকিবে। অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা উপ-কমিটির নিকট আপীল করা যাইবে।

(৮) গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ, দলের নীতি ও সিদ্ধান্ত না-মানা, দলের পক্ষে ক্ষতিকর কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকা প্রভৃতি অপরাধে কার্যনির্বাহী কমিটি উহার নিম্নস্তরের যে কোন কমিটি বাতিল করিতে পারে। কোন কমিটি এইভাবে বাতিল হইলে কার্যনির্বাহী কমিটি নতুন নির্বাচন পরিচালনা করিবে বা নতুন কমিটি মনোনীত করিতে পারিবে।

(৯) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের প্রতিকার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(১০) যে কোন শাস্তি প্রদান ও মওকুফ করিবার ক্ষতা চেয়ারম্যানের থাকিবে।

একবিংশতি ধারা : দলের তহবিল

(১) (ক) সদস্যগণের অন্তর্ভুক্তিকালীন দেয় চাঁদা ও অনুদান;
(খ) প্রার্থী সদস্যদের দেয় চাঁদা;
(গ) সংসদে নির্বাচিত সদস্যগণের চাঁদা;
(ঘ) দলীয় পত্রিকা ও সাহিত্যে প্রকাশনা বা পুস্তিকাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;
(ঙ) এককালীন দান বা সাহায্য;
(চ) সরকারি অনুদান বা বাজেট বরাদ্দ।

(২) দলের তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব সেক্রেটারী জেনারেলের উপর ন্যস্ত থাকিবে। এই কার্যে তাহাকে সহায়তাদানের জন্য সরকারি অর্থ উপদেষ্টা ও হিসাবরক্ষক নিয়োগ করা যাইবে।

(৩) দলের ব্যাংক একাউন্ট সেক্রেটারী জেনারেল এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা যৌথভাবে পরিচালনা করিবেন।

দ্বাবিংশতি ধারা : গঠনতন্ত্রের সংশোধন ও ব্যাখ্যা

(১) দলের কাউন্সিল কর্তৃক গঠনতন্ত্রের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা যাইবে। আবশ্যক মনে করিলে পরবর্তী কাউন্সিলের অনুমোদনসাপেক্ষে চেয়ারম্যান গঠনতন্ত্রের প্রথম ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যান গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাদান করিবেন এবং গঠনতন্ত্রের কোন বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ না-থাকিলে সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ত্রয়োবিংশতি ধারা : অস্থায়ী বিধানাবলি

(১) রাষ্ট্রপতির নিম্নবর্ণিত আদেশাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই কেন্দ্রীয় এবং কার্যনির্বাহী কমিটি নিজ নিজ কার্য পরিচালনা করিবে ঃ

(ক) এস. আর. ও, নং ৮৮-এল–২৪শে ফেব্রুয়ারি. ১৯৭৫;
(খ) এস. আর. ও, নং ৮৯-এল–২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫;
(গ) এস. আর. ও, নং ৯০-এল–২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫;
(ঘ) এস. আর. ও, নং ৯১-এল-২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫;
(ঙ) এস. আর. ও, নং ৯২-এল–২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫;
(চ) এস. আর. ও, নং ৯৩-এল-২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫;

(২) জাতীয় দল সম্পর্কিত ইতিমধ্যে গৃহীত সমুদয় ব্যবস্থাদি এবং জারিকৃত অন্যান্য আদেশাবলী এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্বিংশতি ধারা : বিবিধ

(১) চেয়ারম্যান জাতীয় দলের কার্যনির্বাহী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এবং কাউন্সিল অধিবেশনে ও বিশেষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। কোন অধিবেশন বা সভায় তিনি

উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ হইলে উক্ত সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে যে কোন সদস্যকে দায়িত্ব দিতে পারেন।

(২) দলীয় কোন সংগঠন, কমিটি কিংবা সংস্থার কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে তৎস্থলে চেয়ারম্যান নতুন সদস্য নিয়োগ করিতে পরিবেন।

(৩) জেলা, থানা, আঞ্চলিক, ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কমিটিসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো সংশ্লিষ্ট সংস্থার সদস্য সংখ্যার অনুপাতে এবং অন্যান্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) অষ্টাদশ ধারায় বর্ণিত অঙ্গ-সংগঠন, সংস্থা ও কমিটি সর্বতোভাবে, সর্বস্তরে এবং সর্ববিষয়ে জাতীয় দলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃত্বসম্পন্ন কমিটির পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে কার্য সম্পাদন করিবে।

শেখ মুজিবুর রহমান
রাষ্ট্রপতি

বিচারপতি এম.এইচ. রহমান
সচিব

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের
কার্যনির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি

কার্যনির্বাহী কমিটি

১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান–চেয়ারম্যান, ২। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ৩। জনাব এম. মনসুর আলী–সেক্রেটারী জেনারেল, ৪। জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ, ৫। জনাব আবুল হাসানাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, ৬। জনাব আবদুল মালেক উকিল, ৭। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, ৮। শ্রী মনোরঞ্জন ধর, ৯। ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ১০। জনাব মহীউদ্দিন আহমদ, ১২। জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা, ১৩। জনাব জিল্লুর রহমান–সেক্রেটারী, ১৪। জনাব শেখ ফজলুল হক মনি–সেক্রেটারী, ১৫। জনাব আবদুল রাজ্জাক–সেক্রেটারী।

কেন্দ্রীয় কমিটি

১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান–চেয়ারম্যান, ২। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, উপ-রাষ্ট্রপতি, ৩। জনাব এম, মনসুর আলী, প্রধানমন্ত্রী–সেক্রেটারী জেনারেল, ৪। জনাব আবদুল মালেক উকিল, স্পিকার, ৫। জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ, বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য মন্ত্রী, ৬। জনাব আবুল হাসানাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, শিল্পমন্ত্রী, ৭। জনাব মুহম্মদউল্লাহ্, ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী, ৮। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, কৃষিমন্ত্রী, ৯। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শ্রম, সমাজকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী, ১০। শ্রী ফণী মজুমদার, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী, ১১। ড. কামাল হোসেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ১২। জনাব মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, ১৩। জনাব আবদুল মান্নান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী, ১৪। জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ ও বন, মৎস ও পশুপালন মন্ত্রী, ১৫। শ্রী মনোরঞ্জন ধর, আইন সংসদ বিষয়াবলী ও বিচার মন্ত্রী, ১৬। জনাব আবদুল মমিন, খাদ্য বেসামরিক সরবরাহ এবং ত্রাণ পুনর্বাসন মন্ত্রী, ১৭। জনাব আসাদুজ্জামান খান, পাট মন্ত্রী, ১৮। জনাব এম. কোরবান আলী তথ্য ও বেতার মন্ত্রী, ১৯। ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, অর্থমন্ত্রী, ২০। ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রী, ২১। জনাব তোফায়েল আহমদ, রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী, ২২। জনাব শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, চীফ্ হুইপ, ২৩। জনাব আবদুল মমিন তালুকদার, সমবায় প্রতিমন্ত্রী, ২৪। জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী, বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী, ২৫। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী, ২৬। জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর, তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী, ২৭। জনাব মোসলেম উদ্দিন খান, পাট প্রতিমন্ত্রী, ২৮। জনাব মোহম্মদ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী, ২৯। জনাব কে. এম. ওবায়দুর রহমান ডাক, তার ও টেলিফোন প্রতিমন্ত্রী, ৩০। ডা. ক্ষিতীশ

চন্দ্র মণ্ডল, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রতিমন্ত্রী, ৩১। জনাব রেয়াজুদ্দিন আহমেদ, বন, মৎস ও পশু পালন প্রতিমন্ত্রী, ৩২। জনাব এম. বায়তুল্লাহ, ডেপুটি স্পীকার, ৩৩। জনাব রুহুল কুদ্দুস্, রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিব, ৩৪। জনাব জিল্লুর রহমান, এম. পি,-সেক্রেটারী, ৩৫। জনাব মহীউদ্দিন আহমদ, এম. পি, ৩৬। জনাব শেখ ফজলুল হক মনি, সেক্রেটারী, ৩৭। জনাব আবদুর রাজ্জাক, এম. পি, সেক্রেটারী, ৩৮। জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম, ৩৯। জনাব আনোয়ার চৌধুরী, ৪০। বেগম সাজেদা চৌধুরী এম. পি, ৪১। বেগম তসলিমা আবেদ, এম. পি, ৪২। জনাব আবদুর রহিম, দিনাজপুর, ৪৩। জনাব আবদুল আউয়াল, এম. পি, রংপুর, ৪৪। জনাব লুৎফর রহমান এম. পি, রংপুর, ৪৫। জনাব এ. কে. মুজিবুর রহমান, এম. পি, বগুড়া, ৪৬। ড. মফিজ চৌধুরী, এম. পি, বগুড়া, ৪৭। ডা. আলাউদ্দিন এম. পি, রাজশাহী, ৪৮। ডা. আসহাবুল হক এম. পি, কুষ্টিয়া ৪৯। জনাব আজিজুর রহমান আক্কাস্, এম. পি, কুষ্টিয়া, ৫০। জনাব রওশন আলী, এম. পি, যশোর, ৫১। জনাব শেখ আবদুল আজিজ, এম. পি, খুলনা, ৫২। জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ, এম. পি, খুলনা, ৫৩। মি. মাইকেল সুশীল অধিকারী, খুলনা, ৫৪। জনাব কাজী আবুল কাশেম, এম. পি, পটুয়াখালী, ৫৫। জনাব মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ, এম. পি, ফরিদপুর, ৫৬। জনাব শামসুদ্দিন মোল্লা, এম. পি, ফরিদপুর, ৫৭। শ্রী গৌরচন্দ্র বালা, ফরিদপুর, ৫৮। জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা, এম. পি, ঢাকা নগর, ৫৯। জনাব শামসুল হক, এম. পি, ঢাকা। ৬০। জনাব শামসুজ্জোহা, এম. পি, ঢাকা, ৬১। রফিক্উদ্দিন ভূঁইয়া, এম. পি, ময়মনসিংহ, ৬২। জনাব সৈয়দ আহমদ, ময়মনসিংহ, ৬৩। জনাব শামসুর রহমান খান, এম. পি, টাঙ্গাইল। ৬৪। জনাব নুরুল হক, এম. পি, নোয়াখালী, ৬৫। জনাব কাজী জহিরুল কাইউম এম. পি, কুমিল্লা, ৬৬। ক্যাপ্টেন সুজাত আলী, এম. পি, কুমিল্লা। ৬৭। জনাব এম. আর, সিদ্দিকী, এম. পি, চট্টগ্রাম. ৬৮। জনাব এম. এ, ওয়াহাব, এম পি, চট্টগ্রাম, ৬৯। শ্রী চিত্তরঞ্জন সূতার, এম. পি, ৭০। সৈয়দা রাজিয়া বানু, এম. পি, ৭১। জনাব আতাউর রহমান খান, এম. পি, ৭২। জনাব খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, ৭৩। শ্রী মং প্রুসাইন, মানিকছড়ির রাজা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ৭৪। অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ, ৭৫। জনাব আতাউর রহমান, ৭৬। জনাব পীর হাবিবুর রহমান, ৭৭। সৈয়দ আলতাফ হাসেন, ৭৮। জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ, ৭৯। বেগম মতিয়া চৌধুরী, ৮০। হাজী মোহাম্মদ দানেশ, ৮১। জনাব তওফিক ইমাম, সচিব মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, ৮২। জনাব নুরুল ইসলাম, সচিব বহির্বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ৮৩। জনাব ফয়েজউদ্দিন আহমদ, সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ৮৪। জনাব মাহবুবুর রহমান, সচিব, সংস্থাপন বিভাগ, ৮৫। জনাব আবদুল খালেক, উপ-রাষ্ট্রপতির সচিব, ৮৬। জনাব মুজিবুল হক, সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ৮৭। জনাব আবদুর রহীম, রাষ্ট্রপতির সচিব, ৮৮। জনাব মইনুল ইসলাম, সচিব, পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও শহর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ৮৯। জনাব সাঈদুজ্জামান, সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ৯০। জনাব আনিসুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ৯১। ড. এ. সাত্তার রাষ্ট্রপতির সচিব, ৯২। জনাব এম. এ. সামাদ, সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ৯৩। জনাব আবু তাহের সচিব, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়, ৯৪। জনাব আল হোসায়নী, সচিব, বিদ্যুৎ শক্তি মন্ত্রণালয়, ৯৫। ডা. তাজুল হোসেন, সচিব, স্বাস্থ্য

মন্ত্রণালয়, ৯৬। জনাব মতিউর রহমান, চেয়ারম্যান, টি. সি. বি, ৯৭। মেজর জেনারেল কে. এম. শফিউল্লাহ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান, ৯৮। এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খোন্দকার, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান, ৯৯। কমোডর এম. এইচ. খান. বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান, ১০০। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বি. ডি. আর, ১০১। জনাব এ. কে. নাজিরউদ্দিন আহমদ, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ১০২। ড. আবদুল মতিন চৌধুরী, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৩। ড. মাযহারুল ইসলাম, উপাচার্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৪। ড. মুহম্মদ এনামুল হক, উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৫। জনাব এ. টি. এম সৈয়দ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, সংস্থাপন বিভাগ, ১০৬। জনাব নূরুল ইসলাম, আই. জি. পুলিশ, ১০৭। ড. নীলিমা ইব্রাহীম, ১০৮। ডা. নূরুল ইসলাম, পরিচালক, পি. জি. হাসপাতাল, ১০৯। জনাব ওবায়দুল হক, সম্পাদক, বাংলাদেশ অবজারভার, ১১০। জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সম্পাদক, ইত্তেফাক, ১১১। জনাব মিজানুর রহমান, প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক বি, পি, আই, ১১২। জনাব মনোয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম-সচিব রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, ১১৩। ব্রিগেডিয়ার এ. এন. এম. নূরুজ্জামান, পরিচালক, জাতীয় রক্ষীবাহিনী, ১১৪। জনাব কামারুজ্জামান, সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, ১১৫। ডা. মাজহার আলী কাদরী, বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতির সভাপতি।

স্বৈরাচারী একনায়কত্ব বাঙালি মানে না*

* সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসীবাদ বিরোধী ঐক্য গড়ে তোল
* একদলীয় ফ্যাসীস্ট সরকার উৎখাত কর
* গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার গঠন কর
* গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার কায়েম কর
* গণমুখী অর্থনীতি গড়ে তোল

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশে আজ এক মহাক্রান্তিকাল।

শেখ মুজিব আজ দেশের সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। এক দলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েমের মাধ্যমে শেখ মুজিব গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে এবং মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণ অপহরণ করেছে। পার্লামেন্ট, মন্ত্রীসভা, এমনকি তথাকথিত জাতীয়দলও সম্পূর্ণ স্বকীয়তাহীন, ক্ষমতাহীন এবং শেখ মুজিবের খেয়াল–খুশী চরিতার্থ করার রবার ষ্টাম্প মাত্র।

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নিপীড়িত মানুষ আইনতঃ আর অন্ন বস্ত্রের জন্য আন্দোলন করতে পারবে না। পারবে না নির্যাতন ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। ক্ষমতাসীন চক্রের দুর্নীতি, দালালীর বা লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে আর কেউ কোন কথা উচ্চারণ করতে পারবে না ; প্রকাশ করতে পারবে না নিজেদের কোন মতামত। অন্যায় বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনের নিরপেক্ষ আশ্রয়ও নিতে পারবে না কেউ। দেশের শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী-পেশাদার মানুষ, বাস্তুহারা-দিনমজুর, সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী, দরিদ্র মধ্যবিত্ত প্রতিটি মানুষকে শেখ মুজিবের খেয়াল খুশী, স্বেচ্ছাচারিতা ও করুণার উপর নির্ভর করেই যতোদিন সম্ভব বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

আইন আদালতের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতাও আজ বিনষ্ট। প্রতিরক্ষা বাহিনী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আমলাতন্ত্রের সদস্যেরা আজ্ঞামাত্রই তথাকথিত জাতীয় দলে যোগদান করতে এবং শেখ মুজিবের তল্পিবহন করতে বাধ্য। অন্যথায় হারাতে হবে চাকুরি, বরণ করতে হবে কারাজীবন, এমনকি গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেওয়ার জন্যও সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

শেখ মুজিবের সর্বময় ক্ষমতা দখলের পেছনে মদত যুগিয়েছে মার্কিন-রুশ ও ভারতের ত্রয়ীচক্র। তাদের উদ্দেশ্য দ্রুত বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে যে কোন মূল্যে পিষে ফেলা এবং সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ অব্যাহত রাখা।

---

* পুস্তিকা, (আনুমানিক) ১৯৭০, সংগঠনের নাম নেই।

দেশের প্রতিক্রিয়াশীল, গণবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী সংশোধনবাদী এজেন্টদেরও জাতীয় দলে নেওয়ার অপচেষ্টার মাধ্যমে শেখ মুজিব দেশবাসীকে এবং পৃথিবীকে দেখাতে চায় যে তার আন্তরিকতা আছে, সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে 'উপযুক্ত' লোকেরা নিয়ে সে সরকার গঠন করেছে। কিন্তু এই 'উপযুক্ত' লোকেরা যে আসলে মেরুদণ্ডহীন ও গণবিরোধী এবং তাদের কোন গুরুত্বই যে জাতীয় দল বা সরকারে থাকবে না তা বুঝতে সরল প্রাণ মানুষদের হয়তো কিছুদিন সময় লাগবে ; জনগণ হয়তো আশা করবে এইবার বুঝি তাদের ভাগ্যে সুখ আসছে। জনগণ আশায় আশায় আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে চাইবে, আর এই সুযোগেই শেখ মুজিব সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করে তুলবে।

এটা সকলেরই জানা কথা যে, বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় থেকে কলকারখানা বা কোন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করলে সেটাও হয় পুঁজিবাদ। অথচ শেখ মুজিবেরা সেটাকেই সমাজতন্ত্র বলে চালানোর চেষ্টা করে ইতিমধ্যেই কিছুসংখ্যক সরল নাগরিকের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করেছে। এখন তারা সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়ে, সেটাকে সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্যর্থ করে দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইবে যে সমাজতন্ত্র এদেশে অচল। সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির হাতে ক্ষমতা না আসলে যে সমাজতন্ত্র কায়েমের কোন প্রশ্নই আসে না– এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে ধামাচাপা দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য।

যারা শেখ মুজিবের স্বৈরাচার, তার দলবলের অবাধ লুণ্ঠন, নির্যাতন ও ভাঁওতা ; তাদের প্রভু মার্কিন-রুশ-ভারতচক্রের চক্রান্তসমূহের প্রতিবাদ করবে এবং যারা জনতার খাদ্য-বস্ত্র ও বাঁচার দাবী নিয়ে সোচ্চার হবে তাদেরকে যত্রতত্র গুলি করে হত্যা করার জন্যও তারা নীল নক্সা তৈরি করেছে। সেই নীলনক্সা ইতিমধ্যে কার্যকরী করতেও শুরু করেছে। যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী শেখ মুজিবের তল্পিবহন করতে রাজী হবে না, তাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলাই হলো শেখ মুজিবের পরিকল্পনা।

অথচ এই শেখ মুজিবই একদিন গণতন্ত্রের কথা বলতো। হিটলার-মুসোলিনী যে পথে গেছে আয়ুব-ইয়াহিয়াও সেই পথে যাবে বলে তারস্বরে ঘোষণা করতো। অথচ আজ সেই শেখ মুজিবই আয়ুব-ইয়াহিয়ার চেয়েও বহুগুণ ঘৃণ্যতর স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্বের পথই গ্রহণ করলো। পৃথিবীর প্রতিটি ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের ধ্বংসাত্মক পরিণতি চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও সে কেন এই পথে পা দিল তা আজ অবশ্যই জনগণকে উপলব্ধি করতে হবে।

শেখ মুজিব বলেছিল যে ক্ষমতায় গেলে ২০ টাকা মণ দরে চাউল, আড়াই টাকা সের দরে সরিষার তেল এবং দেড় টাকা সের দরে চিনি খাওয়াবে। শেখ মুজিব সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেনি। শেখ মুজিব বলেছিল একটি লোককেও সে না-খেয়ে মরতে দেবে না। অথচ বাংলাদেশে পথে-ঘাটে আজ হাজার হাজার বেওয়ারিশ লাশ, ডাষ্টবিনে মানুষে-কুকুরে কাড়াকাড়ি এবং শহরে-গ্রামে সর্বত্র কঙ্কালের মিছিল। শেখ মুজিব আশা দিয়েছিল তিন বছর ধৈর্য্য ধরলেই সে জনগণকে খাদ্যবস্ত্র আর সুখ শান্তি দেবে। তিন বছর পার হয়ে গেছে ; শেখ মুজিব খাদ্যবস্ত্র দেয় নাই ; দুর্ভিক্ষ আর

বেওয়ারিশ মৃত্যু; সুখ-শান্তিও সে দিতে পারে নাই ; দিয়েছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান হুমকি। অথচ দেশের কোটি মানুষ যখন বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পর্যুদস্ত তখন ক্ষমতাসীন চক্রের ছোট-বড় কর্তারা শতশত কোটি টাকার মালিক হয়েছে, বিদেশী ব্যাংকে টাকা জমিয়েছে এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আরাম-আয়েশ উপভোগ করছে।

দেশের কলকারখানা ধ্বংস হতে চলেছে। পাট-চামড়া ইত্যাদি রফতানিযোগ্য পণ্যের বিশ্ব বাজার আজ বাংলাদেশের হাতছাড়া। বৈদেশিক মুদ্রার চরম ঘাটতি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী ক্রমহ্রাসমান। শতকরা ৫০০/৬০০ ভাগ হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। খাদ্যবস্ত্রসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েছে গড় ৮/১০ গুণ। দ্রব্যমূল্যের সংগে শতকরা ৯২ জন মানুষের আয়ের কোন সংগতি নেই। দেশের উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রায়-অনুপস্থিত।

একটা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, জনগণের দুর্ভোগ যখন মাত্রাহীন হয়ে পড়ে, লুণ্ঠন-দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারে দেশ যখন ছেয়ে যায়, অবস্থা যখন শোষিত-মেহনতি মানুষের সহ্যের সকল সীমা অতিক্রম করে,– তখন স্বভাবতই গড়ে ওঠে দুর্বার গণবিদ্রোহ, দিকে দিকে প্রজ্বলিত হয় বিপ্লবী আন্দোলনের লাল আগুন।

গত তিন বছরের কুশাসন, দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের দরুণ বাংলাদেশেও সৃষ্টি হয়েছে সেই একই অবস্থা। কৃষকদের মধ্যে গড়ে উঠছে প্রতিরোধ। প্রতিরোধ গড়ে উঠছে শ্রমিক-দিনমজুর-নিম্নআয়ী কর্মচারীসহ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। ক্ষুধার্ত জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছিনিয়ে নিচ্ছে অত্যাচারীর অস্ত্র, ছিনিয়ে নিচ্ছে সরকারি গুদাম আর জোতদারের গোলার ধান। ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত নেমে এসেছে রাস্তায়,– সামিল হয়েছে মেহনতি মানুষের কাতারে। কারখানায় কারখানায় সূচনা ঘটেছে আন্দোলনের। বাঁচার জন্য দেশের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে আন্দোলনের যে অভূতপূর্ব তীব্রতার সৃষ্টি হয়েছে,– তাকে প্রশমিত করার সাধ্য শেখ মুজিবের নেই। শেখ মুজিব সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ অক্ষম। সুতরাং বিদ্রোহের আগুন দিনদিন ছড়িয়ে পড়বে এবং অদূর ভবিষ্যতে শাসক-শোষকগোষ্ঠির ধ্বংস ডেকে আনবে এটা অবধারিত। শেখ মুজিব আজ পৌঁছে গেছে দড়ির শেষ প্রান্তে। তাই, কায়েমী স্বার্থ আর টিকিয়ে রাখা যাবে না। গদী হারাতে হবে। জনতার আদালতে জবাবদিহি করতে হবে এবং ইতিহাসের অমোঘ রায়ের মুখোমুখি হতে হবে– এই ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত শেখ মুজিব একদলীয় স্বৈরাচারের ষ্টীম রোলারের নিচে জনতার আন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। সে সীংম্যান রী বাতিস্তাদের মতোই মনে করছে নৃশংসতার মাধ্যমে যতোদিন টিকে থাকা যায়, ততোদিনই লাভ।

সমাজতন্ত্রের ভয়ে আতংকিত সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী ও আধিপত্যবাদী গোষ্ঠিও আজ শেখ মুজিবকে মদত যোগাতে বদ্ধপরিকর। তারা শেখ মুজিবকে আশ্বাস দিচ্ছে : তুমি একদলীয় সরকার কায়েম করো, গণতান্ত্রিক সমস্ত পথ বন্ধ করে দাও, সমাজতন্ত্রকে ঠেকাতে হলে সমাজতান্ত্রিক প্রোগ্রাম দাও এবং তাকে ব্যর্থ করো, কিছু কিছু লোক দেখানো সংস্কারমূলক কাজে হাত দাও, দরকার হলে নিজের দলের দু'একজনকে শাস্তি

দিয়ে জনতার বাহবা পাও- এবং অন্যদিকে জনতা ও জনতার রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের ওপর চরমতম নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালিয়ে দাও ; তাহলে দেখবে জনগণ আরও কিছুদিন আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় দুলবে ; আর এই সুযোগেই তুমি তোমার শক্তি একচ্ছত্র করে নাও,- আমরাতো তোমার সংগে আছি।

শেখ মুজিব জানে দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা বিধান করা কিংবা ভবিষ্যতের কোন নিশ্চয়তা দেওয়ার এতটুকু সাধ্য তার নেই। ফলে জনতাকে আর তার ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং জনগণকে ধোঁকা দিয়ে কিছুদিন ঠেকিয়ে রেখে এই সুযোগে সৃষ্টি করতে হবে একটি বশংবদ পুঁজিপতি শ্রেণী। আমলাতন্ত্র ও দেশরক্ষা বাহিনীর কর্তাদেরও টানতে হবে এবং এদেরই ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

সাড়ে সাত কোটি মানুষের মূল্যে একটি শক্তিশালী পুঁজিপতি শ্রেণী সৃষ্টি করতে হলে চাই পুঁজি বিনিয়োগের উপযোগি পরিবেশ। এই পরিবেশের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো একটি স্থিতিশীল ও শক্তিমান বুর্জোয়া সরকার। অন্যদিকে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে পুঁজিপতিদের ফুলে-ফেপে ওঠার জন্য চাই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাহায্য। আবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও পুঁজি বিনিয়োগের প্রাক্কালে যে ক'টি পূর্বশর্ত বিবেচনা করে তার প্রধানটি হলো সংশ্লিষ্ট দেশে একটি স্থিতিশীল সরকার আছে কিনা,-যে সরকার তাদের সহায়তায় জনতার আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিতে এবং সমাজতন্ত্রকে ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ। অর্থাৎ একদিকে ক্ষমতার ভিত্তিস্বরূপ একটি শক্তিশালী পুঁজিপতি শ্রেণী সৃষ্টি এবং অপরদিকে বিদেশী প্রভুদের কৃপা লাভের মাধ্যমে গদী আঁকড়ে রাখার যে প্রাণান্তকর প্রয়াস,-শেখ মুজিবের একদলীয় ফ্যাসীস্ট সরকার কায়েমের মধ্যে সেই প্রয়াসেরই উলঙ্গ প্রতিফলন।

কিন্তু আমরা জানি, এই ঘৃণ্য প্রয়াসের মাধ্যমে শেখ মুজিব বড় জোর জনতার একটা অংশকে কিছুদিন বিভ্রান্ত করতে পারবে, কিছু মানুষকে হত্যা করতে পারবে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা আপাত-নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করতে পারবে। কিন্তু এর দ্বারা বস্তুত কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। শেষপর্যন্ত ঠেকানো যাবে না অবশ্যম্ভাবী গণআন্দোলনকে, ঠেকানো যাবে না শাসক-শোষকগোষ্ঠির অনিবার্য পতনকে। পৃথিবীর কোন স্বৈরাচারী একনায়কই শেষপর্যন্ত টেকেনি; শেখ মুজিবও টিকবেনা; শোষিত নিপীড়িত মানুষের চেতনা ও আন্দোলনকে কেউই শেষপর্যন্ত ধামাচাপা দিতে পারেনি, শেখ মুজিবও পারবে না। ইতিহাসের ধারা পাল্টানো শেখ মুজিবদের সাধ্যের বাইরে।

একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন কায়েমের মাধ্যমে শেখ মুজিব যা করলো তাতে জনগণের বা জনতার সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। বরং এটা অত্যন্ত আশার লক্ষণ।

একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন একথাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে দেশের বাস্তব অবস্থা এমনই চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে টিকে থাকার শেষ চেষ্টা হিসাবে এই ইতিহাসধিকৃত পথ গ্রহণ করা ছাড়া শেখ মুজিবের গত্যন্তর নেই। শেখ মুজিব দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে, সে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে, মৌলিক অধিকার নিশ্চিহ্ন করেছে,

আদালতের স্বাধীনতা হরণ করেছে, বিরোধীদলকে বেআইনী ঘোষণা করছে এবং বর্বরতম নিষ্পেষণে নেমেছে। কিন্তু এবার যখন জনতা রুখে দাঁড়াবে তখন শেখ মুজিব আর কি করবে? ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়া ছাড়া আর কিছু কি তার করার আছে? তাই শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে আজ হুঙ্কার ছাড়ছে আর সভয়ে অপেক্ষা করছে শেষ ধাক্কাটির,– যে ধাক্কায় ধূলিসাৎ হবে স্বৈরাচারের সকল ভিত্তি, নিশ্চিহ্ন হবে প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণী এবং কায়েম হবে যথার্থ শোষিত মানুষের রাজ।

সুতরাং এই শেষ ধাক্কাটি দেওয়ার জন্যই আজ জনগণকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সকল ভয়ভীতি ও রক্তচক্ষুর হুমকিকে উপেক্ষা করে অব্যাহত রাখতে হবে বাংলাদেশের মানুষের বিপ্লবী ঐতিহ্য। শ্রমিক-কৃষক-দিনমজুর, ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী, পেশাদার মানুষ ও ব্যবসায়ীসহ দেশের সকল দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষকে আজ আপোষহীন সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে।

শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; বিপ্লবী দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে, শ্রমিক ছাটাই, ট্রেড ইউনিয়নে সরকারি ও সরকারদলীয় হস্তক্ষেপ, লক আউট ঘোষণা ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে কোন মূল্যে আদায় করতে হবে দ্রব্যমূল্যের সংগে সংগতিপূর্ণ মজুরী, বোনাস এবং ধর্মঘটের অধিকারসহ প্রতিটি ন্যায়সংগত দাবী।

ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কৃষকদের। আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে আদায় করতে হবে সার, বীজধান, জলসেচ, সহজ কিস্তীর দীর্ঘ মেয়াদী ঋণসহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা। রুখে দাঁড়াতে হবে রেশনের বন্দোবস্ত না করে লেভী তোলার বিরুদ্ধে।

ছাত্র সমাজকে লড়তে হবে বেতন বৃদ্ধি, আবাসিক সমস্যা, পাঠ্য-পুস্তকের উচ্চমূল্য অস্বাভাবিক খাদ্য খরচসহ প্রতিটি অন্তরায়ের বিরুদ্ধে, অব্যাহত রাখতে হবে ছাত্র-সমাজের যুগযুগের ঐতিহ্য, চেতনা ও মূল্যবোধ, যে কোন মূল্যে সমুন্নত রাখতে হবে শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের রক্তপতাকা।

মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ীসহ প্রতিটি পেশাদার মানুষকেও বেছে নিতে হবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথ, লড়তে হবে দৈনন্দিন আর্থিক ও স্ব স্ব পেশা সংক্রান্ত সমস্যার বিরুদ্ধে, সুনিশ্চিত করতে হবে নিজের এবং বংশধরদের ভবিষ্যৎ।

সংবাদিকদের রুখে দাঁড়াতে হবে সংবাদপত্র হ্রাস, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও সাংবাদিক ছাঁটাইসহ প্রতিটি মৌলিক অধিকার বিরোধী স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

বাস্তুহারাদের আপোষহীন সংগ্রাম চালাতে হবে পুনর্বাসন, জীবিকার নিশ্চয়তা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকার আদায় করার উদ্দেশ্যে।

শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদেরও গ্রহণ করতে হবে দুর্বার আন্দোলনের পথ। লড়তে হবে ক্ষুধা এবং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। গড়ে তুলতে হবে যথার্থ মূল্যবোধ, নিজ নিজ কর্মে বিধৃতি ঘটাতে হবে আপামর জনতার চিন্তা ও চেতনার। সর্বোপরি যুগবিবেক এবং গণ আন্দোলনের সংগে ঘোষণা করতে হবে সর্বাত্মক একাত্মতা।

প্রতিটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা কর্মী এবং মুক্তবুদ্ধি নাগরিককে পালন করতে হবে যুগ দায়িত্ব। সংস্কার, সংকীর্ণতা, উন্নাসিকতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব আবেগ-মোহ, বামপন্থী ও ডানপন্থী সুবিধাবাদ ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। গ্রহণ করতে হবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ঐতিহাসিক পথ।

জনতাকেই নিতে হবে সমাজের ভালোমন্দের পূর্ণ দায়িত্ব। সমাজ থেকে কালোবাজারী, চোরাচালান, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরী, ঘুসখোরী, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও রিলিফচুরিসহ যাবতীয় দুষ্টক্ষতের মূলোৎপাটন করতে হবে।

দেশের প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি মহল্লা, প্রতিটি বস্তি ও প্রতিটি কারখানাকে এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। স্বৈরাচারী শোষকের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে সর্বাত্মক প্রতিরোধ।

সমগ্র জনতা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ায় তাহলে কি করতে পারে পুলিশ, মিলিটারী, রক্ষীবাহিনী? একেতো জনতার বিরুদ্ধে লড়াই করে পৃথিবীর কোন বাহিনীই কোনদিন জয়ী হতে পারেনি; অপরদিকে তারা লড়বেই বা কার বিরুদ্ধে? তারা তো শোষিত জনতারই সন্তান।

সংগে সংগে ক্ষমতাসীন চক্রের প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, রাশিয়ার সংশোধনবাদ ও আধিপত্যবাদী ভারতের সকল অশুভ পায়তারা ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও প্রতিটি বাঙালিকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এদেশে ভিয়েৎনামের পুনরাবৃত্তি কোনক্রমেই বরদাস্ত করা যাবে না। এদেশকে না চিলি, মেক্সিকো কিংবা অশান্ত পেরু।

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ এবং গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে আজ সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসীবাদ বিরোধ দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে; সৃষ্টি করতে হবে দুর্বার আপোষহীন গণআন্দোলন; সকল সন্ত্রাস ও নির্যাতনের বলিষ্ঠ মোকাবেলার মাধ্যমে একদলীয় ফ্যাসীস্ট সরকারকে উৎখাত করতে হবে, গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার কায়েমের মাধ্যমে সত্যিকার গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং যথার্থ গণমুখী অর্থনীতি কায়েম করে খাদ্যসহ জনগণের বেঁচে থাকার প্রতিটি উপকরণের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

সুতরাং আসুন আমরা যে কোন মূল্যে,
গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার গঠন করি,
গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার কায়েম করি, এবং
গণমুখী অর্থনীতি গড়ে তুলি। এবং তার জন্য–
সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসীবাদ বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলি এবং
একদলীয়-ফ্যাসীস্ট সরকারকে উৎখাত করি।

স্বৈরাচারী শোষকের ধ্বংস আর নিপীড়িত জনতার মুক্তির আজ যুগ সন্ধিক্ষণ। হয় তারা টিকে থাকবে না হয় আমরা। আসুন, এই যুগ সন্ধিক্ষণের মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমরা সাহসিকতার সঙ্গেই পালন করি এবং আন্দোলনের তীব্রতার মুখে স্বৈরাচারী শোষকের অস্তিত্ব বাংলার মাটি থেকে চিরতরে মুছে ফেলি।

ইতিহাস আমাদের পক্ষে।
বিজয় আমাদের অনিবার্য্য।

‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ-১৯৭৩’ পরিবর্তন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের প্রস্তাব*

সদস্যবৃন্দ,

স্বাধীনতা অর্জনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আজ শেষ হয়েছে, শেষ হয়েছে প্রথম বিপ্লবের। দেশ ও জাতি আজ দ্বিতীয় বিপ্লবের পথে। দেশ গড়ার জন্য যে কঠিন সংগ্রামের প্রয়োজন তারই অপর নাম দ্বিতীয় বিপ্লব। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনই এই বিপ্লবের মূলমন্ত্র। দ্বিতীয় বিপ্লবের এই মহালগ্নে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি ভূমিকা হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। কারণ, সিনেট এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা নির্ণয়কারীদের অন্যতম। কিন্তু ভূমিকা নিরূপণ করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে অতীতে, কেননা, অতীত ঐতিহ্যকে বর্তমান প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে, নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কতটুকু গ্রহণ করা যায় বা কতটুকু বর্জন করা যায়–তা বিচার করে দেখা দরকার। এই উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে উচ্চশিক্ষার আলোক-বর্তিকা জ্বালাবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়। এর রূপরেখা নির্ণীত হয়েছিল ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুকরণে। কিন্তু সে আমলে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর বেলায় ঠিক তা করা হয়নি। তাই, জন্মলগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল। ঐতিহ্যবাহী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি ও কলেবর আজ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে ছাত্রসংখ্যা আটশত থেকে পনের হাজারে দাঁড়িয়েছে, শিক্ষক সংখ্যা সাড়ে সাত শতের উপরে, বাৎসরিক ব্যয় লক্ষ থেকে কোটিতে এসেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য, মূল বিষয়বস্তু ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নি। এই ধ্যানধারণা ও মানসিকতার উচ্চ শিখর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে নেমে আসতে হবে দেশের জনতার মাঝে, চলতে হবে তাঁদের সঙ্গে একই সমতলে। কারণ জ্ঞান-সাধনা আজ আর ব্যক্তি-সন্তুষ্টির জন্য নয়, সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার রুদ্ধ প্রবাহকে নিয়ে আসতে হবে দুর্দশাগ্রস্ত অগণিত মানুষের মাঝে যাঁদের দানেই পরিপুষ্ট হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর। এ দানের প্রতিদান দিতেই হবে। বহুযুগের অবহেলা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিণাম স্বরূপ এ দেশ ও দেশের মানুষ আজ অগণিত সমস্যায় জর্জরিত। তাই বিশ্ববিদ্যালয়কে বেরিয়ে আসতে হবে তার সীমাবদ্ধ গণ্ডী থেকে ; শিক্ষা ও গবেষণাকে করতে হবে বাস্তবমুখী, গণজীবনমুখী। মানুষকে চিনতে হবে, জানতে হবে। তাঁদের প্রকৃত সমস্যাকে নির্ণয়

* সিনেট রিপোর্ট ২৮ জুন ১৯৭৫

করে, দিতে হবে সমাধানের পথ-নির্দেশ। এ দেশের মানুষের জীবনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, কল্যাণের জন্য আবিষ্কার করতে হবে নূতন তত্ত্ব। দেশের শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসে কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ব্যতীত জাতি বাঁচতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় সাধনা, গবেষণা ও শিক্ষানুশীলনের মাধ্যমে তার প্রভাব বিস্তার করে জাতীয় চরিত্রকে করে তুলবে সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ, সৃষ্টি করবে নূতন দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অর্থনীতি। শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞান-সাধনা–এ যুগের শেষ হয়েছে ; এখন মানুষের মঙ্গলের জন্যই জ্ঞান। সুতরাং দ্বিতীয় বিপ্লবকে সার্থক করে তোলার প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে এক সুমহান দায়িত্ব ও বিশিষ্ট ভূমিকা। দায়িত্ব যত কঠিনই হোক না কেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অতীতে কোন দিনই পিছিয়ে থাকেনি, আজও থাকবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছিল এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রসৈনিক ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ গড়ার অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস হবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ই।

দেশের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণাকার্য, তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, অনুষদ ও ইনষ্টিটিউট দেশের উন্নয়ন ও পরিকল্পনায় তাঁদের অবদান রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, এ দেশের অনুন্নতির ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। তার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ হয়ে উঠে সুস্পষ্ট ও সহজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনষ্টিটিউট পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে। উন্নয়ন ও পরিকল্পনাকে কার্যকর ও সফল করতে হলে সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয় ও সমাধানের ভিত্তি স্বরূপ ব্যাপক মানসিকতার সৃষ্টি–এ দু'কাজের ভারই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হবে। আমার আশা, এ ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয় তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করবে।

আমাদের সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য সীমিত, অনেক আশা কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা ব্যাহত করে আমাদের চলার গতি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, গত সিনেট অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি নিয়ে বিশেষ এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। এ ঘাটতির প্রধান কারণ নূতন শিক্ষক নিয়োগ, সম্প্রসারণ ও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ, অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বেতনের স্কেল পরিবর্তন, বাড়ি ভাড়া ভাতা বৃদ্ধি, ছাত্রদের জন্য বাড়তি বৃত্তিদান, শিক্ষক ও কর্মচারীদের পক্ষ হতে আয়কর প্রদান, গ্রুপ জীবনবীমার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয় টাকার পরিমাণ দ্বিগুণকরণ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে আজ বানচাল করবার প্রয়াস পাচ্ছে তা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্বাভাবিকভাবেই নিষ্কৃতি পায়নি। তা সত্ত্বেও ব্যয় সঙ্কোচের প্রচেষ্টার ফলে প্রাককলিত বাজেটের ৭৯ লক্ষ টাকার ঘাটতি সংশোধিত বাজেটে প্রায় ৩১ লক্ষ টাকায় কমিয়ে আনা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন দিকে ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা করেছি। ব্যয় বৃদ্ধির সূচনা অনেক পূর্বেই হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যয় বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১৯৭৩-৭৪ সালের ৫৩% ব্যয় বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৯% এবং ১৯৭৫-

৭৬ সালের মূল বরাদ্দে ১৪% এ দাঁড়িয়েছে। ব্যয়-হ্রাস এবং আয়-বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে সচেতন ; এ সম্পর্কে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। মোটের উপর, আমাদের আর্থিক অবস্থা একেবারে অসহনীয় না হলেও সচ্ছল নয়।

এ প্রসঙ্গে আমি আরও একটি কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই, কেউ কেউ এই ধারণা করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন খাতে অনেক বেশি টাকা খরচ হয়। এ কথা সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় না। ব্যয়ের খাতগুলোকে শিক্ষা, গবেষণা ও ছাত্রকল্যাণ ; প্রশাসনিক এবং রক্ষণাবেক্ষণ ; বিদ্যুৎ, চিকিৎসা ইত্যাদি কমন সার্ভিসেস–এ তিন ভাগে ভাগ করলে দেখা যাবে যে শিক্ষা, গবেষণা ও ছাত্রকল্যাণ খাতে ব্যয় ৭১%, প্রশাসনিক খাতে ১০% এবং কমন সার্ভিসেস খাতে ১৯%। একথা আমাদের বুঝতে হবে যে শিক্ষক ও ছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ কাজের সহায়ক হিসেবে রয়েছে প্রশাসন। দুটোকে আলাদা করে দেখা ঠিক হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে একটি সুসংবাদ দিতে চাই। বাংলাদেশ সরকারের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৬০০ লক্ষ টাকার যে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছিল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ তা পুরোপুরি অনুমোদন করেছেন। এজন্য আমার পক্ষ হতে এবং আপনাদের সকলের পক্ষ হতে বাংলাদেশ সরকারের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি একান্তভাবে আমাদের কাম্য। প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান তাদেরকেও দেয়া উচিত। কিন্তু এ দেশের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার ও বিশেষ বিবেচনা দানের জন্য দাবী আমি পূর্বেও করেছি এবং সবসময়ই করবো। ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৫০ লক্ষ টাকার বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট মঞ্জুরী কমিশনের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু কমিশন আজ পর্যন্ত ১১০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে। বিভিন্ন হল সম্প্রসারণ, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও ফলিত রসায়ন বিভাগ ভবন সম্প্রসারণ, বিশ্ববিদ্যালয় ১ নং ছাত্রাবাস নির্মাণ বিশেষ জরুরী ভিত্তিতে করতে হয়েছে। আগামী ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্য ২৫০ লক্ষ টাকার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মঞ্জুরী কমিশনের নিকট পেশ করা হয়েছে।

সদস্যবৃন্দ,

যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় একটি গতিশীল ও ক্রমবর্ধমান জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এর দায়িত্ব অনেক এবং এই দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ করার যে কোন প্রচেষ্টা জাতীয় মঙ্গলের পরিপন্থি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরো অনেক বেশি। স্বাধীনতার আগে ও স্বাধীনতাউত্তর কালে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। আমাদের সমস্যা ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এর মানে হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয় চলমান। অন্যথায় এ মৃতের সমান। তাই এই বিশেষ দায়িত্ব পালনে আপনাদের সমালোচনা ও সহযোগিতা আমাদের সকলের কাম্য।

আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করতে চাই না। আপনারা মূল্যবান সময় নষ্ট করে এই বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছেন, সেজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করি।

জয় বাংলা
জয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব চেয়ারম্যান কর্তৃক আনীত বিশেষ প্রস্তাব

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলিক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশে গত ২৫শে জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েম করা হইয়াছে। উল্লেখিত বিল দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় চারটি মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি একক জাতীয় দল 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' গঠন করিয়াছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই জাতীয় দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। গত ৭ই জুন বঙ্গবন্ধু জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন এবং দলের কার্যনির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও পাঁচটি অঙ্গ-সংগঠনের কমিটি গঠন করিয়াছেন। ফলে দেশের মধ্যে এক দলীয় রাজনীতির সূচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি এই সকল মৌলিক পরিবর্তন সমূহের লক্ষ্য ও আদর্শ ঘোষণা করিয়াছেন। গত ২৫শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে, গত ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক জনসভায়, গত ৭ই জুন বাকশালের গঠনতন্ত্রে এবং ১৯শে জুন বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সভাপতির ভাষণে রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান শেখ মুজিবুর রহমান নতুন ব্যবস্থার লক্ষ্য ও আদর্শ এবং কর্মসূচি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এই যুগান্তকারী পরিবর্তনকে দ্বিতীয় বিপ্লব হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

যেহেতু দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং প্রগতির স্বার্থে এই সকল পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে ;

এবং যেহেতু এই মৌলিক পরিবর্তন এবং বঙ্গবন্ধু উপস্থাপিত নতুন লক্ষ্য ও কর্মসূচিগুলির মধ্য দিয়া জাতির দীর্ঘদিনের আশা আকাঙক্ষা বাস্তবভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং যেহেতু দেশকে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ও ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্যে অগ্রসর করিতে হইলে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে একটি অভিন্ন লক্ষ্যে আগাইয়া যাইবার প্রয়োজনীয়তা সবচাইতে বেশি অনুভূত হইয়াছে ;

এবং যেহেতু আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংরক্ষণ, সংহতকরণ এবং দেশকে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে ;

এবং যেহেতু দেশের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষসহ শোষিত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দেশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে ;

এবং যেহেতু সেই পথে যাত্রা শুরু করিতে হইলে মেহনতী শ্রমজীবী মানুষের দল গড়িয়া তোলা এবং ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক ও সমাজ ব্যবস্থা ভাংগিয়া ফেলিয়া স্বাধীন দেশের উপযোগী নতুন প্রশাসনিক ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা একান্তই অপরিহার্য্য;

এবং যেহেতু বিগত দিনে এদেশের জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে সকল আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবদীপ্ত ভূমিকা রহিয়াছে এবং জাতীয় স্বার্থে এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে ;

সেইহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট এই দৃঢ়মত পোষণ করে যে–

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির লক্ষ্যে দেশের এই যাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে আরও ঐতিহ্যমণ্ডিত করিতে হইবে ;

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে, ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং ১৯শে জুন বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উল্লেখিত কর্মপন্থা, লক্ষ্য ও কার্যসূচি এবং ১৯৭৫ সনের ৭ই জুন ঘোষিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্মসূচির ঘোষণাকে সমর্থন করিতেছে এবং এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানাইতেছে ;

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণার সঙ্গে স্বীয় সংহতি ঘোষণা করিতেছে এবং বিপ্লবের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিরলসভাবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে কাজ করিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে ;

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট জাতীয় প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিপ্লব আরোপিত যে কোন দায়িত্ব পালনে এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতার কথা ঘোষণা করিতেছে ;

এবং দেশের আপামর জনগণের সঙ্গে একাত্ম হইয়া সকল বাধা-বিপত্তি-প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করিয়া সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়িয়া তুলিবার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ঘোষণা করিতেছে।

সিদ্ধান্ত (২)

উপরোক্ত বিশেষ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

জনাব মনিরুল হক চৌধুরীর স্থলে জনাব শেখ শহীদুল ইসলামের সিনেট সদস্য পদে মনোনয়ন সম্পর্কে চেয়ারম্যানের বক্তব্য।

জনাব চেয়ারম্যান জনাব মনিরুল হক চৌধুরী অন্য সাংগঠনিক কার্যে ব্যস্ত থাকবেন বলে সিনেটের সদস্য হিসেবে পদত্যাগ করেছেন, তাঁর জায়গায় ডাকসু জনাব শেখ শহীদুল ইসলামকে মনোনয়ন দান করেছে। সিনেটের সদস্য হিসেবে জনাব মনিরুল

হক চৌধুরী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং আশা করি জনাব চৌধুরী তাঁর বর্তমান ও ভবিষ্যত দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সফল হবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অধ্যাদেশ পরিবর্তনের প্রস্তাব।

জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম : জনাব চেয়ারম্যান, আমি প্রস্তাব করছি;

যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট মনে করে যে দেশে সাম্প্রতিক সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের ফলে দেশে একটি নতুন পটভূমির সৃষ্টি হইয়াছে;

এবং যেহেতু দেশের সামগ্রিক পটভূমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে;

এবং যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ এই নতুন পটভূমি সৃষ্টি হইবার পূর্বে পুরাতন পটভূমিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারী করা হইয়াছিল;

এবং যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ নতুন জাতীয় পটভূমিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা পালনে যথাযথ নহে;

সেইহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের এই বিশেষ অধিবেশন মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে দেশের নতুন পটভূমির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জন ও সংশোধন করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

জনাব এনায়েত হোসেন খান : আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

ড. হারুন-অর-রশিদ : এ প্রস্তাবটি আমার নিকট সুস্পষ্ট নহে।

জনাব শেখ শহিদুল ইসলাম : আমি প্রস্তাবটি আবার পড়ছি। (প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করা হইল)

জনাব হুমায়ুন খালিদ : জনাব শেখ শহিদুল ইসলামের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বলতে চাই যে তাঁহার এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব।

ড. আখতারুজ্জামান আমি একজন সদস্য হিসেবে বলতে চাই যে জনাব ইসলামের এ প্রস্তাব পাশ করার পূর্বে বিষয়টি অধ্যাদেশ সম্পর্কিত সিনেট কমিটি বিবেচনা করুক।

জনাব আহসানুল হক : আমি বলতে চাই যে, রাষ্ট্রীয় চারিটি মূলনীতি–সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ আমাদের সামনে এগিয়ে দেবে। আমি মনে করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশে অসঙ্গতি দূরীকরণার্থে যে কমিটি গঠিত হয়েছে এই বিষয়টি ঐ কমিটিতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জনাব আবদুর রাজ্জাক : আমি সিনেট সদস্য শেখ শহীদুল ইসলামের প্রস্তাবের সমর্থন করে বলতে চাই, জনাব শহীদ বলেছেন, রাষ্ট্রপতির আদেশে দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে এবং সেখানে একটি মাত্র জাতীয় দল। তার সঙ্গে অঙ্গ দল আছে। নূতন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবটি আনা হয়েছে। সিনেট কমিটির বিবেচ্য বিষয়ের সঙ্গে এর কোন মিল নেই।

জনাব এনায়েত হোসেন খান : মাননীয় চেয়ারম্যান, প্রথম সমর্থনকারী হিসেবে এসম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমার মনে হয় শেখ শহীদুল ইসলামের প্রস্তাব অনুযায়ী কি পন্থায় অধ্যাদেশের পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হ'বে তা' মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচার করে দেখবেন, কমিটি সাব-কমিটি গঠন করার প্রয়োজন হবে কিনা।

ড. আখতারুজ্জামান : আমরা যে জাতীয় আদর্শ অনুসরণ করে চলছি, তার সাথে এ প্রস্তাবের কোন বিরোধ আছে বলে আমার মনে হয় না। আমরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি কিনা সে সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার।

ড. কাজী আবদুল ফাত্তাহ : যে সিনেট কমিটির কথা বলা হয়েছে তার বিবেচ্য বিষয় এবং প্রস্তাবের কথা এক নয়। সুতরাং রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে যে নূতন অধ্যাদেশ আসবে সেখানে যদি কোন অসঙ্গতি থাকে তবে তা আমরা ঐ কমিটিতে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে পারি।

জনাব আবদুল হাকিম : যে সিনেট কমিটির কথা আলোচনা হচ্ছে প্রস্তাবটি সে কমিটিতে বিবেচনার জন্য পাঠানোই সঙ্গত বলে আমি মনে করি।

জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : মাননীয় চেয়ারম্যান, শেখ শহীদের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। যদি এখানে এ-প্রস্তাব গ্রহণ করা না-হয় তবে রাষ্ট্রীয়নীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা বিঘ্নিত হ'বে। এ বিষয়ে আমরা নূতন প্রস্তাব নিতে পারি। শেখ শহীদুল ইসলামের প্রস্তাব গ্রহণ করা না-হলে, কথাটা দাঁড়ায় যে, কমিটিতে পাঠিয়ে এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার পথে বাঁধার সৃষ্টি করা। ঐ কমিটিতে যে আলোচনা হ'বে, তা' শুধু কমিটিতে সীমাবদ্ধ থাকবে। সে জন্য মূল প্রস্তাবটা গ্রহণ করা হোক। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমির প্রেক্ষিতে কোন কিছু করতে হলে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে।

জনাব সৈয়দ আহমদ হোসেন : এখানে আমার একটি বক্তব্য আছে। সে বক্তব্যটি হোল, আমরা যারা আলোচনায় অংশ নিচ্ছি তাদের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা যায়। নীতিগতভাবে আমরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি। আমাদের মানসিক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি।

জনাব ফজলি হোসেন : যে সিনেট কমিটি আমরা গঠন করেছি তার বিবেচ্য বিষয় এবং যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপিত হয়েছে, এ দুটো জিনিষ এক নয়। কাজেই প্রস্তাবটি আমরা বিবেচনা করতে পারি।

ড. এ. জলিল মিয়া : আমাদের অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিনেটের অধ্যাদেশ সংশোধনের

কোন ক্ষমতা আছে কি? যদি সিনেট কমিটির কোন ক্ষমতা না-থাকে, তবে আমরা এ দুটো মিলিয়ে একটা কিছু করতে পারি কিনা তা দেখা প্রয়োজন।

জনাব আবদুস সোবহান : প্রশ্ন হলো অসঙ্গতি দূরীকরণের জন্য গঠিত সিনেট কমিটি আইনগত কিনা। আমার মনে হয় এটা আইনের মধ্যে রয়েছে। ইনকন্-সিস্টেনসিসের ব্যাপারটা যে কমিটির, সে কমিটি পরীক্ষা করতে পারে। সেদিকে নজর রেখে বর্তমান প্রস্তাবও গ্রহণ করা যেতে পারে।

ডা. টি. হোসেন : আমার মনে হয় আলাদাভাবে গ্রহণ করতে পারি। একটির সঙ্গে আরেকটির মিল থাকার কথা নয়।

জনার চেয়ারম্যান : এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার এ-ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন, নূতন রাজনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পরিবর্তন আসবে। অসামঞ্জস্য দূরীকরণের জন্য ইতিমধ্যে একটি কমিটি করা হয়েছে। আপনাদের পক্ষ থেকে আমি বলেছিলাম যে, সিনেট এ-উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেছে। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, অধ্যাদেশ পরিবর্তন করার সময় এই কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করা হবে। কমিটির রিপোর্ট সিনেটে আসবে, সিনেট তা অনুমোদন করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবে।

জনাব সৈয়দ আহমদ হোসেন : ১৯৫১ সাল হতে আমি এ সিনেটের সদস্য। আমি তখন থেকে দেখে আসছি সিনেটের রিপোর্ট অনুমোদন করার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানোর দরকার নেই, সিনেট যা অনুমোদন করে দেবে তা কার্যকরী হবে, কারণ সিনেটের মূল্য অনেক।

জনাব এ. এফ. এম. সফিয়্যুল্লাহ এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক। আমি বলব আমাদের যা দরকার তা নেয়া উচিত।

জনাব চেয়ারম্যান : জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম, আপনি আপনার প্রস্তাবটি আবার পাঠ করুন। [জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম–আবার প্রস্তাবটি পাঠ করলেন।]

সিদ্ধান্ত (৩)

জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম কর্তৃক আনীত উপরোক্ত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সিনেট সদস্যের বাকশালের বিভিন্ন কমিটির সদস্যপদ লাভের জন্য অভিনন্দন

জনাব আবুল কাশেম : নূতন জাতীয় রাজনীতির পটভূমিতে আমাদের সিনেটের কয়েকজন সদস্য মন্ত্রীপদ এবং জাতীয় দলের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্যপদ লাভ করেছেন, এই প্রেক্ষিতে আমি একটি অভিনন্দনমূলক প্রস্তাব আনতে চাই :

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের এই বিশেষ সভা সিনেটের যে সমস্ত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ জাতীয় সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা জাতীয় রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ'-এর বিভিন্ন কমিটির এবং অঙ্গদলের সদস্যভুক্ত

হইয়াছেন তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছে। সিনেট আশা করে যে, তাঁহাদের এই নিয়োগের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হইয়াছে, ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব অভিযোগ সরকারের নিকট ভালভাবে পেশ করা ও পূরণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে।"

জনাব. এ. এফ. এম. সফিয়্যুল্লাহ : আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

জনাব চেয়ারম্যান : আমার নিজের পক্ষ হইতে এবং সিনেটের অন্যান্য যে সমস্ত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ জাতীয় সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা জাতীয় রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ'এর বিভিন্ন কমিটির এবং অঙ্গদলের সদস্যভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষ হইতে জনাব আবুল কাশেম সাহেবের উপরোক্ত প্রস্তাবের জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

সিদ্ধান্ত (৪)

উপরোক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।